নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের (কলা) পিএইচ.ডি উপাধির
জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক : দেবলীনা পাল

পিএইচ.ডি রেজিস্ট্রেশন নম্বর : F.I.NO :247/13/ARTS

তারিখ : 25/07/2013

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা ড. গোপা দত্ত

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২, পশ্চিমবঙ্গ

২০২১

Certified that the Thesis entitled

---

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of ----------

---

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the
Supervisor :
Dated :

Candidate :
Dated :

প্রস্তাবনা

২০১২ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ড: দীপান্বিতা ঘোষের তত্ত্বাবধানে গবেষণাকর্মের সূচনালগ্নে বিষয়ক্ষেত্রটি ঠিক এই কথাসাহিত্য ছিল না। ঘটনা পরম্পরায় নাম নথিভুক্তকরণের সময় বিষয়ক্ষেত্র নির্বাচিত হল কথাসাহিত্য এবং আরও একটু বিশিষ্ট করে বলা চলে প্রতিবন্ধী চরিত্র। ''নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র'' -এই শিরোনাম নিয়েই ২০১৩ থেকে কাজ শুরু। গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড: দীপান্বিতা ঘোষ। একদিনের এক মৌখিক প্রাথমিক আলোচনা দুজনের। তারপরের ঘটনা অচিন্তপূর্ব। অধ্যাপিকা ড: দীপান্বিতা ঘোষের অসুস্থতা এবং অকালপ্রয়াণ। তখন ২০১৪। কাজ খুব বেশি এগোয়নি। বাংলা কথাসাহিত্যের বিপুল ভান্ডার থেকে গুটি কয় চরিত্র খুঁজে পাওয়া চলছে। ২০১৫, এই মাঝদরিয়ায় হাল ধরলেন আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড: দীপান্বিতা ঘোষের শিক্ষাগুরু ড: গোপা দত্ত। গবেষণাকর্মের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি পদক্ষেপে তত্ত্বাবধায়ক ড: গোপা দত্তের সুচিন্তিত মতামত আমার পরম পাথেয়।

গ্রিক ইলিয়াড ওডিসি মহাকাব্যের রচয়িতা ধ্রুপদী কবি হোমার ছিলেন অন্ধ।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানি স্টিফেন হকিং ১৯৬৩ সালে ২১ বছর বয়সে Motor Neurone Disease (amyotrophic lateral sclerosis) রোগে আক্রান্ত হয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে তাঁর বাচনিক ক্ষমতাও চলে যায়। কিন্তু তবুও তিনি তার গবেষণাকর্ম উত্তরোত্তর চালিয়ে যেতে থাকেন। বিশেষ একধরণের ভাষা-উৎপাদনকারী যন্ত্রের সাহায্যে তিনি অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। প্রথমে হাতের স্পর্শের মাধ্যমে এবং তারপর যখন হাত চালানোর শক্তিও হারান হকিং, তখন গালের পেশীর ন্যূনতম সঞ্চালনের মাধ্যমে যন্ত্রচালনা করে অন্যের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতেন। বিজ্ঞানীর এই কর্মকান্ড শুধুমাত্র তার গবেষণার জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তার সংগ্রামী ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল।

হেলেন কেলার (২৭ জুন ১৮৮০- ১ জুন ১৯৬৮) মাত্র ১৯ মাস বয়সে গুরুতর অসুস্থতার দরুণ বাক্ ও শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলেন। এরপর ছয়বছর বয়সে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী টেলিফোন আবিষ্কর্তা গ্রাহাম বেলের কাছে হেলেনের বাবা-মা তাকে নিয়ে গেলে, তার আসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় বেল বুঝতে পারেন পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেলে স্বাভাবিকের কাছাকাছি সুন্দর জীবন যাপন করা সম্ভব হতে পারে কেলারের পক্ষে। আটবছর বয়সে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এনি সুলিভানের কাছেই কেলার এর পড়াশুনায় সূত্রপাত। হেলেন এরপর সমাজের বাক্-শ্রবণ এবং দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ

করেন। ১৯৪১-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অনুরোধে কেলার বিভিন্ন হাসপাতালে যুদ্ধাহত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী নাবিক ও সৈনিকদের পাশে দাঁড়াতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক স্তরে কেলার বাক্-শ্রবণ ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর রচিত বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল The Forest King (1891), The Story of my life (1903), The World I live in (1908), Out of the Dark,a series of essays on socialism (1913), My Religion (1927, Also called "light in my Darkness), Let us have Faith, ইত্যাদি। দৃষ্টি ও বাক্-শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের বিড়ম্বিত জীবনকে কেন্দ্র করে কেলার একটি চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেন-Deliverance-1919,যেখানে নিজের ভূমিকায় তিনি নিজেই অভিনয় করেন।

এই তিনজনের জীবন আমাকে এ গবেষণায় বিশেষ আগ্রহ জাগিয়েছে।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজ যাদের এককথায় প্রতিবন্ধী মানুষ বলে পরিচয় দেয়, দেখা যায় তারা আসলে মোটেই অক্ষম নয়, বরং তারা প্রতিস্পর্ধী- বিশেষ সক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। যারা সমাজের চোখে করুণার পাত্র, উপহাসের পাত্র তাদের জগৎকে তাদের চোখ দিয়ে দেখানোর যে প্রচেষ্টা সাহিত্যক্ষেত্রে রয়েছে তাকে উন্মোচিত করাই আমার গবেষণাকর্মের প্রধান লক্ষ্য।

গবেষণা-কাজের আমার ভূতপূর্ব তত্ত্বধায়ক ড. দীপান্বিতা ঘোষের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Special Education & HEPSN Cell-এর মার্চ,২০১৩ এর International Research Journal "Persons with special Needs and Rehabilitation Management (Vol-I, ISSN: 2321-9254) এ প্রকাশিত ‘পুরাণ ও সাহিত্যে অক্ষম প্রতিস্পর্ধী চরিত্রেরা’ প্রবন্ধটি এ বিষয়ে আমার প্রাথমিক অবলম্বন। পরবর্তীকালে এ সংক্রান্ত আরোও কিছু মূল্যবান লেখাপত্র নজরে আসে। গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে মূলত: আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের মধ্যে কয়েকটি নির্বাচন করে, প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ, ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভূমিকা আলোচনার সাথে সাহিত্যকারের কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়েছে চরিত্রগুলি, তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

কাজটি করার জন্য প্রচুর পরিমাণে সময় অতিবাহিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে। এ জন্য বিশেষভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণমঠ ও মিশন গ্রন্থাগার বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠান এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মীদের। দীর্ঘ বন্ধুর পথযাত্রায় পরম সন্তোষসহ কাজ শেষ করতে পেরেছি পরিবারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায়। সবাইকেই আমার শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ।

গবেষণাকর্মের মূল অবলম্বন বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে সংগৃহীত মূল রচনাগুলি। এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিন-গ্রন্থাগারেরও সাহায্য নিয়েছি অনেক সময় মূল গ্রন্থাদি পড়ার জন্য।গবেষণাপত্রটি লেখার ক্ষেত্রে বাংলা সংসদ বানানবিধি ব্যবহার করেছি । লেখন ব্যবহৃত বানান অবিকৃত রেখেছি।'আমার বাংলা' সফটওয়ারে গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি লিখিত হল। শব্দের বানানশুদ্ধতা বজায়ের চেষ্টা করেছি, এরপরও কোনো ভুল-প্রমাদ যদি থেকে যায়, সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।

দেবলীনা পাল
বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় :

প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ ও প্রকৃতি ৭

দ্বিতীয় অধ্যায় :

মিথ পুরাণ মহাকাব্য : নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্রে প্রয়োগ ও পরম্পরা ৩৩

তৃতীয় অধ্যায় :

প্রাক আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র ৫৯

চতুর্থ অধ্যায় :

সময় বিবর্তনের কালপর্বে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র ৮৯

পঞ্চম অধ্যায় :

আইনের অনুশাসনের কালান্তর ও নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র ১২৬

ষষ্ঠ অধ্যায় :

নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র : চরিত্রকেন্দ্রিক আলোচনা ১৪২

সপ্তম অধ্যায় :

বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের ধারা ও নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র ৩৯০

অষ্টম অধ্যায় :

কৌতুকরসাশ্রিত সাহিত্যধারা ও নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র ৪০৪

নবম অধ্যায় :

প্রতিবন্ধকতা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি : নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র ৪১৫

উপসংহার ৪৫২

পরিশিষ্ট ৪৫৮

গ্রন্থপঞ্জি ৪৬৩

ভূমিকা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচডি উপাধির জন্য আমার গবেষণা সন্দর্ভের বিষয় শিরোনাম 'নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র' । সংসদ-এর বাংলা অভিধানে প্রতিবন্ধী'র সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যে মানুষরা চলার পথে প্রতিমুহূর্তে বাধাপ্রাপ্ত হয়। 'প্রতিবন্ধী' শব্দটি প্রতিবন্ধ (সং . প্রতি+v বন্ধ্+অ)- শব্দের বিশেষণ রূপ।[১]কথাসাহিত্যের বিপুল আঙিনায় এই চরিত্র সংখ্যা খুব বেশি নয়। যদিও বা আছে অল্পবিস্তর, তবুও খুব কমই এরা প্রধান চরিত্র। সাধারণত: পার্শ্বচরিত্র হিসাবেই রয়েছে এই চরিত্রগুলি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য এরা প্রধান চরিত্রও হয়ে উঠেছে। বাংলা কথাসাহিত্যে আলোচনা প্রসঙ্গের আগে মিথ পুরাণ ও মহাকাব্য এবং প্রাচীন ও মধ্যবাংলার সাহিত্যভান্ডার থেকেও বেশ কিছু চরিত্র তুলে আলোচনার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত আলোচনা করেছি সার্বিকভাবে প্রতিবন্ধকতা নিয়েও।

প্রতিবন্ধকতা নিয়ে চর্চা পাশ্চাত্যে অনেকদিন ধরে চলে আসলেও বিষয়টি বাংলায় একেবারেই বহুল প্রচলিত নয়। প্রথমদিকের ব্যক্তিমানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা ধীরে ধীরে সামাজিক স্তরে পরিণত হয়েছিল। প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত আলোচনার (Disability Studies) প্রাথমিক পর্যায়ে তাই 'Impairment' এবং 'Disability' শব্দদুটির বিভেদ সুস্পষ্ট করার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। সেই থেকে দুটি মডেল উঠে আসে। প্রথমত: শারীরিক প্রতিবন্ধকতা (medical disability), যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজস্ব অক্ষমতার ক্ষেত্রটি নিজের ক্ষেত্র পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়ত: সামাজিক প্রতিবন্ধকতা (social disability), এক্ষেত্রে ব্যক্তির অক্ষমতা বৃহত্তরভাবে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

Disability study বিষয়ে Britanica-র মতে,Disability Studies অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত ১৯৬০-এর সময়ে আমেরিকায়। এই ধারায় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে (United Kingdom) UPIAS (Union of the Physically Impaired Against Segregation) আইন দ্বারা অক্ষম মানুষদের সামাজিক ও নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণ করা হয়। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় Irving Zola এবং Michael Oliver এর প্রচেষ্টায় সূচিত হয় Society for Disability Studies (SDS ; originally section for the Study of Chronic Illness, Impairment and Disability [SSCIID]). Disability Studies অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত আলোচনার উদ্দিষ্ট অক্ষম মানুষদের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে চিকিৎসা-মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করার পরিবর্তে আর্থ-সামাজিক-মানবিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা। এই ধারার গবেষণায় সাহিত্য-বিনোদন-সংবাদমাধ্যম-আইনী অনুশাসনগুলি পর্যালোচনা

করে ভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি-লিঙ্গ-আর্থসামাজিক স্তরায়ন সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী মানুষদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা, বর্তমান সমসাময়িক-অতীত সাপেক্ষে আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং রীতি করে প্রতিবন্ধী মানুষদের উন্নততর জীবনযাপনের প্রচেষ্টা থাকে। এই গবেষণার আসল উদ্দেশ্য অক্ষম মানুষরা যাতে জীবনযাপনে সামাজিক ন্যায়বিচার (social justice) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় methodology এবং approach-এর উদ্ভাবন ও প্রয়োগ।[২]

উইকিপিডিয়া Disability Studies সংক্রান্ত আলোচনার পরিধি স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর করার কথা বলেছে। অক্ষমতাযুক্ত মানুষদের সামাজিক কুসংস্কারের (social stigma) গন্ডী থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর আঙিনায় আনার বিষয়টিকে জোর দেওয়া হয়েছে প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত আলোচনায় (Disability Studies)। এক্ষেত্রে সমাজ-সাহিত্য-ইতিহাস-আইন সমস্ত প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে সমাজে অক্ষম মানুষদের অবস্থান দেখানোর পাশাপাশি সামাজিক দৃষ্টিকোণ এই মানুষদের অবস্থার উন্নয়ন, আইনী স্বীকৃতির মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠাকরণ এবং অনগ্রসরতা দূরীকরণ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। এই Disability Studies সংক্রান্ত গবেষণায় তত্ত্বধায়ক এবং গবেষক-সহ গবেষণাকার্যে যুক্ত প্রত্যেককে নতুন আদর্শ-তত্ত্ব উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিক-ব্যষ্টিক এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়া বহু দৃষ্টিকোণ দেখানোর কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ একজন ব্যক্তি সাপেক্ষে যেমন হবে, তেমনিই বিশেষের প্রেক্ষিতে সেই স্থিতী সাধারণীকরণের স্তরে কীরূপ হবে তাও বিচার্য।[৩]

উইকিপিডিয়া ও ব্রিটানিকার মত সাপেক্ষে বলা যায়, পাশ্চাত্য-গবেষণা লব্ধ প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত পাঠ মূলত: প্রতিবন্ধকতা-সম্পন্ন মানুষদের শারীরিক ও মানসিক অসম্পূর্ণতার চাহিদা বোঝার সঙ্গে, প্রতিবন্ধকতার ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটটি অনুধাবনের চেষ্টা করে। বর্তমান গবেষণা-অভিসন্দর্ভটিতে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত সেইসব প্রতিবন্ধী চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা হল, যাদের প্রতিবন্ধকতা সমাজের উপর প্রভাব ফেলেছে। অভিমুখ চরিত্রগুলি প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে সমাজের অবদান কি, সমাজ-বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে চরিত্ররা কতটা স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসিত হতে পেরেছে, সেটারও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গবেষণা-অভিসন্দর্ভটি আলোচনার পরিসর বিষয়ানুসারে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভাজন করে বিশ্লেষণের প্রয়াসী হয়েছি। ভূমিকা, প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে সমাজ, আইনী অনুশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বহুল উল্লেখ থাকলেও, আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে তাদের কিভাবে দেখানো হয়েছে তা দেখানো।প্রথম অধ্যায়ে, প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে

আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, দেশবিদেশের মিথ পুরাণ মহাকাব্যে প্রতিবন্ধীদের স্থান এবং আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে তাদের প্রয়োগ দেখানোর চেষ্টা করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রাক্-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্রের অবস্থান নির্ণয় করেছি। চতুর্থ অধ্যায়ে, সময় বিবর্তনের ধারায় প্রতিবন্ধী চরিত্রদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছি। পঞ্চম অধ্যায়ে, আইনের অনুশাসনে যুগে-যুগান্তরে প্রতিবন্ধী চরিত্রদের অধিকার রক্ষা প্রসঙ্গে বাস্তব সমাজে তাদের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে, নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতিবন্ধীদের চরিত্র আলোচনা করেছি। সপ্তম অধ্যায়ে, শিশু-কিশোর সাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্রদের প্রয়োগ আলোচনা করেছি। অষ্টম অধ্যায়ে, হাস্য ও কৌতুক রসের ধারায় প্রতিবন্ধী চরিত্রের বিশিষ্ট প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। নবম অধ্যায়ে, প্রতিবন্ধী চরিত্রদের প্রতিবন্ধকতা এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। উপসংহারে, সমগ্র আলোচনা সাপেক্ষে উপলব্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি মূলত: কথাসাহিত্য কেন্দ্রিক হলেও আইনের অনুশাসন এবং সমাজপ্রেক্ষিতে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করেছি।

গবেষণা অভিসন্দর্ভে প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে দৈহিক (medical) এবং সামাজিক (social) দুটি মডেলই গৃহীত হল। ব্যক্তি তো সমাজেরই অঙ্গ। ব্যক্তিই গঠন করে সমাজ। তাই সমাজ এবং ব্যক্তিকে পৃথকসত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। রাষ্ট্র ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষিত করে আইনের অনুশাসন দ্বারা। নাগরিকরাই রাষ্ট্রের ভিত্তি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইনের অনুশাসন তৈরী বা সংশোধন, পরিমার্জনের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে।সমাজে একজন প্রতিবন্ধী মানুষের অবস্থান এবং সেই অবস্থান সূচিত ও পরিবর্তিত করার ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকা সময়ান্তরে কেমন তার প্রতিফলন বাংলা কথাসাহিত্যে কতটা পরিস্ফুটিত তা দেখার চেষ্টা করেছি গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে।

গবেষণা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছাড়াও গ্রন্থাগারগুলি থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। অভিসন্দর্ভের প্রাথমিক আকর নির্বাচিত গল্প ও উপন্যাসগুলি এবং গৌণ-আকর প্রাক্-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য এবং গবেষণার বিষয় সংক্রান্ত বইপত্র এবং web-link গুলি।মূল রচনা অবলম্বনে পারপার্শ্বিক সমাজ পরিবেশ এবং মানবমনের গহনতলের সন্ধান করার চেষ্টা করেছি। কথা সাহিত্যের প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলি কিভাবে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছে তারই অনুসন্ধান করেছি। মিথ পুরাণের যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তাদের সামাজিক অবস্থানগত কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা তার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছি। দেশভেদে মানুষের মানসিকতার তারতম্য এই মানুষগুলির প্রতি সেটাও দেখানোর চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্র

১. মুখোপাধ্যায় অশোক। সংসদ বানান অভিধান। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। সেপ্টেম্বর ২০১৮। ISBN : 978-81-7955-175-X.পৃ. ৫৪১.

2. **Disability studies**, an interdisciplinary area of study based in the humanities and social sciences that views disability in the context of culture, society, and politics rather than through the lens of medicine or psychology. In the latter disciplines, “disability” is typically viewed as a distance from the “norm” in order to bring the disabled closer to the established norm. This area of study questions that view and presents a variety of perspectives on disability, from contemporary society as well as from a range of cultures and histories. Seeking to broaden the understanding of disability, to better understand the experience of disability in society, and to contribute to social change for people with disabilities, the discipline challenges the idea of the normal-abnormal binary and suggests that a range of human variations are “normal.”

   Like African American studies, women’s studies, and Latino/a studies, which were outgrowths of the civil rights and women’s movements, disability studies’ roots are in the disability rights movement of the 1960s. In the United Kingdom the Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS), formed in 1972, was instrumental in politicizing disability in the U.K. and abroad. In the United States the disability rights movement advocated for legislation relating to the civil rights of individuals with regard to employment, education, and accessible transportation. Inspired by UPIAS, the Society for Disability Studies (SDS; originally Section for the Study of Chronic Illness, Impairment, and Disability [SSCIID]) was started in 1982 by a group of American academics led by activist and writer Irving Zola. Michael Oliver, a disabled sociologist, helped to push the movement into academia with his book *Politics of Disablement: A Sociological Approach* (1990), in which he analyzed how a social issue such as disability gets cast as an individual medicalized phenomenon.

   While the political movements initially led social scientists to explorations of disability, researchers in the arts and humanities have also taken up the study of disability. The interdisciplinarity that characterizes the field allows for a variety of methodologies and approaches to be applied to the study of disability. Some of those include narratives of disability; analysis of representations of disability in literature, the arts, the law, and the media; challenges to the absence of disabled researchers in academia; the writing or rewriting of histories of disability; creation of visual art, performance, and poetry that highlights the experiences of disabled people in a world built for the nondisabled; philosophies of justice that speak directly to the interests of the disabled; and narratives and analyses of the experience of living with a disability and how that intersects with race, class, and gender.. (https://www.britannica.com/topic/disability-studies)

3 Using an interdisciplinary, multidisciplinary approach. Disability sits at the intersection of many overlapping disciplines in the humanities, sciences, and social sciences. Programs in Disability Studies should encourage a curriculum that allows students, activists, teachers, artists, practitioners, and researchers to engage the subject matter from various disciplinary perspectives.

- Challenging the view of disability as an individual deficit or defect that can be remedied solely through medical intervention or rehabilitation by "experts" and other service providers. Rather, a program in Disability Studies should explore models and theories that examine social, political, cultural, and economic factors that define disability and help determine personal and collective responses to difference. At the same time, Disability Studies should work to de-stigmatize disease, illness, and impairment, including those that cannot be measured or explained by biological science. Finally, while acknowledging that medical research and intervention can be useful, Disability Studies should interrogate the connections between medical practice and stigmatizing disability.
- Studying national and international perspectives, policies, literature, culture, and history with an aim of placing current ideas of disability within their broadest possible context. Since attitudes toward disability have not been the same across times and places, much can be gained by learning from these other experiences.

Encouraging participation by disabled students and faculty, and ensuring physical and intellectual access. Prioritizing leadership positions held by disabled people; at the same time, it is important to create an environment where contributions from anyone who shares the These communities on their own are topics of numerous deliberations; however, they also often link in significance in many ways. The significance of the movements began to build momentum and most legal recognition in the 1980s. It was only in 1973 that the American Psychiatric Association removed homosexuality from their list of mental disorders.[45] In addition to this, it was about forty years later in 2013 that the *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition* (DSM-5) changed the listing of transgender to "gender dysphoria".[46]

One of the most notable circumstances where the case of these two minority rights come together was the court case *In re Guardianship of Kowalski*, in which an accident that occurred in 1983 left 36-year-old Sharon Kowalski physically disabled with severe brain injuries.[47] The court granted guardianship of her to her homophobic parents who refused visitation rights to her long time partner, Karen Thompson. The court case lasted nearly ten years and was resolved by granting Thompson custody in 1991.[48] This was a major victory in the realm of gay rights but also called to attention the validity of rights for those who identified under the queer and disabled spectrum. Numerous support groups emerged from necessity to create safe spaces for those identifying in these specific minority groups such as

the founding of the Rainbow Alliance of the Deaf in 1977,[*citation needed*] the Lesbian Disabled Veterans of America group in 1996[*citation needed*] which then became the Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Disabled Veterans of America, and the San Francisco Gay Amputees group in 2006.

A 2012 study showed that disability was more common in LGBTQ individuals when compared to heterosexual peers.[49] It was also shown that the LGBTQ group with disabilities were noticeably younger in age than the heterosexual group.

It is also a large topic of discussion to say that both groups have to undergo the same kind of "coming out" process in terms of their sexual identity, gender identity, and disability identity because of the lasting social stigma.[50] "Coming out" through sexual identity, gender identity, and disability identity is one example of "Double Jeopardy", as they are part of more than one stigmatized group.

Queer studies, which emerged from women's studies, brings light towards the different kind of oppression queer and transgender people with disabilities have. For example, the Americans with Disabilities Act dismisses gender disphoria because of its moral case against transgender people.[51] Queer studies are commonly associated with people with disabilities who identify as "Crip" and is commonly believed that queer politics must incorporate crip politics.[52] Alison Kafer describes a first-person experience of identifying queer and crip both reappropriated terms in Kafer's novel, *Feminist Queer Crip*. Kafer describes the politics of the crip future and "an insistence on thinking these imagined futures – and hence, these lived presents - differently".[53] Although many activists with disabilities find empowerment in appropriating the term crip, not all people with disabilities feel comfortable using that identity.[54] There are many different terms used as an alternative to disability, for example Melwood, a nonprofit who uses the term "differing abilities", describes the label disability as "a limitation in the ability to pursue an occupation because of a physical or mental impairment; a disqualification, restriction or disadvantage and a lack of legal qualification to do something, was an inadequate or limiting 'label' for a cross section of people".[55] Because the term disability has a history of inferiority, it is believed by many that substituting the term will help eliminate the ableism that is embedded within it. Susan Wendell describes ableism in society "as a structure for people who have no weakness".[56] This also applies to anyone who has any intersectional disadvantages. Feminism identifies these disadvantages and strategizes how to deconstruct the system that supports marginalizing specific groups of people.

- above goals are welcome.(. https://en.wikipedia.org/wiki/Disability_studies)

প্রথম অধ্যায়:

প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ ও প্রকৃতি

প্রতিবন্ধী কাকে বলা হয়? যে মানুষেরা সাধারণ মানুষের যা যা কর্মক্ষমতা থাকে সেগুলি থেকে বঞ্চিত, তাদেরই প্রতিবন্ধী বলা যায়। কিন্তু সব মানুষই কি সব কাজ করতে পারে? না, পারে না। bn.wikipedia.org/wik/ প্রতিবন্ধী অনুসারে বলা যায়, বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান সর্ববিধ অবস্থা অনুযায়ী আর পাঁচ-দশজন সাধারণ মানুষ যে কাজগুলি করতে পারে, বিশেষ কোনো কারণ তথা impairment দরুণ কোনো মানুষ যখন তার প্রাত্যহিক জীবনযাপনের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মগুলি নির্বাহ করতে পারে না, তখন তার সেই বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় প্রতিবন্ধকতা বা disability। impairment বলতে দেহের বিশেষ কোনো অংশ বা অঙ্গ বা তন্ত্রের আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষণস্থায়ী বা চিরস্থায়ীভাবে স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা লুপ্ত হবার অবস্থাকেই বোঝায়। এই বিশেষ অবস্থার মানুষদের প্রতিবন্ধী নামে চিহ্নিত করে থাকে সমাজ-পরিবেশ।

বর্তমান সমাজ 'প্রতিবন্ধী' শব্দটি পরিহার করতে চায়। আধুনিক উন্নতমানের বিজ্ঞানের শক্তিতে এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলিকে অনেক পরিমাণেই প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। মানুষও অনেকটাই বদলেছে। তাই বর্তমানে এদের প্রতিবন্ধী না বলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বা বিশেষভাবে সক্ষম (Differently abled) মানুষরূপে পরিচয় করানো হয়। এতে আপাতভাবে সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীরও কিছুটা বদলের আভাস রয়েছে। এই মানুষরা আজ বিভিন্ন যন্ত্র বা উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে তাদের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক জীবনযাপনের শরিক হতে চলেছে। এখানে অবশ্যই সবথেকে বড় শক্তি হল মানসিক শক্তি। তাই এই শক্তি আরও বৃদ্ধির জন্য এবং এই positivity- তে যাতে সমাজের কোনোরকম নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে তাই 'প্রতিবন্ধী' শব্দটির পরিবর্তে নতুন শব্দ সংজ্ঞায়িত হয় 'বিশেষ-চাহিদা-সম্পন্ন' বা বিশেষভাবে সক্ষম- Differently abled।

প্রতিবন্ধকতার তাত্ত্বিক দিকটি আলোচনা করা যেতে পারে মূলত দুই ভাবে,-

১। প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ-

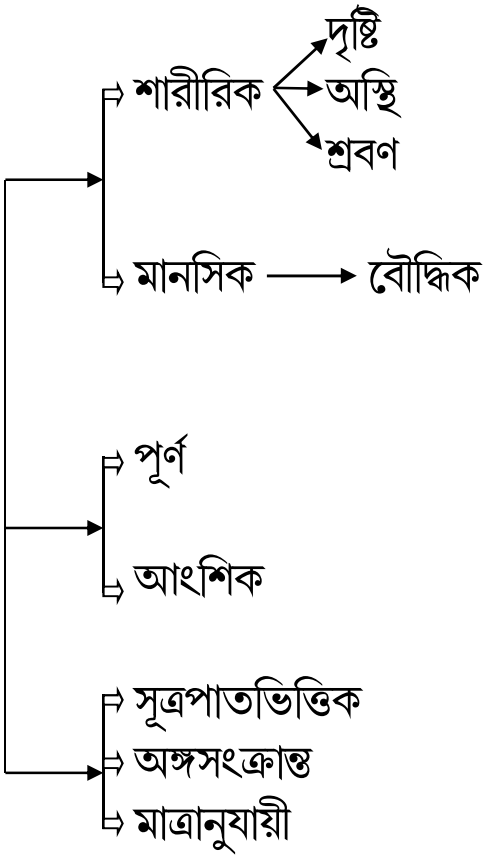

২। প্রতিবন্ধকতার কারণ-

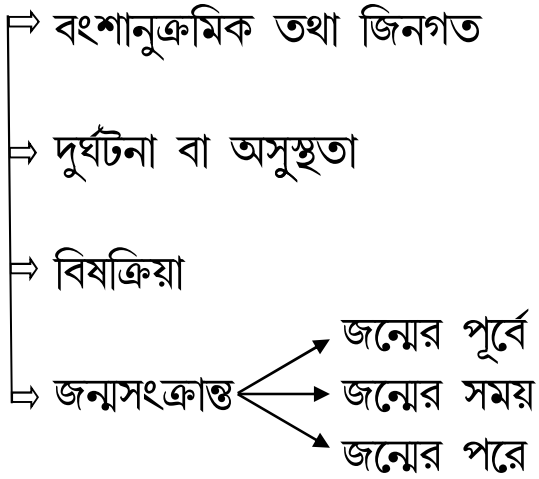

১। **প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ**

প্রতিবন্ধকতা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। তার শ্রেণীবিভাগ করার নির্দিষ্ট কিছু মানদন্ড নির্ণয় করা যায়।

***প্রতিবন্ধকতা সূত্রপাতের সময়কে ভিত্তি করে-**

সাধারণত: সব শিশুই যে সুস্থভাবে স্বাভাবিকরূপে পৃথিবীর আলো দেখে, অনেকসময় তা নাও হতে পারে। জন্ম থেকেই কোনো বিশেষ প্রতিবন্ধকতা নিয়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, সুস্থ স্বাভাবিক শিশু জীবনপথে এগিয়ে চলার সময় বিশেষ কোনো কারণে প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। সেই হিসাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়-

i) প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা- একটি শিশু জন্মের সময়ই যখন বিভিন্নরকম প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মলাভ করে, তাকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

ii) পরবর্তীসময়ে বা অর্জিত প্রতিবন্ধকতা- জন্মের সময় সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু পরবর্তীকালে যখন কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়, তখন তাকে এই পর্যায়ভুক্ত করা হয়।

****কোন অঙ্গ আক্রান্ত হয়েছে তার ভিত্তিতে-**

পঞ্চ ইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক। এর মধ্যে নাসিকা বাদে অন্য যে কোনো একটি বা একাধিক অঙ্গহানি ঘটতে পারে, যা নিত্যজীবননির্বাহে অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। শুধু এই পঞ্চেন্দ্রিয়ই নয় হাত ও পাও আছে যার অনুপস্থিতিতে মানুষ প্রতিবন্ধী জীবনযাপন করে। সেই ভিত্তিতে কয়েকটি শ্রেণিবিভাগ করা যায়।-

i) চলন গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

ii) হস্তজনিত প্রতিবন্ধী

iii) দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

iv) শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

v) বাক্ প্রতিবন্ধী

শুধুমাত্র অঙ্গ সংক্রান্তই নয়, অনেকসময় মানসিক স্থিতি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীও দেখতে পাওয়া যায়। এদের মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

i) উন্মাদ

ii) বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী-মানসিক জড়বুদ্ধি সংক্রান্ত তথা হাবা

একসঙ্গে একাধিক অঙ্গের প্রতিবন্ধকতা অত্যন্ত বিরল হলেও একেবারেই যে অসম্ভব, তা বলা যায় না। সাধারণত: তারাই বোবা হয়, যারা কানে শুনতে পায় না, বোবা-কালা। এই পর্যায়ের মানুষদের রাখা যায় নিম্নলিখিত পর্যায়ে-

i) বহুবিধ প্রতিবন্ধী

*****মাত্রা অনুযায়ী**

impairment যে সবক্ষেত্রে সমান হয়ে থাকে, তা নয়। মাত্রার তারতম্য হয়েই থাকে। সেই হিসাবে কয়েকটি ভাগ বলা যেতে পারে,-

i) মৃদু

ii) মাঝারি

iii) তীব্র

iv) চরম

যদিও এই মাপক যাই হোক না কেন, মানুষটিকে প্রতিবন্ধীই বলা হয় ।

একে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়-

i) পূর্ণ

ii) আংশিক

অনেকসময় প্রতিবন্ধকতার আঘাত পূর্ণ হয়, যেমন দুটি চোখই দৃষ্টিশক্তিহীন, কিংবা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। আবার কখনো এই আঘাত আংশিক হয়। যেমন দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরো অন্ধকারে চলে যায়নি, চোখে অল্প দেখা যাচ্ছে, কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির যে মাত্রা তা নেই। অতি অল্প ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নতা। সর্বক্ষেত্রেই এইরূপ দুই প্রকারভেদ দৃষ্ট।

২। **প্রতিবন্ধকতার কারণ**

সূত্রানুযায়ী প্রতিটি ঘটনারই কার্যকারণ যোগ থাকে। মানুষের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা ঘটে বিশেষ কারণ দ্বারা। কিন্তু সমস্ত প্রতিবন্ধকতার অন্তর্গূঢ় কারণ আবার জানা যায় না। যেমন বলা যায় মূলত উন্মাদের ক্ষেত্রে। উন্মাদের মানসিক ভারসাম্য ঘটে নিশ্চয় বিশেষ কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতিতে। মনের মধ্যে কোথাও একটা জট বাঁধে। যার সাথে পেরে উঠতে না পারায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগল হয়ে যায়। তবুও এই বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে কয়েকটি বিশেষ কারণ দ্বারা পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে।

***বংশানুক্রমিক বা জিনগত**

চিকিৎসাশাস্ত্রানুযায়ী বলা হয়ে থাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রক্তসম্পর্কসূত্রে নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন স্থাপিত হলে সেই দম্পতির সন্তান প্রতিবন্ধী হয়। শুধুমাত্র এই একটি কারণ নয়, বহু জেনেটিক রোগ আছে যার গতিপ্রকৃতি এখনো চিকিৎসাশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অধিগত নয়। হিমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি। বাবা বা মা বাহক হলে যে সব রোগ শিশুর মধ্যে বর্তায়।

****দুর্ঘটনা বা অসুস্থতা**

যে কোনো দুর্ঘটনায় এক বা একাধিক অঙ্গহানি হয়ে থাকে। শুধুমাত্র তাই-ই নয় অনেকসময় অঙ্গহানিও হয়।

অনেকসময় উচ্চমাত্রায় জ্বর, মেনিনজাইটিস, বসন্ত ইত্যাদি বহু রোগের কবলে পড়লে মানুষ প্রাণে তো বেঁচে যেত কিন্তু কোনো না কোনো এক বা একাধিক অঙ্গের হানি ঘটত। এখনো মেনিনজাইটিস হলে তা ঘটে।

*****বিষক্রিয়া**

মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু অসুখ বা ইনফেকশন থেকেও বিপরীত বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় অঙ্গহানি ঘটতে পারে। এই বিষক্রিয়া শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির অভাব। যেমন বলা যেতে পারে-

i) পুষ্টির অভাব

ii) ভিটামিনের অভাব

iii) আয়োডিনের অভাব

****জন্ম সংক্রান্ত**

শিশুর জন্ম অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই এটি চলে আসছে। এই জন্মকালীন কিছু ঘাটতি থেকেই শিশু সুস্থ স্বাভাবিকের পরিবর্তে হয় বিকলাঙ্গ বা বিশেষ কোনো পক্ষাঘাত আক্রান্ত। জন্মকালীন প্রক্রিয়াটিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগে করা যায়।-

i) **জন্মের পূর্বে-** প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন সলতে পাকানোর পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনই সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক শিশুকে ভূমিষ্ঠ করানোর জন্য মাকে গর্ভাবস্থাতেই বা গর্ভধারণের আগেই বেশ কিছু সাবধানতা বা সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়। নতুবা বিকলাঙ্গ শিশু প্রসবের ঝুঁকি থেকে যায়। সুস্থ সর্বাঙ্গসুন্দর শিশুর জন্য মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। শুধু মায়ের ভূমিকা বলা ভুল, মা এবং পরিবেশ-পরিবার-সমাজের ভূমিকা সুন্দর সুস্থ শিশু ভূমিষ্ঠের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

- মায়ের বয়স যদি ১৬ বছরের নীচে অথবা ৩০ বছরের বেশি হয় তাহলে শিশুর সুস্থতার বিষয়টিতে হানি ঘটতে পারে।
- গর্ভাবস্থার প্রথমদিকে রুবেলার মত কোনো বিশেষ সংক্রমণ দ্বারা আক্রান্ত হলে।
- গর্ভাবস্থায় বা পূর্বাবস্থায় মায়ের খাবারে পুষ্টির অভাবও গর্ভস্থ শিশুর সুস্থতার উপর প্রভাব বিস্তার করবে।
- গর্ভাবস্থার প্রথম তিনমাস বলা হয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।এই সময় মা যদি কোনোরকম কড়া ওষুধ, রাসায়নিক, কীটনাশক, রশ্মি, বিষক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়, তাহলে তার প্রভাব গর্ভস্থ শিশুর সম্পূর্ণ সুস্থতার উপর প্রভাব বিস্তার করবে।
- গর্ভাবস্থায় মায়ের যদি বড় রকমের হাম হয় তাহলে তার প্রভাব মারাত্মকভাবে পড়ে গর্ভস্থ শিশুর উপর। মূলত ইন্দ্রিয় স্থান শ্রবণ এবং দৃষ্টি আক্রান্ত হয় শিশুর। নতুবা মস্তিষ্কের সেরিব্রাল পালসি কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধকতা অথবা শরীরের অভ্যন্তরস্থ বাহুতেও প্রভাব বিস্তার করে। গর্ভাবস্থায় মায়ের হাম এর প্রভাবে শিশুর বিকলাঙ্গতার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে থাকে।
- গর্ভবতী মায়ের হৃৎযন্ত্রের জটিলতা শিশুর সুস্থতায় প্রভাব বিস্তার করে।
- গর্ভাবস্থায় মা যদি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও শিশুর বিকলাঙ্গতার সম্ভাবনা প্রবলভাবে থেকে যায়।

- গর্ভাবস্থায় মা যদি তামাক, মদ্য, ধূমপান বা অন্যান্য যেকোনো নেশা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে তার প্রভাবেও সন্তানের বিকলাঙ্গ জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে প্রবল।

ii) **জন্মের সময়-** জন্মের পূর্বাবস্থা থেকেই মাকে যেমন বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়, তেমনই শিশুর জন্মের সময়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জন্মপূর্ববর্তী অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় শিশুর প্রতি সমস্ত যত্নশীলতা ও দায়িত্ব যথাযথ পালন করা হলেও জন্মের সময়ও বেশ কিছু বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন।

- শিশুর অপরিপক্কতায় প্রসব হলে শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে।
- প্রসবের সময় অপরিণত বা অপ্রশিক্ষিত কর্মীদ্বারা যদি সন্তান প্রসব করানো হয় তাহলে অব্যবস্থাপনায় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে।
- প্রসবের সময় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যদি সঠিক গুণমানসম্পন্ন উৎকৃষ্ট না হয় তাহলেও শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে।
- প্রসবের সময় গর্ভস্থ শিশুর মাথায় কোনো চোট আঘাত লাগলে শিশুর অঙ্গহানি বা মস্তিষ্কঘটিত বিকলাঙ্গতার ঝুঁকি থাকে।
- শিশু জন্মের সময় অক্সিজেনের যদি অভাব ঘটে তাহলে আন্তশারীর বিকলাঙ্গ শিশু জন্মাতে পারে।

iii) **জন্মের পরে-** জন্মের পূর্বে গর্ভাবস্থায় এবং জন্মের সময়কালীন সমস্ত সাবধানতা সর্তকতা অবলম্বন করলে সুস্থ স্বাভাবিক শিশু জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু তারপরও বেশ কিছু বিষয়ে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়, নতুবা সমাজ এক বিকলাঙ্গ নাগরিক পাবে। বলতে গেলে পূর্ববর্তী দুটি পর্যায়ে যা যা সতর্কতা অবলম্বিত হয়েছে, তার সবকটিই এই তৃতীয় পর্যায়ে অবলম্বন করলে তবেই পূর্ববর্তী স্তরদুটির সতর্কতা অবলম্বন সার্থক হবে।

- সদ্যোজাত শিশুর মাথার গঠন খুবই নরম হয়।। তাই বিশেষ করে নজর রাখতে হবে যাতে মাথায় কোনোরকম আঘাত না লাগে। মাথাটাই হল আসল। মাথায় আঘাত লাগলে শরীরের যেকোনো অংশে পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা থাকে।
- অক্সিজেনের অভাবে রক্তপরিসঞ্চালনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শিশুর স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়।
- দুর্ঘটনা তো যে কোনো সময়ে, যে কোনো পরিস্থিতিতে ঘটতে পারে। তার ফলাফলও যা কিছুই হতে পারে। আর শিশুর প্রাণ খুবই নমনীয়। শিশু নিজের রক্ষা নিজে করতে

পারে না। সাবধানতাও অবলম্বন করতে পারে না। তাই শিশুর যাতে কোনোরকম দুর্ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

- শিশুর ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। ওষুধ প্রয়োগের মাত্রার তারতম্য শিশুশরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।
- পোলিও টীকাকরণ না করালে।
- কুষ্ঠ,ম্যালেরিয়া,যক্ষ্মা বা অন্যানা কোনো সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে।

উপসংহারে, বলা যায়, প্রতিবন্ধকতা যেকোনো বয়সেই আসতে পারে। কারণও বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু একটি শিশুর ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন বিশেষভাবে জরুরী। কারণ শিশু নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারে না। শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। তাই যেকোনো ঘটনাই হয়ে উঠতে পারে দুর্ঘটনা। যার ফলে ভবিষ্যৎ সমাজ প্রতিবন্ধী নাগরিক পাবে। এছাড়াও শৈশবের কোনো ত্রুটি প্রথমাবস্থা থেকেই যদি সুচিকিৎসাপদ্ধতি অনুসারে প্রতিকার করার চেষ্টা করা যায়, তাহলে হয়ত ভবিষ্যৎ নাগরিক প্রতিবন্ধী নাও হতে পারে।

।।২।।

মনস্তত্ত্ববিদ্ বার্বে (Barbe) 'প্রতিবন্ধী' শব্দটির পরিবর্তে ব্যতিক্রমধর্মী শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী। কারণ কোনো মানুষের ক্ষমতা তথা ability সাধারণ বা গড় মানুষের ক্ষমতার থেকে কম বা বেশি মাত্রায় হলে তাকেই বলা যায় ব্যতিক্রমী বা ভিন্নক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। এদের মূলত: **তিনটি** শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,-

i) **ব্যাহত** (impairment) - যে সব মানুষদের দৈহিক গঠন, ইন্দ্রিয়জ বিষয় এবং অঙ্গসঞ্চালনগত অথবা পেশীগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাদের এই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। যেমন কোনো ব্যক্তির হয়ত কোনো কারণে হাতের বা পায়ের এক বা একাধিক আঙ্গুল নেই। ফলে তাদের কোনো কাজ আটকে থাকছে তা হয় না, কিন্তু কাজটি করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

ii) **অক্ষমতা** (disability) - এই শ্রেণীভুক্ত মানুষগুলি শারীরিক তথা দৈহিক বা পেশীগত এবং ইন্দ্রিয়জ কোনো অক্ষমতার বা গঠনগত ত্রুটির জন্য দৈনন্দিন জীবনযাপনে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যেমন- উপযুক্ত দৃষ্টিশক্তির অভাবসম্পন্ন মানুষরা অনেকসময় বিভিন্ন স্বাভাবিক কাজকর্ম নিজে

থেকে করতে পারেন না। দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা বোধ করেন। এই অক্ষমতা থেকে তারা উত্তীর্ণ হতে পারেন চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ ক্রমে চশমা ব্যবহারের মাধ্যমে।

iii) **প্রতিবন্ধী** (handicapped) - এই পর্যায়ভুক্ত মানুষরা তাদের অক্ষমতার জন্য প্রাত্যহিকতায় যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হন, তা হয় অনতিক্রম্য।

পৃথিবীতে যে সমস্ত মানুষজন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ সচল সক্রিয় এবং অবিকৃতভাবে বিভিন্ন মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে সামাজিক গুণাবলীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তাদের সাধারণ মানুষ বলা হয়। আর এই সব সক্ষমতা থেকে চ্যুত ব্যক্তিরা ব্যতিক্রমী পর্যায়ভুক্ত। ব্যতিক্রমী মানুষদের সাধারণত: কোনো ইন্দ্রিয়হানি বা অঙ্গহানি ঘটে বা মানসিক সক্ষমতাও সাধারণের তুলনায় স্বল্প এবং সর্বোপরি বৌদ্ধিক বিকাশ সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণ বিকল। ব্যতিক্রমী মানুষদের প্রতিবন্ধকতা তথা জীবনযাত্রানির্বাহের বাধাবিপত্তি সমস্যার সম্মুখীনতার উপর ভিত্তি করে একটি শ্রেণিবিভাগ করা যায়-

প্রতিবন্ধকতা

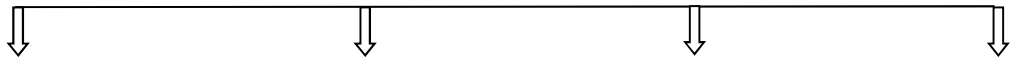

সংবেদনমূলক প্রতিবন্ধকতা (sensory handicap)	দৈহিক প্রতিবন্ধকতা (physical handicap)	মানসিক ব্যতিক্রম (mental exceptionality)	প্রজ্ঞামূলক সমস্যা (cognitive disorder)
i) অন্ধত্ব বা দৃষ্টিহীনতা (blindness or visual impairment)	i) অস্থিবিকলাঙ্গতা (orthopedio handicap)	i) প্রতিভাবান (gifted or talented)	i)মনোযোগহীনতা (attention deficit)
ii) বধিরতা বা শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা (deafness or hearing impairment)	ii) মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত (cerebral palsy	ii)মানসিক সমস্যা (mental retardation)	ii)পঠন অক্ষমতা (dyslexia)
		iii) প্রক্ষোভজনিত সমস্যা (emotional disturbance)	iii) গণিত অক্ষমতা (dyscalculia)
		iv) অটিজম (autism)	iv) লিখন অক্ষমতা (dysgraphia)

প্রতিবন্ধকতার প্রতিটি ধরণকে তার অক্ষমতার মাত্রা ও ব্যাপকতা অনুসারে চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়।-

i) ৪০% এর কম ⟶ সামান্য ⟵ ০%-৪০%
ii) ৪০% এর বেশী ⟶ মধ্যমাত্রা ⟵ ৪০%-৭৫%
iii) ৭৫% এর বেশী ⟶ তীব্র ⟵ ৭৫%-৯৯%
iv) ১০০% ⟶ চূড়ান্ত ⟵ ১০০%

দৃষ্টিহীন বা ব্যাহত দৃষ্টিসম্পন্ন

দৃষ্টিহীন বলতে কাদের বুঝব? যাদের চোখের আলো পুরোপুরি তিমিরাবৃত তারা তো দৃষ্টিহীন বটেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক দৃষ্টিহীনত্ব নিবারণী সংস্থা তথা International Association for the Prevention of Blindness-এর তরফ থেকে দৃষ্টিহীনতা তথা Blindness এর একটা সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে। এই সংস্থার মতে, সেই সমস্ত ব্যক্তিরাই দৃষ্টিহীন যারা দেড় মিটার দূরত্ব থেকে আঙুল গুনতে পারে না। এদের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির ১/২০ ভাগের কম বলে গণ্য করা হয়। এই পরিমাপক তথা মানদন্ড বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। যেমন, আমেরিকায় স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষের থেকে ১/১০ ভাগ কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষদের দৃষ্টিহীন বলে গণ্য করা হয়, যেখানে ফ্রান্সে এই মাপক ১/২০।

দৃষ্টিহীন মানুষদের মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,-

i) সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন

ii) আংশিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন

তবে মনোবিদ লোয়েনফেল্ড মতানুযায়ী দৃষ্টিহীন মানুষদের চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা সমীচীন,-

i) জন্মগত দৃষ্টিহীন

ii) পাঁচবছর বয়সের পর সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন

iii) জন্মগতভাবে আংশিক দৃষ্টিহীন

iv) অর্জিত আংশিক দৃষ্টিহীন

দূরদৃষ্টিগত সক্ষমতা (visual acuity), দৃষ্টিক্ষেত্র (field of vision) এবং দৃষ্টিসক্ষমতা (visual efficiency) এর উপর নির্ভর করে Dr. Herbert Snellen একটি তালিকা (chart) প্রস্তুত করেছিলেন। এর সাহায্যেই দৃষ্টিগত সক্ষমতা-প্রতিবন্ধকতা বিচার করা হয়।

চিকিৎসাবিদ্যা অনুসারে অন্ধত্বের কারণ বিভিন্ন হলেও মূল কারণ হল প্রতিসরণমূলক ত্রুটি (Refractive error)। এর মধ্যে পড়ে Hyperopia, Myopia এবং Astigmatism । পেশীগত ত্রুটি strabismus এর জন্য প্রথমে ট্যারা চাউনি, তারপর ক্রমে দুর্বল চোখ নষ্ট হয়ে যায়। দ্বৈতদৃষ্টি (Double vision) থেকে জন্ম হয় Ambliopia। ছানিও অন্ধত্বের একটি কারণ। শিশুর গর্ভাবস্থায় মায়ের কোনো ভারী অসুখ (সিফিলিস, গুটিবসন্ত), মায়ের কড়া ওষুধসেবন, মস্তিষ্কের জ্বর, অপুষ্টি, কোনো শারীরিক আঘাত অনেকসময় শিশুর অন্ধত্বের কারণ হয়। শুধু তাই-ই নয়, শিশুর

জন্মগ্রহণকালে কোনো যান্ত্রিক সমস্যা বা প্রসবকালীন কোনো যান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগ দ্বারা শিশুর শরীরে বা মস্তিষ্কে কোনো আঘাত শিশুর অন্ধত্ব ডেকে আনতে পারে। শিশুর অন্ধত্বের কারণ হতে পারে শিশুর কোনো দুরারোগ্য রোগ, অপুষ্টি, কোনো আঘাত বা সংক্রমণও। এগুলি ছাড়াও মস্তিষ্ক বা চোখের ক্যানসার, যেকোনো রকম বিষক্রিয়া বা শরীরে ভিটামিন এ, বি, বি২, সি এবং ডি- এর অভাবও দৃষ্টিশক্তিহীনতার কারণ হয়।

ভারতের Rehabilitation Council of India Act (১৯৯২) অনুসারে দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার তিনটি স্তর,-

i) স্বল্প দৃষ্টিমান- আলোকিত ব্যবস্থা ও বিশেষ কিছু ধরণের সাজসরঞ্জামের সহায়তায় এরা প্রায় স্বাভাবিক দৃষ্টিমান মানুষের মতো কাজকর্ম করতে সক্ষম হয়।

ii) আংশিক দৃষ্টিমান- দৃষ্টি সহায়ক সাজসরঞ্জামের সহায়তাতেও এরা স্বাভাবিক নির্ভুল কাজকর্ম করতে পারে না। দৃষ্টি প্রয়োজন এরূপ কাজ করার জন্য এদের প্রচুর সময় এবং অধিক শ্রম ব্যয় করতে হয়।

iii) দৃষ্টিহীন- দৃষ্টির দ্বারা এরা কোনো কাজ কর্ম করতে সক্ষম হয় না। এদের কাজকর্ম চালানোর জন্য একমাত্র ভরসা শ্রবণশক্তি এবং স্পর্শক্ষমতা।

অর্থাৎ বলা যায় স্তরায়নটি হল-

i) সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা ।

ii) সংশোধনকারী লেন্সের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত ভাল চোখে দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা ৬/৬০ বা ২০/২০০ (তীক্ষ্নদৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন) এর থেকে বেশী না হওয়া (Snellen-এর চার্ট অনুযায়ী)।

iii) দৃষ্টিশক্তির সীমাবদ্ধতা ২০ ডিগ্রী বা তার কম।

আলোক প্রত্যক্ষণহীন মানুষরা অর্থাৎ অন্ধ তথা দৃষ্টিহীন মানুষরা তাদের অতিক্রমী সক্ষমতার সহায়তায় আলো, অন্ধকার, স্থাবর-জঙ্গম বস্তু সবকিছুরই অস্তিত্ব টের পায়। বলা ভাল কার্যকরী বা কার্যগত অন্ধত্ব (Functional Blindness) মানে যারা বিকল্প পদ্ধতি বা কৌশলের সাহায্যে দৈনন্দিন কাজকর্ম নিজে সম্পাদন করে। আর অন্যের সাহায্যে সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীলতায় বিকল্প পদ্ধতিতে দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পন্ন করা। নিকটদৃষ্টিহ্রস্বতা (Myopia) বা দূরদৃষ্টিহীনতা (Hyperopia) দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ধরা যায় না।

American Medical Association (১৯৩৪) অন্ধত্বের আইনত সংজ্ঞা (Legal Definition) নির্ধারণ করেছেন। এদের মতানুযায়ী অন্ধ তারাই যারা ২০ ফুট দূরত্ব থেকে স্পষ্ট দেখতে পান না। কারণ Snellen- এর চার্ট অনুযায়ী একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষ ১৮০ ডিগ্রি কৌণিক সীমানার মধ্যে যেকোনো বস্তু ২০ ফুট দূরত্ব থেকে দেখতে সক্ষম হন।

দৃষ্টিক্ষীণতা সম্পর্কে Hathway বলেছেন, যখন কোনো মানুষ সমস্তরকম চিকিৎসামূলক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের পরও ২০/৭০ বা তার থেকে কম এবং ত্রুটি পূরণের চেষ্টার জন্য লেন্সের সাহায্য গ্রহণ করেন তাদের আংশিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ বলা যায়। এঁরাই দৈনন্দিন জীবনযাপনে অসুবিধার সম্মুখীন হন।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা WHO (World Health Organisation) এর মতে, যাদের দৃষ্টিক্ষমতা ২০/৭০ এবং ২০/৪০০ যা বিভিন্ন চেষ্টার মাধ্যমে এবং উপযুক্ত চিকিৎসামূলক সুযোগ-সুবিধা দ্বারা সক্ষমতার পর্যায়ে আনা যায়, তাদের ক্ষীণদৃষ্টিশক্তি সম্পন্নতার শ্রেণীভুক্ত করা যায়। আর যেসব মানুষদের দৃষ্টিশক্তিক্ষমতা ২০/৪০০ এর মধ্যে এবং দৃষ্টিক্ষেত্র ১০ ডিগ্রিরও কম WHO তাদের দৃষ্টিহীনতার পর্যায়ভুক্ত করে।

WHO দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছে,-

i) ক্ষীণদৃষ্টি-১ (vision Low -1) ⟶ চিকিৎসামূলক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দৃষ্টিশক্তির সক্ষমতা ২০/৭০

ii) ক্ষীণদৃষ্টি-২ (Low vision-2) ⟶ ২০/২০০ থেকে শুরু

iii) অন্ধত্ব-৩ (Blindness-3) ⟶ ২০/৪০০ থেকে শুরু

iv) অন্ধত্ব-৪ (Blindness-4) ⟶ ৫/৩০০ এরও নীচে

v) অন্ধত্ব-৫ (Blindness-5) ⟶ সমস্ত আলোই থাকে প্রত্যক্ষণহীনতায়।

মূক ও বধির

যে মানুষ কথা বলতে পারে না, তাদের বলা হয় মূক বা বোবা (dumb) এবং যেসব মানুষ কানে শুনতে পায় না তাদের বলা হয় বধির বা কালা (deaf)। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকলেও সাধারণত: মূকত্ব ও বধিরত্বের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিশিষ্ট মনোবিদ অ্যালিস স্ট্রেঞ্জ (Alice Streng) এর মন্তব্য এবিষয়ে প্রণিধেয়-

''A child who is born with little or no hearing or who has suffered the loss early in infancy before speech and language patterns are acquired, is said to be deaf''[১]

অর্থাৎ, একটি মানবশিশু যখন জন্মায়, অনেকসময় তখনই তার স্বল্প শ্রবণক্ষমতা থাকে অথবা শ্রবণক্ষমতা একেবারেই প্রায় থাকে না। এরূপ অবস্থায় ভাষা ও বাচনিক ভঙ্গী বিকশিত হবার আগেই যখন শ্রবণহীনতা এসে যায়, তখন মানবশিশুটি হয় মূক ও বধির।

মূকত্বের কারণ-

স্বরযন্ত্রের ত্রুটি মূকত্বের প্রধান কারণ হলেও অনেকসময় দুর্ঘটনা বা মানসিক আঘাত থেকেও মূকত্বের শিকার হয় মানুষ। আবার অনেকক্ষেত্রে উপরোক্ত তিনটি কারণ ছাড়াও মানুষ স্বরহীন হয় শ্রবণহীনতার জন্য। সুতরাং মূকত্বের কারণগুলি হতে পারে,-

i) জন্মগত স্বরযন্ত্রের ত্রুটি

ii) যেকোনো প্রকার দুর্ঘটনা, রোগব্যাধি

iii) মানসিক আঘাত

iv) শ্রবণহীনতা

বধিরতার কারণ-

কোনো মানুষ বধির কিনা তা নির্ণয় করার জন্য বর্তমানে বেশ কিছু যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন-সাউন্ড লেবেল মিটার, অক্টেভ ব্যান্ড, ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালাইজার, অডিওমিটার ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ ২৫ ডেসিবেলের শব্দ শুনতে পায়। যেসব মানুষের শোনার জন্য ২৬-৪০ ডেসিবেল শব্দের তীব্রতার প্রয়োজন তাদের স্বল্প ব্যাহত শ্রবণক্ষমতাসম্পন্ন বলে গণ্য করা হয়। আর যে সমস্ত মানুষের শ্রবণক্ষমতা ক্রিয়াশীলতার জন্য ৪১ - ৮০ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দের তীব্রতার প্রয়োজন হয় তাদের প্রবল গুরুতর ব্যাহত শ্রবণক্ষমতা সম্পন্ন পর্যায়ভুক্ত করা হয়। আর যাদের শ্রবণক্ষমতা ৮০ ডেসিবেলের উপরে তাদের পূর্ণ বধির রূপে গণ্য করা হয়।

বধিরতার মূল কারণ শ্রবণযন্ত্রের ত্রুটি। এই ত্রুটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। জন্মগত স্নায়বিক বা অঙ্গগত গঠনের ত্রুটিও হতে পারে, আবার যে কোনো দুর্ঘটনায় এই ত্রুটিগুলি অর্জিত হতে পারে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, বধিরতার কারণ দুপ্রকারের হতে পারে,-

i) জন্মগত

ii) অর্জিত

বিভিন্ন মানদন্ড অনুযায়ী বধির মানুষদের কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়,-

*** মাত্রানুযায়ী**

i) স্বল্প

ii) মৃদু

iii) মাঝারি

iv) গুরুতর

v) প্রায় সম্পূর্ণ

vi) সম্পূর্ণ

*** বয়সানুযায়ী**

i) জন্মগত

ii) সংগঠিত

*** ভাষাগত অভিজ্ঞতানুযায়ী**

i) ভাষাগত বিকাশের পূর্ববর্তী

ii) ভাষাগত বিকাশের পরবর্তী

*** কর্ণের ত্রুটি অনযায়ী**

i) শ্রবণ সঞ্চারণের - বহি:কর্ণ ও মধ্যকর্ণের গঠনগত সমস্যা (conductive loss)

ii) স্নায়বিক - অন্ত:কর্ণের ককলিয়া ও অর্ধবৃত্তাকার নালী থেকে বহির্গত (sensory neural loss)

iii) মিশ্র - প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের মিলিত ত্রুটি (mixed loss)

শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার স্তর-

i) ০-২৬ ডেসিবেল - স্বাভাবিক শ্রবণক্ষমতাসম্পন্ন

ii) ২৭-৪০ ডেসিবেল - অতিসামান্য শ্রবণহীনতা (mild)

iii) ৪১-৫৫ ডেসিবেল - স্বল্পমাত্রায় শ্রবণহীনতা (moderate)

iv) ৫৬-৭০ ডেসিবেল - মধ্যম মাত্রায় শ্রবণহীনতা (severe)

v) ৭১-৯০ ডেসিবেল - গুরুতর মাত্রায় শ্রবণহীনতা বা বধির (profound)

vi) ৯০ডেসিবেলের ঊর্দ্ধে - গভীর মাত্রায় বধিরতা

১৯৮৫ তে UNESCO এর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বধিরতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। তাদের মতে, বধির সংজ্ঞাটি কেবলমাত্র সেইসব মানুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে, যাদের শ্রবণ অক্ষমতার প্রাবল্যের জন্য স্বত:স্ফূর্ত বাচনিক বিকাশ বা ভাষাগত বোধগম্যতার বিকাশ হয়নি বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং শ্রবণহীন যে সমস্ত ব্যক্তি যথার্থ প্রযুক্তির বা প্রশিক্ষণের সহায়তাও পাননি।

বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা WHO এর মতে, বধির ব্যক্তিদের মূল সমস্যা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের শ্রবণমূলক সংবেদনের গ্রহণযোগ্যতার অক্ষমতা। এই সমস্যার জন্যই তারা সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সঠিকভাবে সংযোগসাধন করতে অক্ষম হয়। ফলত এদের সামাজিক কার্যকারিতাও অনেকাংশে ব্যাহত হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, যথাযথ শিক্ষা এবং উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বর্তমানে এই সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস করা যায়।

শ্রবণ অক্ষমতা জন্মগতও হতে পারে, আবার জন্মপরবর্তী যেকোনো সময়েও হতে পারে। তাই এই সমস্যাকে দুটি পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

i) Prelingual- অর্থাৎ, শিশুর ভাষাশিক্ষার পূর্ববর্তী বধিরতা। এই বধিরতা মূকত্বের কারণ হয়।

ii) Post lingual- শিশুর ভাষাশিক্ষার পরবর্তী স্তরে এই বধিরতা আসায় বধির ব্যক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্যকারিতা হারালেও বাক্‌শক্তিরহিত হয় না।

তাই বলা যায়, মূকত্বের অনেক কারণের মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান কারণ বধিরতা। কিন্তু আবার বধিরমাত্রই যে সে ব্যক্তি মূক হবেই, তাও বলা যায় না। মূকত্ব এবং বধিরত্বের পারস্পরিক সম্পর্কে একমুখীন প্রবাহ লক্ষ্যণীয়। মূকমাত্রই বধির নয়, আবার বধিরমাত্রই মূক নয়। কিন্তু কোনোভাবেই বধিরত্বের কোনো কারণ মূকত্ব নয়। যদিও সাধারণত মূক ও বধির মানুষই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়।

মানসিক প্রতিবন্ধকতা

যে মন:শ্চালমূলক প্রতিবন্ধকতায় মানুষজন স্বাভাবিক মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাদের মানসিক প্রতিবন্ধকতার পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের শ্রেণীবিন্যস্ত করার বিষয়টি বেশ জটিল। কারণ এরা যে নির্দিষ্ট একটি পর্যায়ভুক্ত হয় তা নয়। মানসিক অস্থিরতায় এদের নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা না গেলেও কয়েকটি প্রকারভেদ করা যায়-

(ক) IQ অনুসারে-

IQ	I
i) ৫০-৬৯	Moran
ii) ২১-৪৯	Imbicill
iii) ২০ এর কম	Idiot

(খ) মানসিক প্রতিবন্ধকতা অনুসারে-

IQ	I
i) ৫০-৬৯	মৃদুমাত্রার
ii) ৩৫-৪৯	মধ্যমমাত্রার
iii) ২৫-৩৯	গুরুতরমাত্রার
iv) ২৫ এর কম	চূড়ান্ত মাত্রার

(গ) শিখনের প্রতিবন্ধকতা অনুসারে-

i) ৩৫ এর বেশী	শিখনে সমর্থ
ii) ২৫ এর মধ্যে	শিখনে অসমর্থনযোগ্য
iii) ২৫ এর কম	তত্ত্বাবোধনযোগ্য

কোনো ব্যক্তির আচরণের স্বাভাবিকতা নির্ধারিত হয় তার মানসিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে। মনোবিদ Eysenck এর মতে, কোনো ব্যক্তিকে অস্বাভাবিক বলার মাপকাঠি তার মানসিক সুস্থতা বা অসুস্থতা নয়, বরং অস্বাভাবিকতার লক্ষণরূপে ত্রুটিপূর্ণ মনোবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াশীলতাকেই দায়ী করা চলে।

এই মনোবৈজ্ঞানিক অসংগতিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়।

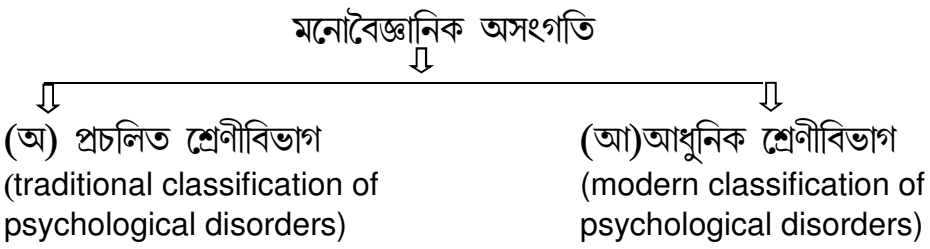

(অ) প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ

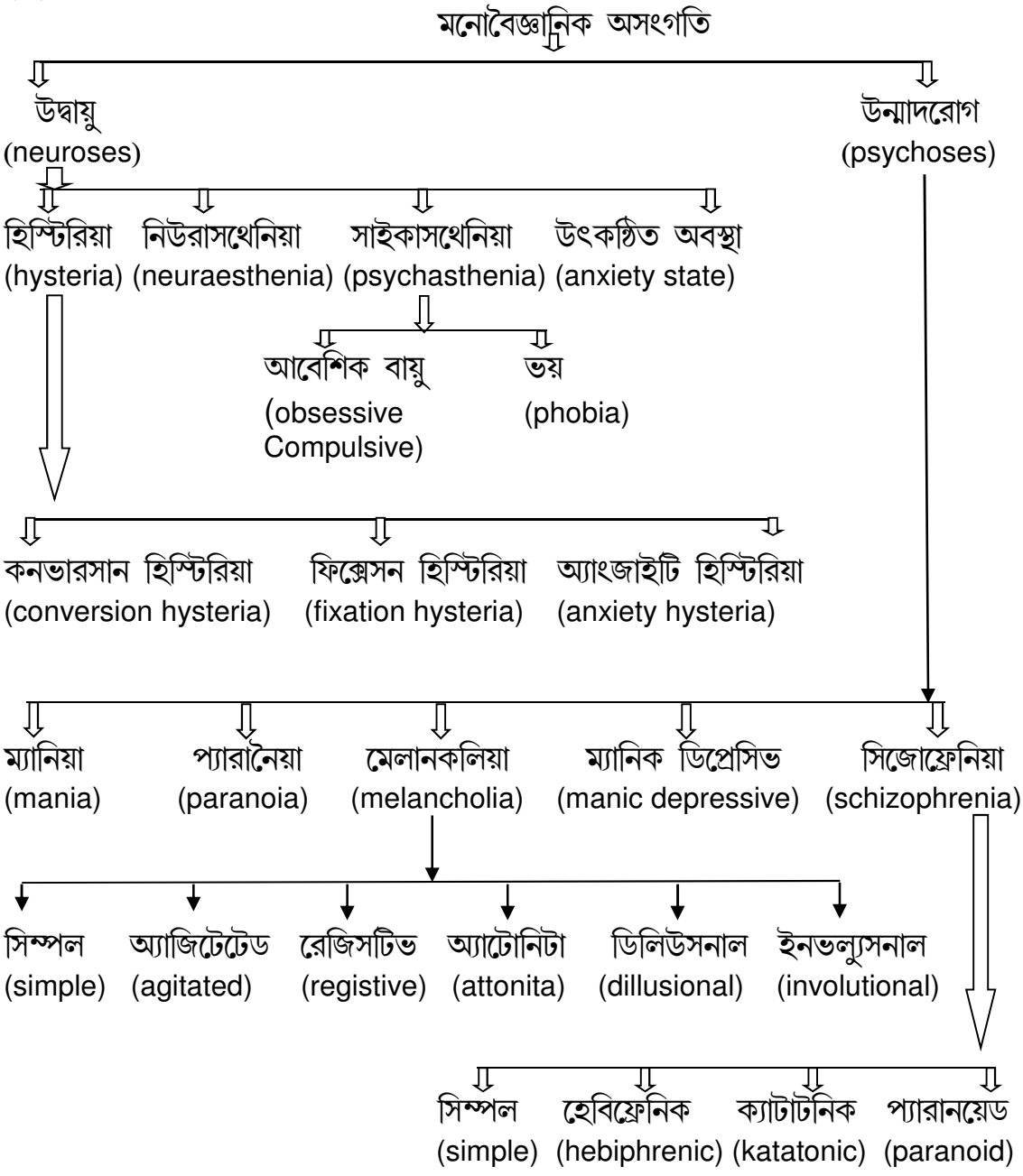

(আ) আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

ক. আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ (WHO এর পদ্ধতি অনুসারে)

খ. আমেরিকার মনোচিকিৎসকদের সংগঠন অনুসারে

গ. Page-এর শ্রেণীবিভাগ অনুসারে

ক. আর্ন্তজাতিক শ্রেণীবিভাগ-

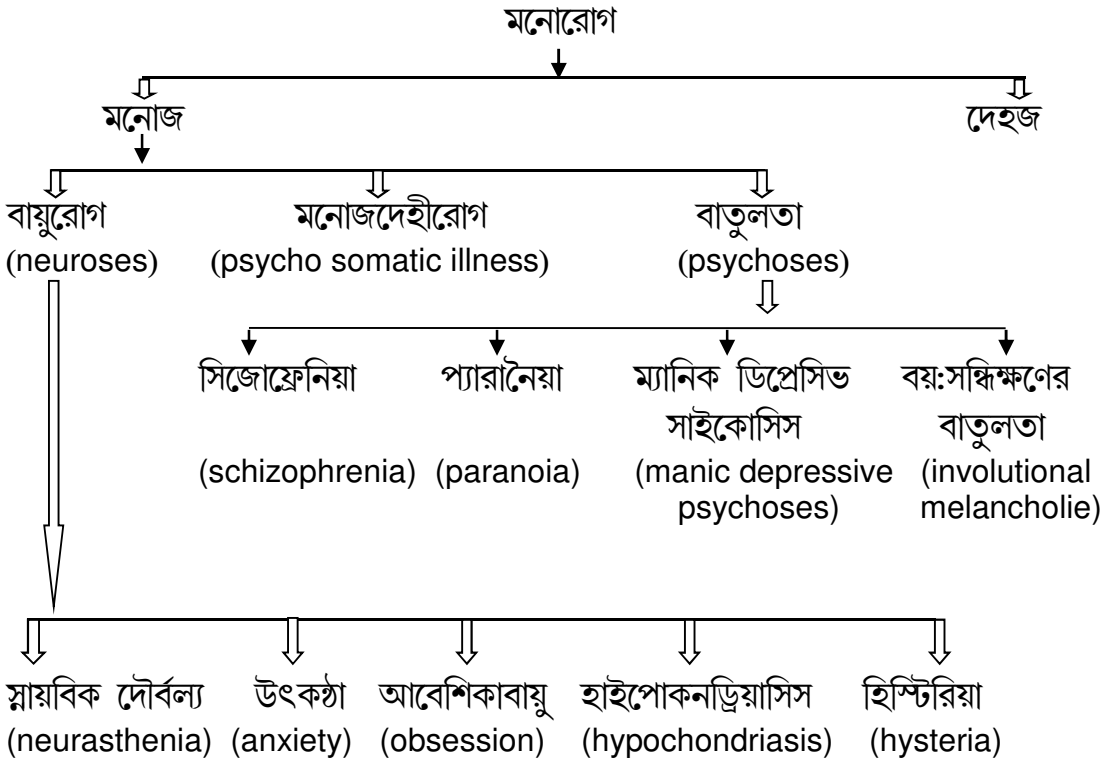

খ. আমেরিকার মনোচিকিৎসকদের সংগঠন অনুসারে-

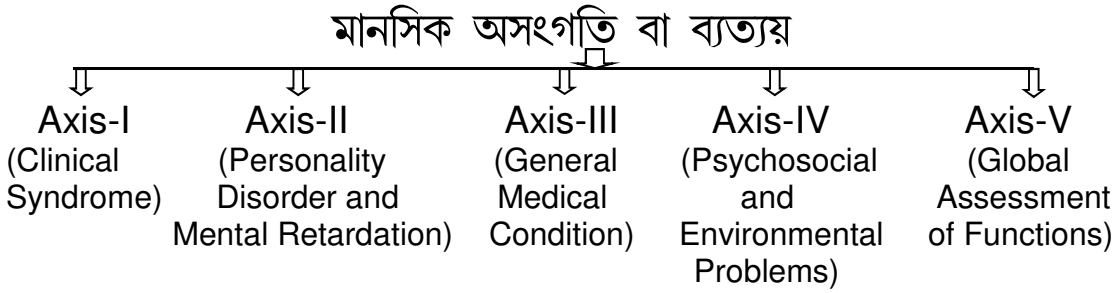

গ. Page(১৯৭৬)-এর শ্রেণীবিভাগ অনুসারে-

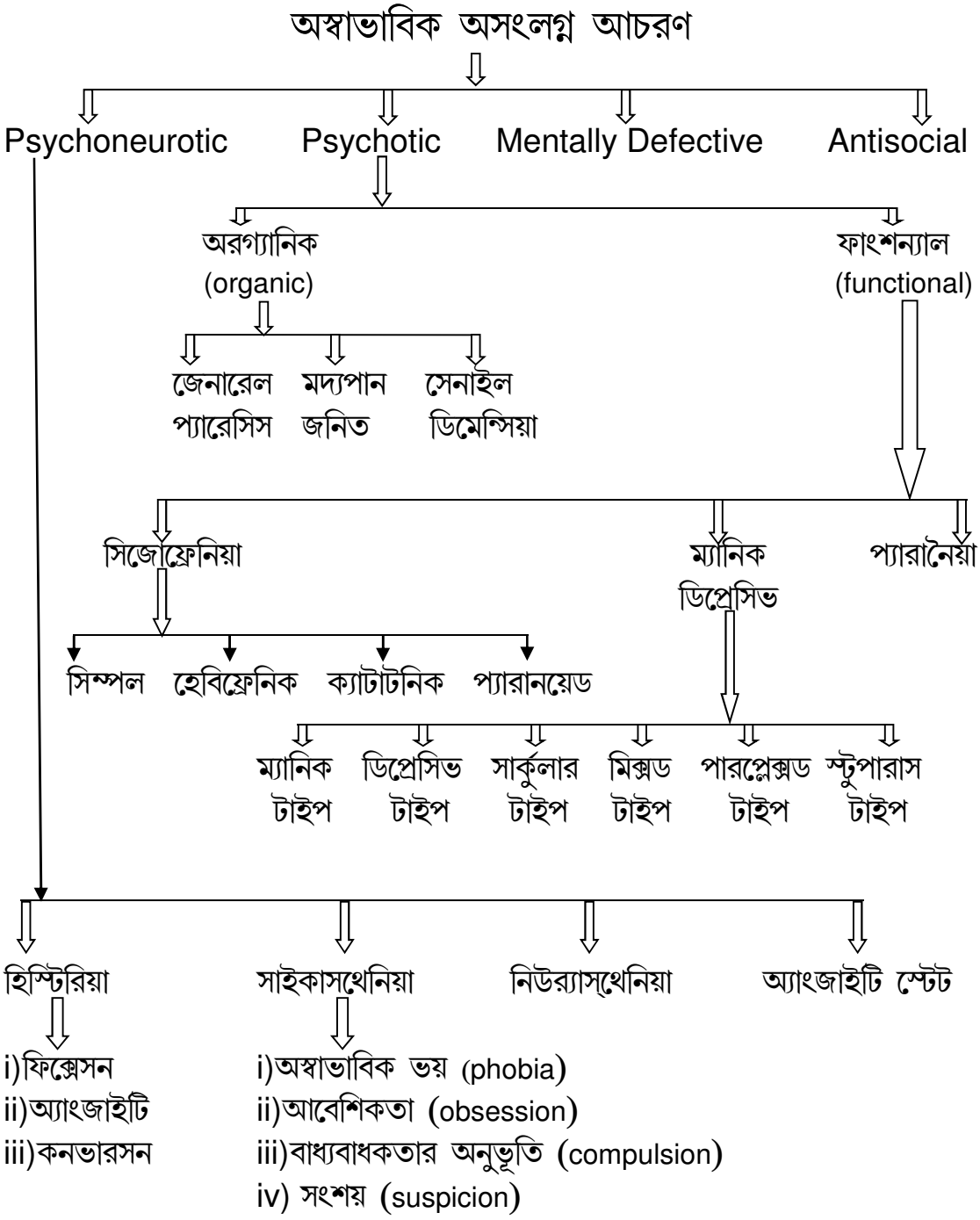

অস্থিসংক্রান্ত

বিভিন্ন বা যে কোনো কারণে কোনো মানুষ যখন স্বাভাবিক শারীরিক অক্ষমতার শিকার হন তখন অস্থিসংক্রান্ত কিছু প্রতিবন্ধকতাও থাকে। তার মধ্যে রয়েছে পোলিও-পরবর্তী পক্ষাঘাত, একপার্শ্বীয় পক্ষাঘাত, উভয় বা দ্বিপার্শ্বীয় পক্ষাঘাত, নিম্নাঙ্গের স্নায়ুতে পক্ষাঘাত, ম্যালইউনাইটেড ফ্যাকচার, ডেক্সট্রিমিটি, হেমিপেলভেকর্টমি। সাইমস কিয়োপার্টস, এক বা একাধিক আঙ্গুলহীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম। অসামর্থ্যের পরিমাপক ম্যাকব্রাইড স্কেলে গঠনতান্ত্রিক ও ক্রিয়ামূলক ভিত্তিতে অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার চারটি পর্যায়,-

i) ২৫% এর কম

ii) ২৫% -৭৫%

iii) ৭৫% -৯০%

iv) সম্পূর্ণ অসামর্থ্য

CLASSIFICATION OF ORTHOPAEDIC DISABILITIES[2]

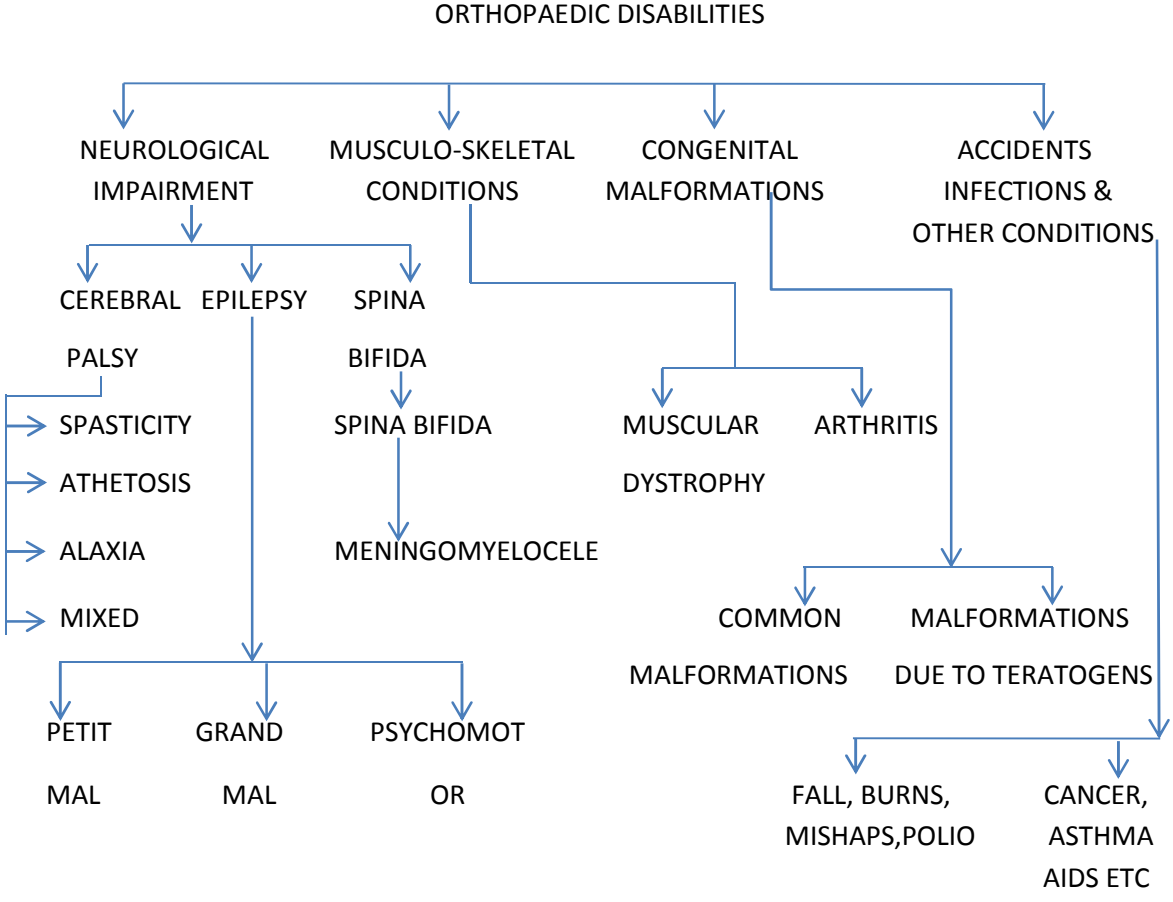

অটিজম

শিশুর অটিজমের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ

১. অযথা হাসে।

২. কোনো ভয় বা বিপদ বোঝে না ।

৩. ব্যথা পেলে কাঁদে না ।

৪. আদর পছন্দ করে না বা বোঝে না ।

৫. অসংলগ্নভাবে একই খেলা বারবার খেলে।

৬. চোখের দিকে তাকায় না ।

৭. একা থাকতে পছন্দ করে।

৮. নিজের চাওয়া বোঝাতে সমস্যা হয়, সাধারণত অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করে।

৯. কোনো খেলনা বা বস্তু অস্বাভাবিক পছন্দ করে।

১০. একই কাজ বারবার করে।

১১. প্রশ্ন করলে উত্তর না দিয়ে সেও একই প্রশ্ন করে।

১২. কোনো শব্দ হলে সে দিকে সাড়া দেয় না অথবা জোরে শব্দ হলে সহ্য করতে পারে না ।

১৩. একা একা ঘুরতে থাকে অথবা খেলনা ঘোরাতে থাকে।

১৪. অন্যদের সাথে মিশতে ও খেলতে চায় না ।

কুষ্ঠ

মাইকোব্যাক্টেরিয়াম লেপ্রি বা মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপ্রোমাইসিস ব্যাকটিরিয়া দ্বারা এই দীর্ঘমেয়াদী সংক্রমণ বর্তমানে ওষুধ দ্বারা নিরাময় সম্ভব হলেও, সংক্রমণটি স্নায়ু, শ্বাসনালী, ত্বক এবং চোখের ক্ষতি করে অনেকসময় অঙ্গহানি ঘটায়।

উপসর্গের ওপর ভিত্তি করে কুষ্ঠ তিনপ্রকার।

১। টিউবারকিউলয়েড

২। লেপ্রোমেটাস

৩। বর্ডারলাইন

আক্রান্ত অবস্থার উপর ভিত্তি করে এটি দুপ্রকার হতে পারে।

১।পসিব্যাসিলারী (ত্বকের পাঁচ জায়গায় আক্রান্ত হলে)

২। মাল্টিব্যাসিলারী (ত্বকের ছয় বা তার বেশি জায়গায় আক্রান্ত হলে)

নরওয়ের বিখ্যাত বিনি ডা: আরমান হ্যানসেন ১৮৭৩ সালে কুষ্ঠরোগের জীবাণু আবিষ্কার করায় মানুষ এ রোগ সম্পর্কে অবহিত হয়। ১৯৬০ সালে মার্কিন শেফার্ড এ রোগের ওষুধ আবিষ্কার করেন।মাল্টি ড্রাগ থেরাপি চিকিসায় কুষ্ঠ বর্তমানে সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য। ১৯৮২ সালে WHO দ্বারা এটি আনুমোদন প্রাপ্ত হয়।

দুহাজার খৃষ্টপূর্বাব্দে প্রাপ্ত পাকিস্তান ও হরোপ্পা-মহেঞ্জোদাড়োর জীবাশ্মতেও কুষ্ঠরোগাক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে।মূলত দারিদ্র্যের জন্য কুষ্ঠ মহামারির আকার নিতে পারে,তার উদাহরণ ইতিহাসে রয়েছে।

লোকোমোটর

হাড়, অস্থিসন্ধির অসুখের জন্য মূলত গমনাগমনের অক্ষমতা।

খর্বত্ব

সাধারণ মানুষের গড় উচ্চতা ৪ ফুট ধরা হয়, তার থেকে কম উচ্চতাসম্পন্ন মানুষের (গ্রোথ-হরমোনের অভাবে) শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খর্ব হয়।

বামনত্বের কারণ:-

১। হরমোনঘটিত কারণ,যেমন হাইপোথাইরয়েডিজম।

২। বাবা-মা বা পরিবারের কারোর থাকলে।

৩। অপুষ্টি।

৪। ক্রোমোসোমাল ডিসঅর্ডার (যেমন-টারনার সিনড্রোম) ।

৫। পিটুইটারী গ্রন্থিতে আঘাত বা টিউমার।

৬। লিউকিমিয়া বা শরীরে অপরিপক্ব শ্বেতকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি।

বামনত্বের প্রকারভেদ:-

১।প্যানহাইড্রোপিটুইটারিজ

২।বৃদ্ধি হরমোনের অভাবজনিত বামনত্ব

৩।লেভিলয়েন বামনত্ব

বামনত্বের লক্ষণ

২ থেকে ৪ বছরের শিশুর মধ্যে এ লক্ষণ দেখা যায়।এর লক্ষণগুলি হল-

১।হাত-পা অতিরিক্ত খাটো ।

২।মুখমন্ডলের হাড় ম্যাক্সিলা ও ম্যান্ডিবলের তেমন বিকাশ না হওয়ায় ছোট মুখ।

৩।অপরিপক্ক দাঁত।

৪।ছোট নাক।

৫।চোখ দুটো কাছাকাছি মনে হওয়া ।

৬।শরীরে অস্বাভাবিক চর্বি বৃদ্ধি।

৭।প্রজনন অঙ্গ সুগঠিত না হওয়া ।

থ্যালাসেমিয়া

এইটি ত্রুটিপূর্ণ জিনঘটিত বংশগত রোগ। এই রোগের প্রভাবে অঙ্গবিকৃতি হয়ে থাকে। যেমন,- অস্বাভাবিক অস্থি, মুখের হাড়ের বিকৃতি, পেট বাইরের দিকে বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি, যার ফলে মানুষের শারীরিক বিকৃতি দেখা যায়।

হিমোফিলিয়া

এই বংশানুক্রমিক জিনঘটিত রোগে রক্ততঞ্চনে বাধা সৃষ্টি হয়।

পারকিনসনস:

এই স্নায়ুঘটিত অসুখে মানুষ চলাফেরায় অসুবিধার সম্মুখীন হয়,স্মৃতিভ্রম হয়, হাত কাঁপে।

অ্যাসিড আক্রান্ত

অ্যাসিড আক্রান্ত হলে যে কোনো অঙ্গেরই হানি ঘটতে পারে।

শ্বেতী

শ্বেতী যাকে ধবল রোগও বলা হয়ে থাকে,তা মূলত একটি চামড়ার অসুখ।ত্বকের স্বাভাবিক রং রক্ষাকারী মেলানিনের ভারসাম্য ব্যাহত হলে এ রোগ প্রকটিত হয়।বংশগতভাবেও আনেকে শ্বেতী রোগাক্রান্ত হন।

আধুনিককালে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, সব মানুষই ব্যতিক্রমী, কারণ তারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার নীতি অনুযায়ী পৃথক পৃথক ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব আগ্রহ, চিন্তন, মানসিকতা, সম্ভাবনা, সক্ষমতা অনুযায়ী ব্যতিক্রমী মানুষ। তাই বর্তমান মনোবিদ্‌রা বিশেষ সক্ষমতা দ্বারা প্রতিবন্ধকতা জয়কারী মানুষদের প্রতিবন্ধী বা ব্যতিক্রমী না বলে প্রতিদ্বন্দ্বী (challenged) বলার পক্ষপাতী। বিশেষভাবে সক্ষম বা প্রতিদ্বন্দ্বী এই শব্দবন্ধই বোধ হয় এই সমস্ত মানুষদের সংজ্ঞায়িত করার পক্ষে যথার্থ।

তথ্যসূত্র

১. মজুমদার ড. অমলেন্দু, ব্যানার্জী সুনীপা দেব। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা । ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩।মার্চ ২০১৯ ।পৃ.১৯০ ।

২ B. Ed (SE-DE) BANGLA PROGRAMME, SECP-04: INTRODUCTION OF DISABILITIES. A collaborative Programme of Netaji Subhas Open University and Rehabilitation Council of India. অক্টোবর ২০১৩। পৃ.৩০ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

মিথ পুরাণ মহাকাব্য : নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্রে প্রয়োগ ও পরম্পরা

আদিমযুগের মানুষ যখন সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল, তখন তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন তারা অলৌকিকতার মধ্যে সমাধান করত। বিশ্বসৃষ্টিরহস্য থেকে শুরু করে দেবদবীর উদ্ভব-স্বরূপ সমস্ত উত্তর সংকেতের মধ্যে পাওয়ার প্রচেষ্টা ছিল। আদিম মানুষদের অনিবার্য জীবনবিধি ক্রমান্বয়ে এক গল্প হয়ে দাঁড়াল। এই গল্পই মিথ। অর্থাৎ বলা যায় মিথ হল একটি সমগ্র জাতির ঐতিহ্যের যৌথনিজ্ঞান মনের প্রশ্ন ও উত্তর। মিথের পরবর্তী যুগে রচিত হয় পুরাণ এবং মহাকাব্যগুলি। সভ্যতার বিস্তার শুরু হলে সমাজব্যবস্থা তৈরী হয় এবং ধীরে ধীরে গঠিত হয় সমাজব্যবস্থায় ধর্ম, বর্ণ ভেদে বিভিন্ন আশ্রমপ্রথা। এই সময় মিথ-গল্পমালার সূত্র ধরে রচিত হতে থাকে পুরাণগুলি। আরও পরবর্তীকালে পুরাণ-কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল প্রাচীন মহাকাব্য। মিথ-পুরাণ-মহাকাব্যের মধ্যে কাহিনি অনুবর্তনের ধারা চিরপ্রবাহমান। ফ্রয়েড অনুসারে বলা যায় মিথ-পুরাণ-মহাকাব্যের মধ্যে মানুষ তাদের আকাঙ্খার পরিপূর্ণরূপ দেখতে পায়। আধুনিক যুগ সেই প্রেক্ষিতে স্বপ্নভঙ্গের যুগ-ধ্বস্ততার যুগ। আধুনিক সাহিত্য তাই মিথ-পুরাণ-মহাকাব্যের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে-বিপন্নতা থেকে পরিত্রাণের পথ অনুসন্ধান করে। পুরাকথায় সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যায় জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর অস্তিত্বকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত আগুন-আগুন একাধারে জীবনের প্রতীক, আবার পাশাপাশি মৃত্যুরও দ্যোতনবাহী আগুন। মিথ-পুরাণ-মহাকাব্যের আগুনের ব্যবহার আধুনিক সাহিত্যেও বারবার প্রতীকায়িত হয়েছে।

''Myth fulfills in primitive culture or indespensible function: it expresses, enhances and codifies belief, it safeguards and enforces morality; it vouches for the efficiency of ritual and contains practica rules for the guidance of man.''[১]

T.S. Eliot তাঁর 'The Waste Land' (1922) কাব্যে প্রাচীন মিশরীয় 'Adonis' 'Attis' J' Osiris' উপাখ্যানের প্রয়োগে সমকালীন ইউরোপের শূন্য সময়ের ছবি যেভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন সমস্ত সংবেদনশীল সাহিত্যিক তাদের সময়ের প্রেক্ষাপট রচনায় মিথ-পুরাণ -মহাকাব্যকে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যে মিথ-পুরাণ-মহাকাব্য সরাসরিভাবে, বিনির্মাণে, পুনর্নির্মাণে, প্রতীকী ব্যঞ্জনায়, আবার কখনো এসেছে মিথোম্যানিয়া।

শুধু আমাদের দেশ নয়, দেশ-বিদেশের পুরাণ-মহাকাব্যগুলিতে প্রতিবন্ধী চরিত্রেরা কেমন তার একটা ছবি দেখানোর চেষ্টা রয়েছে এই অধ্যায়ে। সাহিত্য তো আসলে সমাজেরই দর্পণ । তৎকালীন সমাজব্যবস্থা এবং এই বিশেষ মানুষগুলির অবস্থান কেমন ছিল জানব এই অধ্যায়ের কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রের মাধ্যমে।

২

এই অধ্যায়ের নির্বাচিত চরিত্ররা হল,-

পুরাণের - কুবের, কুব্জা, গণেশ, জগন্নাথ, জড়ভরত, যম।

রামায়ণের - অন্ধকমুনি, অরুণ, অষ্টাবক্র, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি, কুশনাভের শতকন্যা, মন্থরা, শূর্পনখা

মহাভারতের - উপমন্যু, একলব্য, ঘটোৎকচ, জরাসন্ধ, দীর্ঘতমা, দ্যুমৎসেন, ধৃতরাষ্ট্র, পৌষ্য, শকুনি,শিখন্ডী, শিশুপাল, যযাতি ও চ্যবনমুনি।

কুবের (পুরাণ)

দশদিকপালের অন্যতম ধনাধিপতি কুবের যক্ষ ও কিন্নরগণের অধিপতি। ‘কু’ অর্থাৎ কুৎসিত ‘বের’ অর্থাৎ দেহ যার তিনিই কুবের। কুবেরের পা তিনটি ও দন্ত আটটি। আবাস কৈলাস পর্বতে। স্ত্রী আহুতি, কন্যা মীনাক্ষী, পুত্রদ্বয় নলকুবের ও মানিগ্রীব। একদা হিমালয়ে তপস্যার সময়ে দেবী রুদ্রানীকে দর্শন করে ফেলায় কুবেরের বামচক্ষু ধূলিধূসরিত পিঙ্গলবর্ণ এবং দক্ষিণচক্ষু দগ্ধ হয়ে যায়। এই জন্য কুবেরের অপর নাম একপিঙ্গল। পরবর্তীকালে মহাদেব কুবেরের কঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে তাঁকে রক্ষা করেন। কুবের বা কুবেরন হলেন ধনৈশ্বর্যের দেবতা এবং হিন্দু পুরাণ অনুসারে অর্ধদেব যক্ষদের ঈশ্বরতুল্য রাজা। তিনি দিকপাল হিসাবে বিবেচিত হন এবং উত্তরদিকের অধিষ্ঠাতা হিসাবে পূজিত হন। এছাড়া কুবের লোকপাল তথা জগতের সংরক্ষক হিসাবেও পূজিত হন। বিভিন্ন পৌরাণিক পুস্তকগুলি থেকে কুবেরকে একাধিক অর্ধদেব শক্তির সংমিশ্রণ ও বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি হিসাবে গণ্য করার উচ্চ প্রশংসনীয় বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রায়শই কুবের মূর্তি অলঙ্কারসজ্জিত স্থূলকায় দেহস্বরূপ ও একটি বেদানা বা মুদ্রাপাত্র ও গদা নিয়ে থাকতে দেখা যায় এবং সঙ্গী হিসাবে নকুলকে থাকতে দেখা যায়।

প্রাথমিকভাবে বৈদিক যুগে উল্লিখিত অসুরকুলের একজন অন্যতম প্রধান চরিত্র হিসাবে কুবেরের কথা থাকলেও পৌরাণিক যুগে ও হিন্দু মহাকাব্য রচনাকালে তিনিই হয়ে ওঠেন ধনদেবতা। বিভিন্ন লিখিত প্রমাণ ও পুরাণে কুবেরকে লঙ্কার রাজা হিসাবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণের দ্বারা তিনি লঙ্কাপুরী থেকে বিতাড়িত হন এবং পরবর্তীকালে অলকাপুরীতে নিজের রাজত্ব স্থাপন করেন, যা বর্তমানে শ্রীলঙ্কার সিগিরিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকে কুবেরের ধনৈশ্বর্য ও আড়ম্বরের কথা উল্লিখিত আছে।

কুবের বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের সর্ব্বেবদেবতার মন্দিরেও পূজিত হন। বৌদ্ধধর্মে তিনি বৈশ্রবণ নামেও পরিচিত। বৈশ্রবণ নামটি হিন্দুপুরাণেও উল্লিখিত রয়েছে বিশ্রবা মুনির পুত্র হিসাবে। আবার জৈনদের মধ্যে তিনি সর্বানুভূতি নামে অধিক পরিচিত।

কুবেরকে মূলত বামনরূপে পদ্মপাতার বর্ণযুক্ত ও ভুঁড়িসহ চরিত্রচিত্রণ করা হয়ে থাকে। পৌরাণিক বর্ণনানুসারে তাঁর তিনটি পা, একটি চোখ ও মাত্র আটটি দাঁত রয়েছে। এছাড়া তার মূর্তিকে অলঙ্কারবিভূষিত হয়ে থাকতেই দেখা যায়। অনেকসময় কুবেরমূর্তিকে এক পুরুষের উপর অধিরূঢ় অবস্থায় দেখা যায়। কুবেরের বিবরণে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ কমসংখ্যক দাঁত, তিন পা, তিন মাথা, ও চার হাতের উল্লেখ পুরাণ পরবর্তী সময়েও পাওয়া যায়। তিব্বতে গুপ্তধনের তত্ত্বাবধায়ক নাগদের ওপর কুবেরের বিজয় হিসাবে বেজিকে চিহ্নিত করা হয়।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে কুবেরকে ঐশ্বর্য ধনসম্পদ ও অর্থশাস্ত্র উভয়ের প্রতিরূপ হিসাবে বিবরণ দেওয়া হয়, যা পরবর্তীকালে কুবেরের মূর্তিকল্পেও প্রভাব ফেলে। বর্ণনানুসারে কুবেরের গাত্রবর্ণ পদ্মপাতার মতো। তিনি এক পুরুষের ওপর অধিরোহিত যা চিহ্নিত করে ধনহানিকে। আবার তিনি অলঙ্কার ও স্বর্ণবস্ত্র পরিহিত, যা তার ঐশ্বর্যের প্রতীক। তার বামচক্ষু পীত বা হরিদ্রাবর্ণ। তিনি গাত্রবর্ম পরিহিত এবং বৃহদোদর অবধি স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ মতে কুবেরের মুখ সামান্য বামদিকে হেলানো এবং সুস্পষ্ট দাড়ি ও গোঁফযুক্ত। তার সামনের দিকে এগোনো চোয়াল ও দুটি বহিঃগজদন্ত তার দানশীলতা ও প্রয়োজনে শিক্ষাদানের গুণটিকে নির্দেশ করে।বাম জঙ্ঘায় অধিষ্ঠিত তার স্ত্রী ঋদ্ধি জীবনযাত্রার পথের প্রতিনিধিত্ব করেন। মূর্তিকল্পে ঋদ্ধিদেবীর বামহাত কুবেরের পৃষ্ঠদেশে এবং ডানহাতটি একটি রত্নপাত্র ধারণ করা অবস্থায় থাকে। প্রথাগত কুবের চতুর্ভূজ। তার হাতের গদা দন্ডনীতি, প্রশাসন এবং বিচারব্যবস্থার প্রতীক। তার সম্মুখ বামহাতে একটি সিংহচিহ্ন রয়েছে যা ধনৈশ্বর্যের প্রতীক আবার পশ্চাদ বামহাতে রয়েছে শিবিক বা কুবেরাস্ত্র। এ কারণে তার বামহস্তজোড়কে বলা হয় শক্তিধারণ। কুবের নিধি পরিবেষ্টিত, কুবের মূর্তির দু'পাশে মানবরূপে মহাপদ্ম এবং শঙ্খ রয়েছে এবং তাদের হাতে তাদের স্বরূপ তথা পদ্ম ও শঙ্খও শোভা

পায়।অগ্নিপুরাণ মতে কুবেরকের মন্দির স্থাপিত করতে হলে অবশ্য কুবেরমূর্তিটি ছাগল বাহনে অধিষ্ঠিত হতে হবে এবং মূর্তির হাতে গদা থাকা বাঞ্ছনীয়। মূর্তিকল্পের বদলে চিত্রকল্প হলে অবশ্যই চিত্রে স্বর্ণবর্ণের ব্যবহার ও একাধিক উজ্জ্বল বর্ণের প্রয়োগ থাকতে হবে। কিছু উৎস, বিশেষত জৈনধর্ম মতে মাদকাসক্ত রূপে কুবেরকে ফুটিয়ে তোলানোর জন্য তার হাতে একটি উল্লেখযোগ্যভাবে অমিয়বদনার উপস্থিতি বর্ণনা করা হয়।

কুব্জা (পুরাণ)

মথুরা রাজবংশের অনুলেপন বাহিকা পরিচারিকা ছিলেন কুব্জা। শারীরিক ত্রুটির জন্য তার এরূপ নামকরণ। পৃষ্ঠে জন্মাবধি তার একটি কুঁজ ছিল। এই বক্রতার জন্যই তার নাম কুব্জা। কংসের ধনুর্যজ্ঞ উৎসবে কৃষ্ণ ও বলরাম যাবার সময় পথমধ্যে কুব্জা কৃষ্ণকে অনুলেপন দেন। কুব্জার ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ কুব্জার বক্রপৃষ্ঠে হস্তলেপন করায় কুব্জার পৃষ্ঠের বক্রতা স্বাভাবিক ঋজু হয়ে যায়। এই কাহিনির উল্লেখ পাই ভাগবতে। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের সাধারণী পূর্বরাগের নায়িকা হিসাবেও কুব্জার উল্লেখ পাই।কৃষ্ণ-কুব্জা সাক্ষাতের কথা বর্ণিত হয়েছে ভগবৎপুরাণ এবং সুরদাসের সুরসাগরে। তিনস্থানে কুঁজ ছিল বলে কুব্জার আরেক নাম ছিল ত্রিবর্ক। শরীরে কুঁজ থাকলেও তার মুখশ্রী ছিল অপূর্ব। তাঁকে দেখে স্বভাবতই তাঁর রূপের প্রশংসা করেন শ্রীকৃষ্ণ। রূপের স্তুতিতে অপমানিত হন কুঁজো দাসী কুব্জা। উপলব্ধি করতে পেরে কৃষ্ণ বলেন, তিনি তাঁর মনের রূপের প্রশংসা করেছেন।এরপর কুব্জার হাতের সুগন্ধি পেতে চান কৃষ্ণ। কিন্তু তা ছিল রাজা কংসের জন্য। দ্বিধান্বিত হলেও কুব্জা সেটি কৃষ্ণকে দিয়ে দেন। সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান নিজের পা তুলে কুব্জার পিঠে রাখেন। দু-হাতে তুলে ধরেন কুব্জার দেহের কুঁজ। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন কুব্জা। কুৎসিত কুব্জা থেকে তিনি হয়ে উঠলেন সুডৌল-স্তন-নিতম্ব সহ এক পূর্ণযৌবনা যুবতী।আনন্দে বিহ্বলা কুব্জা কৃষ্ণের পাদস্পর্শে সমস্ত সমর্পণ করতে চেয়ে কামনা করলেন কৃষ্ণকে। ভক্তের প্রার্থনা মঞ্জুর করে কৃষ্ণ কুব্জাকে আলিঙ্গন দান করেন। কংস-নিধন শেষ করে কুব্জার কক্ষে আরও একবার পদার্পণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।বিষ্ণুপুরাণে কুব্জার কুঁজমুক্তির কথা থাকলেও কৃষ্ণ-কুব্জা মিলনের বর্ণনা নেই। সুরদাস অবশ্য একে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভক্তের আত্ম-সমর্পণ হিসাবেই বলেছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আবার বলা হয়েছে ত্রেতাযুগের শূর্পণখাই দ্বাপরযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কুব্জারূপে। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রকে কামনা করে পাননি রাবণের বোন শূর্পণখা। তাঁর সেই ইচ্ছাপূরণ হয়েছিল দ্বাপরযুগে।ভগবান বিষ্ণু তথা রামচন্দ্রের সঙ্গলাভ করেন বিষ্ণুর অন্য অবতার শ্রীকৃষ্ণরূপে।

গণেশ (পুরাণ)

সিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা দিয়ে সাহিত্যরচনার সূত্রপাত প্রায় সমস্ত মধ্যযুগীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। পৌরাণিক হিন্দুধর্মেও গণেশ সর্বাগ্রে পূজ্য। গণেশের উল্লেখ রয়েছে শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, দেবীপুরাণ, মৃদুলপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও বামনপুরাণে। এছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্রমন্ত্রতেও গণেশের উল্লেখ রয়েছে। এবং অবশ্যই উল্লেখ্য গণেশপুরাণ। গণেশের জন্মকথায় পাওয়া যায় গণেশের মাথাটা হাতির। গণেশের জন্মবিষয়ে একাধিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। গণেশের মাথাটা হাতির হবার জন্য এক শারীরিক অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু তবুও এই দেবতাই পূজিত হন অন্য সমস্ত দেবতার পূজার পূর্বে।

জগন্নাথ (পুরাণ)

ভারতের মূলত ওড়িশা, ছত্তিসগঢ় অঞ্চলের জগতের নাথ জগন্নাথ। জগন্নাথ মূর্তির চোখ দুটি বিশাল বড় বড় এবং গোলাকার। হাত অসম্পূর্ণ, মূর্তিতে কোনো পা নেই। বিষ্ণুর রূপভেদ হিসাবে এক অসাম্প্রদায়িক দেবতা জগন্নাথ। শুধু হিন্দু নয় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সঙ্গেও যোগ দেখানো হয় জগন্নাথের। জগন্নাথের এরূপ মূর্তির দুটি কাহিনি প্রচলিত রয়েছে।

প্রথম কাহিনিটি হল রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাহিনি। কৃষ্ণভক্ত রাজা সমুদ্রে ভেসে আসা কাষ্ঠখন্ড দ্বারা মূর্তি নির্মাণের আদেশপ্রাপ্ত হন। সেই অনুযায়ী কাষ্ঠ ভেসে আসে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাও অজ্ঞাত কাষ্ঠশিল্পীর রূপ ধরে মূর্তি নির্মাণ শুরু করেন। শর্ত ছিল মন্দির বন্ধ করে মূর্তি নির্মাণ চলবে। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারো কোনো হস্তক্ষেপে কাষ্ঠশিল্পীর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু একদিন রানি কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে দরজার বাইরে থেকে কোনো আওয়াজ শুনতে না পেয়ে অত্যুৎসাহী হয়ে বন্ধ দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন। সাথে সাথে দেখেন মূর্তি অর্ধসমাপ্ত এবং কাষ্ঠশিল্পী অন্তর্ধিত। তখন রাজা ও রানি অনুতপ্ত ও বিমর্ষ হয়ে পড়লে নারদ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন এই অর্ধসমাপ্ত মূর্তিই পরমেশ্বরের এক স্বীকৃত স্বরূপ।

দ্বিতীয় কাহিনিটি বৃন্দাবনের গোপীদের কাহিনি। গোপীরা সুভদ্রাকে পাহারায় নিযুক্ত করে কৃষ্ণপ্রীতির কথা আলোচনা করছিলেন। এই কথা শুনে সুভদ্রাও এতটাই বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে যে খেয়ালই করেনি যে তার দুই দাদা কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। শুনতে শুনতে দুই ভাইয়েরও কেশ খাড়া হয়ে উঠল, হাত গুটিয়ে এল, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল এবং উচ্চকিত আনন্দে মুখে হাসির বিস্মৃত রেখা ফুটে উঠল। এই কারণেই জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের এই

প্রকার রূপ। বৈষ্ণবভক্তরা এই রূপের পূজারী। কেউ কেউ বলে থাকেন দ্বিতীয় কাহিনিটি প্রথম উপাখ্যানটির ব্যাখ্যা এবং সংশয় নিরসনকারী কাহিনি।

জগন্নাথ শব্দটির সমাস বিভাজনে পাওয়া যায় যিনি জগতের নাথ বা প্রভু। 'জগৎ' এর মূল ধাতু 'গম' অর্থাৎ যা কিছু সচল। অর্থাৎ বলা যায় সচলমান জগতের অধিপতি এই অপদ জগন্নাথ।

জড়ভরত (পুরাণ)

ভরত রাজার কাহিনি পাই বিষ্ণুপুরাণে। রাজা ভরত বানপ্রস্থে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন ছিলেন। স্নানের সময় গর্ভিনী হরিণীকে দেখে ভরত রাজার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। লাফাতে গিয়ে হরিণীটির গর্ভপাত ঘটে মৃত্যু হয়। সদ্যোজাত মৃগশিশুটিকে স্রোত থেকে তুলে এনে পরম স্নেহে তাকে বড় করতে তুলতে লাগলেন রজা ভরত। তাঁর ধর্মকর্ম সব লুপ্ত হল মৃগশিশুর স্নেহপাশে। অবশেষে ভরত রাজা মৃত্যুর পর এক জাতিস্মর হরিণরূপে আবার জন্মগ্রহণ করেন। যথাকালে মৃত্যু হলে এবার তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এবার যাতে আর ভুলক্রমেও অধোগতি না হয়, তাই এজন্মে রাজা ভরত মৌন হয়ে জড়বুদ্ধি-বৎ আচরণ করতেন। তাঁর জড়িত স্বর এবং কর্মবিমুখতার জন্য 'জড়ভরত' নামে তাঁকে ডাকা হত। সকলে তাঁকে জড়বুদ্ধি জ্ঞান করে অপমান করত এবং কর্মবিমুখ হওয়া সত্বেও তাঁকে দিয়ে সর্বপ্রকার কাজ করিয়ে নেবার প্রচেষ্টায় থাকত। তারই প্রমাণস্বরূপ বলা যায় রাজা সৌবী তাঁর শিবিকাবহনের কাজে একবার নিযুক্ত করেছিলেন রাজা ভরতকে।

যম (পুরাণ)

যমের কাহিনি পাই প্রায় সবকটি পুরাণেই। যম হলেন সূর্য এবং সংজ্ঞার পুত্র। স্বামীর প্রবল তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা ছায়ার কাছে স্বামী-সন্তানদের ভার ন্যস্ত করে চলে যান উত্তরকুরুবর্ষে। ছায়া সংজ্ঞার সন্তানদের প্রতি যত্নে অবহেলা করতেন বলে একদা যম প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ছায়াকে পদাঘাত করেন। তখন ছায়ার অভিশাপে যমের পদযুগল ক্ষতযুক্ত (পদস্ফুল) এবং কীটদষ্ট হয়ে যায়। পরে যম পিতা সূর্যকে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত জানালে সূর্যদেব তাঁর ক্ষতস্থানের জন্য পূরীষ দান করেন এবং যমের পায়ের কীট ভক্ষণের জন্য তাঁকে একটি সারমেয় প্রদান করেন। এবং একটি মহিষ-বাহনও দান করেন ক্ষতপায়ে হাঁটার অসুবিধা থেকে মুক্তির জন্য। নরকের অধীশ্বর যম সমস্ত দেবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুন্যবান বলেই তাঁর অপর নাম ধর্মরাজ।

উপমহাদেশীয় মানুষের কাছে ধর্মের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।মানুষের জীবনে চলার পথে প্রতিবন্ধকতাকে সহজভাবে গ্রহণ করা এবং প্রতিবন্ধী মানুষদের যথাসম্ভব সাহায্য করার উপদেশ

রয়েছে বিভিন্ন ধর্মে।উপমহাদেশীয় সাহিত্যেও প্রতিবন্ধকতার ইতিবাচক দিকটি ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।মধ্যযগীয় ভারতবর্ষে যেমন বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষদের গোপন সরকারী দলিল-দস্তাবেজ সংক্রান্ত কাজে নিয়োগ করা হত।অর্থাৎ সমাজ প্রতিবন্ধী মানুষদের ইতিবাচক জীবনশৈলীর ব্যবস্থাপনায় উৎসাহী ছিল।

অন্ধকমুনি (রামায়ণ)

অন্ধকমুনি ও তাঁর পত্নী দুজনেই ছিলেন দৃষ্টিহীন। তাঁদের পুত্র সিন্ধু অন্ধকার রাত্রে নদীতে কলসী ভরতে যায়। নদীতে কলসী নিমজ্জনের শব্দ শুনে হরিণের জলপানের শব্দভ্রমে রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণে নিহত হলেন মুনিপুত্র সিন্ধু। এই শোক সহ্য করতে পারলেন না মুনি দম্পতি। দশরথকে অভিশাপ দিয়ে মুনিদম্পতি শোকে প্রাণত্যাগ করেন।

অন্ধকমুনি রাজা দশরথকে শাপ দিয়েছিলেন,-

‘‘আর কিবা দশরথ শাপিব তোমাকে।

এই মত তব প্রাণ যাবে পুত্রশোকে।।’’[২]

এই অন্ধত্বের কারণই রামের জন্মসম্ভাবনা সূচিত করেছিল।

‘‘পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাংপ্রতম্।

ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি।।’’[৩]

এই শাপ অপুত্রক রাজা দশরথের কাছে আশীর্বাদ রূপে পরিণত হয়েছিল। রাজা দশরথ পুত্রলাভের আনন্দে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগের শোকেও মর্মন্তুদ হলেন না। এরপর অন্ধকমুনি ধ্যানে জানতে পারলেন স্বয়ং বৈকুণ্ঠ নারায়ণই আসতে চলেছেন রাজা দশরথের গৃহে।

এবার অন্ধকমুনির মুখেই জানতে পারি তার অভিশপ্ত জীবনের কাহিনি। একদা ত্রিজটা মুনি তাঁর গৃহে ভিক্ষা করতে এলে পিতার আদেশে অন্ধক ত্রিজটা মুনির পদধূলি গ্রহণ করতে যান। কিন্তু ত্রিজটা মুনির গোদা পা দেখে ঘৃণায় চোখ বন্ধ করে পদধূলি গ্রহণ করেন। এই শ্রদ্ধাহীনতাই মুনি এবং মুনিপত্নীর অন্ধত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অরুণ (রামায়ণ)

গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরুণ। পিতা মহর্ষি কশ্যপ। মাতা বিনতা। দীর্ঘদিন হয়ে যাবার পরও প্রসূত ডিম বিদীর্ণ না হওয়ায় মাতা বিনতা ধৈর্য হারিয়ে অকালে ডিম বিদীর্ণ করায় উরুহীন বৈনতেয় অরুণের জন্ম হয়। অন্ধরু তাঁর আরেক নাম। অর্ধপুষ্ট অন্ধরু মাতৃজঠর থেকে নির্গত হয়ে

বিনতাকে পাঁচশত বছর সপত্নী বদ্রুর দাসত্বের অভিশাপ দেন। এবং বিনতাকে সেই দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করবে বিদীর্ণ না হওয়া অপর অন্ডজাত সন্তান। এই কাহিনিতে রয়েছে চিরন্তন সতিনী-কোন্দল-এর চিত্র।

অরুণের স্ত্রী শ্যেনী।তাদের দুই পুত্রসন্তান হল- সম্পাতি ও জটায়ু।

অষ্টাবক্র (রামায়ণ)

মহর্ষির শিষ্য কহোড়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে যুক্ত হন মহর্ষি উদ্দালকের কন্যা সুজাতা ওরফে সুমতি। গর্ভবতী সুমতির গর্ভস্থ শিশু শ্রুতির দ্বারাই হয়ে ওঠে সর্ববেদজ্ঞ। গর্ভাবস্থাতেই পিতা কহোড়ের বেদপাঠে গর্ভস্থ শিশু তাকে অশুদ্ধ বলায় পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ পুত্রকে অভিশপ্ত করলেন এই বলে যে, সন্তান গর্ভস্থ অবস্থাতেই যখন এতটা বক্র-স্বভাবের, তখন জন্মের পর সে শরীরে আটটি স্থানে বক্রতা প্রাপ্ত হবে। ফলত: অষ্ট অঙ্গে বক্রতা নিয়ে যথাসময়ে গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হল- নাম হল অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র মুনির জীবনকাহিনি রামায়ণে বহু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাসম্ভারে পরিপূর্ণ। যদিও প্রাকজন্মেই তিনি পিতৃশাপে অষ্টাবক্র হয়েছিলেন, তাঁর বক্রতা মুক্ত হয়েছিল বারোবছর বয়সে পিতাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে পিতৃ-আশীর্বাদে সমঙ্গা নদীতে স্নান করে। অত:পর সুন্দর দেহের অধিকারী হয়ে ও বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শেষপর্যন্ত প্রেয়সী সুপ্রভার ভার্যাত্ব প্রাপ্ত হন।

রাজর্ষি জনক অষ্টাবক্র মুনির কাছে জ্ঞান, মুক্তি ও বৈরাগ্য লাভের উপায় জানতে চেয়েছিলেন। তার জিজ্ঞাসার উত্তরে অষ্টাবক্র যা বলেছিলেন তা পরবর্তীকালে অষ্টাবক্র-গীতা নামে বিশটি অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে। এতে অদ্বৈতবাদ ও সমদর্শন বিষয়ে গভীর আলোচনা আছে।বক্রতা জয় করে দৃঢ় চরিত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে অষ্টাবক্র, সাথে পরবর্তীকালে ভগীরথের জন্মকাহিনিতেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।পরবর্তী আলোচনায় অষ্টাবক্র মুনির পুনরুল্লেখ পাব রামায়ণে ভগীরথের জন্মকাহিনিতে।

ঋষ্যশৃঙ্গ (রামায়ণ)

রাজা দশরথের জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ কশ্যপ-পুত্র বিভান্ডক মুনি এবং দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম ভগ-এর কন্যা স্বর্ণমুখীর পুত্র। স্বর্ণমুখী মৃগীরূপে বিচরণ করতেন। একদা স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে দেখে স্নানরত বিভান্ডক কামার্ত হয়ে পড়েন। হ্রদের জলেই তাঁর রেত:পাত ঘটে। মৃগীরূপী স্বর্ণমুখী তা পান করায় গর্ভবতী হয়ে পড়েন এবং যথাসময়ে এক মানবশিশু প্রসব করেন যার মাথায় মৃগীরূপের শৃঙ্গ বর্তমান। এই মানবশিশুই পরিচিত হল ঋষ্যশৃঙ্গ নামে। বিকৃতদেহ শিশু পিতার

তপোবনে কৌশিকী নদীর তীরে নি:সঙ্গভাবে প্রতিপালিত হতে থাকল। দশরথের মিত্র অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ একবার ব্রাহ্মণদের সাথে দুর্ব্যবহার করায় ব্রহ্মশাপে তাঁর রাজ্যে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রাজা প্রতিবিধান পেলেন ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁর রাজ্যে আনয়ন করতে হবে। রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে (অঙ্গদেশে) আনয়নের উদ্দেশ্যে কতিপয় বারাঙ্গনাকে প্রেরণ করলেন বিভান্ডকের আশ্রমে। বারাঙ্গনারা বিভান্ডকের অনুপস্থিতিতে নারী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ঋষ্যশৃঙ্গকে কৌশলে অতি সহজেই নিয়ে আসে অঙ্গদেশে। ফলত অঙ্গদেশ অনাবৃষ্টির অভিশাপমুক্তিতে প্রচুর বর্ষণে স্নাত হল। অবশেষে দশরথের ঔরসজাত এবং লোমপাদের পালিতা কন্যা শান্তার সঙ্গে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ সম্পন্ন হল।বিকৃতদেহী হলেও ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি রামায়ণে সুপরিচিত হলেন অঙ্গদেশের ত্রাতারূপে।

কুশনাভের শতকন্যা (রামায়ণ)

মহারাজ কুশনাভ এবং অপ্সরী ধৃতাচীর একশত কন্যা ছিলেন পরমাসুন্দরী। তাদের রূপে মুগ্ধ হয়ে পবনদেব তাদের বিবাহ প্রস্তাব দেন। কিন্তু কন্যারা পিতার অজ্ঞাতসারেই পবনদেবের প্রস্তাবে সম্মতি জানালে ক্রুদ্ধ পবনদেব তাদের সর্বাঙ্গ ভগ্ন ও বিকৃত করে দেন। পরে শতকন্যার অনুনয়ে পবনদেবের বরে কাম্পিল্যা নগরের রাজা ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে বিবাহে তাদের শাপমুক্তি ঘটে এবং তারা বিকৃতিমুক্ত হয়ে পূর্বসৌন্দর্য ফিরে পায়। কন্যারা যে স্থানে অভিশপ্ত হয়েছিল সেই স্থানটিই কান্যকুব্জ বা কনৌজ নামে পরিচিত।

কন্যাকুব্জ > কান্যকুব্জ > কনৌজ

শুধু বিকৃতদেহীতেই জীবনের সমাপ্তি নয়। সমস্ত সমাপ্তির পরেও থাকে নতুন করে সূচনা অধ্যায়। কনৌজ নামকরণ আসলে সেই কন্যাদের স্বীকৃতিদানেরই স্মারক।

মন্থরা (রামায়ণ)

রামায়ণের এই চরিত্রটির বিকৃতির কারণ জানা যায়নি। বিকৃতাকার, বক্রদেহী, ঈর্ষাপরায়ণা, কুটবুদ্ধিসম্পন্না দাসী মন্থরার কুপরামর্শেই কৈকেয়ী দশরথকে বাধ্য করে রামচন্দ্রের পরিবর্তে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে রামকে চোদ্দবছরের জন্য বনবাসে যেতে। পরে ভরত সব জানতে পেরে রামের পাদুকা এনে রাজ্যপরিচালনা করে এবং দাসী মন্থরাকে প্রহার ও তিরস্কার করে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে। রামায়ণে চরিত্রটি খলচরিত্র। বলা যায় রাম-রাবণের যুদ্ধের কারণ সীতাহরণ, তার কারণ রামের বনবাস, তথা সমস্ত রামায়ণের ঘটনা সংঘটিত হবার নেপথ্য কারণ তথা কারয়িতা মন্থরা,একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। আধুনিক মানসে যদি একটু ভেবে দেখা যায়, তাহলে বলা

যেতে পারে, কৈকেয়ী হতে পারে, মন্থরার পরামর্শে রাজা দশরথের কাছে নিজ পুত্রের যৌবরাজপদ প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু কৈকেয়ীর চাহিদা কি খুব বেশি কিছু ছিল? মোটেই নয়। বরং কৈকেয়ীর মধ্যে মানবীসত্তার জাগরণ ঘটিয়েছে দাসী মন্থরা। এই মন্থরা কৈকেয়ীর প্রকৃত হিতৈষী ছিল।

শূর্পণখা (রামায়ণ)

বাল্মীকি বর্ণিত রাবণের ভগিনী শূর্পণখা রাক্ষস-কন্যা ভীষণদর্শনা, বাল্যবিধবা। লক্ষ্মণকে প্রণয় নিবেদন করলে লক্ষ্মণ তার নাসিকাচ্ছেদন করেছিল। শূর্পণখা শব্দটির সংস্কৃতগত আক্ষরিক অর্থ হল কুলোর মত নখ। আঞ্চলিকতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অঞ্চলে তার বিভিন্ন ধরনের নাম পাওয়া যায়। যেমন, তামিল ভাষায় সূর্পণগৈ, ইন্দোনেশিয় ভাষাতে সর্পকনকা, খমের ভাষাতে শূর্পণখর, মালয় ভাষাতে শূরপন্ডাকী এবং থাই ভাষাতে শম্মণকখা। পিতা বিশ্রবা এবং মাতা নিকষার কন্যা শূর্পণখা কুম্ভোদরা (কলসির মত উদর), চোখ ট্যারা, কৃশকৃত বাদামীবর্ণ চুল, কর্কশ রূঢ় ও শ্রুতিকটু কণ্ঠস্বর, অত্যাকৃতি স্তনগ্রন্থি এবং অসদাচারী হৃদয় শূর্পণখা জন্মকালে মীণাক্ষী এবং দীক্ষা এই দুটি নাম পায়। আবার অনেকের মতে, চাঁদের মত আকৃতির নখের জন্য তিনি চন্দ্রনখা নামেও পরিচিত ছিলেন। এই শূর্পণখা বাল্মীকি রামায়ণে খলচরিত্র। যুগপরিপ্রেক্ষিতে যে অন্তরাত্মা নারীত্বের সংকট শূর্পণখাকে নাসিকাহীনা করেছিল,আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' শূর্পণখা তার অবমাননার কথা নিজমুখে বলতে পেরেছে। শূর্পণখা যুগযুগান্তর ধরে নারীর অসহায়ত্বের মূর্তি। তবে এই অসহায়তাই পরবর্তীকালের নারীর জবানীতে ভাষা জুগিয়েছে।

উপমন্যু (মহাভারত)

গুরু আয়োদধৌম্যের অন্যতম শিষ্য উপমন্যু অতুলনীয় গুরুভক্তির জন্য বিখ্যাত হন। গুরুগৃহে বাসকালীন উপমন্যু গুরুর ধেনু চরাতে যেতেন। গুরুর নেওয়া দুরূহ থেকে দুরূহতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন উপমন্যু। শেষে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত অবসন্ন উপমন্যু অর্কপত্র (আকন্দপাতা) ভক্ষণ করায় তাঁর সাময়িক অন্ধত্ব ঘটে এবং দৃষ্টিহীনতায় একটি কূপে পড়ে যান। এদিকে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হয়ে গেলেও বাধ্য শিষ্য ঘরে না ফেরায় চিন্তিত হয়ে গুরু সশিষ্য উপমন্যুর খোঁজে বেরলেন। সেখানে গুরুর কণ্ঠস্বর শুনে কূপের ভিতর থেকে উপমন্যু নিজের অবস্থান জানান। অতঃপর গুরু উপমন্যুকে উদ্ধার করেন এবং অশ্বিনীভ্রাতৃদ্বয়কে শরণ করেন। তাদের দেওয়া পিষ্টক খেয়ে উপমন্যু অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হল।গুরু-শিষ্য মধুর সম্পর্ক এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গুরুকে আত্মসমর্পণের ছবি রয়েছে এখানে। গুরু যে কোনো বিপদে শিষ্যের শরণে সাড়া দিয়ে শিষ্যকে সঠিকপথ দেখান, উপমন্যুর অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হওয়া সেই ঘটনারই রূপকপ্রতীক মাত্র।

একলব্য (মহাভারত)

নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য। কুরু-পান্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কাছে একলব্যর অস্ত্রশিক্ষার অভিলাষ বাস্তবায়িত হয়নি কেবলমাত্র নিম্নজাতের সন্তান হবার জন্য। কিন্তু তাতে দমে যাননি একলব্য। দুঃখিত মনে জঙ্গলেই দ্রোণাচার্যের মৃন্ময়মূর্তি গঠন করে যোগবলে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলেন একলব্য। একদিন কৌরবপান্ডবরা সেই বনে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। সেখানে কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্মাবৃত জটাজুটধারী একলব্যের ভীষণরূপ দর্শন করে রাজপুত্রদের সঙ্গে আসা সারমেয়টি চীৎকার করে ওঠে। তখন একলব্য একসঙ্গে সাত শর নিক্ষেপ করে তার ওষ্ঠাধর বন্ধন করে দেয়। রুদ্ধমুখ সারমেয় প্রভুদের কাছে ফিরে গেলে তারা বিস্ময়াপন্ন হয়ে পড়েন শরনিক্ষেপণকৌশলে। সন্ধান পাওয়া গেল একলব্যের। তখন স্বয়ং গুরু দ্রোণাচার্যও বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়লেন তাঁর এমত এক 'অন্তরালবর্তী' শিষ্যের সন্ধান পেয়ে। একলব্যের প্রতিভা অর্জুনকেও অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে। অর্জুন রাজপুত্র - ভাবী রাজাও বলা যায়। সেখানে একলব্য নিতান্তই শুদ্রপুত্র। তাই গুরু-শিষ্যের সাক্ষাৎকালে একলব্য গুরুকে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেও গুরু দ্রোণাচার্য গুরুসুলভ আচরণ করতে পারলেন না। দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা হিসাবে চেয়ে নিলেন একলব্যের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। একলব্য অক্লেশেই তা ছেদন করে গুরুকে কাঙ্খিত গুরুদক্ষিণা দান করেন। অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব এতে রক্ষিত হয়েছিল। আর গুরুর প্রতি অবিচল ভক্তিই একলব্যকে অঙ্গহীন করল। এখানে রয়েছে গুরুকে ভক্তিবিশ্বাস এবং সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করার অদম্য সাহস ও মানসিক জোর। গুরু অল্পজ্ঞ হলেও গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর জ্ঞানে সেবা শুশ্রূষা করলে সেই গুরুর উপদেশক্রমে শিষ্য মোক্ষলাভ করতে পারে একলব্য তারই নিদর্শন।

ঘটোৎকচ (মহাভারত)

মহাভারতের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র ঘটোৎকচ। দ্বিতীয় পান্ডব ভীমের ঔরসজাত রাক্ষসী হিড়িম্বার পুত্র। জন্মাবধিই সে বিকট দর্শন, তার মাথাটা ঘটের মতন এবং কেশহীন ছিল। তাই তার নামকরণ হয়েছিল ঘটোৎকচ। মহাভারতের আদি পর্বেই তার উল্লেখ রয়েছে। তার শরীরে মাতৃদত্ত রাক্ষসরক্ত থাকার জন্য ঘটোৎকচ বিশেষ কিছু সক্ষমতার অধিকারী ছিল। যেমন উড়ে বেড়ানো, নিজের দেহের আকৃতি ছোট-বড় করা, অদৃশ্য থাকা প্রভৃতি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের হাতে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু ইন্দ্রের একাঘ্নী অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুর পূর্বে ঘটোৎকচ বিশালাকার ধারণ করে, ফলে ঘটোৎকচের শবাঘাতে কৌরবের এক অক্ষৌহিনী সৈন্য নিহত হয়েছিল।দেহ বিকৃত হতে পারে, কিন্তু নিজের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে আনুগত্য প্রকাশের অপূর্ব নিদর্শন ঘটোৎকচ।

জরাসন্ধ (মহাভারত)

মহাভারতের আরেক উল্লেখযোগ্য চরিত্র জরাসন্ধ। জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ। মাতা কাশীরাজের দুই যমজ কন্যা। বৃহদ্রথ কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু বিবাহের বহু বছর পরেও দুজনেরই কোনো সন্তান হল না। তারপর একদিন ঋষি চন্দ্রকৌশিক তাদের কাছে এসে পুত্রসন্তানের জন্য একটি মন্ত্রপূত আম রাজাকে দেন। কিন্তু রাজা তার দুই রানীকেই সমান ভালোবাসতেন। তাই তিনি আমটিকে সমান দুটি খন্ডে বিভক্ত করে দেন। ফলত দুই স্ত্রীই অর্ধেক সন্তানের জন্ম দেয়। তখন রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অর্ধ শিশুর অংশদুটি বনে ফেলে দিয়ে আসেন। সেই বনে জরা নামক এক রাক্ষসীর বাস ছিল। সেই জরা শিশুর অর্ধাংশ দুটি জুড়ে এক সর্বাঙ্গ শিশু নিয়ে রাজার কাছে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসে। সন্ধ শব্দটির অর্থ সন্ধি বা যুক্ত করা। জরা নামক রাক্ষসীর দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় শিশুটির নাম রাখা হল জরাসন্ধ। ভারতবর্ষ শুধু নয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার একটি রীতি ছিল পুরুষের বহুবিবাহ। শুধু বহুবিবাহই নয়- রামায়ণ মহাভারতের যুগে বহু উপপত্নী দ্বারাও প্রমোদ উপভোগ করতেন রাজারা। সেই সময়ে বৃহদ্রথের দুই পত্নীর প্রতি একেবারে সমান ভালোবাসা অবশ্যই দৃষ্টান্তব্যঞ্জক।

দীর্ঘতমা (মহাভারত)

ঋষি উতথ্য ও মাতা মমতার পুত্র দীর্ঘতমার কাহিনি পাই মহাভারতের আদিপর্বে। দেবর দেবপুরোহিত বৃহস্পতি সন্তানসম্ভবা মমতার সঙ্গে বলপ্রয়োগে সঙ্গম করতে এল গর্ভস্থ সন্তান দীর্ঘতমা তার পদযুগল সুদীর্ঘ করে শুক্র প্রবেশের পথে বাধাসৃষ্টি করেছিল। এতেই বৃহস্পতি কুপিত হন এবং অন্ধত্বের অভিশাপ দেন। দীর্ঘ তামস অর্থাৎ অন্ধত্ব- তা থেকেই দীর্ঘতমা নামকরণ। দৃষ্টিহীন দীর্ঘতমা বেদজ্ঞ ও ধার্মিক হলেও যত্রতত্র সঙ্গম করে বেড়াতেন। তাই তাঁর স্ত্রী প্রদ্বেষী ও পুত্রেরা ভেলায় করে তাঁকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেন। স্নানকালে বলিরাজা নদীর ভেলায় ভেসে চলা দীর্ঘতমাকে দেখে বাড়ি নিয়ে আসেন ক্ষেত্রজ সন্তান লাভেচ্ছায়। প্রাথমিক পর্যায়ে বলিরাজার স্ত্রী সুদেষ্ণা অন্ধ বৃদ্ধ দীর্ঘতমাকে দেখে শূদ্রদাসীকে প্রেরণ করেছিল। দীর্ঘতমার আশীর্বাদে দাসী একাদশপুত্রের জননী হন। ফের বলিরাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে দীর্ঘতমা রানী সুদেষ্ণার অঙ্গস্পর্শ করে পঞ্চপুত্র লাভের আশীর্বাদ করেন। এই পঞ্চপুত্র - অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম।তাদের নামেই নামাঙ্কিত হয়ে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছে।নিঃসন্তান দম্পতির সন্তানহীনতার কষ্ট বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে অনেকরকমভাবেই সম্ভবপর। এগুলিরই সূত্ররূপ ছড়িয়ে আছে আমাদের প্রাচীন মহাকাব্যেও।

দ্যুমৎসেন (মহাভারত)

মহাভারতে (বন ও শান্তিপর্ব) উল্লিখিত দ্যুমৎসেন শাল্বদেশের নৃপতি। তাঁর স্ত্রী শৈব্যা। পুত্র সত্যবান। সত্যবানের শৈশবেই পিতা দ্যুমৎসেন দৃষ্টিশক্তি হারান। শত্রুর চক্রান্তে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে রাজা দ্যুমৎসেন রাজ্য হারিয়ে বনে বসবাস করতে শুরু করেন। সত্যবান স্বল্পায়ু জেনেও মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রী সত্যবানকে বিবাহ করতে চান। বিবাহের কিছুদিন পরে সত্যবানের মৃত্যু হলে সাবিত্রী যমরাজকে তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ এবং শ্বশুরের হৃতদৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। যমরাজের বরে তারা পুনরায় রাজ্য ফিরে পেয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। ভারতীয় দর্শন ধর্মবাদী। ধর্মপথের পথিক আপাত কষ্ট পেলেও শেষাবধি তাদের কষ্টলাঘব হয়। দ্যুমৎসেনের অন্ধত্ব এবং পুনরায় দৃষ্টিশক্তিলাভ সেই কথাই শোনায় আমাদের।

ধৃতরাষ্ট্র (মহাভারত)

পুরুবংশের অন্যতম নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র কৌরবকুলপতি। সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর দুই পুত্র - চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদের অল্পবয়সে মৃত্যুর পর কাশীরাজকন্যাদ্বয় অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিবাহ হয় কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্যের। অতঃপর অপুত্রক অবস্থায় ক্ষয়রোগে বিচিত্রবীর্যেরও মৃত্যু ঘটলে বংশলোপের আশঙ্কায় মাতা সত্যবতী গঙ্গাঁর গর্ভজাত শান্তনুর সন্তান ভীষ্মকে অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে পুনর্বিবাহের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু মাতা সত্যবতীকে দেওয়া পূর্বপ্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে ভীষ্ম সত্যবতীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন সত্যবতী নিজ কানীনপুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের শরণাপন্ন হন ক্ষেত্রজ সন্তান দানের জন্য। দ্বৈপায়ন ব্যাসের পিঙ্গলবর্ণ বৃহৎ জটাশ্মশ্রু ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং দীপ্তনয়ন দেখে আতঙ্কিত হয়ে সঙ্গমকালে অম্বিকা চক্ষু মুদ্রিত করেন এবং অনুজা অম্বালিকা ভীত পান্ডুর হয়ে পড়েন। ফলতঃ তাদের সন্তানদ্বয়ও সেইমতই জন্মগ্রহণ করেন। অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র হলেন জন্মান্ধ এবং অম্বালিকাপুত্র পান্ডু হলেন পান্ডুবর্ণ। জ্যেষ্ঠ সন্তান হয়েও দৃষ্টিহীনতার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের পরিবর্তে রাজ্যপাট সামলানোর দায়িত্ব ন্যস্ত হয় পান্ডুর প্রতি। ধৃতরাষ্ট্র পত্নী গান্ধারী বস্ত্রখন্ডে নিজ চক্ষুও সর্বদা আবৃত করে রাখতেন পাতিব্রত্যে।ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব মহাভারতের কাহিনিতে পুত্রস্নেহান্ধের দ্যোতক। হিন্দুশাস্ত্র জন্মান্তরে বিশ্বাসী। প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হয়। একজন্মে না হলে তা জন্মান্তরে বাহিত হয়। হিন্দুধর্মের এই মূলকথা এখানে আরও একবার ব্যক্ত হল।

বর্ণিত উপাখ্যান থেকে জানা যায়, ধৃতরাষ্ট্র তার পূর্বজন্মে একজন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তখনকার দিনের ক্ষত্রিয়রা হরিণের মাংস ভক্ষণ করত। একদিন রাজা হরিণ শিকারে জঙ্গলে যান এবং হঠাৎ তিনি একটি হরিণ দেখতে পান। হরিণটিকে ধরার জন্য তিনি হরিণটির পশ্চাৎধাবন

করেন। মায়ার দ্বারা হরিণটি তাকে আকৃষ্ট করায় রাজা গভীর জঙ্গলে পৌছালে সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়। তখন প্রাসাদে ফিরতে না পেরে রাজা জঙ্গলেই একটি গাছের নিচে আশ্রয় নেন। গাছের ডালপালা ভেঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত রাজা মনে মনে খাবারের কথা ভাবছিলেন। যে গাছের নিচে রাজা বসেছিলেন সেই গাছেই এক পাখি দম্পতির একশ ছানাসহ বাসা ছিল। রাজার ক্ষুধ্বাসনার কথা শুনে মা-পাখি এবং বাবা-পাখি নিজেদের মধ্যে বাত্বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে যে কে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে রাজার ক্ষুধানিবৃত্তি করবে। দুজনেই তাদের শাবকদের স্বার্থে আত্মবলিদান দিয়ে বাচ্চার জীবনে অন্যের ভূমিকার কথা বলতে থাকে। এই কথাকাটাকাটি চলার মধ্যে হঠাৎই দুজনেই আগুনে পড়ে যায়। রাজা দুইপাখির ঝলসানো মাংস ভক্ষণ করে। এরপর রাজার খাবার স্পৃহা আরোও বেড়ে যায়। তখন রাজা গাছে উঠে ছানাদের নামায় এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে তীর দিয়ে একচোখ দিয়ে ঢুকিয়ে অন্যচোখ দিয়ে বার করে ছানাদের গেঁথে রাখে। তারপর সেগুলো ঝলসে খেতে থাকেন। পূর্বজন্মের এই কৃতকর্মের জন্য এই রাজা পরজন্মে ধৃতরাষ্ট্র হয়ে জন্মান, যিনি হন জন্মান্ধ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শতপুত্রের মৃত্যুসংবাদ তাঁকে শুনতে হয়।

পৌষ্য (মহাভারত)

এই রাজাও অভিশপ্ত হয়ে সাময়িক অন্ধত্বের শিকার হয়েছিলেন। গুরু আয়োদধৌম্যের ইচ্ছানুযায়ী দক্ষিণা পরিশোধের জন্য উতঙ্ক রাজা পৌষ্যের কাছে তার স্ত্রীর দুটি কুন্ডল যাঞ্চা করেন। সেই পরিসরে পৌষ্য উতঙ্ককে আতিথ্য দান করেন এবং অন্ন পরিবেশন করেন। পরিবেশিত অন্নে ছিন্ন কেশের অস্তিত্ব উতঙ্ককে ক্রুদ্ধ করে তোলে। কুপিত উতঙ্ক রাজা পৌষ্যকে অন্ধত্বের অভিশাপ দেন। পরে রাজা নিজদোষ স্বীকার করলে উতঙ্কর ক্রোধ-প্রশমিত হওয়ায় উতঙ্ক আশ্বস্ত করেন যে রাজার এ অন্ধত্ব চিরস্থায়ী হবে না। শাস্তি হিসাবে সাময়িক অন্ধত্বের শিকার হবেন পৌষ্য। পৌষ্যের সাময়িক অন্ধত্ব নিরসন হল নিজ দোষ স্বীকারে। এ কাহিনি কোথাও যেন খৃষ্টধর্মের confession প্রথার কথা স্মরণ করায়। জীবনে সুখ দুঃখ দুই-ই থাকবে। আত্মদোষস্বীকার আসলে দুঃখকষ্টের লাঘব করে। রাজা মানেই সে-ও দোষ-গুণের উর্দ্ধে নয়। এ মহৎ বাণীর প্রতিমূর্তি রাজা উতঙ্ক।

শকুনি (মহাভারত)

মহাভারতের অন্যতম প্রধান খলচরিত্র মামা শকুনি। গান্ধাররাজ সুবলের শ্রেষ্ঠ পুত্র শকুনি কৌরবমাতা গান্ধারীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা। মহাভারতের কাহিনিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে উস্কানিদাতা শকুনি। শকুনি খলচরিত্র হবার পিছনের কাহিনিটি মর্মস্পর্শী। গান্ধাররাজ সুবলের একশটি পুত্র এবং একটিমাত্র কন্যা গান্ধারী। গান্ধারীর সাথে বিবাহ হয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের। ভীষ্মের উদ্যোগে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। বিবাহের পর পতিনিষ্ঠতায় গান্ধারী নিজেকেই জগতের আলো দেখা থেকে দূরে

সরিয়ে নিল। গান্ধারী নিজের চোখও কাপড়ের পটি দিয়ে বেঁধে রাখল। বোনের এই আত্মত্যাগ প্রবলভাবে দু:খ দিল শকুনিকে। তাই শকুনির সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ভীষ্মের উপর। কিন্তু বোনের মুখ চেয়ে কোনোরকম অসদাচরণ করেনি কখনো শকুনি।

গান্ধারীর জন্মছকে লেখা ছিল যে গান্ধারীর প্রথম স্বামী খুব অল্প দিনের মধ্যেই মারা যাবে। তাই সেই দোষ কাটানোর জন্য এক ছাগলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় গান্ধারীর। তারপর সেই ছাগলটাকে কেটে ফেলা হয়। তারপর বিবাহ হয় ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে। এ কাহিনি গান্ধার রাজবংশে গোপনীয় ছিল। বিবাহের কয়েকবছর পর কোনোক্রমে ধৃতরাষ্ট্র এ সত্য জানতে পারে। তখন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর আত্মত্যাগের কোনো মূল্য না দিয়ে, রাজা সুবল এবং তার শতপুত্রসহ সমগ্র গান্ধাররাজ পরিবারকে বন্দী করে রেখে প্রচন্ড কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়েছিল। প্রত্যেককে প্রতিদিন খাবার জন্য মাত্র একমুঠো চাল দেওয়া হত। ফলে ক্ষুধার জ্বালায় আস্তে আস্তে পরিবারের একজন একজন করে ক্রমেই মৃত্যুমুখে ঢলে পড়তে লাগল। তখন সুবলরাজ কারারুদ্ধ গান্ধারদের সাথে পরামর্শক্রমে ঠিক করল যে এইভাবে সবাই মিলে মৃত্যুমুখে পতিত হবার চেয়ে অন্য কোনো উপায় ভাবতে হবে। প্রতিদিন একমুঠো অন্নে কেউই বাঁচতে পারবে না। তাই তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান যে হবে তাকে বাকিরা তাদের খাদ্য দিয়ে সুস্থসবলভাবে বাঁচিয়ে রাখবে যাতে সে গান্ধারদের উপর হওয়া এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে পারে। সেই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান গান্ধার ছিল শকুনি। এরপর গান্ধাররাজ সুবল তার শেষনি:শ্বাস ত্যাগের আগে জামাতা ধৃতরাষ্ট্রকে কাতর অনুনয় জানায় শকুনিকে যেন ধৃতরাষ্ট্রের পরিবারে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়, যাতে শকুনি তার ভাগ্নাদের অভিভাবকত্ব পালন করতে পারে। ধৃতরাষ্ট্রও শেষপর্যন্ত শ্বশুরমশাই-এর প্রতি দয়াপরবশতায় সুবলরাজের অন্তিম ইচ্ছা মেনে নেয়। মৃত্যুর আগে সুবলরাজ শকুনিকে তার উরু এবং মেরুদন্ড দিয়ে জাদুপাশা বানানোর কথা বলে যা দিয়ে কৌরবদের ধ্বংসসূচিত হবে। এবং সুবলরাজ লাঠি ছুঁড়ে মেরে শকুনির পা ভেঙে দেয়, যাতে এই ভাঙা পা প্রতিমুহূর্তে যন্ত্রণার দিনগুলোর কথা স্মরণ করায় এবং কৌরবদের ধ্বংসের পথে অগ্রসর করাতে অনুপ্রাণিত করে। এই জন্য শকুনির আরেকনাম সুবলোত্তম অর্থাৎ সুবলরাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম সন্তান।

শকুনি আসলে মানুষের কর্মফল। প্রত্যেক মানুষকে তার কর্মফল তার ইহজীবনে ভোগ করতে হয়। শকুনি আসলে তারই প্রতীক। সবেরই ভাল এবং মন্দ দুটি দিকই আছে। শকুনির সেই ইতিবাচক দিকের প্রতি সম্মান জানায় কেরালার কোল্লাম জেলার কুত্তরার সম্প্রদায়। শ্রদ্ধার চিহ্ন হিসাবে পবিথেরেশ্বরম গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে শকুনির মন্দির।

শিখন্ডী (মহাভারত)

হিন্দু মহাভারতের অন্যতম চরিত্র শিখন্ডী। পূর্বজন্মে সে ছিল কাশীরাজের জ্যেষ্ঠাকন্যা অম্বা। বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহের উদ্যোগে ভীষ্ম অম্বাকে তার দুইবোন সহ স্বয়ম্বরসভা থেকে জয় করে নিয়ে গিয়েছিল। অম্বা ভীষ্মকে জানিয়েছিল সুবলরাজ শাল্বের প্রতি তার ভালোবাসার কথা। ভীষ্ম তাতে কর্ণপাত করেননি। এরপর বিচিত্রবীর্যকে অম্বা তার মনের কথা জানালে বিচিত্রবীর্য তাকে সসম্মানে বিবাহজালে আবদ্ধ হওয়া থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু অম্বা এরপর শাল্বের কাছে ফিরে গেলে পরাজয়ের গ্লানি ভুলে অম্বাকে পত্নীরূপে স্বীকার করতে অস্বীকৃত হন শাল্ব। তখন অপমানিত অম্বা ভীষ্মকেই বিবাহের দাবী জানায়। কিন্তু ভীষ্মও কঠিন পণের কথা বলে বিবাহ না করার। এমনকি ভীষ্মের গুরুদেব পরাশরও ভীষ্মকে অম্বাকে বিবাহের জন্য রাজী করাতে পারেননি। ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ অপমানিত অম্বা প্রাণত্যাগ করার আগে ভীষ্মকে অভিশপ্ত করে যে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে শিখন্ডী।

এরপর শিখন্ডী দ্রুপদরাজার ঘরে জ্যেষ্ঠাকন্যা শিখন্ডিনীরূপে জন্মগ্রহণ করেন শিবের বরপ্রাপ্ত হয়ে। শৈশবে একদিন শিখন্ডী রাজফটকের বাইরে রাখা চিরসবুজ পদ্মের মালা পরে দ্রুপদরাজার কাছে এলে দ্রুপদরাজ বুঝতে পারেন এ আসলে অম্বা। কারণ কুমার কার্তিকেয় প্রদত্ত চিরসবুজ পদ্মের মালা একমাত্র অম্বাই পরতে পারে। ভীষ্মের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তখন দ্রুপদরাজ শিখন্ডিনীকে বনে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। সেখানে শিখন্ডিনী কঠোর সাধনা করে স্থূণাকর্ণ নামক এক যক্ষের থেকে পুরুষত্ব লাভ করে হয়ে ওঠে শিখন্ডী। এরপর বন থেকে ফিরে এসে শিখন্ডী বিবাহ করে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করে। তার ঔরসজাত পুত্র ক্ষত্রদেব।

কৌরব ও পান্ডবের যুদ্ধে পিতা দ্রুপদ এবং ভাই ধৃষ্টদ্যুম্নের মত শিখন্ডীও পুরুষবেশে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল পান্ডবদের পক্ষ থেকে। কিন্তু ভীষ্ম শিখন্ডীকে দ্রুপদরাজকন্যা হিসাবে জানতে পেরে অস্ত্রপরিত্যাগ করে শরাক্রান্ত হয়। শিখন্ডীকে পরাস্ত করার সমস্তরকম চেষ্টা করেছিল শকুনি। কিন্তু ভীষ্মের অদৃষ্ট শিখন্ডীর জন্য মৃত্যুবরণ। তাই ভীষ্মের শরশয্যায় শায়িত হবার পরই শিখন্ডীর মৃত্যু হয়। অষ্টাদশদিবসব্যাপী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ১০ম দিনের পর আর শিখন্ডীকে দেখা যায় না।

এই মানুষগুলি বর্তমান দিনে কেবল লিঙ্গপরিচয়ে গন্ডীবদ্ধ না থেকে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শিখন্ডী তাদেরই প্রথম পর্যায়ের প্রতিনিধি।

শিশুপাল (মহাভারত)

মহাভারতের অন্যতম চরিত্র শিশুপাল জন্মেছিল তিনটি চক্ষু এবং চারটি হস্ত নিয়ে। পিতা দমোঘোষ তখনই এ বিকৃত অঙ্গ শিশুত্যাগ করতে চাইলে এক দৈববাণী হয় যে, যার অঙ্গের স্পর্শে এ শিশুর অতিরিক্ত অঙ্গ অবলুপ্ত হবে তার হাতেই শিশুপালের মৃত্যু হবে। শিশুপালের মাতার সম্পর্কিত আত্মীয় কৃষ্ণের কোলে শিশুপালের অতিরিক্ত অঙ্গ খসে পড়ায় ভবিষ্য সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। শিশুপালের মাতাকে দেওয়া কথা অনুসারে কৃষ্ণ শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করলেও শেষ অবধি কৃষ্ণের হাতেই তার মৃত্যু হয়।

শিশুপাল আসলে অমোঘ নিয়তির প্রতিভূ। নিয়তিকে কেই খন্ডাতে পারে না।সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে কবি মাঘের লেখা 'শিশুপালবধ' কাব্যটি একটি অনবদ্য শাস্ত্রীয় সংস্কৃত সাহিত্য। এটি একটি মহাকাব্যিক কবিতাশৈলী যাতে ১৮০০টি উচ্চ অলঙ্কৃত পংক্তি ও ২০টি সর্গ ব্যবহার করা হয়, যা এটিকে ছয়টি অতুল্য সংস্কৃত মহাকাব্যের একটি বলে মান্যতা দেয়। কবির নামে এটি 'মাঘকাব্য' নামেও পরিচিত।

যযাতি ও চ্যবন (মহাভারত)

মহাভারতের এই দুই চরিত্র সেই অর্থে প্রতিবন্ধী নন। এঁরা যৌবনেই বার্ধক্যের স্বীকার হয়েছিলেন। যৌবনহীনতা তাঁদের দমিয়ে রাখতে পারেনি জীবনের চলার পথে। পুনর্যৌবন এবং চ্যবনপ্রাসের মাধ্যমে নতুনভাবে জীবনের সববাধা পেরিয়েছেন এঁরা।

শুধুমাত্র হিন্দুধর্মপুরাণই নয় পারিপার্শ্বিকতা তথা ইসলাম, ইহুদী, খৃস্ট ও বুদ্ধধর্মমতই বা কি বলে এই বিশেষ সক্ষম বা অক্ষম মানুষগুলি সম্পর্কে অতিসংক্ষেপে তাও উল্লেখ রয়েছে এই অধ্যায়ে।সাথে রয়েছে গ্রীক ও জার্মান পুরাণে উল্লিখিত এই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষদের কথা। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের মতই অতি অতি অল্প পরিসরে এক নজরে বিশ্বমানবজাতির দরবারে প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমকারী মানুষদের এক কোলাজের প্রয়াস রয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা ও ইসলামধর্ম

বুদ্ধধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম যেমন মনে করে মানুষের খারাপ কাজের শাস্তি হল শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, ইসলামধর্ম সে কথা মনে করে না। শারীরিক অক্ষমতার জন্য মানুষের নিজের বা তার পিতামাতার পাপের কোনো ভূমিকার উল্লেখ নেই ইসলামধর্মে। বরং ইসলামধর্ম মনে করে ভগবান

যখন কাউকে পরীক্ষা নিতে চায়, তখনই তাকে প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কোরাণ তাই জন্য মানুষকে সবসময় প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি সহৃদয় আচরণের কথা বলে। ইসলাম বলে মানুষের অর্থ প্রয়োজনীয় বস্তু। এই অর্থ নিজের ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থতায় নয়, অক্ষম মানুষদের সাহায্যে আল্লা দেন। কোনো কোনো ইসলাম-প্রবর্তকের মতে আল্লার অবমাননার ফল প্রতিবন্ধকতা। আল্লাকে একনিষ্ঠভাবে সেবা করলেই এই প্রতিবন্ধকতাকে জয় করা যায়।

প্রতিবন্ধকতা ও ইহুদীধর্মমত

ইহুদীধর্ম আবার প্রতিবন্ধকতার কারণ হিসাবে মানুষেরই কোনো কৃত অন্যায়কে দায়ী করে থাকে। তাই বলে এই ধর্ম অক্ষম মানুষদের দূরে সরিয়ে রাখার কথা বলেনি। বরং প্রতিবন্ধী মানুষদের সাহায্যার্থে সদাসর্বদা সচেষ্ট হবার কথা বলেছেন। ইহুদী দেশগুলিতে তাই প্রতিবন্ধী মানুষদের শিক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্র ও ধর্ম সদাসতর্ক, সদাপ্রচেষ্ট।

প্রতিবন্ধকতা ও খ্রীষ্টধর্ম

বাইবেল অনুসারে ভগবান মানুষকে তার পাপের শাস্তিস্বরূপ শারীরিক অক্ষমতার মধ্যে ফেলেন। এই পাপের কারক কে? মানুষ কি নিজের পাপের ফল নিজেই ভোগ করে থাকে নাকি পিতামাতার কোনো পাপের ফলে সন্তান শারীরিক অক্ষমতার শাস্তি পায়? এর সরাসরি উত্তর না পাওয়া গেলেও প্রভু যীশুর মতে, অক্ষমতা দিয়েছেন যে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরই তাঁর সন্তানদের অক্ষমতা থেকে উত্তরণের জন্য পথ দেখাবেন। এই কারণে কোনো কোনো খ্রীষ্টবাদী মনে করে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষেরা সাধারণ মানুষদের থেকে অনেক বেশী ধর্মপ্রাণ হয়ে থাকেন। আধুনিককালেও মানসিকভাবে অক্ষম মানুষদের প্রতিদিন নিয়ম করে ভগবানের কাছে প্রার্থনায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিছু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মানুষ তাই প্রতিবন্ধী মানুষদের সেবা করাকেই ধর্মাচরণ বা জীবসেবার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম বলে মনে করেন।

প্রতিবন্ধকতা ও বুদ্ধধর্ম

বুদ্ধধর্ম মনে করে মানুষের যে কোনো প্রতিবন্ধকতার জন্য দায়ী মানুষের খারাপ কর্ম। তাইজন্য বুদ্ধধর্ম সদাসর্বদা মানুষের সৎচরিত্র গঠনের দিকে দৃক্‌পাত করে। বুদ্ধধর্ম অক্ষম মানুষদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করে।

গ্রীক পুরাণ

গ্রীক পুরাণে আগুনের দেবতা (God of Fire) হেপাসটর (Hepastor)। হেপাসটরের মাতা দেবরানি (Queen of God) হেরা ছিলেন আকাশ এবং বিবাহের দেবী (God of the Sky and Marriage) এবং পিতা দেবরাজ তথা দেবপিতা (King of the Gods') জিউস (Zeus) কিনা বজ্রের দেবতা (God of Powerful and Strong Symbol Thunderbolt)। দুর্বল ও কুদর্শন হবার অপরাধে মা হেরা (Hera) জন্মের পরই তাকে পরিত্যাগ করেছিল। হেপাসটরকে তাই জন্মের পরই অলিম্পাস (Olympus) থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সমুদ্রদেবী (মতান্তরে বোন) থেটিস (Thetis) তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। স্পার্টায় বিকলাঙ্গ শিশুদের পাহাড়ের চূড়া থেকে নগরের বাইরে নিক্ষিপ্ত করা হত। স্পার্টায় দুর্বল ভবিষ্যতের কোন স্থান নেই। গ্রীক পুরাণের হেপাসটর ফিরে তো এলেন, কিন্তু খঞ্জত্ব বরণ করতে বাধ্য হলেন। অলিম্পাসে ফিরে এসে হেপাসটর প্রতিহিংসা-চরিতার্থতায় তৈরী করলেন 'the chair levitated' এবং হয়ে উঠলেন 'able disabled'। তবে অমৃত ঈশ্বরের কাছে প্রতিবন্ধকতাই মৃত্যুসমান।

''It is small wonder that Gods regard mortality as a disability''[৪]

মানুষের সাথে ভগবানের এইটুকুমাত্র তফাৎ, ভগবান অমর আর মানুষ মরণশীল। অমর এবং মরণশীলের সন্তানও হয় মরণশীল। এমনকি অনেকসময় অমর পিতামাতার সন্তানও অমর না হয়ে মরণশীল হয় অথবা প্রতিবন্ধী হয়। দেবরাজ জিউস নিজসন্তানদের অমরত্বদানের প্রচেষ্টারত ছিলেন। এর দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলেন অন্যান্য দেবতারাও। কিন্তু এই অমরত্বপ্রদান পদ্ধতিটি সহজ ছিল না। একটু ভিন্ন ধারায় এই প্রথার প্রবর্তন করতে সচেষ্ট ছিলেন দেবকূল।

দেবতারা মরণশীল মানবশরীরে অমৃত লেপন করে বারংবার তাকে আগুনে নিক্ষেপ করত। এবং শেষ পর্যন্ত জন্ম হত অমরত্বের। এই পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন থেটিস ও ডেমেটর (Demeter)। কিন্তু কেউই সাফল্যলাভ করতে পারেননি। ভগবান হলেও প্রতিক্ষেত্রেই নিজেদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছে পিতামাতা মরণশীলতাকে।

প্রথমে আসা যাক থেটিস-এর কাহিনিতে। হেপাসটরের পালিতা মাতা থেটিস-এর সঙ্গে মরণশীল পেলিউস (Peleus) এর বিবাহের সন্তান পুত্র একিলিস (Achilles) ছিলেন ট্রোজান যুদ্ধের নায়ক। সন্তানকে বাঁচানোর আকুল প্রচেষ্টায় থেটিস একিলিসকে নারীর ছদ্মবেশে লুকিয়ে রেখেছিল। মহাভারতে অর্জুনের বৃহন্নলা ছদ্মবেশ ধারণ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। থেটিস একিলিসের শৈশবে পেলিউসকে লুকিয়ে অমৃতলেপন করে অগ্নিনিক্ষেপ করত। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবার আগেই

বিষয়টি পেলিউস জানতে পারায় প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হয়ে থেটিসের প্রতি অসিনিক্ষেপ করেন। ক্ষুব্ধ থেটিস এরপর গৃহত্যাগ করলেন, পুত্র একিলিসের সাথে সম্পর্কছিন্ন হয়নি।

দ্বিতীয় কাহিনি ডেমেটর-এর। শস্যদেবী ডেমেটর যখন তার হারিয়ে যাওয়া কন্যাকে খুঁজে পেলেন তখন আনন্দে কন্যার প্রতিপালিকা পরিবারের প্রতি দয়াপরবশতায় ঐ পরিবারের শিশুপুত্র ডেমোফনকে (Demephon) অমরতা দানের চেষ্টা করেন। পদ্ধতি সেই পূর্ব উল্লিখিত। এক্ষেত্রেও একদিন শিশুপুত্রটির মা সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে ওঠায় পদ্ধতিটি সাফল্যের পূর্বেই সমাপ্ত হয়ে যায়। কোনো কোনো মতে, শিশুপুত্রটিও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।

থেটিস এবং ডেমেটর দুজনেই অমরত্বের প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং দুজনেই সফলকাম হবার পূর্বেই মরণশীল মানুষের দোষে অসমাপ্ত হয়ে যায়। থেটিস-এর কাহিনি আর অগ্রসর না হলেও ডেমেটর এরপর অন্যপথে অমরত্বদানের চেষ্টা করেন। ডেমোফন-এর ভাই ট্রিপটোলেমাসকে (Triptolemus) এরপর দেবী শস্যদানা দিয়ে জনজাতির জন্য কৃষিকর্মের শুভ সূচনা করলেন।

অক্ষমতা সংক্রান্ত গ্রীকপুরাণ কাহিনি দ্বিবিভক্ত। একদিকে রয়েছে হেপাসটর-এর কাহিনি। যে নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছিল রাগে-দু:খে-অপমানে। নিজের অক্ষমতাকে নিজেই জয় করে অন্যান্য অক্ষম মানুষদের প্রতিনিধিত্বও করেছে। আর আরেকদিকে রয়েছে থেটিস ও ডেমেটর এর কাহিনি। এদের মধ্যে তথাকথিত প্রতিবন্ধকতার কোনো নিদর্শন নেই। কিন্তু দেবতা যখন অমরতা দিতে পারে না, তার সক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয় তখন কি তাকে অক্ষম বলা যায় না। প্রতিবন্ধী তথা অক্ষম শব্দটি স্বাভাবিক সক্ষমতার মাপকাঠিতে কম সক্ষমতার কথা বলে। থেটিস এবং ডেমেটরও অক্ষম হলেন অমরতা প্রদান করতে। হেপাসটরের মত ডেমেটরও অক্ষমতাকে ভিন্ন পথে বিশেষ সক্ষমতায় রূপান্তরিত করেছিলেন। অক্ষমতাকে বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা উত্তীর্ণ হওয়া প্রতিবন্ধকতাজয়ের বাণী শোনায়।

জার্মান পুরাণ

চ্যাঞ্জেলিং[৫] (changeling)

এই চরিত্রটি পাওয়া যায় জার্মান এবং উত্তর ইউরোপীয় পুরাণে। এর মাথা সুবৃহৎ, বড় বড় চোখ। চ্যাঞ্জেলিং প্রচুর আহার গ্রহণ করে এবং খুব একটা বেশ নড়াচড়া করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে-

'বিকৃত বৃহৎ স্থাণুমাত্র'। [৬]

মার্টিন লুথার মনে করেন এই চ্যাঞ্জেলিং-রা শয়তানের প্রতিভূস্বরূপ। তাঁর মতে, এদের কেবলমাত্র শরীরই থাকে যা কিনা মূলত: শয়তানের শরীর হয়। এদের মধ্যে মানবমন তথা মনস্তত্ত্বের লেশমাত্রও থাকে না। স্পার্টায় যেমন বিকলাঙ্গ শিশুদের স্থান হত না, তেমনই এই শিশুদের প্রতিও লুথারের মনোভাব ছিল অত্যন্ত কঠোর। লুথার মনে করতেন এইসব শিশুদের বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানেই হয় না। এই মাংসপিন্ডদের নদীর জলে চুবিয়ে মেরে ফেলা উচিত। লোকবিশ্বাসানুযায়ী এরা অতিপ্রাকৃত সন্তান হলেও আধুনিককালে এরূপ মানুষ একবারেই অপরিচিত নয়। Hydro-cephlus, Downs Syndrome বা Cerebral palsy তে আক্রান্তদের চেহারা এরূপ বিকৃতরূপ ধারণ করে।

মিথ-পুরাণ কথাসাহিত্যে প্রয়োগ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'তে গুরু রাজসিংহের উদ্দেশ্যে মাণিকলালের অঙ্গুলি-কর্তন স্মরণ করায় একলব্যের কথা। একলব্যের গুরুর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং অবিচল বিশ্বাস তাকে সাফল্যের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। মাণিকলালও দেখেছি তার অঙ্গুলিহীনতাকে কি অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির মুন্সিয়ানায় কাজে লাগিয়েছে রাজসিংহের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহামায়া' গল্পটির নামকরণ হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামে। নায়িকা মহামায়াকে কেন্দ্র করে গল্পটি আবর্তিত হয়েছে। মহামায়ারই এক নাম কালী। গল্পের মহামায়াও আগুনে পুড়ে বিকৃতরূপী হয়েছিল। আগুনে পোড়ার রং কালো। সেইসূত্রে একটি মিথের যোগ অস্বীকার করা যায় না।

বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার বামন রূপে দৈত্যরাজ বলিকে দমন করেছিল। জার্মান মিথে চ্যাঞ্জেলিং-কে শয়তানের প্রতিভূ বলে মনে করা হত। কিন্তু হিন্দু মিথ-পুরাণে বামন স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার রূপে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেছে। অভিসন্দর্ভটির নির্বাচিত চরিত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'খাখ্' গল্পে ভোম্‌রা সারা জীবন ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পাত্র হলেও প্রতিশোধস্পৃহ হয়নি, বিমল করের 'দেওয়াল' উপন্যাসের 'উমা' কল্যাণীরূপে গৃহকর্মভার সামলেছে । মানুষের মধ্যে থাকা প্রবৃত্তি রিপুকে জয় করেছে এরা।

বিকৃতদেহীরূপে পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতে একাধিক চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। তারা তাদের শারীরিক বক্রতার কারণে কোপনস্বভাবা হিসাবেও উল্লিখিত হয়েছেন। যেমন- অষ্টাবক্র। জার্মান মিথে চ্যাঞ্জেলিং বলে চরিত্রের উল্লেখ আছে, যাকে কুদর্শনের জন্য শয়তানের প্রতিভূ হিসাবে গণ্য করা হয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'খাখ্'-এর ভোম্‌রা, বিমল করের 'দেওয়াল' এর উমা, নীহাররঞ্জন

সেনগুপ্তের ‘উল্কা’য় অরুণাংশুকে সাধারণ সমাজ প্রথম দর্শনেই শয়তানের প্রতিভূ, ভূতের মত চেহারা ইত্যাদি বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত করেছে।

মহাভারতের শকুনি খঞ্জ, খল চরিত্র। শকুনির ভূমিকা সম্পত্তিগত বিবাদ সংক্রান্ত। গান্ধার রাজপুত্র শকুনি তার পিতার প্রতি ধৃতরাষ্ট্র যে অন্যায় করেছিল, রাজ্যচ্যুত করেছিল তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অর্থমনর্থম্’ গল্পের ফণিভূষণ খোঁড়া ছিল। তার মনের অপরাধপ্রবণতা, হীনন্মন্যতার মধ্যেও সম্পত্তিঘটিত বিষয়টি জড়িত। শকুনি যাতে প্রতিশোধ নেবার কথা ভুলে না যায়, তাইজন্য তার পা খঞ্জ করে দিয়েছিল তার পিতা এবং শকুনির বাবা ও অন্যান্য সব ভাইরা মারা যাবার পর শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রিত হয়েছিল। ফণিভূষণও দেখেছি আশ্রিত ছিল এবং তার খঞ্জত্ব প্রতিমুহূর্তে তাকে মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে এবং অপরাধের পথে ঠেলে দিয়েছে।

পৌরাণিক কুবেরের দুই স্ত্রী - ভাগ্যদাত্রী ভদ্রা এবং সাফল্যদাত্রী ঋদ্ধি ।মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসের কুবেরের জীবনেও দুই নারী - পঙ্গু স্ত্রী মালা এবং দুরন্ত শ্যালিকা কপিলা।পঙ্গু মালা দরিদ্র জেলে কুবেরের জীবনে সৌভাগ্য এনেছিল - স্ত্রী সন্তানসহ পরিবারের সৌভাগ্য ।পুরাণে রাবণবধের পর কুবের ভদ্রাসহ লঙ্কাগমন করেছিলেন।‘পদ্মানদীর মাঝি’র কুবের ভাগ্যের অন্বেষণে কপিলার সঙ্গে হোসেন মিঞার স্বপ্নরাজ্য ময়নাদ্বীপে পাড়ি দিয়েছিল।

সোমেন চন্দের ‘সংকেত’ গল্পে যুগবদলের ইঙ্গিত প্রথম পেয়েছিলেন দশরথ। দশরথ অন্ধ। তার পুত্রের নাম রাম। এরাও রামায়ণের কথা মনে করায়। তবে রামায়ণের রাজা দশরথ অন্ধ ছিলেন না। ‘মহাভারতে’র রাজা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তিনি সেই কাহিনি শুনতেন। ‘সংকেতে’র দশরথও সমকালীন রাষ্ট্রিক-সামাজিক-বিপর্যস্ততার কথা শ্রবণ করতেন। এখানে রামায়ণের রাজার নাম দশরথ এবং মহাভারতের অন্ধ রাজার ধৃতরাষ্ট্রের যুদ্ধকাহিনি শ্রবণ, দুটি মিলে আধুনিক দশরথকে পাই।

গ্রীক পুরাণের কাহিনিতে দেখেছি থেটিস তার সন্তান একিলিসকে প্রাণে রক্ষা করার জন্য নারীর ছদ্মবেশে লুকিয়ে রেখেছিল। মহাভারতে অর্জুনও আত্মরক্ষার জন্য বৃহন্নলাবেশ ধারণ করেছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ ও ‘শুকসারী কথা’য় নসুকে দেখেছি নারীর সাজে সমস্ত নারীকৃত্য পালন করতে। তৃতীয় লিঙ্গের এই মানুষরা আধুনিক যুগে আর প্রতিবন্ধী হিসাবে পরিচিত নন, তাদের স্বাধীন পরিচয়ের প্রচেষ্টায় সমাজ এবং রাষ্ট্র উদ্যোগী।নলিনী বেরার ‘অপৌরুষেয়’ উপন্যাসে আনন্দী তাই তার সর্বপ্রথম পরিচয় স্থাপন করতে পেরেছে একজন মানুষ হিসাবে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' রামায়ণ আদলে ঢোঁড়াই-এর জীবনবৃত্তকথা।বৌকা বাওয়ার সঙ্গে ঢোঁড়াই-এর বাৎসল্য সম্পর্ক দশরথ ও রামের কথা স্মরণ করায়।রামায়ণের রাম পিতা দশরথের সত্যরক্ষার্থে বিবাহপরবর্তীকালে বনবাসে গিয়েছিল,আর ঢোঁড়াই-এর বিয়ের পর বৌকা বাওয়া নিজেই অজ্ঞাতবাসে চলে যায়।

কমলকুমার মজুমদারের 'মতিলাল পাদরি' গল্পে লেখক অনায়াস দক্ষতায় মিথ-ভাঙার রীতি অনুসরণ করেছেন। গল্পে ভাম্‌রির শিশুকে সাদরে বরণ করেছিল হিজরে বদন। মতিলাল পাদরি প্রথমে খৃষ্টান হবার জন্য বরণ করতে চাননি ভাম্‌রি ও তার সন্তানকে। গল্পের শেষে মানবিকতার উন্নতিবোধে মানবিকতার বিকাশে মতিলাল সত্যিই সন্ন্যাসীতে উত্তীর্ণ হয়ে বুকে টেনে নিয়েছিল শিশুটিকে। কমলকুমার এখানে সাঁওতাল পরগণার দেশি পাদরি চরিত্রের মাধ্যমে খৃষ্ট জন্মের বহু প্রচলিত কাহিনিটি ভেঙে বেরিয়ে এলেন- এই পুরোপুরি অন্য এক কাহিনি নির্মাণে বদন হিজরে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা'র অরুণাংশু অসম্ভব বীরদর্পে মিলিকে রক্ষা করেছিল দুষ্টুলোকের হাত থেকে এবং শেষে প্রাণ দেন। রামায়ণের জটায়ুও অসম্ভব যুদ্ধ করেছিল সীতাকে দুষ্টুলোক রাবণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। রামায়ণের জটায়ু পারেনি সীতাকে বাঁচাতে, কিন্তু অরুণাংশু পেরেছিল।

স্পার্টায় দেখেছি বিকলাঙ্গ শিশুকে নগরপ্রান্ত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত, নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা'তে অরুণাংশুর জন্মের সময় বিকৃতদেহী হওয়ায় তার বাবা রাজীব তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, যদিও ডাক্তারের জন্য নবজাতকটির প্রাণ রক্ষা পায়, কিন্ত আসলে সেও তার মায়ের কোল থেকে ত্যক্ত হয়ে এক অনাথ আশ্রমে বড় হয়ে ওঠে এবং পঁচিশ বছর পরে ফিরে আসে। গ্রীক পুরাণে হেপাস্টরকে দেখি দুর্বল এবং কুরূপতার জন্য মা হেরা কর্তৃক পরিত্যক্ত হতে। হেপাস্টর পরে ফিরে এসেছিল আরোও শক্তিশালী হয়ে এবং তার মধ্যে কাজ করেছিল এক প্রতিশোধস্পৃহা। অরুণাংশু ফিরে আসে, তখন তার শারীরিক শক্তি প্রচুর, প্রতিশোধস্পৃহা তার মধ্যে না থাকলেও, আর দুই ভাই বোনকে দেখে মাতৃস্নেহবুভুক্ষায় তার মধ্যে এক মানসিক কষ্ট ছিল।

মহাভারতের শিশুপালের কাহিনিতে দেখি বিকৃতদেহী হয়ে জন্মের জন্য প্রথমে পিতা পরিত্যাগ করতে চাইলে এক দৈববাণী হয়, যার অঙ্গস্পর্শে সুরূপ পাবে শিশুপাল তার হাতেই তার মৃত্যু হবে। নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' উপন্যাসে দেখি অরুণাংশুকে পিতা পরিত্যাগ করতে চাইলে ডাক্তার তাকে বাঁচায়, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে অরুণাংশু যখন আবার পিতা-মাতার স্বীকৃতিলাভের পর্যায়ে এসে পৌছায় তখন সেই ডাক্তারের কন্যাকে বাঁচাতে গিয়ে অরুণাংশুর মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মহামায়া’ গল্পে দেখি মহামায়া তার জীবনের বিপর্যয় কাটিয়ে ভালোবাসার মানুষের কাছে ফিরে আসে। একত্রে বসবাসের শর্ত রাজীব কোনোদিন মহামায়ার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে পারবে না। মহামায়া নিজের জ্বলে যাওয়া রূপ দিয়ে কারোর করুণার পাত্র হয়ে থাকতে চায়নি। তাই রাজীব যখন মহামায়ার শয়নমন্দিরে উপস্থিত হয়ে মহামায়ার অবগুণ্ঠনহীন অগ্নিদগ্ধ রূপ দেখল, মহামায়াও চিরজীবনের মত রাজীবকে ছেড়ে চলে যায়। মনে পড়ে গঙ্গাও তার প্রতিশ্রুতিভঙ্গের জন্য শান্তনুকে ত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে গেছিল। কাহিনিসূত্রে আমরা জানতে পারি ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়ন করেছিলেন। হিন্দী সাহিত্যের প্রখ্যাত লেখক ফণীশ্বরনাথ রেণুর ‘জ্বলবা’ (বাংলা অনুবাদে ‘দাহ’) গল্পে ফাতিমাও অ্যাসিড হামলায় রূপবিকৃতির শিকার হয়েছিল। তার প্রিয় অনুচর অজিতের আহ্বানে ফাতিমাদি অবগুণ্ঠন থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। ভগীরথের জন্মবৃত্তান্তে আমরা দেখেছি বহু শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছিল ভগীরথ। হিন্দু অজিতের মুসলিম ফাতিমাদির আজিজ ভাই হয়ে ওঠার পিছনেও রয়েছে প্রচুর প্রতিবন্ধকতা জয় করার গল্প। পৌরাণিক গঙ্গা পবিত্রতার প্রতীক। গঙ্গার পুণ্যস্পর্শে বহু পাপী পুণ্যতায় উত্তীর্ণ হয়। ফাতিমাদিও নারীকে রক্ষণশীলতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মহামায়া রূপবিকৃতির লজ্জা থেকে নিজে মুক্ত হতে পারেনি, কিন্তু ফণীশ্বরনাথ রেণুর ফাতিমাদি পেরেছিল সমস্ত লজ্জা সংস্কার থেকে নিজে মানসিকভাবে মুক্ত হতে। তাই জন্য অ্যাসিড-আক্রান্ত বিকৃতরূপী ফাতিমাদি লজ্জায় মুখ ঢাকার বদলে অজিতের সামনে হেসেছিল এবং অন্ত:করণের তীব্র প্রাণশক্তিতে তার চোখ দুটো উজ্জ্বলতর হয়েছিল।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জটায়ু’ গল্পে নিত্যচরণের দুটো হাত নেই। অথচ সে রক্ষা করছে তার পরিবারকে। লেখকের ‘জটায়ু’ নামকরণ রামায়ণের জটায়ুর কথা মনে করায়। রামায়ণে ‘জটায়ু’ তার দুইপক্ষ বিস্তার করে রক্ষা করতে চেয়েছিল সীতাকে, কিন্তু পারেনি। ‘জটায়ু’ গল্পের নিত্যচরণ তার কাটা হাত নিয়েই প্রতিমুহূর্তে রক্ষা করে চলেছে তার দুর্গাকে। ‘নিত্যচরণে’র এই দুই হাত না থাকা প্রভু জগন্নাথকেও মনে করায়। জগন্নাথেরও দুটি হাত না থাকাতেও তিনি সমগ্র জগৎকে রক্ষা করেন। নিত্যচরণ আগেও দুর্গাকে রক্ষা করেছে, পরিচয় দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে এবং হাত খোয়ানোর পরও অল্প সময়ের জন্য হলেও আগুন নাচের সময় সাধারণের চোখে দুর্গাকে সম্মানের স্থানে স্থাপন করতে পেরেছে।

মিথ-পুরাণে আগুনের ব্যবহার অনেকক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। গ্রীক পুরাণে আগুন সভ্যতার অগ্রসরমানতার প্রতীক। ‘জটায়ু’ গল্পের আগুন ও বিশেষভাবে প্রতীকায়িত হয়েছে। নিত্যচরণের আগুন নাচ- রামায়ণের সীতার সতীত্ব প্রমাণের জন্য অগ্নিপরীক্ষা- নিত্যচরণের দুর্গা তথা

নারীজাতির সম্ভ্রমরক্ষার প্রচেষ্টা- গ্রীকপুরাণে থেটিসের একিলিসকে মরণশীলতা থেকে রক্ষা করার জন্য অমৃতলেপন করে অগ্নিনিক্ষেপ- নিত্যচরণের সীমাবদ্ধতা সব কিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

মহাভারতে কর্ণ যেমন বিরাট সংগ্রামে একাকীত্বের যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছিল, তেমনিই সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া'র ব্যর্থ আন্দোলনের নায়ক রুহিতন শেষপর্যন্ত একাকীত্বের যন্ত্রণায় আত্মবিসর্জন দেন।

মহাভারতের চরিত্র শাম্বকে আমরা পাই কৃষ্ণপুত্র হিসাবে। মাতার নাম জাম্ববতী। দুর্যোধন কন্যা লক্ষ্মণার সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। কথিত আছে, কৃষ্ণ শিবের মত পুত্র বাঞ্ছা করায় এক মুনির পরামর্শে কঠোর তপস্যায় শিব ও পার্বতীকে তপস্যা করে পুত্র শাম্বকে লাভ করেন। শাম্ব ঋষি দুর্বাসার অভিশাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়। পরবর্তীকালে সূর্যপূজার মাধ্যমে শাম্বের রোগমুক্তি ঘটে। কথিত আছে, কোনারকের সূর্যমন্দিরই শাম্বপ্রতিষ্ঠিত সেই সূর্যমন্দির।সমরেশ বসু পৌরাণিক শাম্বকে অসাধারণ আধুনিকতায় প্রতিস্থাপিত করলেন বিংশ শতাব্দীতে তার উপন্যাসে। কৃষ্ণপুত্রেও কুষ্ঠের মত ভয়ংকর ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, যেখানে গ্রীক পুরাণে দেখি অমর দেবতাদের কাছে রোগব্যাধি মরণশীলতার তুল্য যন্ত্রণাদায়ক ছিল। এখানে সমরেশ বসু শাম্বকে ভয়ানক রোগব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হবার পরও ঘুরে-দাঁড়ানোর প্রত্যয় স্থাপনের দৃষ্টান্ত রাখলেন। কুষ্ঠব্যাধির সঙ্গে ধর্মঠাকুরের যোগ পাওয়া যায়। ধর্মের সাথে সূর্যদেবতা এবং যমদেবতার অভেদকল্পনা অনার্যসংস্কৃতিজাত। সূর্যের পূজার মাধ্যমে শাম্বের রোগমুক্তি এ দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। মিথ-পুরাণের সাথে সূর্যবিজ্ঞানকে মিলিয়ে মিশিয়ে নব-আঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন সমরেশ বসু 'শাম্ব' উপন্যাসে কুষ্ঠরোগমুক্ত শাম্বকে। শাম্ব পুরাণে বর্ণিত ঋষি দুর্বাসা সমরেশ বসুর লেখনীতে কালপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। সমরেশ বসুর শাম্ব নারদ মুনির ষড়যন্ত্রের পিতা কৃষ্ণের অসূয়া দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন। সমরেশ বসু নিজে যেভাবে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন তাই মিথের মোড়কে নবনির্মিত হয়।

মহাভারতে উল্লিখিত শিখন্ডী চরিত্র পাই কমল চক্রবর্তীর 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণে'। আধুনিক যুগে এরা আর প্রতিবন্ধী হিসাবে গণ্য হয় না। এরা সমাজে ভিন্নতর চাহিদাসম্পন্ন মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

প্রতিবন্ধকতা এদের জীবনের চলার পথ রুদ্ধ করতে পারেনি। বরং অতিরিক্ত সক্ষমতার উপায় বাতলেছে মানবজাতিকে।

তথ্যসূত্র

১ Malinowski, Branislaw : "Magic, Science, Religion and other Essays', Sovenir Press, London, 1974, page-7 ।

২. প্রামাণিক মলয় (সম্পাদনা)। রামায়ণ : কৃত্তিবাস বিরচিত। গ্রন্থবিকাশ। কলকাতা-৭। জানুয়ারি ২০১১।পৃ৩৭ ।

৩. শ্রীমানী শান্তা (সম্পাদনা)।সরকার পবিত্র (ভূমিকা)।উপেন্দ্রকিশোর রচনাসমগ্র।বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড।কলিকাতা-৭৩।পৃ ৭২৪।

৪ https://en.wikipedia.org/wiki/Hephaestus ।

৫. https://en.wikipedia.org/wiki/Changeling ।

৬. মুখোপাধ্যায় তরুণ। প্রসঙ্গ পঞ্চভূত। পাণ্ডুলিপি। দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০২। পৃ ৯৫ ।

তৃতীয় অধ্যায় :

প্রাক্ আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল অভিমুখ বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতিবন্ধী চরিত্রদের আলোচনার পূর্বেকার সমাজে প্রতিবন্ধী বলতে কোন মানুষরা বিবেচিত হত এবং সমাজে তাদের স্থান কেমন ছিল, সেটা দেখার চেষ্টা করব।

প্রায় সহস্রাধিক বছরের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রদীপ জ্বালানোর পূর্বে সলতে পাকানোর মতই বলা যায় এই অধ্যায়টিকে। বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্রের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পরিসর আলোচনা বিশেষ প্রণিধেয়।

প্রাচীন বাংলার একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদের ৪০ সংখ্যক 'সহজ দৌর্ল্লভ্য'[১] পদে কাহ্নপাদ (কৃষ্ণাচার্য) বলেছেন, বোবার কথা কালাই বোঝে।-

''গুরু বোব সে সীস কাল।।''[২]

গুরুবাদী পরম্পরা, গূঢ় সাধনতত্ত্ব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখা সমস্ত কিছুর মধ্যেও স্পষ্ট মূক এবং বধিরদের নিজেদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় আদানপ্রদান এবং সংযোগসাধন।

মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছিল যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তার প্রধান তিনচরিত্রের মধ্যে বড়াই-এর শরীরেই দেখি বেশ কিছু শারীরিক বিকৃতি। বয়সের ভারে ন্যুব্জ শরীর তবুও অসাধারণ মনের জোরে পেরিয়ে গেছে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা। এছাড়া ভিন্নভাবে অক্ষম আয়ান ঘোষ বামনের মত চরিত্রও আছে। দেবচরিত্র হলেও বাদ যায়নি মনসাও। আছে ভগীরথকথা। ভাঁড়ুদত্তের দাদা শিবাও উঠে এসেছে স্বল্পপরিসরে। সার্বিকভাবে বর্ণিত হয়েছে নারীগণের পতিনিন্দা ও শাশুড়ীদের জামাইনিন্দা অংশগুলিতে বর্ণিত অক্ষম চরিত্ররা। এক ঝলকে এই কয়েকটি চরিত্রও আলোচিত হল।

আইহন (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: বড়ু চন্ডীদাস)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার স্বামীর নাম আইহন বা অভিমন্যু। জন্মখন্ডেই বলা হয়েছে সে নপুংসক।

''দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জাণী।

নপুংসক আইহনের রাণী ''[৩]

পুরাণে কথিত আছে, পূর্বজন্মে অভিমন্যু তথা আইহন সুদীর্ঘকালব্যাপী গভীর তপস্যায় রত থেকে ভগবান নারায়ণকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করেছিলেন। নারায়ণ প্রসন্ন হয়ে ধ্যানমগ্ন যোগীপুরুষকে বরপ্রার্থনা করতে বললে, আইহন নারায়ণপত্নী দেবীলক্ষ্মীকেই পত্নীরূপে প্রার্থনা করেন। স্তম্ভিত নারায়ণ প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে আইহনকে বললেন, লক্ষ্মীকে তিনি পত্নীরূপে লাভ করবেন নিশ্চিত, কিন্তু আইহন নিজে নপুংসক রূপে জন্মগ্রহণ করবেন।

বিয়ের সময় আইহন ও রাধার বয়স কত ছিল জানা না গেলেও কাব্যের প্রথম দিকে রাধার নিজেকে এগারো বছরের বালিকা বলে উল্লেখ রয়েছে। আইহনের স্নেহ প্রীতি ভালোবাসায় রাধা এতটাই মুগ্ধ ছিল যে, বিবাহের বেশ কিছুদিন পর সে স্বামীর নপুংসতার কথা বুঝতে পারে। এমনকি কাব্যের প্রথম খন্ড জন্মখন্ডেই আইহনকে নপুংসক উল্লেখ করা হলেও তাম্বুলখন্ডে রাধা নিজের স্বামী সম্পর্কে বলেছে-

''ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষণ দেহ।।''[৪]

অবশ্য রাধার এরূপ স্বামীকে সর্বাঙ্গসুন্দর সুলক্ষণ বলার দুটি কারণ থাকতে পারে- প্রথমত, বালিকা রাধার তখনও স্বামীর পৌরুষত্ব সম্পর্কে জ্ঞান না হওয়া এবং দ্বিতীয়ত, নিজের স্বামীর দোষত্রুটির কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ না করা। তবে রাধা বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও সে যে বিশেষ শাস্ত্রটি সম্পর্কে খুব বেশি রসিকা নয় তা কৃষ্ণের প্রতি তার উক্তিই প্রমাণ দেয়-

''ছাড়হ নিলজ কাহ্নাঞিঁ হেন পাপ বাণী।
আহ্মে শিশুমতী রতিকথাহো না জাণী ।।''[৫]

আবার কৃষ্ণ যখন রাধাকে সম্ভোগের প্রস্তাব দেয়,-

''সুন্দরি রাধা মোর বোল শুন।
ছাড়িব দান দেহ আলিঙ্গন।।''[৬]

তখন রাধা বলে,-

''প্রথম বএঁসে মোঁ রাধিকা গোআলী।
না জানোঁ সুরতি ভাব সুণ বনমালী।।''[৭]

আবার বলেছে

''না জাণো কাহ্নাঞিঁ সুরতি আশে।
কেহ্নে করহ হেন আভিহাসে।।''[৮]

প্রতিক্ষেত্রেই স্পষ্ট যে, রাধা রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিজ অজ্ঞতার কথাই স্বীকার করছে।

আইহন ও রাধার বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য সম্পর্ক না এলেও আইহন রাধার প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল ছিল তার প্রমাণ মেলে রাধার জবানীতেই-

''সামীর বড়ই দুলালী''[৯]

এতেই প্রমাণিত রাধার প্রতি আইহনের ভালোবাসায় স্ত্রী রাধা তৃপ্ত ছিল। কিন্তু হায়! বিধি বাম।

দেবতার নিদারুণ আশীর্বাদে তেজদৃপ্ত তপশ্চারী আইহন মর্ত্যভূমিতে জন্মাল ছিন্নমূষ্ক হয়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আইহন নপুংসক চরিত্ররূপে আবির্ভূত হলেও বড়ু চন্ডীদাস কাব্যে সেই চরিত্রের অসম্মান বা অমর্যাদা কখনোই করেননি। এই পর্যায়ের করুণ চিত্রটি রয়েছে আইহন ও রাধার শয়নকক্ষে, সেখানে দুজন একই শয্যায়। রাধা প্রহর গুনছে কতক্ষণে স্বামী নিদ্রামগ্ন হবে, তবেই সে কৃষ্ণের বিরহলতার পাপড়িগুলো ক্রন্দন কাজলে সিঞ্চিত করতে পারবে। ওদিকে আইহনের মর্মযাতনার কথার অনুক্তই থেকে গেল রাধাকৃষ্ণের প্রেমের পটপরিবর্তনে। সরলমন আইহন পত্নী রাধার পয়োধরে কোনো নখরাঘাতের চিহ্ন না দেখে কোনোদিনই হয়ত কৃষ্ণের অস্তিত্বের কথা ভাবতে পারেননি, অথবা নিদ্রিত অবস্থায় হঠাৎ করে জেগে উঠে যদি কোনোদিন রাধাকে কাঁদতে দেখত আইহন, তাহলে হয়ত আইহন ভাবত তারই অসম্পূর্ণতা রাধাকেও কাঁদাচ্ছে। কিন্তু আসল সত্য কি উপলব্ধি করতে পেরেছিল বা পারত নপুংসক আইহন?

মধ্যযুগীয় ধারায় যেখানে মানবতার কোনো ভূমিকা ছিল না, কেবলমাত্র দেববাদের কথাই গ্রাহ্য হত, সেখানে আইহন চরিত্রের উপস্থাপনা নি:সন্দেহে ভিন্নমাত্রার দাবি রাখে। আইহনের নপুংসকতা তৎকালীন সমাজপ্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান সূচিত করে। সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ স্বীকৃত ছিল। অর্থাৎ পুরুষের ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থতায় কোনো খামতি রাখতে চায়নি সমাজ। কিন্তু কোনো স্বামী যখন নপুংসক হয়, তখন তার স্ত্রীর যৌনকামনার অতৃপ্তি এখানে দেখানো হয়েছে। তবে বড়ু চন্ডীদাস পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষের একাধিপত্য দেখানোর বদলে আইহনের মনস্তাপ চিত্র অঙ্কন করে নপুংসক মানুষের অসহায়ত্ব দেখিয়েছেন। সমাজের চোখে পুরুষ হলেও কিন্তু পৌরুষহীনতার গ্লানিতে অনুতাপে তারা যথার্থ মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে।আধুনিক কথাসাহিত্য আলোচনার পরিসরে আমার দেখব নপুংসক মানুষরা একবিংশ শতাব্দীতে অক্ষম মানুষ নন, তারা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে,আইনও এদের পাশে।

বড়ায়ি / বড়াই (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : বড়ু চন্ডীদাস)

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' বড়ায়ি চরিত্রটিকে প্রাচীন কামশাস্ত্রের কুট্টিনী বা দূতী চরিত্ররূপে কেবলমাত্র বিশ্লেষণ করা যায় না। বড়ায়ি হল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধার মা পদুমার পিসী। রাধাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইহনের মা বড়ায়িকে পদ্মার কাছ থেকে নিয়ে আসেন। বড়াই এর অনেকটাই বয়স হয়েছে।

''শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে।।
ভ্রুহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুঈ আখি।।
মাহা পুট নাশা দন্তহীনে।
উন্নত গন্ড কপোল খীনে।।
বিকট দন্ড কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী।।
কাঠী সম বাহুযুগলে।
নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে।।
কুটিল গমন ঘন কাশে।''[১০]

সাদা চামরের মত তার পক্কিত কেশ, কপাল দুপাশে বসে গেছে। সাদা ভ্রূকুটি দেখতে যেন দুটি চুনের রেখা, চোখদুটি গর্তে ঢুকে গেছে, নাক মাঝখান থেকে বসা, থোবড়ানো গালের হাড়দুটো উঁচু বীভৎস দন্তরাশি , উটের ঠোঁটের থেকেও নিকৃষ্ট ওষ্ঠদ্বয়, কাঠির মত সরু দুই বাহু , নাভিদেশ পর্যন্ত লম্বিত ঝুলে পড়া স্তনযুগল , এবং বলহীন পদযুগল চলার সময় ভারসাম্যহীন হয়ে এদিক-ওদিক এঁকে-বেঁকে চলে।চোখেও ভাল দেখে না-

''এঁবে বড় নয়নে মো না দেখোঁ সুন্দরী।'' [১১]

বিকটদর্শন বড়াই-এর ব্যবহার যে সুমধুর তা রাধার উক্তিতে প্রথমেই বড়ু চন্ডীদাস জানিয়ে দিয়েছেন-

''ভাগ্যেন মম রক্ষায়ৈ জরাতি ত্বং নিয়োজিতা।
তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে।।''[১২]

বড়াই এর সাথেই রাধা মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধ বিক্রয় করতে যেত। পথে রাধাকে হারিয়ে ফেলায় বড়াই কৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করে। রাধার যথাযথ বর্ণনা দেয় বড়াই কৃষ্ণকে। সবই করে বড়াই

শুধুমাত্র রাধার সন্ধান লাভের উদ্দেশ্যেই। রাধার সন্ধান লাভের জন্য গোচরণরত কৃষ্ণের সমস্ত প্রস্তাবেই বড়াই স্বীকৃত হয়। এখানে নাতনী রাধার প্রতি বড়াই-এর ভালোবাসার প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। আসলে বড়াই এটাও জানত, এ কৃষ্ণ কোনো সাধারণ বালক নয়, সে-

''দেব সংসারের সার।''[১৩]

আর ঠিক সেই কারণেই কৃষ্ণের প্রণয় প্রস্তাব স্বরূপ ফুলতাম্বুলাদি রাধার কাছে নিয়ে যেতেও বড়াই দ্বিধান্বিত হয়নি। বড়াই নিজেই বলেছে-

''যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে দেখিল হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী।।''[১৪]

কিন্তু এখানে রাধার পূর্বস্মৃতি বিস্মৃত হয়েছে। তাই আয়ান ঘোষের বিবাহিতা হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণের প্রণয় প্রস্তাব আনায় ক্রোধিত হয়ে বড়াই-কে সে পদাঘাত করল। মানবী বড়াই তাতে যারপরনাই অপমানিতা হয়ে প্রতিশোধস্পৃহায় কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটানোর।

দানখন্ডে বড়াই-চরিত্রের অন্য আরেকরূপ পরিস্ফুট। এখানে বড়ায়ি

''ঠেঠালি'' ।[১৫]

রাধাকৃষ্ণের মিলনের জন্য সুকৌশলে যেমন সে রাধার শাশুড়ীর অনুমতি সংগ্রহ করেছে , আবার তেমনি বনমধ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলনও কৌশলে সাধিত করেছে-

''বনে বনে পালাইআঁ রাধা যবেঁ জাএ ।
আগুছিআঁ বাটে তবেঁ কাহ্নাঞিঁ রহাএ ।।
তাক দেখি বড়ায়ি পালটি অথবেথে ।
অতিবড় ঠেঠালি রহিলী মূল পথে।।''[১৬]

নৌকাখন্ডে বড়ায়ি-এর পরিকল্পনার তো কোনো জবাবই নেই। সে রাধা অদর্শনে ব্যাকুল কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার পুনরায় মিলন সাধনই হোক-

''মধুরাং মথুরাং নেতুং জরতী কপটে পটুঃ।
কৃষ্ণস্য বচসা প্রাহ শীঘ্রং রাধামিদং বচঃ।।''[১৭]

কিংবা আবার রাধার শাশুড়ীর থেকে অনুমতি আদায় করে দধিদুগ্ধ বিক্রির অছিলায় রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটানোই হোক-

''তবেঁ তার থান গিআ বুইল সত্বরে।

কি কারণে দধি দুধ নঠ কর ঘরে।।
হেনক কুমতীএঁ হয়িবেঁ ভিখারী।
বুঝি রাধিকা পাঠাহ মথুরা নগরী।।
হেনমতেঁ নানা পরকার করিআঁ।
বুঢ়ি দিল রাধিকারে আনুমতী লআঁ।।''[১৮]

এই পর্যন্ত মোটামুটি বড়ায়ি কৃষ্ণের সমর্থনে কাজ করলেও বাণখন্ডে কৃষ্ণের শরের আঘাতে রাধা মূর্ছিতা হলে ক্রুদ্ধা বড়াই কৃষ্ণকে সুতীব্র তিরস্কার করে-

''বিচার না করী কাহ্না কেহ্নে হেন কৈলেঁ।
তিরীবধপাপেঁ আপণা মজায়িলেঁ।।''[১৯]

এমনকি এ বড়ায়ি কৃষ্ণের ঐশীসত্তা ভুলে গিয়ে শাপশাপান্ত করতেও ছাড়েনি ,-

''মোরে নাহিঁ ছো কাহ্নাঞিঁ বারাণসি যা।
আঘোর পাপেঁ তোর বেআপিল গা ।।
তিরী বধ কইলি কাহ্নাঞিঁ আপন মনে।
আপযশ থাকিল তোর তীন ভুবনে।।''[২০]

আর এর পরবর্তী খন্ডগুলিতে বড়াই-এর ব্যবহার তো আরোই মধুর থেকে মধুরতর মধুরতম হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষভাগে এসে রাধা যতই কৃষ্ণগতপ্রাণা হয়ে উঠেছে বড়াই-ও ততই রাধার প্রতি সহৃদয় হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণবিরহিনী রাধিকার পাশে থেকেছে সদাসর্বদা। কৃষ্ণকে রাধার কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি বড়াই। 'নিন্দাউলি মন্ত্র'[২১] উচ্চারণে কৃষ্ণকে নিদ্রাভিভূত করে বড়াই। তারপর বড়াই-এর পরামর্শেই রাধা কৃষ্ণের বংশীচুরি করে। এমনকি কৃষ্ণ বাঁশি ফেরৎ চাইলে বড়াই কৃষ্ণকে রাধার ষোলশত সখীর সামনে জোড়হাতও করিয়েছে।-

''ষোল শত রাধার সঙ্গিণী। আল।
তার থান চলহ আপুণী। ল কাহ্নাঞিঁ।
একেঁ একেঁ কর যোড়হাথে। আল।
তবেঁ বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে। ল কাহ্নাঞিঁ।''[২২]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সূচনায় যে বড়ায়ি কৃষ্ণের হয়ে রাধার কাছে বারবার আবেদন-নিবেদন জানিয়েছে সেই বড়ায়িই শেষপর্যায়ে একেবারে বদলে গিয়ে রাধার বিরহযন্ত্রণায় কাতর হয়ে কৃষ্ণকে বলেছে-

''তনের উপর হারে। আল মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে।।
সরস চন্দন পঙ্কে। আল দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে।।
আল তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে।।''[২৩]

চারিত্রিক পক্ষপাতহীনতায় এখানেই বড়ায়ি চরিত্রটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্যতম মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠেছে। দুই স্নেহভাজন প্রীত্যাস্পদের মধ্যে যখনই যার প্রয়োজন হয়েছে, দুজনের মধ্যে দূরত্ব মেটানোর জন্য তখনই তার পক্ষ অবলম্বন করায় বড়ায়ি চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা কর্মকুশল চরিত্ররূপে চিত্রিত হয়েছে।

যদিও এই বড়ায়ি চরিত্র বড়ু চন্ডীদাসের স্বকপোলকল্পিত নয়। এই গ্রাম্য বৃদ্ধা চরিত্রের শারীরিক অক্ষমতাগুলি মনস্তত্ত্বজ্ঞানের নিপুণতায় হয়ে উঠেছে অতিসংবেদনশীল চরিত্রবিশেষ। সদুক্তিকর্ণামৃতের হরিক্রীড়া; শ্লোক ২৫৯ অংশের জরতী চরিত্রের মধ্যেই বড়ায়ি চরিত্রের বীজ আছে। এছাড়াও দামোদর গুপ্তের 'কুট্টিনীমতম্', বা বাৎস্যয়নের 'কামসূত্র' কিংবা জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণনরত্নাকর' গ্রন্থগুলির কুট্টিনী চরিত্রগুলিকেও বড়ায়ির পূর্বজ বলে ধরা যায়।

বাৎস্যয়নের 'কামসূত্রে'র 'পারদারিকাধিকরণম্' অংশের চতুর্থ অধ্যায় 'দূতীকর্ম্মাণি' তে নিসৃষ্টার্থা, পরিমিতার্থা ও পত্রহারিণী এই তিনপ্রকার পরকীয়া প্রেমের সহায়িকা দূতীর উল্লেখ রয়েছে। এদের মধ্যে নিসৃষ্টার্থা দূতী সেই যে কিনা নিজ উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা নায়ক-নায়িকার অভিপ্রায় অনুসারে বিভিন্ন কৌশলে কার্যসিদ্ধি করে থাকে। আর পরিমিতার্থা দূতী নায়ক-নায়িকার বক্তব্য চাতুর্যের সঙ্গে পরস্পরের কাছে নিবেদন করে পারস্পরিক প্রণয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তৃতীয় প্রকার দূতী পত্রহারিণীর কাজ কেবলমাত্র পরস্পরের মধ্যে পত্র আদান-প্রদান। পত্রহারিণীর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির কোনো লক্ষণ পরিস্ফুট নয়। এসব দিক দিয়ে বলতে গেলে বড়ায়ি চরিত্রে নিসৃষ্টার্থা এবং পরিমিতার্থা দূতীর গুণ বর্তমান। যদিও দূতীরা অর্থের বিনিময়ে কার্যসিদ্ধি করত। কিন্তু বড়ায়ি রাধাকৃষ্ণের কাছ থেকে বিনিময়ে কিছু পেতেন কিনা স্পষ্ট না হলেও,এরূপ দূতীয়ালির কাজ যে সে আগেও করেছে তার প্রমাণ রয়েছে তার উক্তিতেই-

''আনেক জনের কাজেঁ গেলোঁ নানা থানে।
সব নারী জনে মোর করিল সম্মানে।।
তোহ্মার আন্তরেঁ গেলোঁ রাধিকার থানে।

পাএ পেলাইল রাধা তোর গুআ পানে।।''[২৪]

রাধাবিরহে দেখি বড়ায়িকে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ঘটানোর বিনিময়ে 'শতদল সোনা'[২৫]ও দিতে চেয়েছে। এখানে বড়ায়ি মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয়ে যে কোনো দূতীর থেকে অনেক বড় হয়ে উঠেছে। মমত্ববোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে কখনো রাধা আবার কখনো কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করে অবৈধ প্রেমের দূতীয়ালি করেছে। কাব্যের সূচনায় বড়ায়ি রাধার যথার্থ অভিভাবিকা। কৃষ্ণের প্রণয় প্রস্তাব প্রথমবারেই সে রাধার কাছে জানায়নি। প্রথম দুবার নিজ ধৈর্য রেখে বড়ায়ি প্রত্যাখ্যান করেছিল কৃষ্ণের প্রস্তাব। কিন্তু তৃতীয়বার আর না পেরে রাধার কাছে কৃষ্ণের প্রস্তাব জানায়। এই প্রস্তাবে রাধা প্রচন্ড ক্রুদ্ধ হয়ে বড়ায়িকে প্রহার করলে বড়ায়ি প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে পড়ে। এটি বড়ায়িকে রক্ত-মাংসের মানবী করে তুলেছে। আবার এই বড়ায়িই শেষাংশে রাধাকে কৃষ্ণ যখন নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন কৃষ্ণকে তিরস্কারও করেছে। এই স্পষ্টভাষিতা এবং পক্ষপাতহীনতায় গ্রাম্যবৃদ্ধা চরিত্রটি স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।মধ্যযুগীয় সমাজপ্রেক্ষিতে বড়ায়ি শুধু কুট্টিনী মাত্র নয় ,একজন যথার্থ অভিভাবিকা।

ভগীরথ (শ্রীরাম পাঁচালি : কৃত্তিবাস ওঝা)

কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকান্ডের গঙ্গা ও ভগীরথের জন্মকথায় ভগীরথকে জন্মলগ্নে দেখি, এক বিকৃত মাংসপিন্ডরূপে, যদিও এই খন্ডেরই শেষাংশে সর্বাঙ্গসুন্দর ভগীরথের জন্ম হয়। একদা গোলকধামে উপবিষ্ট লক্ষ্মী- নারায়ণ পঞ্চমুখে শিবের মধুর গান শুনে নারায়ণ দ্রবরূপ হলেন-

''দ্রবরূপ হইলেন নিজে চক্রপাণি।

সেই গঙ্গা জন্মিলেন পতিতপাবনী।।''[২৬]

এই গঙ্গার জল বিধাতা কমন্ডলুতে সঞ্চয় করে রাখলেন। এই গঙ্গাকেই পৃথিবীতে আনয়ন করতে পারলে সগররাজার বংশ উদ্ধার হবে বলে বিশ্বামিত্র উপদেশ দিয়েছিলেন অংশুকে-

''কপিলের স্থানে পাইলাম অশ্বধনে।

তাঁর কোপানলে মরিয়াছে সর্ব্বজনে।।''[২৭]

কালক্রমে রাজা অংশুমানের পুত্র রাজা দিলীপের রাজত্বকাল শুরু হল। অপুত্রক দিলীপের মৃত্যুর পর তার দুই কন্যা অযোধ্যা নগরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজাহীন রাজ্য কীভাবে চলবে। যখন ব্রহ্মা ও পুরন্দর সেই চিন্তায় ব্যাকুল তখন সব দেবতাদের পরামর্শক্রমে শিব অযোধ্যায় আসেন। তাঁরই আশীবাদে দিলীপ রাজা এক কন্যা গর্ভবতী হয় এবং যথাসময়ে

''মাংসপিন্ড মাত্র পুত্র হইল উদয়।''[২৮]

নবজাতকের এই রূপ দেখে দিলীপরাজার দুই কন্যা কাঁদতে কাঁদতে বলে-

''দেখিয়া হাসিবে লোক সকল সংসারে।''[২৯]

তাই মনকষ্টে তারা এই সন্তানকে চুপড়িতে করে সরযু নদীতে ভাসিয়ে দিতে যায়। মনে পড়ে, স্পার্টার রাজপ্রথার কথা। সেখানেও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হলে তাকে পাহাড়ের উপর থেকে নগরের বাইরে ফেলে দেওয়া হত। রামায়ণে অবশ্য সহায় বশিষ্ট মুনি। বশিষ্ট মুনি যোগবলে জানতে পারলেন এই বিকৃত শিশুটি সর্বসুলক্ষণযুক্ত, তাই তিনি দুই বোনকে পরামর্শ দিলেন-

''থুয়ে যাও পথে শোয়াইয়া।''[৩০]

এমন সময় অষ্টাবক্রমুনি সেইপথে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। বিকৃত শিশুটিকে দেখে তিনি প্রথমেই ভাবলেন শিশুটি হয়ত মুনির শারীরিক বক্রতাকে পরিহাস করছে। তাই তিনি বিকৃত শিশুশরীরকে অভিশপ্ত করলেন-

''মম ব্রহ্মশাপে হবে শরীর বিনাশ।''[৩১]

অবশ্য সাথে সাথে মুনি আবার এও ভাবলেন, যদি শিশুটি তাকে উপহাস না করে থাকে, সত্যই যদি এরূপ শারীরিক বিকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে নিজেই উপহাসের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, তাহলে,-

''মম বরে হও তুমি মদনমোহন।''[৩২]

অষ্টাবক্র মুনি যিনি নিজে শারীরিক বক্রতার দু:খকষ্ট প্রত্যক্ষকারী তার মনে এই দ্বন্দ্ব খুবই সুচারু রূপ দেন কবি কৃত্তিবাস-

অষ্টাবক্র মুনি যায় স্নান করিবারে।।
আট ঠাঁই বাঁকা মুনি গমনে কাতর।
বালক তেমনি করে পথের উপর।।
এক দৃষ্টে অষ্টাবক্র তার পানে চায়।
মনে ভাবে আমারে এ দেখিয়া ভেঙায়।। [৩৩]

ব্রহ্মশাপ বরে পরিবর্তিত হল। বিকৃত শিশু সর্বাঙ্গ সুন্দর রাজপুত্রের রূপ পেল। এ হেন ঘটনার আকস্মিকতায় মুনিও অবাক হয়ে গেলেন। তারপর সবাই মিলে এই সর্বাঙ্গসুন্দর রাজকুমারকে যথাযথ অভ্যর্থনায় নাম দিলেন ভগীরথ।ভগীরথ এখন শুধু একটা নাম বা পৌরাণিক চরিত্র মাত্র নয়। নবযুগের প্রবর্তক হিসাবে 'ভগীরথ' শব্দটি শুভদ্যোতক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ভগীরথের গঙ্গার মর্ত্যে আনয়ন করে মানব জাতির উদ্ধারের কথা স্মরণ করে সংস্কৃতে ''ভগীরথ প্রযত্ন'' নামক একটি শব্দবন্ধ প্রচলিত আছে।

সর্পদেবী মনসা (মনসামঙ্গল)

দেবী মনসা সর্পবিভূষিতা নাগমাতা। পিতা শিব। স্বামী জরৎকারু। পুত্র আস্তিক। সমস্ত মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সুপ্রাচীন হল মনসামঙ্গল। সর্পদেবী মনসার পূজাপ্রচারের ইতিহাসই মনসামঙ্গল। মনসা হিন্দুপুরাণে সর্পকুল অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে কল্পিত। এছাড়াও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত এবং দ্বাদশ শতকীয় সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে মনসাদেবীর উল্লেখ রয়েছে। অনুমান করা যায় খ্রীষ্টিয় নবম শতকের শেষার্ধ থেকেই বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে মনসার গান ছড়ার আকারে গীত হত। বৌদ্ধ তন্ত্রসাহিত্যে ইনি 'জাঙ্গুলী' নামে পরিচিতা। মনসা অনার্যদেবী হলেও আর্যপুরাণে তিনি স্থান পেয়েছেন। ঋগ্বেদ, চন্দ্রগোমীর ব্যাকরণেও মনসাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। লৌকিক প্রভাবে মহাভারতেও সর্প বা নাগ সম্প্রদায়-এর উল্লেখ রয়েছে। আর্যঋষি কশ্যপ এবং অনার্যা কদ্রুর সন্তান নাগরাজ বাসুকী। এই বাসুকীরই পরমাত্মীয় জরৎকারু মুনি। এছাড়াও নাগদের অন্যান্য কাহিনিগুলির মধ্যে রয়েছে অর্জুন এবং নাগকন্যা উলুপীর বিবাহ, সর্পদংশনে রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকাহিনি প্রভৃতি।

ইউফ্রেতিস নদী তীরবর্তী প্রাচীন তুরানী জাতির মধ্যে প্রথম সর্পপূজার প্রচলন ঘটে। পরবর্তীকালে এই জাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার মধ্যেই সর্পপূজাও প্রসারিত হয়। ভারত এবং বাংলাদেশ অষ্ট্রিক এবং মূলতঃ দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মানুষই সর্পদেবী মনসার পূজার সূত্রপাত ঘটান বলে অনুমিত। কালক্রমে অরণ্যসংকুল প্রদেশে সর্পভয় এবং সর্প প্রজনন শক্তির প্রতীক এই দুটি কারণে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে এই মনসাদেবীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মনসামঙ্গলের কাহিনি থেকে পাই, মনসার জন্ম মূলতঃ শিবের সন্তানলাভের বাসনা থেকেই। শিবের মানসজাত তথা মানসকন্যা বলেই এই দেবীর নাম মনসা। কালীদেহে পদ্মপাতায় জন্ম বলে তার আরেক নাম পদ্মা। শিব পত্নী চন্ডীর ভয়ে এই মানস-কন্যাকে ঘরে না তুলে পাতালরাজ্যে সর্পরাজ্যের দেবীপদে অধিষ্ঠিত করলেন। তারপর ফুল তুলতে গিয়ে হঠাৎই একদিন শিবের পরিত্যক্ত কন্যা মনসার সঙ্গে পরিচয় ঘটায় তাকে কৈলাসে নিয়ে আসেন। আর তখন থেকেই বিমাতা চন্ডীর সঙ্গে শুরু হল মনসার প্রবল কলহ-বিবাদ। একদিন প্রচন্ড রাগের মাথায় দেবী চন্ডী মনসাকে আঘাত করেন এবং ফলত মনসার একটা চোখ কানা হয়ে যায়। এই চরম অশান্তি দূর করে গৃহে শান্তিস্থাপনার উদ্দেশ্যে শিব মনসাকে রেখে আসেন সিজুয়া পর্বতে। এই পরিস্থিতিতে কন্যার জন্য শিবের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া একবিন্দু অশ্রু থেকে জন্ম হল নেতা ধোপানীর, যে

মনসার সহচরীরূপে পরিচিত হয়ে রইল। এরপর সমুদ্রমন্থনে উত্থিত তীব্র হলাহল পানে শিবের মৃত্যু হলে তাকে বাঁচিয়ে তোলেন দেবী মনসা। তখন শিব মুনি জরৎকারুর সঙ্গে তার বিবাহ দেন। কিন্তু সে বিবাহও বেশিদিন টিকল না।

এমতাবস্থায় সহচরী নেতা ধোপানীর পরামর্শে মর্ত্যধামে দেবী মনসা নিজপূজা প্রচারে প্রবৃত্ত হলেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের হাজং উপজাতির মানুষরা মনসাদেবীকে 'কাণি দেউও' (অন্ধ দেবী) বলেন। একচক্ষু-বিশিষ্ট দেবী নামেও মনসা পরিচিত। তবে মনসার ঘট গর্ভবতী নারীর প্রতীক, যা ফসলের উর্বরতার প্রতীক, যা প্রজনন শক্তির প্রতীক-প্রবহমান মানবসমাজের অগ্রগতির পরিচায়ক।

আনন্দ কে কুমারস্বামী ও ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, চাঁদ সদাগর ও মনসাদেবীর কিংবদন্তীটি সম্ভবত এশীয় সমাজের মাইকিনিয়ান পর্যায়ের সমসাময়িক। এই কিংবদন্তীতে শৈবধর্ম ও বাংলার লৌকিক দেবদেবীদের সংঘাতের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে মনসা 'শক্তি'র একটি রূপ হিসাবে স্বীকৃতি হলে শৈবদের দ্বারা মনসার পূজা স্বীকৃত হয়। মাতৃকাশক্তি হিসাবে মনসা পরবর্তীকালে ভক্তসমাজে নির্গুণ শিবধারণার থেকে অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

> ''(The) legend of (Chand Sadagar and) Manasa Devi, (....) who must be as old as the Mykenean Stratum in Asiatic Society, reflects the conflict between the religion of Shiva and that of female local deities in Bengal. Afterwards Manasa or Padma was recognised as a form of Shakti, (.....) and her worship accepted by Shaivas. She is a phase of the mother-divinity who for so many worshippers is nearer and dearer than the far-off and impersonal Shiva.....'')[৩৪]

মনসামঙ্গলে দেবী মনসাচরিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। মধ্যযুগীয় পরিমন্ডলীতে মনসা ভালোমন্দ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, শুভাশুভ সমস্ত কিছুর সঙ্গে লড়াই করে এগিয়ে গেছে এবং প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে নিজেকে। কুলীনশ্রেষ্ঠ পিতার ঔরসে জন্ম হলেও পিতৃপরিত্যক্ত এবং স্নেহবঞ্চিত হয়ে যে নারীকে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিমাতার সঙ্গে অসমসংগ্রামে বাধ্য হতে হয় এবং অবশেষে দাম্পত্যজীবনেও চরম হতাশায় সে নারী প্রতিমুহূর্ত জীবনপিপাসায় অতৃপ্ত থাকছেন এবং সমাজ-সংসার থেকে নির্বাসিত হচ্ছেন তার পক্ষে স্নেহ-প্রেম-দয়া-মায়া-মমতাহীন প্রচন্ড হিংস্র-ক্রূর চরিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। যদিও চৈতন্যপূর্ববর্তী আদিম উগ্রতা ও প্রচন্ড জিঘাংসাপ্রবৃত্তি সমৃদ্ধা কুটিলা, নীতিজ্ঞানহীন, সুকোমল হৃদবৃত্তিহীনা ভয়ধারী দেবী মনসা

চৈতন্যপরবর্তীকালের কবিদের লেখনীতে হয়েছিলেন অনেকটাই মানবিক। ঔদার্যের গৌরব অনেকটায় দেবী মনসার মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন পরচৈতন্যযুগীয় মনসামঙ্গলকাররা।

শিবা (চন্ডীমঙ্গল)

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম চরিত্র শিবা। তাকে আমরা নিজস্ব পরিচয়ে চিনতে পারব না। কে এই শিবা ? এক নামে না চিনলেও যেই বলব ভাঁড়ুদত্তের দাদা শিবা, তখনই তার পরিচয় পরিস্ফুটিত হবে। শিবা চরিত্রের পরিচয় দিতে গেলেও বারবার চলে আসছে ভাঁড়ুরই কথা। দেবী চন্ডীর কৃপায় কালকেতু নতুন গুজরাট নগরী স্থাপন করেছে। কপট ভাঁড়ুদত্ত চলেছে রাজসন্দর্শনে। ভেট নিয়ে যাবে অগ্রজ শিবা।-

''ভাঁড়ুদত্তের জ্যেষ্ঠ ভাই নাম তার শিবা।
পৈঁতাল্লিশ বৎসর হৈল নাহি হয় বিভা।।
অভিমানে ভান্ডুর সঙ্গতি নাহি চলে।
কার্য অনুরোধেতে তাহার পায়ে পড়ে।।
ছোট ভাই সাম্যবাক্যে নিবারিল ক্রোধ।
বিভা নাহি হয় তার দুই পায়ে গোদ।।
বলে ভাঁড়ুদত্ত দাদা দৃঢ় কর হিয়া।
এবার মন্ডলী পাইলে আগে দিব বিয়া।।
বড় ভাই শিরে নিল ভেটের আয়োজন।
ধীরে ধীরে ভাঁড়ুদত্ত করিল গমন।।''[৩৫]

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেলেও শিবার এখনও বিবাহ হয়নি। এক তো পায়ে গোদ হওয়ায় শারীরিক ক্লেশ আছেই, তার সাথে বিবাহ না হবার জন্য মানসিক যন্ত্রণায় সদাসর্বদা বিমর্ষ থাকে শিবা। আর সেই সুযোগটাই সদ্ব্যবহার করছে ভাঁড়ুর মত কিছু কপট স্বার্থান্বেষী মানুষ। তার অসম্পূর্ণতা দুর্বলতার সুযোগে নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করছে।

এক্ষেত্রে একটি অসামঞ্জস্য লক্ষ্যণীয়। নারীগণের পতিনিন্দা অংশে যেখানে নারীদের বিবাহে স্বামী নির্বাচনের কোনো স্বাধীনতা থাকছে না, কুব্জ, বধির, অন্ধ বা যেকোনো শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধীকেই স্বামীত্বে বরণ করে দিনের পর দিন সেবা করছে, বিনিময়ে পাচ্ছে শুধুই স্বামীর অবহেলা সেখানে শিবা চরিত্রটির প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত অকৃতদার থাকার কারণটি কি? কি বোঝাতে চাইছেন সমাজসচেতক মুকুন্দরাম? কবিকঙ্কণ দেখাতে চেয়েছেন

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় মানুষ কেউ না, সবকিছুর উর্দ্ধে রয়েছে সমাজব্যবস্থা। এখানে শিবা ভাঁড়ুর হাতের পুতুলরূপে চিত্রায়িত হয়েছে।

বামন (লোরচন্দ্রানী : সৈয়দ আলাওল)

মধ্যযুগীয় ধর্মনির্ভর সাহিত্যরচনায় সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, প্রেম-বিচ্ছেদ তাদের নিজস্ব দাবি নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে মগরাজ্যে মুসলমান কবিরা তাদের প্রণয় কাব্যগুলিতে ইন্দ্রিয়সুখের বার্তাকেই মুখ্যরূপে তুলে ধরতে চাইল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ু চন্ডীদাস একান্তভাবেই রাধাকৃষ্ণের রূপকে নরনারীর দেহমিলনের চিত্রই অঙ্কিত করেছেন। তৎপূর্ববর্তী চর্যায় শবর-শবরীর মিলনমত্ততার কথা থাকলেও তাতে প্রকৃতপক্ষে রূপকাকারে সর্বশূন্যতার সর্বশেষ পরিশুদ্ধ চতুর্থানন্দরূপ মহাসুখলাভের কথাই পরিব্যক্ত হয়েছে।

চন্দ্রানীর স্বামী বামনের চেহারাতে খর্বত্ব থাকলেও বীরত্বে অপরাজেয় সে। সাহসী, বীর, রণনিপুণ বলেও বিধাতার নির্মম পরিহাসে সে নপুংসক। রাজকন্যা চন্দ্রানীর স্বামী হবার সমস্ত যোগ্যতাই তার আছে।-

''দুর্জয় বামন বীর বিখ্যাতভুবন।
সমরভূমিতে যেন সাক্ষাৎ সমন।।
খর্বরূপ হইয়া বীর দীর্ঘ করে নাশ।
বামন বিক্রমে যেন বলি রউ দাস।।''[৩৬]

কিন্তু সর্বগুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও নপুংসকতা তাদের দাম্পত্য জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনল। চন্দ্রানীই যে শুধুমাত্র পালিয়েছে তার কাছ থেকে তাই না, বামনও পলায়ন করেছে তার কাছ থেকে। পশুশিকারের অছিলায় বীরত্বের অন্তরালে বামন নিজের কষ্টটাই যেন আড়াল করতে চেয়েছে।

প্রতি রাতে বামন শয়ন করত রাজদ্বারের বাইরে। চন্দ্রানীর সখীরা অনেকে সাধ্যসাধনা করেও বামনকে ঘরে আনতে পারত না। মোহময়ী সুসজ্জিত হয়েও যৌবনবতী চন্দ্রানী কামচেতনা জাগাতে পারত না বামনের মধ্যে।

''মদন বেদন নিত্য আঁখী বহে নীর।''[৩৭]

কিন্তু এ শুধু চন্দ্রানীর বেদনা নয়। পুরুষের চূড়ান্ত পরাজয় নারী-সহবাস-অক্ষমতা এবং তার স্পর্শে জীবনসঙ্গিনীর জীবনব্যর্থতা যতটা না অন্যের কাছে কুণ্ঠার-লজ্জার তার থেকেও বেশি মর্মাহত করে পুরুষটিকে। বামনের জীবনও সেই যন্ত্রণায় দীর্ণ। স্বামী সঙ্গলিপ্সায় অতৃপ্ত চন্দ্রানী বামনকে ত্যাগ করে যখন লোরকের হাত ধরে তখন বামন অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে না থেকে ''স্ত্রী-চোর''

বলে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করতে করতে লোরকের পশ্চাদধাবন করেছে। অনেকের মতে এখানে বামন চরিত্রের মধ্যযুগীয় সামন্তপ্রভুত্বের মতই স্ত্রীসম্পত্তির উপর অধিকারবোধজনিত আক্রোশ প্রতিফলিত। আর এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসাও।

নায়ক লোরের প্রতিনায়ক বামন। কাহিনির দুই নায়কই বিবাহিত। লোর-ময়নামতীর দাম্পত্যজীবনে কেউই অসুখী বা অসম্পূর্ণ নয়। চন্দ্রানীর স্বামী নপুংসক হওয়ায় সে অন্যাসক্ত। কিন্তু ময়নামতী ? তার তো কোনো দোষ নেই। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেও পূর্ণ স্বামী-সোহাগিনী নয়। লোর শারীরিক দিক থেকে সক্ষম হলেও তার চারিত্রিক গঠনে ত্রুটি লক্ষ্যণীয়। নৈতিক দিক থেকে বামন লোরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে বামনের অস্ত্রত্যাগের কারণ সাময়িক স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতাই। শুধু তাই-ই নয়, লোরের বীরত্বের প্রতিও বামন যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে কুণ্ঠিত হয় নি। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছিলেন,-

''তাঁর (বামনের) বীরত্ব এবং মহত্ব দেখে মনে হয় পরাজিত হলেও শেষপর্যন্ত জয়লক্ষ্মী
যেন তাঁর অশ্রুসিক্ত মাল্যখানি ভাগ্যহত বামনের কণ্ঠেই পরিয়ে দিলেন।'' [৩৮]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধার স্বামী আইহনের নপুংসকতা কোনো সমস্যার কারণ হয়নি। কারণ রাধার যৌবন চেতনা পরিস্ফুট হবার পূর্বেই কৃষ্ণ তাকে সম্ভোগ করেছিল। কিন্তু চন্দ্রাণীর ক্ষেত্রে বামনের ব্যর্থতা, পুরুষত্বহীনতা চন্দ্রাণীকে লোকলজ্জা, সতীত্বের সংস্কার পেরিয়ে প্রতিবাদী করে তুলেছে।

নারীগণের পতিনিন্দা ও শাশুড়ীদের জামাইনিন্দা

বিবাহ উপলক্ষ্যে নারীদের নিজ নিজ পতি সম্পর্কিত আলোচনা ও নিন্দা তৎকালীন মধ্যযুগীয় কাব্য রীতি বিশেষ। কিন্তু স্বতন্ত্রতার নামান্তর মুকুন্দরাম। মৎস্যপুরাণে বর্ণিত শিবের মনোহর রূপ দর্শনে উপস্থিত নারীগণের পতিনিন্দা-অন্তরমথিত

''দগ্ধমনোভব এষ পিনাকী কাময়তে স্বয়মেব বিহর্তুম্।
কাচিদপি স্বয়মেব পতন্তী প্রাহ পরাং বিরহস্খলিতাঙ্গীম্।।''[৩৯]

মুকুন্দরামের কাব্যের নারীগণের পতিনিন্দার অনুপ্রেরণা মুকুন্দরামের কাব্যে বিবাহের বর্ণনা আছে ছয়টি। শিব-সতী, শিব-পার্বতী, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনা, শ্রীমন্ত-সিংহলরাজকন্যা সুশীলা, শ্রীমন্ত-গৌরাধিপতিকন্যা জয়াবতী। মুকুন্দরামের ব্যক্তিগত না-পসন্দের কারণেই হয়ত পতিনিন্দার উল্লেখ পাই কেবলমাত্র দুটি বিবাহসভায়- দেবখন্ডে শিব-পার্বতী এবং বণিকখন্ডে ধনপতি ও খুল্লনার বিবাহে।

নগরাজ হিমালয় গৃহে হরগৌরীর বিবাহে আয়োজন।সেখানে যথাসময়ে শিব এলেন নিজস্ব বেশে-

''গলেতে হাড়ের মাল পরিলেন বাঘছাল

বৃষভে করিলা আরোহণ।''[৪০]

বিবাহসভায় বরাগমন হলে শাশুড়ী মা মেনকা যথাবিধি স্ত্রী আচার পালন শুরু করলেন।

''মেনকা ঢালিল দধি বরের চরণে।
অঙ্গের ভূষণ দেখে বিষধরগণে।।
অস্থি-ভস্ম-বিভূষণ দেখি কলেবর।
হইয়া বিরসমুখী চিন্তেন অন্তর।।
কান্দয়ে মেনকা সে গৌরীর মায়ামোহে।
ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লোহে।।
চরণে নূপুর সর্প সাপ কটিবন্ধ।
পরিধান বাঘচাল দেখি লাগে ধন্ধ।।
অঙ্গদ বলয়া সাপ সাপের পইতা।
চক্ষু খায়্যা হেন বরে দিলাম দুহিতা।।
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছোঁ।।
ঔষধ সাধিয়া ঘৃত দিলেন কপালে।
ঘৃত দিতে শিবের ললাটে বহ্নি জ্বলে।।
দেখিয়া শিবের রূপ মনে লাগে ধান্ধা।
কোন ভাগ্য উদয় কৈলা সাপের মাথায় চান্দা।।
হের তার জটায় জলের কলকলি।
জলজন্তুগণ যত করে কোলাহলি।।
হেন বরে বিবাহ দিল ই দেখি সম্পদ।
বাপ হয়্যা মূঢ়মতি কন্যা করে বধ।।
অঙ্গুরী জড়িত মোর গরুঢ়ের মণি।
এই হেতু হাতে মোর নাহি খায় ফণি।।
বর দেখি এয়ো সব করে কানাকানি।

চক্ষু খাউক কন্যার বাপ চক্ষে পড়ুক ছানি।।
পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া বর।
দেখিয়া মেনকা দেবীর জ্বলছে অন্তর।।
মেনকার দাসী আনে ঔষধের ডালি।
আছিল ঈষের মূল তথি কতগুলি।।
ঈষের মূলের গন্ধে পালায় ভুজঙ্গ।
অঙ্গনার মধ্যে হর হইলা উলঙ্গ।।
লাজ পায়া মেনকা পালায় গুড়িগুড়ি।
নন্দী সে বুঝিয়া কাজ নিবায় দেয়ড়ি।।
সভাতে উলঙ্গ দেখি দেব ত্রিলোচন।
জোড় করে সবিনয়ে বলেন বচন।।
নন্দী বলে শুন প্রভুদেব শূলপাণি।
মনোহর বেশ প্রভু ধরহ আপনি।।
এমন নন্দীর বাক্য শুনি ত্রিলোচন।
হেনকালে লৈলা প্রভু মদনমোহন।।
যোগবলে ধরে হর মনোহর বেশ।
জটাভার হইল কুঞ্চিত চারুকেশ।।
আছিল বাঘের ছাল হইল বসন।
হইল অঙ্গের ভস্ম সুগন্ধি চন্দন।।
হাড়মালা হইল কনক-রত্নমাল।
হরিতাল-তিলক শোভিত কৈল ভাল।।
বাসুকী হইল তার কিরীট-ভূষণ।
অঙ্গদ বলয়া হৈল ভুজঙ্গমগন।।
মুকুট উপরে শোভে মুধাকর-কলা।
ধরিলা মদনরিপু মদনের লীলা।।
কনক-পাদক গলে দোলে সিংহনাদ।
দেখিয়া মেনকা বরে তেজিল বিষাদ।।
দেখিয়া বরের রূপ যতেক যুবতী।
মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি।।[৪১]

এরপরই শুরু হল উপস্থিত নারীদের আপন আপন পতিদের সম্পর্কে আলোচনা। কোথাও উঠে এসেছে অস্বাভাবিক স্ফীতকায় স্বামী যিনি কোষস্ফীতিকারণে কোঁয়া জ্বরে আক্রান্ত, কখনো এসেছে বীভৎসদর্শন বৃদ্ধ জরাতুর পতি। কারো বর আবার শ্রবণহীন। এসেছে বাখুরিয়া কুব্জ স্বামীরাও।

সবে বলে গৌরীর বর মিল্যাছে ভাল।
মদনমোহন রূপে ঘর কর্যাছে আলো।।
এক যুবতী বলে সই মোর গোদা পতি।
কোঁয়া-জ্বরের ঔষধ সদা পাব কতি।।
ভাদ্র মাসের পাঁকুই বড়ই দুর্বার।
গোদে তৈল দিতে কত তুলিব ন্যাকার।।
আর যুবতী বলে পতির বর্জিত দশন।
শাক-সূপ-ঘন্ট বিনে না কর ভোজন।।
দড় ব্যঞ্জন আমি যেই দিনে রান্ধি।
মারয়ে পিড়ির বাড়ি কোনে বস্যা কান্দি।।
আর যুবতী বলে সেই মোর কর্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ।।
কোন দেশে দুখিনী নাহিক মোর পারা।
কোলের কাছে থাকিতে সদাই করে হারা।
অন্ধমুনির মত মোর গেল সর্বকাল।
জলপাত্র বল্যা কানা তুল্যাচ্ছে বিড়াল।।
আর যুবতী বলে সখি মোর পতি কালা।
আনের হইল্য ঘরকন্না মোর হইল্য জ্বালা।।
দিনে ঠারে-ঠোরে কহি কথা পতির সনে।
রাত্রি হইলে নিদ্রা যাই গরুড়-শয়নে।।
রন্ধনের তরে আমি যদি চাহি জল।
দড়ি ধর‍্যা এনে দেয় কালা মোরে ছাগল।।
আর যুবতী বলে সখি মোর কথা বুঝ।
অভাগিয়া পতি মোর পিঠে বড় কুজ।।
চিৎ হয়্যা শুতে নারে কুজের প্রকারে।

খুঁজিয়া রেখ্যাছি খন্দ মেঝের ভিতরে।।
আর সখী বলে মোর বাখুড়িয়া স্বামী।
তার পেট পানে চেয়্যা মর‍্যা থাকি আমি।।
পোয়ের পো হইয়াছে নাতির হইয়াছে ঝি।
প্রয়োগ তেলে চুল পাকিছে বয়স বটে কি।।
রূপে-গুনে সুন্দরী নাতিনী ঘরে আছে।
হেন বরে বিহা দিয়া রাখি আপন কাছে।।
নগরে নাগরীগণ খায় মনকলা।
হরগৌরীর বিহা হব শুভক্ষণ বেলা।।
নিবিষ্ট হইয়া ভজ চন্ডীর চরণে।
মধুর সঙ্গীত কবিকঙ্কন ভণে।।[৪২]

নিয়মরক্ষার খাতিরে রচিত এই 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশটি মুকুন্দরামের কাছে এতটাই আকর্ষণহীন হবার কারণেই পরবর্তী বণিকখন্ডে ধনপতি সদাগরের বিবাহ উপলক্ষ্যে নারীদের পতিনিন্দায় তিনি পূর্বাংশেরই অনুবর্তন করেছেন মাত্র। আসলে এই অংশে মূলত তৎকালীন সমাজের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত নারীদের হৃদয়যন্ত্রণাই পরিস্ফুটিত হয়েছে। বিবাহ মানে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন। সেখানে নারীদের বলার কোনো স্থান নেই। জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন হলেও সেই বন্ধন স্থির করবে সমাজ - পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। আর নারী তাকেই বিধাতার লিপি বলে মেনে নেবে। এই অসহায়তা কন্যার পিতামাতারও। তারাও তাদের আদরের আত্মজকে পাত্রস্থ করার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই সমাজের নিয়মনীতির নিগড়ের জালে বাধ্য হত পাত্রের দৈহিক-মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে চোখ-কান খোলা রাখা থেকে বিরত থাকতে। তাহলে হয়ত তাদের কন্যার আর বরই জুটত না। না জুটত না জুটত। থাকত বাপ-মায়ের কাছে। না। সমাজও তাকে মেনে নেবে না।

তবে চন্ডীমঙ্গলের কবি ক্ষান্ত হলেও মনসামঙ্গল বা অন্নদামঙ্গল এমন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের পৃষ্ঠায় পতিনিন্দা উঠে এসেছে নারীদের জবানিতে অনর্গলভাবে।

নারীগণের পতিনিন্দা

কারে কব লো যে দুখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার।।
বাঁধা আছি কুলফাঁদে পরাণ সতত কাঁদে

না দেখিয়া শ্যামচাঁদে দিবস আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয় সদা কলঙ্কিনী কয়
পাপ ননদিনী ভয় কত সব আর।।
শ্যাম অখিলের পতি তারে বলে উপপতি
পোড়া লোক পাপমতি না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম শ্যাম সে পুরুষোত্তম
ভারতের সে নিয়ম কৃষ্ণচন্দ্র সার।।

চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি।।
কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কান।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ।।
ভূষন লয়েছে কাড়ি হাতে পায়ে দড়ি।
কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছাড়।।
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।।
এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন।
দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন।।
বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা।।
দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি।
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি।।
আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া।।
এক রামা বলে সই মুন মোর দুখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালমুখ।।
সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত।।
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।

আলোতে কিঞ্চিত ভাল প্রমাদ আঁধারে।।
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন।।
আর রামা বলে সই এ ত বরং সুখ।
মোর দুখ শুনিলে পলাবে তোর দুখ।।
মন্দভাগ্য অন্ধ পতি দ্বন্দে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল।।
ভরা পূরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুন্য।।
আর রাম বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার পতি বুড়া।।
বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত।
সে মুখচুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত।।
আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয়।
ধর্ম্ম ভারি তাহার আবেশ যদি হয়।।
ঝাঁপনি কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত।
অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত।।
গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায়।
কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায়।।
আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর।
মোর দুঃখ শুনি তোর দুঃখ যাবে দূর।।
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেঁট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুড়ো পেট।।
অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মন।
একবার নহে কভু চুম্ব আলিঙ্গন।।
বদনে চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে।
আঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে।
একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর।।

আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ।
না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ।।
বামন বঙ্খুর পতি কৈতে লাজ পায়।
তপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায়।।
তাপেতে হইনু জরা না পুরিল সাধ।
হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ।।
আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুখ।
কোলশোভা হয়ে থাকে এহ বড় সুখ।।
রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে।।
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমন।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বণ।।
চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়।
বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায়।।
আর রামা বলে সই কিছু ভাল বটে।
নাড়ী ধরিবার বেলা হাতে ধরা ঘটে।।
রাজসভাসদ পতি ব্রাহ্মণপন্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত।।
ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ।।
আর রামা বলে হৌক তথাপি পন্ডিত।
বরমেকাহুতিঃ কালে না করে বঞ্চিত।।
অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার।।
পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা।
অভাগারে এক দিন না ছাড়িবে পারা।।
সর্ব্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে।
তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে।।
আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তায়।

পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায়।।
পাঁতিলেখা রাজার মুনশী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি।।
কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার।।
আর রামা বলে সই ভাল ত মুনশী।
বখশী আমার পতি সদাই খুনশী।।
কিঞ্চিত কশুর নাহি কশুর কাটিতে।
বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে।।
পরের হাজির গরহাজির লিখিতে।
ঘরে গরহাজিরী সে না পায় দেখিতে।।
ফেরের ফিকিরে ফেরে ফাঁকি ফুঁকি লেখে।
কেবল আমার গুনে পুত্রমুখ দেখে।।
আর রামা বলে সই এ ত গুণ বড়।
উকীল আমার পতি কিল খেতে দড়।।
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে।।
আর রামা বলে সই এ ত ভাল শুনি।
আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী।।
আরজীর আটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে।
কথানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গভঙ্গে।।
আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদীর মিশালে।
করিতে না পারে নিশা টালে টোলে টালে।।
আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম।
খাজাঞ্চি আমার পতি সবারি অধম।।
চাঁদমুখা টাকা দেই সোনামুখে লয়।
গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয়।।
পরধন পরে দিতে যার এই হাল।
তার ঠাঁই পানিফোঁটা পাইতে জঞ্জাল।।

কহে আর রসবতী গালভরা পান।
পোদ্দার আমার পতি কৃপণপ্রধান।।
কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।
চিনির বলদ সবে একখানি গুণ।।
আমারে ভুলায় লোক রাঙ্গ তামা দিয়া।
সে দেই তাহার শোধ হাত বদলিয়া।।
আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর।
অভাগীর পতি হিসাবের মুহরীর।।
শেষ রেতে আসে সারা রাতি লিখে পড়ে।
খায়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে।।
গোঁজা বিদ্যা না জানে হিসাবে দেই গোঁজা।
নিকাশে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা।।
আর রামা বলে সই এ বটে গভীর।
অভাগীর পতি নিকাশের মুহরীর।।
মফঃসল সরবরা কেমন না জানে।
অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে।।
জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়।
পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু কয়।।
আর রামা বলে সই এ বড় রসিক।
অভাগীর পতি বাজেজমার মালিক।।
যম সম ধরিতে পরের বাজেজমা।
নিজ ঘরে বাজেজমা না জানে অধমা।।
সবে তার এক গুনে প্রাণ ঝুরে মরে।
বধুঁ এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে।।
আর রামা বলে সই এ ত বড় গুণ।
দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন।।
সদা ভাবে কোন ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।
পড়াভাগ্য নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায়।।
হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায়।

পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায়।।
আর রামা বলে সই এ ত শুনি ভাল।
ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু ফাল।।
রাত্রি দিন আট পর ঘড়ি পিটে মরে।
তার ঘড়ি কে বাজায় তল্লাস না করে।।
রাতি নাহি পোহাইতে দুঘড়ি বাজায়।
আপনি না পারে আরো বন্ধুরে খেদায়।।
আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে।।
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই।।
বিয়াকালে পন্ডিতে পন্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে।।
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ষাটি।
জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি।।
দু চারি বৎসরে যদি আসে এক বার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার।।
সূতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখে নহে রুষ্ট হয়ে যায়।।
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি।।
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।।
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে।।
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে করে রতি বলিহারি তার।।
শাঁখা সোনা রাঙ্গাঁ শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুনে বিহারের প্রভু।।

ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে।
তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে।।
গোদা কুঁজো করুন্ডে প্রভূতি আর যত।
সকলের রমনী সকলে নিন্দে কত।।
দ্রুত হয়ে চোর লয়ে চলিল কোটাল।
ভারত কহিছে গেল যথা মহীপাল।।[৪৩]

'রাজকণ্ঠের মণিমালা' রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তিনি রাজসভার কবি। তাই তৎকালীন জনরুচির চাহিদা মেটাতে গিয়ে লিখলেন নারীগণের পতিনিন্দা। মুকুন্দরাম নারীগণের পতিনিন্দা লিখতে গিয়ে যেখানে থেমে গেছিলেন ভারতচন্দ্র ঠিক সেখান থেকেই নতুন করে লেখনীকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। ভারতচন্দ্র এই গতানুগতিক লেখনীতেই নারীর কণ্ঠে দিলেন শীৎকার ধ্বনি। ভারতচন্দ্রের নারীরা অক্ষরজ্ঞানযুক্তা। নবজাগ্রত উনবিংশ শতাব্দীর আগমনবার্তা শোনায় অন্নদামঙ্গলের নারীরা। তাই কামকেলির মধ্যেও মানবতার জয়গান রয়েছে এখানে।

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য 'নারীগণের পতিনিন্দা'। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে হরগৌরীর বিবাহ এবং ধনপতি-খুল্লনার বিবাহে, (নারীগণের পতিনিন্দা উল্লিখিত হয়েছে) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে, মনসামঙ্গলে, ধর্মমঙ্গলে জামতি পালায় লাউসেন ও কর্পুরকে দেখে এবং জয়ানন্দের ধর্মমঙ্গলে। 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে বিবাহ-সভায় নারীদের মধ্যে হাসাহাসির পরিবেশ সৃষ্টি এবং উদ্দিষ্ট রাজসভার পাঠকহৃদয়ের শৃঙ্গার-রসসিক্ত হৃদয়ের চাহিদাপূরণ কবিদের উদ্দেশ্য হলেও অংশটিতে নারীহৃদয়ের মর্মযাতনা ফুটে উঠেছে। বিবাহসভায় বরের মনোহর রূপ-বেশ দেখে নারীদের নিজ নিজ স্বামীর শারীরিক বিকলাঙ্গতা, অক্ষমতার কথা উঠে এসেছে। তৎকালীন সমাজে নারীর বিয়ের ব্যাপারে অতি করুণ অবস্থা, কৌলিন্য প্রথার যূপকাষ্ঠে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানে অসহায় নারীদের বলিদান সকরুণভাবে ফুটে উঠেছে। বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষদের বয়স, শারীরিক ত্রুটি, অক্ষমতা কোনো কিছুই গ্রাহ্য হত না, অথচ মেয়েদের জাতি, কুল শীল মান বয়স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখা হত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়। নারীগণের পতিনিন্দায় নারীদের স্বামী-সম্ভোগে অতৃপ্তি, পরপুরুষে গমন এসব চিত্র দেখানোর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নারীর প্রতি স্বামীদের চূড়ান্ত অবহেলার চিত্রও। 'শিবায়ন' কাব্যে 'শাশুড়ীদের জামাইনিন্দা' অংশেও পুরুষদের প্রতি নারীর ধিক্কারের স্বর ধ্বনিত। শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সর্বাঙ্গ-সুন্দর নয় এমন ছেলের সাথে সর্বাঙ্গ-সুন্দর মেয়েদেরও বিয়ে দিতে হয় সামাজিক রীতি-নীতির চাপে। সে ছবি এখানে স্পষ্ট। কয়েকটি উদাহরণ-

''চুকি বলে আরে মোর ছায় কপাল ছি।
অন্ধকারে বিহা দিনু চন্দ্রা হেন ঝি।।
শুয়্যা থাকে শয্যায় যুবতী কর্য়া কোলে।
হাবাতিকে হারাইয়া হাতাড়িয়া বুলে।।''[৪৪]

''মন্দোদরী কান্দ্যা মল্য মল্লিকার মোহে।
কুঁজা বরে বিভা দিয়া ভিজ্জা গেল লোহে।।
কোদন্ডার মত সে কুন্ডলকৃতি কুঁজে।
পুরা পটুলীর পারা পড়্যা থাকে সেজে।।''[৪৫]

''চক্ষু চাপ্যা চাড়ু কর্য়া চাড়ু বলে কি।
বঙ্ক করে বিভা দিল বুধি হেন ঝি।।
শয্যায় শিশুর পারা শুয়্যা থাকে কোলে।
কদাচ কান্তের পারা কেহ নাহ বলে।।
মাধুনী ধনীর তরে করে মনস্তাপ।
গোদা বরে সাধ্যা আন্যা বেটী দিল বাপ।।
বারমাস দারুণ গোদের উঠে ঘ্রাণ।
বিষম জঞ্জালে বাছা হারাইল প্রাণ।।''[৪৬]

কথাশেষ:

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র আলোচনার প্রাক্কালে প্রাক্-আধুনিক কথাসাহিত্য বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের গূঢ়সাধনপ্রণালী চর্যাগানে বোবা কালা গুরু শিষ্যের উল্লেখে রয়েছে প্রতিবন্ধকতাকে সমাজে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা । মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য থেকে কয়েকটি চরিত্র নির্বাচন করে আলোচনা সাপেক্ষে এটি বলা যায়, মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় দেববাদের আড়ালে যে মানবতাবাদের কথা বলেছে সেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্বৈরাচারী রূপটিই ফুটে উঠেছে, নারী এখানে সমাজপ্রথার নির্মমতায় ক্রীড়নক মাত্র। প্রসঙ্গত, আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, প্রাক্-আধুনিক সমাজে পুরুষের নপুংসকতা সমাজের দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতার উদাহরণ। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখব, আধুনিক যুগসমাজ লিঙ্গগত-প্রতিবন্ধী মানুষদের তৃতীয়-লিঙ্গ

পরিচয় দিয়ে ভিন্নতর চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের মত সমাজের মূল স্রোতে স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করেছে। প্রাক্-আধুনিক সমাজব্যবস্থায় পুরুষতান্ত্রিকতার সোচ্চারতায় পুরুষের যে কোনো বিকলাঙ্গতা তাকে সমাজের বুকে উচ্চস্থান থেকে চ্যুত করেনি, বরং তাদের জন্য কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে নারীদের। প্রাক্-আধুনিক সমাজে নারীর অবস্থান সুস্পষ্ট করছে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নির্বাচিত প্রতিবন্ধী চরিত্ররা।

তথ্যসূত্র

১ চক্রবর্তী জাহ্নবী কুমার। চর্যাগীতির ভূমিকা। ডি. এম. লাইব্রেরী। কলকাতা। পুর্নমুদ্রণ- ফাল্গুন ১৪১১/ মার্চ ২০০৫।পৃ. ২৪১ ।

২. তদেব পৃ. ২১৯ ।

৩. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন (ভূমিকা সম্পাদনা টীকা)। বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা-৭৩। আশ্বিন ১৪১১। অক্টোবর ২০০৪। ISBN-81-7079-901-5. পৃ. ১৮৬ ।

৪. তদেব পৃ. ১৯৫ ।

৫ তদেব পৃ. ২১৯ ।

৬. তদেব পৃ. ২৩৭ ।

৭. তদেব পৃ. ২৩৪ ।

৮. তদেব পৃ. ২৩৭ ।

৯. তদেব পৃ. ২২১ ।

১০ তদেব পৃ.১৮৮ ।

১১ তদেব পৃ. ৩৫৮ ।

১২ তদেব পৃ. ১৮৮ ।

১৩ তদেব পৃ. ১৯১ ।

১৪ তদেব পৃ. ১৯৫ ।

১৫ তদেব পৃ. ২৫৬ ।

১৬ তদেব পৃ. ২৫৬ ।

১৭ তদেব পৃ. ২৬৫ ।

১৮ তদেব পৃ. ২৬৬ ।

১৯ তদেব পৃ. ৩৪৯ ।

২০ তদেব পৃ. ৩৪৯ ।

২১ তদেব পৃ. ৩৬৭ ।

২২ তদেব পৃ. ৩৭৭ ।

২৩ তদেব পৃ. ৪১৩ ।

২৪ তদেব পৃ. ১৯৯ ।

২৫ তদেব পৃ. ৩৮৭ ।

২৬ প্রামাণিক মলয় (সম্পাদনা)। রামায়ণ : কৃত্তিবাস বিরচিত। গ্রন্থবিকাশ। কলকাতা-৭। জানুয়ারি ২০১১। পৃ. ১৫ ।

২৭ তদেব পৃ. ১৫ ।

২৮ তদেব পৃ. ১৬ ।

২৯ তদেব পৃ. ২৯ ।

৩০. তদেব পৃ. ১৬ ।

৩১ তদেব পৃ. ১৬ ।

৩২ তদেব পৃ. ১৬ ।

৩৩ তদেব পৃ. ১৬ ।

৩৪ (Coomaraswamy, Ananda K ; Sister Nivedita (2003). Myths of the Hindus and Buddhists. Kessinger Publishing.. ISBN 0-7661-4515-8. pg 330 ।

৩৫ সরকার সৌম্যেন্দ্রনাথ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল (আক্ষটি খন্ড। কালকেতুর উপাখ্যান)। গ্রন্থবিকাশ। কলিকাতা-৭৩। দ্বিতীয় বামা সংস্করণ ১৫ই আগষ্ট ২০০০। পৃ. ১০৯ ।

৩৬ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ, (সম্পাদিত), লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না, দৌলত কাজি, সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯৫, ISBN-81-85626-81-2. পৃ. ২০ ।

৩৭ তদেব পৃ. ২৪ ।

৩৮ তদেব পৃ. বিয়াল্লিশ।

৩৯ সরকার সৌম্যেন্দ্রনাথ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল (আক্ষটি খন্ড। কালকেতুর উপাখ্যান)। গ্রন্থবিকাশ। কলিকাতা-৭৩। দ্বিতীয় বামা সংস্করণ ১৫ই আগষ্ট ২০০০। পৃ. ১৫০ ।

৪০ তদেব পৃ. ৩০ ।

৪১ তদেব পৃ. ৩০-৩১ ।

৪২ তদেব পৃ. ৩১-৩২ ।

৪৩ ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী ; সম্পাদক- ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ; চতুর্থ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪০৪ পৃ ৩১৭-৩২৪ ।

৪৪ রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন'', শ্রী যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭। পৃ ৮৪ ।

৪৫ তদেব পৃ. ৮৪ ।

৪৬ তদেব পৃ.৮৯ ।

চতুর্থ অধ্যায়:

সময় বিবর্তনের কালপর্বে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

বাঙালির ইউরোপ সংসর্গ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব সূচিত করল। ব্রিটিশ সংযোগ বাঙালির চেতনার অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের মধ্যে রেনেসাঁসের বীজ বপন করল। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্য যেখানে দেববাদের মোড়কে মানবতাবাদের জয়গান করতে বাধ্য ছিল, সেখানে ব্রিটিশ বাংলা মানবমুক্তির স্বপ্ন বুননে লাগল। আর ব্রিটিশ শাসন-শোষণের প্রভাবে গোপনে চলছিল যে দীর্ণতার প্রস্তুতি, সমাজ-জীবনে এর স্পষ্ট দুটি রূপ প্রতিফলিত হতে দেখা গেল। প্রথমত:, গ্রাম-বাংলা এবং নগর-বাংলার মধ্যেকার বিভেদ ক্রমেই দৃঢ় স্পষ্ট হতে শুরু করল। বাংলার কেন্দ্র-জীবন হয়ে পড়তে লাগল পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত নাগরিক সামাজিকতার জীবনবৃত্ত। দ্বিতীয়ত:, শাসক ব্রিটিশের প্রতি একশ্রেণীর বাঙালির অন্ধ আনুগত্যের মনোভাব। মুঘল-বাংলায় মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি জীবনধর্মের যে বিনষ্টির ধারা শুরু হয়ে গেছিল, ব্রিটিশযুগে এসে ক্রমবর্ধমান ধনলোভ এবং যথেচ্ছ ভোগতৃষ্ণায় বাঙালি গ্রাম ছেড়ে নগরমুখী হয়ে সেই ভাঙনকেই প্রতিস্থাপিত করল। ফলত: বাঙালি তার নিজের ঐতিহ্যকেই অনাস্থায় হারিয়ে ফেলতে বসল। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে চরম অনিশ্চয়তা ও ভাঙ্গনের এই সময়কালকেই মোটামুটিভাবে পলাশীযুদ্ধোত্তর থেকে ১৮৪৫ পর্যন্ত সময়কালকেই আধুনিক কালের সূচনালগ্ন হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের নেশায়, প্রথম পর্বে ভারতের উপর করা অতিচার থেকে নিজ জাতির সুনাম এবং মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনবোধে, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের নিয়ন্ত্রণ আইন (Regulating Act) এর অধিকারে বাংলার গবর্নর জেনারেল পদের দায়িত্বভার পালনে বাংলায় আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস্। হেস্টিংসের অভিজ্ঞতায় ভিত্তি করে, ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়বারের ভারত শাসন আইন (Pitt's India Act) বলে ব্রিটিশ-ভারতের প্রথম গবর্নর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। এবার এই ব্রিটিশ-ভারতের সিভিলিয়নদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত করার উদ্যোগে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। পাশ্চাত্য সংস্রবে বাঙালির মননে যে নবচেতনার আলোকাভা উদ্ভাসিত হচ্ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্মধারার শরীক হয়ে সেই সংস্পর্শ প্রত্যক্ষভাবে স্থাপিত হতে শুরু করল।

একদিকে ধনতৃষ্ণা এবং অপরদিকে ইংরেজ-সরকারের চাকরি-এ দুই লোভনীয় হাতছানিতে বাঙালি-সাধারণও ইংরাজি শিখতে শুরু করল। তবে শুধুমাত্র এরাই নয়, এই ইংরাজি-শিক্ষার হুজুগের যুগে সেই-সময়কার 'ফিরিঙি-স্কুলে' ইংরাজি শিখতে শুরু করেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীলের মতন কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালিও। শুধু রাজভাষা বলেই নয়, যে ইংরেজ বাঙালি-চিত্তে এক বিশেষ মর্যাদার আসন নিচ্ছে তার ভাষা হিসাবেও ইংরাজির প্রতি আকর্ষণ এত তীব্র অনুভব করল বাঙালি, ফল হিসাবে বাঙালির সামনে পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির এক বিশাল ভান্ডারের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হতে লাগল। রামমোহন রায় শুধুমাত্র ইংরাজি ভাষা সাহিত্যই নয় পাশ্চাত্য দর্শন এবং রাজনীতি বিষয়েও বিশেষ পারঙ্গম হয়ে উঠেছিলেন।

শুধুমাত্র ইংরেজ এবং ইংরাজির প্রতি দুর্দম আকর্ষণে মধ্যবিত্ত শহুরে বাঙালি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে যথার্থ জ্ঞানচর্চায় পতিতা দেশমাতৃকার পুনরুদ্ধারকল্পে ব্রতী হয়েছিল। বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে 'নব্যবঙ্গ যুগ' যতই নিন্দাযুক্ত ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করুক, এই পথেই রামমোহন দ্বারা উপ্ত বাঙালির আধুনিকাতার বীজ বিদ্যাসাগরের হাতেই পত্রপুষ্পশোভিত হয়ে মহীরূহ বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। রামমোহন-বিদ্যাসাগর ইংরাজি সংস্কৃতিতেও পুষ্ট হলেও এতদিন ধরে চলতে থাকা সতীদাহপ্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সমাজের দুষ্টক্ষতগুলি দূরীকরণের চেষ্টা করলেন। বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করলেন। সমাজসংস্কারক হিসাবে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ইংরেজ আগমনের পূর্বপর্যন্ত বাংলা সাহিত্যচর্চার সংরূপ হিসাবে ছিল পদ্যরীতি। আধুনিক যুগ বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন সংরূপের সাথে পরিচয় করাল। মুদ্রণযন্ত্র পূর্ববর্তী সাহিত্যের স্মৃতিনির্ভরতার জন্য সুর-ছন্দ ছিল প্রধান অবলম্বন। শ্রীরামপুর মিশনারীদের উদ্যোগে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন গদ্যপ্রবন্ধের সঙ্গে একাত্ম করল বাঙালি সারস্বত সমাজকে। এই নতুন সংরূপগত ধারায় সর্বশেষে আগমন কথাসাহিত্যের ।প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে নকশাজাতীয় গদ্যরচনার পর উপন্যাস-স্রষ্টা হিসাবে বাংলার মানুষের কাছে পরিচিত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পেল কথাসাহিত্যের আস্বাদ।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রেনেসাঁসপুষ্ট নাগরিক বাঙালি চিরাচরিত প্রথাভেঙে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতিষ্ঠায় মানুষের ব্যক্তিজীবন-পারিবারিক জীবন-সামাজিক জীবনের কথায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এই বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীলতার প্রকাশ তাঁর উপন্যাসগুলিতে। আত্মমুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে বঙ্কিম লেখনীতে ফুটে উঠেছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং লেখকের ব্যক্তিক-সত্তাও। ব্যক্তিপূজার

আবেগই যখন এ যুগের প্রধান সুর, সেখানে বঙ্কিমসৃজনশীলতার যুক্তিনিষ্ঠতার কেন্দ্রবিন্দুতে সক্রিয় থেকেছে সামাজিক উপযোগিতাবাদের আদর্শ এবং চূড়ান্ত রোম্যান্টিকতা সুসমঞ্জস সহাবস্থান।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উপন্যাস-সাহিত্যের সূচনালগ্নে উপন্যাসের প্রসঙ্গে পট এবং পটবিধৃত মানুষই প্রধান হয়ে উঠল। উনবিংশ শতকীয় পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট হলেও 'রজনী' (১৮৭৭) বঙ্কিমের এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। 'রজনী'তে কলকাতা শহরের নাম উল্লেখ হয়েছে মাত্র, উনিশ শতকের শেষপাদে যে দ্বন্দ্ব সমুপস্থিত হয়েছিল 'রজনী'তে তা একেবারেই আনেননি বঙ্কিম। 'রজনী' দৃষ্টিশক্তিহীনা হলেও তার প্রেমের প্রতি প্রত্যয় প্রথম থেকে শেষ অবধি ছিল সুদৃঢ়, সেখানে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সময়চেতনা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। গঠনরীতির এক নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা এতে বর্তমান।'রজনী'মূলত: এক জন্মান্ধ রমণীর প্রেম রোম্যান্টিকতার কাহিনি হলেও এর মধ্যে তৎকালীন প্রচলিত সমাজের কিছু রীতি-নীতির দৃষ্টান্ত রয়েছে। নানান ঘটনা-আবর্তের মধ্য দিয়ে নায়িকা রজনী ও শচীশের প্রেম শুভ-পরিণয়ে পরিণতি এবং পরে কোনো মহাপুরুষের কৃপায় রজনীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার পাশাপাশি লবঙ্গলতা-অমরনাথের উপকাহিনিটিও সমান্তরালভাবে পরিবেশিত হয়েছে। প্রথম যৌবনে শচীশের বিমাতা লবঙ্গের প্রতি অমরনাথ আকৃষ্ট হয়েছিল। লবঙ্গ অমরনাথের পিঠে জ্বলন্ত শলাকা দিয়ে 'চোর' লিখে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে আবার লবঙ্গের জীবনে আসেন অমরনাথ। গৌণ চরিত্র অবলম্বনে বঙ্কিম সমকালীন সময় ও সমাজপ্রেক্ষিত হিসাবে নব্যপন্থী বিকারগ্রস্ততা ব্যঙ্গের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। অমরনাথের মধ্যে হিতবাদী সমাজবোধের প্রতিফলন এবং দার্শনিক আত্মজিজ্ঞাসা তৎকালীন সময়োচিত। তবে মহাপুরুষ দ্বারা রজনীর দৃষ্টি ফেরানোর ব্যাপারটা পুরোপুরিই রোমান্স, উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক সমাজ মনস্কতার পরিচয় তাতে নেই।

গঠনরীতির নৈয়ায়িক চেতনা রয়েছে 'রাজসিংহ' (১৮৮২) উপন্যাসেও। উপন্যাসটির সময়কাল অবশ্য এক ঐতিহাসিক ঘটনাবহুলতার স্মারক।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প লেখনীর ধারাটি সুবিস্তৃত। কাল বিচারে হিতবাদী পরবর্তী ১৮৯১ থেকে ১৯০০-এর মধ্যে প্রকাশিত গল্পগুলি সাধনা-ভারতী পর্যায়ভুক্ত বলা যায়। এই পর্বের রবীন্দ্র লেখনীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন,-

> ''এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ যেমন বিচিত্র বিষয় ও বিচিত্র ভাবের গল্প লিখেছেন, তেমনি সেইসব গল্পের শিল্পায়নেও অভিনব দক্ষতা অর্জন করেছেন।একদিকে তিনি প্রাচীন মিথের মুখোশ ছিঁড়ে উন্মোচন করেছেন গল্পের মুখশ্রী, পুরাকালীন প্রথা ও সংস্কারের ভগ্নভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন গল্পের নতুন প্রতিমা, অন্যদিকে রূপকথা তার উপকথার শুক্তিতে তাঁর গল্পের

মুক্তাটি উজ্জ্বল ব্যঞ্জনায় বিভাসিত হয়েছে। একদিকে আছে সামাজিক ও পারিবারিক যৌথ মানবসম্পর্কের তীব্র নির্মমতা, অন্যদিকে আছে একক চরিত্রের সূক্ষ্মপেলবতা।.... ভৌতিক গল্পের চির পুরাতন সিদ্ধরস ভেঙে চুরমার করে তিনি যেমন, বাংলা কথাসাহিত্যে অস্বভাবী মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের এক সম্পূর্ণ অভিনব শিল্পরূপ আবিষ্কার করেছেন তেমনি বাস্তব আর রোমান্সের সংঘর্ষে সৃষ্টি করেছেন আধুনিক ছোটগল্পের ক্ষণদীপ্ত স্ফুলিঙ্গ।''[১]

গবেষণা অভিসন্দর্ভে রবীন্দ্র সৃষ্টিধারার এই পর্যায় থেকে পাঁচটি চরিত্র নির্বাচন করেছি। ১৮৯৩ এর জানুয়ারিতে লেখা 'সুভা'র সুভা, ফেব্রুয়ারিতে লেখা 'মহামায়া'র মহামায়া, জুলাই-তে লেখা 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মেহের আলি ও কাফ্রি খোজা এবং ১৮৯৮-ডিসেম্বর-জানুয়ারি-তে 'দৃষ্টিদানে'র কুমু। তৎকালীন সমাজে মেয়েদের অবস্থান, বিবাহ-প্রথা, কৌলিন্য-রীতি বারবার ফিরে এসেছে গল্পগুলিতে। তবে 'সুভা' বাক্‌হীনতার জন্য স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ উদ্যোগ বন্ধ করতে পারেনি, কিন্তু সময়ান্তরে কুমু নিজের দৃষ্টিহীনতার জন্য স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নিতে পারেনি। মহামায়াও নিজেকে ভালোবাসার মানুষের চোখে করুণার পাত্র হিসাবে দেখতে চায়নি। প্রাচীন প্রথা ও সংস্কারকে ভেঙে নারীজাগৃতির কথা বলেছে এই চরিত্ররা। মিথ-পুরাণের মহামায়া দুর্গা নতুন রূপে ফিরে আসেন মহামায়া-কুমুর মাধ্যমে। মহামায়া স্বামীর জ্বলন্ত চিতা থেকে সতীদাহ প্রথাকে ভেঙে উঠে আসতে পেরেছিলেন। পুরাণে মহামায়ার যেমন বহুরূপ, সাহিত্যের মহামায়াও নতুন রূপে চারিত্রিক দার্ঢ্যতায় ফিরে এলেন। ভৌতিক গা-ছম্‌ছমে আবহে রচিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের পাগল মেহের আলি এবং কাফ্রি খোজা মধ্যযুগীয় বর্বরতার চিহ্ন বহন করছে। ভৌতিক গল্পকে নতুনভাবে উপস্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রদুটির মাধ্যমে মানবিক দিক উন্মোচন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির রচনাকাল আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা একটি চিঠির কিছু অংশ উল্লেখ্য-

''বাইরের জগতের একটা জীবন্ত প্রভাব আমার সমস্ত মুক্ত দ্বার দিয়ে অবাধে প্রবেশ করতে থাকে- আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজ হিল্লোলে এবং আমার মনের নেশায় মিশিয়ে অনেক রকম গল্প তৈরি হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষত এখানকার দুপুরবেলাকার মধ্যে বড়ো একটা নিবিড় মোহ আছে।..... কেন জানি নে, মনে হয় এইরকম সোনালি-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে- অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, ডামাস্ক সমরকন্দ্ বুখারা- আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ- মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস- নগর, মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ রাজপথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড়-পরা দোকানি খরমুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে- পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাপ বিছানো-জরির চটি ফুলো

পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলি-পরা আমিনা জোবেদি সুফি, পাশে পায়ের কাছে কুন্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো কাপড়-পরা কালো হাবসি পাহাড়া দিচ্ছে- এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে মানুষের হাসিকান্না আশা-আশঙ্কা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে।''[২]

প্রখ্যাত রবীন্দ্র-গবেষক ড: তপোব্রত ঘোষের মতে,-

''সাজাদপুরের এই আরব্য উপন্যাসের ভূতে পাওয়া নির্জন মধ্যাহ্নের সঙ্গে শাহিবাগের ভূতে-পাওয়া নির্জন মধ্যাহ্ন মিশে গিয়ে কি এরই কাছাকাছি কোনো সময়ে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর রচনা শুরু হয়? এটা ঠিক যে, 'ক্ষুধিত পাষাণ' নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের গল্প নয়- নিস্তব্ধ রাত্রির গল্প। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই তো 'ছেলেবেলা'য় দুপুরবেলাকে বলেছেন, 'দিনের বেলাকার রাত্তির' (ছেলেবেলা, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড, পৃ. ১৪৮), 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় 'বেলা দ্বিপ্রহর' যেন 'রৌদ্রময়ী রাতি। ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নি:ঝুম' ('যেতে নাহি দিব', সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৭৪)। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে 'আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী' উপন্যাসলোক থেকে উড়ে এসেছে, 'যেন অন্ধকার নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগদাদের নির্বাপিতদীপ সংকীর্ণ পথে' শুরু হয়েছে সংকটসংকুল অভিসার'।''[৩]

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সবুজপত্র পর্বের রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির মধ্যে নির্বাচিত 'স্ত্রীর পত্র' (১৯১৪) গল্পের অপ্রধান চরিত্র বিন্দুর স্বামী এবং শাশুড়ী আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভের পাগল চরিত্র। পারিবারিক ও সামাজিক রক্ষণশীলতা ভেঙে বেরিয়ে আসার এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ মা-ছেলের চরিত্রে দেখালেন সামাজিক নিষ্পেষণের ভয়াবহ চিত্র। সমকালীন স্বদেশী আন্দোলনের উল্লেখ পাই শরতের কার্যকলাপে। সময় পাল্টালেও মানুষের সমাজ, মন পড়ে আছে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই। নাগরিক কলকাতার বনেদী শিক্ষিত বাড়ির সাজসজ্জায় আধুনিকতার ছাপ পড়লেও মানসিকতায় তাদের রয়েছে মধ্যযুগীয় মূল্যবোধহীনতা যেখানে নারীর অবস্থান ভয়ঙ্কর। নারী সেখানে পুরুষের ভোগ এবং প্রয়োজনের কর্মী। কোনো সম্মান নেই। সমস্তরকম সংকীর্ণতা গ্রাস করেছে তাকে। তবে এর পাশাপাশি আছে মৃণালের ভাই শরতের ছোট্ট উপস্থিতি যার মধ্যে পরোপকার প্রবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে।

কথাসাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছোটগল্পেরও আবির্ভাব ঘটল এই সময়েই। বঙ্কিমলেখনীতে প্রায় ভূমিকাবিহীন মধ্যবিত্ত বাঙালি উনবিংশ শতকের সায়াহ্নে রবীন্দ্রলেখনীতে হয়ে উঠল ভীষণভাবে প্রাণবন্ত, কর্মচঞ্চল। রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে নায়কনায়িকারা আধুনিক ভারতবর্ষের দ্বান্দ্বিকতা পরিস্ফুটনে অনুভব করেছে খন্ডায়নের যন্ত্রণা। রবীন্দ্রনাথের চরিত্ররা তাই সর্বদাই যেন সীমার মধ্যে অসীম, খন্ডতার মধ্যে পূর্ণতার সন্ধানে অভিসারী। আসলে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ ফেলে আসা গ্রামীণ জীবনের হাতছানি এবং আধুনিক ভারতবর্ষ গঠন প্রক্রিয়ার ক্রিয়াশীলতায় অপূর্ণ ভারতবর্ষের নতুন

নাগরিকতায় যন্ত্রণাদীর্ণ। নিসর্গচিত্রের অপূর্ব কাব্যময়তার পাশাপাশি রবীন্দ্রলেখনীতে উঠে আসছে গ্রাম ও নগর জীবনের মানুষ তাদের 'আঁতের কথা' এবং সামাজিক সমস্যা নিয়ে।

স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রসন্নকুমারী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, মানকুমারী বসু, কামিনী রায়, সরলা দেবীর উত্তরসূরী নিরুপমা দেবীর জনপ্রিয়তা তাঁর উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্রায়নে। বহরমপুরের গোঁড়া হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা বাল্যবিধবা নিরুপমা দেবী সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর মুক্তির ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। নিরুপমা দেবীর নিজের জীবন সম্পর্কে ভাবনা তারই একটি কবিতায় প্রকাশিত-

''জন্ম যে দেয় মৃত্যু দেবে
কাজ কি তবে এত ভেবে
সুখের সাথে মাথায় তোল দু:খ।''[৪]

মেয়েদের জীবন মানেই দু:খের-যন্ত্রণার, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্বামীর মধ্যেই নারীর সব সুখ-এই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নারী আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের, আত্মপ্রতিষ্ঠার ধ্বনিতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ যখন মুখরিত তখন ১৯১৯-এ নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' স্বাতন্ত্র্যসূচক। একদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে মনুষ্য-পদবাচ্য না মনে করা, বিয়ের জন্য নারীকে পণ্যরূপে মনে করা, বাংলাদেশের কৌলিন্য প্রথা, সামাজিক রীতিনীতির যূপকাষ্ঠে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মানবিকতার বলিদান, এ সব কিছুর মধ্যেও সমাজে সৎ-বিবেকবান প্রকৃত পুরুষের কতিপয় অবস্থান অনিল চরিত্রে ফুটিয়ে তুললেন লেখিকা। ব্যক্তিজীবনে সংগ্রামপথে শরৎচন্দ্রের মত অগ্রজের স্নেহধন্যতায় নিরুপমা দেবীকে অনেকসময় সামাজিক কালিমালিপ্ততার সম্মুখীন হতে হলেও, সমস্ত কিছুকে জয় করতে পেরেছিলেন নিরুপমা দেবী। শ্যামলীকে মূক-বধির স্কুলে প্রশিক্ষিত করার যে অগ্রসরতা স্থাপন করেছিলেন সাহিত্যে, ব্যক্তিজীবনে দেখি, নিরুপমা দেবী মহিলা কংগ্রেসে যোগদান এবং মেয়েদের শিক্ষা এবং স্বনির্ভরতার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী এই ব্রিটিশ-বাংলা তখন তৎকালীন বঙ্গভঙ্গ, বিদেশী পণ্যবর্জন, স্বদেশী আন্দোলন,খিলাফত আন্দোলন (১৯২০), অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১), মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সাম্যবাদী আন্দোলন (১৯১৯-২১), কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৯২৮), মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বহু রাজনৈতিক কর্মীর দন্ড (১৯২৯), আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে Great Depression- এর প্রভাব, আইন-অমান্য আন্দোলনের (১৯৩১) নানাবিধ কর্মসূচীতে উত্তাল। মার্কসবাদের প্রসার হতে লাগল বাংলায় বুকে (১৯৩১) শুধু অহিংসই নয়, এরপর ক্রমান্বয়ে এর সঙ্গে যুক্ত হল সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। একদিকে বাঙালির নবজাগরণের চিত্তদূত ইংরেজ শাসকের ক্রমবর্ধমান দমন-পীড়ন-অত্যাচার-বর্বরতা আর অন্যদিকে দেশীয় নেতাদের পারস্পরিক সমঝোতা-প্রচেষ্টা, সবমিলিয়ে এক

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের সাক্ষী হল বিংশ শতকের প্রথমদিক। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে এই বাংলাও প্রত্যক্ষ করল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আর তার অতি অল্পকালের মধ্যেই মানবাধিকারের সনদ নিয়ে এল রুশ বিপ্লব (১৯১৭)। পাশ্চাত্য চিন্তাস্রোতেই বাংলা জানল ফ্রয়েড-এর নাম। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের 'The Interpretation of Dreams' (১৯১৩) থেকে বাংলার নব্যসমাজ শিহরিত হল মানবমনের অবচেতনে থাকা আদিমবাসনা সম্পর্কে। চারিদিকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিক্ষুব্ধ পরিবেশে মানসিকভাবে ক্লান্ত যুবসম্প্রদায় ফ্রয়েড-কথিত Sex is the main spring of our unconscious life মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে উঠল। একদিকে বিশ্বসাহিত্য দরবারে ঠিক এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলার সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি আর অপরদিকে ইউরোপীয় শাসকগোষ্ঠীর কালান্তক মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর আগমনীর ডঙ্কানিনাদ। য়ুরোপ অভিজ্ঞতার সাথে ঔপনিষদিক চিন্তাচেতনা এবং বের্গসঁর গতিবাদ এবং ডারউইনের যোগ্যতমের উদ্বর্তন এসময়ের লেখনীতে বারবার ফুটে উঠেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী এবং বাংলা এক নতুন মূল্য-চেতনার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে শাশ্বত জীবনমূল্যে উত্তরণ চাইল। মহাযুদ্ধের হাত ধরে আগত বিপর্যয় এল জাতির জীবনের পুরোনো মূল্যবোধগুলো একে একে সব ভেঙে যেতে বসল। উনিশ শতকের সনাতন মূল্যবোধগুলো বিশ শতকে বিপর্যস্ততার মুখোমুখি হল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১২),লর্ড কার্জনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখরিত সারা বাংলা, সশস্ত্র স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বাজারদর, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য- এ সবকিছুতে ঘৃতাহুতি

পড়ার মত এল ১৯১৯-এ দমনমূলক রাউলাট আইন সঙ্গে জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটনা এবং যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০)। বাংলা এবং ভারত জুড়ে এক প্রচন্ড ঝড়। একদিকে আশা, আরেকদিকে আশাভঙ্গ; একদিকে উদ্যম, অন্যদিকে হতাশা; একদিকে আত্মবিশ্বাস, আরেকদিকে নিজের প্রতিই চূড়ান্ত অনাস্থা। স্বদেশী আন্দোলন বাঙালির মানসিক জগতেও এতটাই মারাত্মক আঘাত হেনেছিল যে আর্থিক সঙ্কট গভীর থেকে গভীরতর হবার সাথে সাথেই বাংলার মানুষের বিশেষত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মূল্যবোধও ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে একেবারে ভাঙনের মুখে পর্যবসিত হয়েছে।

এই কালপর্বে প্রবল ঘূর্ণনে আবির্ভাব হল 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকার। পুরাতনকে ভেঙে নতুন কিছু আনার স্বপ্ন নিয়ে একদল তরুণ অতিক্রম করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথকে। বিষয় আঙ্গিক ভাষা সবকিছুতেই নতুনত্ব আনতে চাইল 'কল্লোল'। 'কল্লোলে'র হাত ধরেই ফ্রয়েড-অ্যাডলার-ইয়ুঙ্-হ্যাভলক এলিস স্ক্যান্ডেনেভীয় সাহিত্য বিশেষত হামসুন-বোয়ার পড়ে সেকালের বাংলা জানল দারিদ্র্যের উপকথা এবং আদিমতম প্রবৃত্তির তাড়না। কল্লোল মনে করত রবীন্দ্রদর্শন অনতিক্রম্য

শরীরকে অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করেছে। তাই কল্লোলীয় চেতনায় এল যৌনতার মনস্তত্ত্ব। শ' এবং ফেবিয়ানদের নতুন অর্থনৈতিক চিন্তাধারাও পরিচিত হল। কল্লোল সময়কালীন সাহিত্য একটু অন্যদিকে তাকাতে চাইল। তাই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসাবে প্রাদেশিক-আঞ্চলিক মানুষজন, তাদের রীতি-নীতি সংস্কৃতি এল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের রচনাবলীর (দ্বিতীয় খন্ড) একটি গল্প 'খাখ্'। এই গ্রন্থটির অন্তর্গত 'টুটা-ফুটা' ভূমিকাংশে পাই,-

''এই গল্প ক'টি লেখা তেরোশ তিরিশ থেকে চৌত্রিশ সালের মধ্যে। কল্লোল, উত্তরা

ও প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল।''[৫]

'খাখ্' গল্পটি 'টুটা-ফুটা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত একটি গল্প। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গল্প 'খাখ্'। ইংরেজ আগমন এবং রাস্তা নির্মাণ সমকালীন সাহিত্যে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। বামন ভোম্রার জীবনেও এর প্রভাব পড়েছে, সেও বেশি রোজগারের আশায় মায়ের মাছ বিক্রি ছেড়ে রাস্তার মাটি কাটার কাজে হাত লাগিয়েছে।

'একটা করকরে একানি আর দুটো পয়সা। ..... আনিটা এ বছরের, একেবারে আনকোরা'[৬]

ভোম্রার জীবনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত আনে। ভোম্রার জীবনের পরিবর্তন সময় প্রেক্ষিতের পরিবর্তন সাপেক্ষে লেখক উপস্থাপিত করেছেন গরুর গাড়ির সঙ্গে ছ্যাকড়া গাড়ির টক্কর-এর চিত্রায়ণে। উন্নয়নের ধুমে গ্রামে রাস্তা তৈরির পাশাপাশি অফিস ঘর তৈরির ব্যবস্থাপনাও হয়। নতুন ব্রিটিশ সভ্যতার রথ আসার ফলে প্রাচীন সংস্কৃতি যে বিপন্নতার মুখোমুখি, সেই সংকটময় সময় কালের কথা উঠে এসেছে ভোম্রার মর্মস্পর্শী ভাষায়,-

''তুমুল তোলপাড়- এগিয়ে এসে দেখে- অশ্বত্থগাছটার গোড়ায় কুড়ুলি পড়েছে।

যেন শিকড়ে শিকড়ে হাহাকার, শাখায় শাখায় ;- শুকনো হলদে খসা পাতায় মর্মান্তিক

দীর্ঘশ্বাস যেন।মাটির তামাম বুক যেন বেদনায় টনটন ক'রে উঠেছে।যুগযুগান্তলালিত

বর্দ্ধিতায়তন সংস্কারকে যেন এই নিমেষে টেনে হিঁচড়ে উপ্রে ছারখার ক'রে দেবে-''[৭]

গ্রামের শহর হয়ে ওঠা, ভোম্রার ঝাঁকা নিয়ে ফেরি করা থেকে নিজের দোকান করা, দর্জির কল, ঘন্টা বাজিয়ে ছোক্রা বাবুদের পা-গাড়ী চড়া, ভিস্তিওলাদের রাস্তায় জলসিঞ্চন, সান বাঁধানো মাছের বাজার, নামহীন অলি-গলির মোড়ে-মোড়ে কাঠের বাতিস্তম্ভ, রাস্তার নিচে দিয়ে জলের পাইপ বসানোর ব্যবস্থাপনা, বিহারী সওদাগরের কারখানায় লোকজনের শ্রমিকবৃত্তি, চশমার ব্যবহার, রেল

লাইন বসানো, মেয়েদের প্রসাধনীর বিপুল সম্ভার, বারাঙ্গনা পল্লীর অস্তিত্ব- সবই দিন পরিবর্তনের সূচনা ইঙ্গিত করে।

বনফুলের সমসাময়িক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্য 'আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী' গ্রন্থে বলেছিলেন,-

''শরদিন্দুবাবু, মুখ্যত কবি, রহস্যরসিক কবি। ফলে তাঁর গল্পগুলিতে জীবনের স্বাদ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় উৎকৃষ্ট কাব্যের রস। ..... শরদিন্দুবাবুও জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন। .... এ যুগের বাস্তবতার হাটে তার যে মূল্যই নিরূপিত হোক না কেন, সহৃদয়ের অন্তরে তার আকর্ষণ কোনদিনই ক্ষুন্ন হবার নয়। বরং সাহিত্যের আঙিনায় ও যখন ফ্রয়েড ও মার্ক্সের দৌরাত্ম্য মারাত্মক হয়ে ওঠে, অসুস্থ যৌন বিকার এবং শ্রেণীসংঘাতের উগ্রচেতনায় সাহিত্যের পরিবেশ কলুষিত ও ভারাক্রান্ত হয়, তখন অসংখ্য সমস্যাভারে জর্জরিত পাঠকের শ্রান্ত ক্লান্ত মন রোমান্সের স্বপ্নস্বর্গে একটু শান্তি পাবার আশায় আকুল হয়ে ওঠে। মানুষের এই স্বপ্নসাধকে তার পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলে ভর্ৎসনা করা সহজ হলেও এই স্বপ্নই জীবনকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করে রাখতে পারে।''[৮]

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের গল্প শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অর্থম্‌নর্থম্' (১৯৩৩)-এর খোঁড়া ফণিভূষণ বিত্তশালী নগর সংস্কৃতির বাতাবরণে নিজ অক্ষমতায় মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে মানস-প্রবৃত্তির তাড়নায় খুনের অপরাধী। শরদিন্দুর মননশীল ব্যোমকেশ বিপন্ন পরিস্থিতির শিকার ফণিভূষণকে আইনি শাস্তি না দিয়ে মৃত্যুর নিশ্চিত আশ্রয়ে শাস্তি দিয়েছিল। ফণিভূষণ জীবনসংগ্রামে লড়াই না করে পালিয়ে গেল তা নয়, বরং বলা যায় অসুন্দর জীবনটাকে সে আর বয়ে বেড়াল না, বা জীবনটার অসুন্দরতা সে আরও বাড়িয়ে দিল না। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের সংক্ষুব্ধ পরিবেশে সাহিত্য অঙ্গনে ভিন্নধারার সঞ্জীবনের নাম হল ফণিভূষণ।

এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলতাময় সময়কালের মধ্যে আবির্ভাব বাংলাসাহিত্যের তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক। এর মধ্যেও যারা স্বতন্ত্র ধারা সৃজন করলেন। প্রত্যক্ষত রাজনীতিকে এড়িয়ে বিভূতিভূষণ প্রকৃতিসংলগ্নতায় আত্মসমাহিত হলেন। যে পাঠক বিভূতিভূষণকে যেভাবে পেতে চাইলেন বিভূতিভূষণ প্রশান্তিতে পাঠকচিত্ত সেই রসধারায় স্নাত করলেন। রাঢ় বাংলার রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে উঠে এল ক্ষয়িষ্ণু জমিদারীর চিত্র। একদিকে সৌন্দর্য, অপরদিকে বীভৎসতা; একটি প্রথাসর্বস্বতা, অপরদিকে মানবমনের গহন প্রবৃত্তি, সবমিলিয়ে বহুবিচিত্র রঙে রঙিন তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য। মানিক এলেন মার্ক্সীয় বীক্ষণে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সমাজ-সচেতনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যজীবনের শুরু ১৩৩৪ সালে 'কল্লোল' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় 'রসকলি' গল্পের মাধ্যমে। তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' গল্পটি বিশ শতকের তৃতীয় দশকের রচনা (১৯৩৪)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনে পর্যুদস্ত বাংলার শিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত -অশিক্ষিত সর্বস্তরের মানুষদের বেঁচে থাকার লড়াই সময়ের চিহ্ন স্বরূপই উঠে এসেছে খোঁড়া শেখের চরিত্রে। সমকালীন সময়ে কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখকরা বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় যখন প্রবলভাবে মানুষের আদিম যৌনচেতনাকে সাহিত্যে প্রকটভাবে রূপ দিচ্ছিলেন, তখনই জীবন-জীবিকার পাশাপাশি আদিম প্রবৃত্তি যৌনতা ভয়ঙ্কর অথচ শান্তভাবে রূপ নিল তারাশঙ্করের লেখনিতে খোঁড়া শেখের সঙ্গে জোবেদা ও নাগিনীর যৌনতায়। গান্ধীবাদে বিশ্বাসী তারাশঙ্করের শেখ তাই জন্য জোবেদার হত্যাকারী নাগিনীকে শেষপর্যন্ত ক্ষমা করে দিয়ে নিজে ফকির হয়ে যায়। বিশ শতকের তৃতীয় দশক যেখানে বিশ্বাসহারানোর স্মৃতি বহন করছে, সেখানেই তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী'র খোঁড়া শেখ আত্মবিশ্লেষণে শান্তির পথ প্রদর্শন করেছে। তারাশঙ্করের জীবন বহুবিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। তারাশঙ্করের কলকাতাবাস, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াকালীন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে পড়া বন্ধ হওয়া, গ্রামে ফিরে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ, তারপর কংগ্রেসে প্রত্যক্ষ যোগদান এরকম বহুঘটনাময় তাঁর জীবন। প্রথম জীবনে তারাশঙ্কর সুভাষচন্দ্র বোসের দ্বারা আকৃষ্ট হলেও শেষাবধি গান্ধীবাদী জীবনাদর্শই তারাশঙ্করের পাথেয় হয়েছিল। মাঝে অবশ্য তারাশঙ্কর চল্লিশের দশকের ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সাথে কিছুদিনের জন্য জড়িতও হয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী মানুষ যখন সম্পর্কহীনতায় ভুগছে আর কল্লোল-প্রভাবে সাহিত্যে বিষয় হিসাবে আসছে প্রান্তিক মানুষ, তখন তারাশঙ্কর এক অ-মানুষীর সম্পর্কের গল্প লিখলেন 'নারী ও নাগিনী'।

বাংলা কথাসাহিত্যে যখন রুশ বিপ্লবের ছায়া ক্রমেই দীর্ঘায়িত হয়ে চলেছে তখন আবির্ভূত হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকের মাঝামাঝি (১৯৩৬) 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাস দুটিতে মানিক মানুষের গহন মনস্তত্ত্ব নিয়তিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে সুস্থ এবং অসুস্থের নতুন সংজ্ঞা নিরূপণ করলেন। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের মুখ্য আলোচ্য চরিত্র শারীরিক এবং/অথবা মানসিকভাবে অক্ষম বা প্রতিবন্ধী চরিত্ররা, মানিকের লেখনীতে নতুনরূপে বিশ্লেষায়িত হল। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মালা ভালো করে হাঁটতে পারে না, কিন্তু সমকালীন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সে হেরে যায় না, রূপকথার গল্প শোনায় বাচ্চাদের, কুবের কপিলাকে নিয়ে হোসেন মিঞার স্বপ্নরাজ্য ময়নাদ্বীপে পাড়ি দিলেও মালা বাচ্চাদের নিয়ে অসহায়তার ভেঙে পড়ে না। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক যখন কেবলই আত্মমগ্নতার, স্বার্থপরতার, অর্থলোলুপতার, নগ্ন দারিদ্র্যের স্বাক্ষর বহন করছে ; নতুন নতুন স্বপ্নরাজ্য ময়নাদ্বীপ এবং হোসেন

মিঞারা এসে নতুন উপনিবেশ স্থাপন করছে, তখনও মালা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে রূপকথার ইতিবাচকতা বপন করছে। এই উপন্যাসেই হাবা মেয়ে বগলী মালার রূপকথায় মগ্ন হয়েছে। মালার খোঁড়া মেয়ে গোপীও সক্ষমতার পথে পা বাড়িয়েছে। শারীরিক অক্ষমতাকে প্রবল মানসিক শক্তিতে কাটিয়ে উঠে নতুন দিনের সূচক মালা। সমকালীন ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব আরোও একবার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সমকালের মানিকের আরেকটি উপন্যাস 'পুতুলনাচের ইতিকথা'তে (১৯৩৬)। যাদব পন্ডিত এবং পাগলাদিদি খ্যাতির মোহ বিড়ম্বনায় মানুষের পরিণতি যে কি ভয়ঙ্কররূপ হতে পারে তার প্রমাণ। বিশ শতকে তিরিশের দশক যখন পাশ্চাত্য নিয়তিবাদের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছে, তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় ছোট ছোট চরিত্র ভূতো, মোহন-দের মাধ্যমে নশ্বর মনুষ্যজীবনের অচিরন্তনতার ছবি দেখালেন। সমপ্রায় সময়কালে (১৯৩৭) লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্প-চরিত্র গবেষণা-অভিসন্দর্ভের প্রয়োজনে নির্বাচন করা হয়েছে। 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু ডাকাত, যার হাত জখম হয়েছিল ডাকাতি করতে গিয়ে এবং 'অন্ধ' গল্পের সনাতন চক্রবর্তী, অতিরিক্ত মদ্যপান যার অন্ধত্ব সূচিত করেছিল। প্রতিমুহূর্তে সংগ্রাম করে প্রবলভাবে বেঁচে থাকা উপভোগ করার মূর্ত প্রতীক ভিখু ডাকাত, যে নিজের প্রাপ্যটুকু ছিনিয়ে নিতে পারে। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের টালমাটাল সময় মানুষকে প্রাপ্যটুকু ছিনিয়ে নেবার পথে চালিত করে। এই সময়প্রেক্ষিতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'অন্ধ' গল্পে সনাতন চক্রবর্তীর মত পিতাচরিত্র সৃষ্টি করলেন যে বাংলাদেশের কন্যাদায়গ্রস্ত অসহায় পিতাদের মনের মানস সরোবরের অগম তীরের বাসিন্দা। বাংলা-দেশের পিতারা কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে থাকেন, কিন্তু সনাতন চক্রবর্তীর লগুড়াঘাত আসলে শুধু মেয়ের শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারী লোকজনের প্রতিই নয়, বরং বাংলার মেরুদন্ডহীন কন্যার পরিবারের প্রতিও। এখানেও মানিক নিজের মান-সম্মান, অধিকার নিজে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছে। বিশ শতকের তিনের দশকের একেবারে অন্তিমে(১৯৩৯) মানিক 'সরীসৃপ' গল্পে ভুবন আর তার বাবাকে দেখালেন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী চরিত্ররূপে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অটিজম বলে যাকে চিহ্নিত করেছে তারই লক্ষণাক্রান্ত ভুবন। আসলে সেই সময় ছিল বড়ই অস্থিরতায় পূর্ণ। মানুষের বোধবুদ্ধি শুভচেতনা সমস্তই কালঝঞ্ঝায় বিলুপ্তপ্রায়। আত্মস্বার্থসর্বস্বতায় আকণ্ঠমগ্ন হতবুদ্ধি মানুষরাই নিজেদের অক্ষমতাকে যথাযথ নিরূপণ করতে পারে না। 'সরীসৃপ' গল্পে ভুবন এবং তার পিতা ছাড়া বাকি চরিত্ররা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, সমাজের চোখে, কিন্তু মানিক দেখালেন যে সমাজ পুরোটাই বিকৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। তাই ভুবন-এর মত সহজ সরল মানুষরা সমাজের কুটিল জটিল আবর্তে মানসিকভাবে অসুস্থ হিসাবেই প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। এই একই সময়কালে (১৯৩৯) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাকালের জটার জট' গল্পে সুচিত্রা এমনই এক মানসিকভাবে অসুস্থ চরিত্র। সুচিত্রা এই জন্য পাগল সমাজের চোখে, কারণ সে তার থেকে

বয়সে অনেকটাই ছোট এক ছেলেকে নিজের স্বামী কল্পনা করে দাম্পত্যজীবন রচনা করে চলেছে। বিশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মানুষ অস্তিত্বহীনতায়, বিশ্বাসভঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ, তারই প্রেক্ষাপটে ফ্রয়েড-ইয়ং-এলিসদের মনস্তাত্ত্বিক যৌনচেতনার বিশ্লেষণ- সব মিলিয়ে মানিকের রচনার অনবদ্য সুচিত্রা। নিজের দাবিটুকু পরিবেশনে সুচিত্রার আপ্রাণ প্রচেষ্টা সমাজের চোখে পাগলামি। মানিক এই পাগলী মেয়ের আচরণে আসল তথ্য নির্মোকভাবে পরিবেশন করলেন। কল্লোলীয় সাহিত্য এই যুগপ্রেক্ষিতে যে নতুন ধারার সূচনা করলেন তার উদাহরণ সুচিত্রা।

১৯৩৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সোমেন চন্দের 'সংকেত' গল্পটি পরবর্তীকালে ১৯৪২ ডিসেম্বরে 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' সংকলনে গ্রন্থবদ্ধ হয়। এক দরিদ্র মুসলমান তাঁতি পরিবারকে কেন্দ্র করে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিকের একত্র জোটবদ্ধ সংগ্রামের কাহিনি 'সংকেত'-এ অন্ধ মাঝি দশরথ-ই প্রথম যুগপরিবর্তনের ইঙ্গিত পান। নতুন যুগের বার্তাবাহী হিসাবে গল্পটির বিশেষ অভিমুখ নির্দেশ করেছে দশরথ।

বিংশ শতাব্দীর চার ও পাঁচ-এর দশক আন্তর্জাতিকতার প্রেক্ষাপটে কম্পিত। ১৯৩৯-এ পোল্যান্ড আক্রান্ত হয় হিটলার দ্বারা। জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যুদ্ধঘোষণার পর ফ্রান্সের পতন এবং ব্রিটেনের বিধ্বস্ততা। ১৯৪০-এ বিশ্বক্ষেত্রে একাধিপত্যরক্ষার জন্য জাপান-ইতালি-জার্মানির চুক্তিবদ্ধতা। ১৯৪১ থেকে হিটলারের বিশ্ববিজয়যাত্রার সূচনা। ২২ জুন, ১৯৪১- হিটলারের সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ। একদিকে ফ্যাসিবাদী শক্তিগোষ্ঠী জাপান-ইতালি-জার্মানী, অপরদিকে ফ্রান্স-রাশিয়া-ব্রিটেন-আমেরিকা। অক্ষশক্তি ও মিত্রশক্তি স্পষ্টত এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে চলল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণস্বাধীনতার শর্তসাপেক্ষে ব্রিটিশ-ভারত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।

১৯৩৯, নভেম্বরে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ব্যর্থ হওয়ায় প্রদেশ কংগ্রেসের পদত্যাগ, ১৯৪০ এর অগষ্টে ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর ঐতিহাসিক অগষ্ট ঘোষণা এবং তার ফলস্বরূপ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন, ১৯৪২-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একেবারে কলকাতায় বোমাবর্ষণ। ১৯৪২-এ ক্রিপস মিশন যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতাদানের আশ্বাস এবং যুদ্ধান্তে ভারতীয়দের স্বাধীন সংবিধান রচনার ব্রিটেন-প্রদত্ত আশ্বাসবাণীতে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয়ের প্রবল আপত্তির ফলস্বরূপ শুরু হল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। গান্ধীজিকে কারারুদ্ধ করা এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে বেআইনি ঘোষণাকরণ, গণবিক্ষোভ দমনে আরোও নির্মমতা সবকিছু মিলিয়েও শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল।

১৯৩৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন রয়েছে বিমল করের উপন্যাস 'দেওয়াল'-এ (১৯৩৮)। কলকাতা নগরী যখন প্রত্যক্ষ করছে বোমাবর্ষণ, কলকাতার অনেক যুবক প্রয়োজনে বা

সখে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যাচ্ছে, তারই জীবন্ত ছবি রয়েছে বিমল করের উপন্যাসটিকে। উপন্যাসের সুচারু যুদ্ধে গিয়ে একটা হাত খুইয়ে আসে, লোকসমক্ষে সুচারু তার এই অঙ্গহীনতা নিয়ে রসিকতা করে পরিবেশটাকে সামান্য হালকা করার চেষ্টা করলেও সুচারু আসলে নিজেই প্রবলভাবে ভেঙে পড়েছিল মানসিক দিক থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময় মানুষের মধ্যে আরও বেশি করে অনিশ্চয়তাবোধ বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধই মানুষের জীবনে মূল্যবোধহীনতার সূচনা করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেই বিপর্যয় আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দিল। রাজনৈতিক কার্যকলাপে মানুষ জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হতে থাকল। উপন্যাসটির আরেকটি চরিত্র উমার জীবন কি ভয়ংকরভাবে এই সময়ের প্রভাবে বর্ণময় হয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উপন্যাসটির প্রতিটি চরিত্রের উপরই সমকালীন সময় ভয়ানকভাবে ছাপ ফেলেছে, কিন্তু গবেষণা-অভিসন্দর্ভের অভিমুখ্য প্রতিবন্ধকতার শিকার চরিত্র হিসাবে সুচারু এবং উমা আলোচ্য। সুচারু কাহিনির সূচনায় সুস্থ স্বাভাবিক সর্বাঙ্গসুন্দর এক যুবাপুরুষ ছিল, যে কিনা জীবনযুদ্ধে সুধাকে সবসময় সাহস জুগিয়েছে ; প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে যাওয়াটা সুধার ভাই-এর মত বেকার দরিদ্র ছেলেদের নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদে প্রয়োজনীয় হলেও, সুচারুর কাছে তা ছিল নিতান্তই রোম্যান্টিকতা। এহেন মানুষ যুদ্ধে গেল, একটা হাত খোয়াল এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। যে সুচারু আগে সুধার মানসিক শক্তি, আশ্রয় হয়েছিল, সেই সুচারু সুধার থেকে মানসিক শক্তি আহরণ করল যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে। যুদ্ধের এই ভয়াবহ রূপের উল্টো পিঠ হচ্ছে উমার জীবন। উমা বামন এক মেয়ে। তার বাবা বিপ্লবী কাজকর্মের সাথে যুক্ত থাকার জন্য খুন হন। ভাগ্যের এমন পরিহাস তার পিতৃহন্তা গিরিজাপতি বাবু এই হত্যার পর মানসিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে উমা, তার মা ও দাদার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন এবং উমা ও তার দাদার কাকা হয়ে ওঠেন। রক্তের টান এবং যুগের হাওয়ায় উমার দাদা মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্বেও বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। কিশোরী উমা একাহাতে কাকা গিরিজাপতির সংসার সামলাতে থাকে। যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে টালমাটাল মানুষের বিশ্বাস-আস্থা নতুন করে ঘর বাঁধতে সাহস পায় না। উমার বিবাহ সম্ভাবনা তৈরী হলেও যুদ্ধকালীন সঙ্কটাবস্থা তা বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। সমকালীন সময়ের কালোবাজারি, রেশনিং, খাদ্যাভাব, জ্বালানীর অভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অগ্নিমূল্য, গ্রাম থেকে দলে দলে নিরন্ন মানুষদের শহরে এসে ভিড় করা, সাধারণ গৃহস্থর পরিস্থিতি মোকাবিলায় আবার গ্রামে ফিরে যাওয়া সব চিত্র উপন্যাসটিতে সময়কে জীবন্ত করে তুলেছে। উমা এই সময়ের হেরে না যাওয়া শক্তির প্রতীক। মৃত্যুর দিকে তাকিয়েও উমা জীবনকেই বেছে নিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কলকাতার বুকে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী প্রচুর ধ্বংসের তান্ডবলীলা চালিয়েও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবের জোয়ার এনেছিল, যা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছিল। সেই

স্বাধীনতা আবার অন্য অনেক সমস্যা আনলেও স্বাধীনতার আস্বাদ পাবার পেছনে বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে যখন কলকাতার বুকে আবর্তের ঢেউ আছড়ে পড়েছে, সেই সময়কাল ছবি পাই বিমল করের 'দেওয়াল' উপন্যাসের তিনটি খন্ড 'ছোটঘর', 'ছোটমন', 'খোলা জানলা'য়। গ্রাম থেকে মানুষ শহরে আসছে ক্রমান্বয়ে- যেমন একসময়ে এসেছে সুধার বাবা তার পরিবার নিয়ে, তেমনই এল গিরিজাপতিবাবু উমাদের নিয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে মানুষজন নিজের ভিটে ছেড়ে চলে যাচ্ছে যেমন, তেমনই আবার প্রাণ বাঁচাতে অনেকে চলে যাচ্ছে শহর ছেড়ে গ্রামে। 'দেওয়াল' উপন্যাসে দেখি সুচারু যুদ্ধে যাবার আগে সুধা তাকে কথা দিচ্ছে যে সুচারু ফিরে এসে সুধাদের সেখানেই দেখতে পাবে। 'দেওয়াল' উপন্যাসে দেখি উমা, সুধারা সবাই একসাথে কি ভয়ঙ্কর বোমাবর্ষণের রাতগুলো কাটিয়েছে। 'দেওয়াল' উপন্যাসের দুটি প্রতিবন্ধী চরিত্র রয়েছে ; এক, বিকৃতরূপী বামন উমা এবং দুই, সুচারু- সে যুদ্ধে গিয়ে একটা হাত খুইয়েছে। যে সময় প্রেক্ষিতে বিমল কর লিখছেন, তখন মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে ভুলে গেছে, কিন্তু সেই সময়কালেই বিমল কর উমার মত মানুষকে তুলে ধরলেন। উমার বয়স খুব বেশি না হলেও অসাধারণ পটুত্বে সে গিরিজাপতির সংসার সামলেছে। অতি অল্প আয়ে কোনোরকমে নিজের সংসার চালিয়েও উমা যথাসাধ্য সাহায্য করেছে সুধাদের। গিরিজাপতিবাবু, যাকে উমা নিজের কাকা বলে ভাবে, তিনি আসলে উমার বাবার হত্যাকারী। সেই সময় পরিস্থিতিতে বিপ্লবপন্থা বিপ্লবের আনুগত্য মানুষকে বাধ্য করত মনুষ্যত্বকে হারাতে। গিরিজাপতি পরবর্তীকালে বিপ্লবের পন্থাত্যাগ করে উমাদের দায়িত্ব নিয়েছে এবং উমার মত বিকৃত চেহারার মেয়েরও বিয়ের ব্যবস্থা করতে চেয়েছে। যদিও তখনকার সমাজ-যুবমানসিকতা ভীরুতায় নিজের দায়িত্ব নিতেই যখন অক্ষম, তখন উমার মত মেয়েকে বিয়ে করা মানে বিকৃত ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিতে কেউ প্রস্তুত নয়। পাশাপাশি বিমল কর দেখালেন সুচারুর মত এক তরুণ যুবককে, প্রচন্ড প্রাণোচ্ছলতায় পূর্ণ সুচারু সুধাকে ভরসা দিলেও নিজে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। হাত চলে যাওয়ায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল সুচারু। কিন্তু সুধাকে পাশে পেয়ে আবার নতুন করে জীবনের পথে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখতে থাকে। আসলে বিমল কর যুদ্ধ প্রেক্ষিতে প্রতিমুহূর্তে অনিশ্চয়তায় ভরা জীবনের ছবি আঁকলেন 'দেওয়াল' উপন্যাসে। 'উমা'কে দেখালেন দেবী দুর্গার মতই প্রচন্ড positive শক্তির আধার রূপে, যে মৃত্যুর বদলে জীবনকে বেছে নিল। আর সুচারুর মধ্যে হতাশাগ্রস্ত বিধ্বস্ত ভেঙে পড়া যুবসমাজ, তার পাশে দাঁড়ানো সুধা, যে কিনা তখনকার সময়ে সংসাররক্ষায় মেয়েদের ভূমিকা পরিবর্তনের প্রতীক, সুচারু-সুধার মিলনে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলা-সমস্ত, বিপদকে পাশে নিয়েই দু:খ-আনন্দের মধ্যে যেমন

বুদ্ধদেব বলেছিলেন জীবনানন্দকে গ্রহণ করে অগ্রসরের কথা সেই কথাই বিমল কর ধ্বস্তসময়ক্ষেত্রে আরোও একবার বললেন।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তিরোলের বালা’ ছোটগল্পটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বা অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের রচনাটিতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের থেকেও বড় হয়ে উঠেছে মানব-মনস্তত্ত্ব এবং অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস। পাগল পূর্ণিমাকে অনেক দূরের রাস্তা পার করে আসতে হচ্ছে তিরোলে- চিকিৎসার জন্য। পূর্ণিমার বাবার আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল না থেকে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস বিভূতিভূষণের লেখনীর স্বাতন্ত্র্য। প্রত্যক্ষ রাজনীতিকে এড়িয়ে প্রকৃতির মধ্যেই আত্মসমাহিত হয়ে শান্তিনীড় রচনার চিরপ্রয়াসী বিভূতিভূষণের স্বাতন্ত্র্য।

১৯৪২-এ প্রকাশিত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘বরযাত্রী’ গল্পগ্রন্থের নির্বাচিত গল্প ‘বরযাত্রী’-র গণশা তোতলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন উত্তাল সমাজ রাজনৈতিক পরিবেশ, যেখানে গণশার মত যুবকরা চাকরি খোঁজার মরিয়া প্রচেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়, হাতে অর্থের প্রাচুর্য নেই, তবুও এরা সময়ের ভয়ঙ্করতায় ভেঙে পড়েনি, বরং হাসি মুখে উপভোগ করেছে জীবনকে। সাধারণ বাঙালি বিয়ের স্ত্রী-আচারকে কেন্দ্র করে কিছুক্ষণের জন্য পাঠক সাধারণও নির্মম হাস্যরসের উৎসারে ভেসে গিয়ে ভুলে থাকতে পারে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ না-পাওয়াগুলিকে। আদ্যোন্ত হাসির গল্পটির কেন্দ্রিয় চরিত্র, চালিকা শক্তি গণশার তোতলামো এ রসধারাকে আরও বেগবান করেছে। হাস্যরসের আড়ালে থাকা কোনো ব্যঙ্গের চাবুক বা ক্ষুরধার বক্রতার চাপা আঘাত কিছু নেই ‘বরযাত্রী’ গল্পটিতে। সমকালীন সমাজ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে দমচাপা আবহাওয়ায় একঝলক টাটকা বাতাস বরযাত্রীর ‘গণশা’।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং সমকালীন মন্বন্তরের জীবন্ত রূপ অঙ্কিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের সুবোধ ঘোষের ‘সুন্দরম্’ গল্পের হাবু বোষ্টম ও হামিদা চরিত্রে। নৈতিক মূল্যবোধের অবমূল্যায়ণ উচ্চ-মধ্য এবং নিম্ন-সর্বস্তরে কি ভয়ংকরভাবে ক্রিয়াশীল তা নির্মমভাবে দেখিয়েছেন গল্পটিতে সুবোধ ঘোষ। ভিক্ষুক দম্পতি হাবু বোষ্টম ও বেদিয়ার মেয়ে হামিদা শারীরিকভাবেও সম্পূর্ণ সুস্থ সবল নন। কুষ্ঠরোগে হাবুর হাত অক্ষত নয়, আর হামিদার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। দুটি আলাদা গোষ্ঠী থেকে তারা জীবনসংগ্রামের তাগিদে একসাথে পাশাপাশি লড়াই চালাচ্ছে। তাদের যুবতী মেয়ে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ তুলসী শুধুমাত্র যে খাদ্যের লোভে উচ্চবিত্ত সুকুমারের লালসার শিকার হয়েছে তা নয়, আসলে জীবনসংগ্রামের কঠোর নির্মমতায় হাবু-হামিদাও বাধ্য হয়েছে তুলসীকে নিজেদের ভরণপোষণে কাজে লাগাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজ এবং মানবমনের

অবনমন প্রত্যক্ষ হয় গল্পটিতে। হাবু আর হামিদা- দুজনেই মানুষের রূপধারী ব্যঙ্গমূর্তির প্রাণী বিশেষ। একে শারীরিক বিকৃতি, তার উপর প্রচন্ড দারিদ্র্য। সংসারের জিনিসপত্র বলতে একটা ছেঁড়া মাদুর, নোংরা চটের একটা পোঁটলা, হাঁড়ি, উনুন, ক্যানেস্তারা। হাবু, তার স্ত্রী হামিদা, বড় মেয়ে চতুর্দশী তুলসী আর কয়েক মাসের কোলের ছেলে ছাড়াও তাদের সংসারের অন্যান্য আরোও সদস্যদের মধ্যে রয়েছে পিঁপড়ে আর মাছির দল।এরা এতদিন যে বস্তিতে থাকত মিউনিসিপ্যালিটি নতুন আফিসের গুদাম বানানোর জন্য সেটা ভেঙে দিয়েছে। শহর এলাকায় আর এদের থাকবার হুকুম নেই। তাই মফঃস্বলের সরকারী ডাক্তার কৈলাসবাবুর বাংলোয় এই পরিবার এসেছে মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পিছনের দিকে থাকার অনুমতিপত্র জোগাড় করতে।হামিদা এবং হাবু দুজনেরই পেশাদারিত্ব অসাধারণ। হাবু ডাক্তারবাবুর কাছে অনুমতিপত্র জোগাড়ের সময় দীননাথের নামে দিব্যি কাটতে ভোলে না। আর এটাও জানায় তাদের মেয়ে তুলসীর শরীরে কুষ্ঠরোগ থাবা বসায়নি। তাই শহরে গিয়ে ভিক্ষা করে আনবে তুলসী। সেই রোজগারেই চারটি পেট প্রতিপালিত হবে। আর হামিদা সেই অনুমতিপত্র জোগাড়ের সাথে কোলের শিশুর জন্য দুধটুকু প্রার্থনা করে নেয়। এখানে হামিদার মাতৃত্বকে ছাপিয়ে গেছে তার নকল কান্না। একমুঠো দানা এবং এক পেয়ালা দুধের সাথে তাই দু-একটি জামাকাপড়ও জুটে যায় তাদের জন্য।হাবু এবং হামিদা একেবারে ‘হাঁড়ির মুখের সরা’র মত। উভয়ই প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ জীবনযুদ্ধ জয় করার সঙ্গী হিসাবে দুজনকে যথাযথ নির্বাচন করেছে। সাধ করে আবার প্রথমা সন্তানের নাম রেখেছে তুলসী। পৌরাণিক অনুষঙ্গ ‘তুলসী’ নামকরণের পশ্চাৎপট সার্থক করেছে। চরিত্রগুলির সামাজিক এবং ব্যক্তিমনস্তত্ত্ব সুপরিস্ফুট হয়েছে এর মাধ্যমে। চরিত্রগুলি সমাজের অবরবর্গীয় শ্রেণী তথা সাব-অল্টার্ন মানসিকতার শ্রেণী প্রতিভূ। আর্থ-সামাজিক অবস্থার স্বীকার এই চরিত্রগুলি।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন গ্রন্থ ‘বৌ’-এর অন্তর্গত ‘কুষ্ঠরোগীর বৌ’ গল্পটি অভিসন্দর্ভের নির্বাচিত গল্প। ঠিক এর পরের বছরই ১৯৪৪-এ মানিক প্রত্যক্ষভাবে মার্কসবাদের সঙ্গে যুক্ত হন, কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। সুতরাং বলা যায়, ‘কুষ্ঠরোগীর বউ’ গল্পটিতে মানিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-সমকালীন সময়ে, মন্বন্তর যখন সূচিত হয়নি, সেই প্রেক্ষিতে মানবমনের টানাপোড়েনের অসাধারণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। কুষ্ঠরোগে বিকলাঙ্গ যতীনের বিকৃত মানসিকতার সঙ্গে মহাশ্বেতার সহজ সরল দাম্পত্যের মধ্যে জটিলতার আবর্ত এবং শেষে পরম প্রশান্তিতে মহাশ্বেতার উত্তরণ সঙ্কটকালকে পেরিয়ে যাবার ইতিবাচকতার ভূমিকা রচনা করেছে।

এই মাৎস্যন্যায় পরিস্থিতিতে ২৮ মার্চ ফজলুল হক মন্ত্রীসভার অবসানে ২৪ এপ্রিল নতুন নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এটা ১৯৪৩। যা পরবর্তীকালের বাংলাদেশী ইতিহাসের এক কালিমালিপ্ত অধ্যায় হিসাবে রয়ে গেছে। এই সময়েই বাংলা প্রাকৃতিক রোষেরও শিকার হল। ১৯৪২-সালে শস্য যথেষ্ট পরিমাণে ফলন হলো না। আর তার সাথে যুক্ত হল মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের বন্যা ও শস্যকীটের আক্রমণ। এর সাথে তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছেই। এর ফল হল পঞ্চাশের মন্বন্তর। আর এর ঐতিহ্যবহন করেই চলে এল ১৯৪৪-এর বস্ত্রসংকট।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের বস্ত্রসংকট ফুটে উঠেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্পে। ১৯৪৬-এর সময়কালের গল্পগ্রন্থ 'আজকাল পরশুর গল্প'এর অন্তর্গত 'তারপর?' গল্পে ফুটে উঠেছে অর্থলিপ্সায় তরুণ সমাজের বিপথগমন, কালোবাজারির চিত্র। 'শিল্পী' গল্পটির প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন,-

> ''বস্ত্রশিল্পকে অধিগত করে বল্গাহীন মুনাফা লাভের লোভে গিল্ডগুলিকে ভেঙে দিয়ে তাঁতীদের সর্বহারা শ্রেণীতে নামিয়ে দেবার ক্ষেত্রে ইংলন্ডে বণিক এবং দেশীয় অভিজাত শ্রেণী একসময় নিয়েছিলেন নির্মম ভূমিকা। হানসিয়া টিক লীগ, মার্চেন্টস্ অব দি স্টেপল্ , এডভেঞ্চারার্স কোম্পানীর 'হানসা' বা লাখোপতি ব্যবসায়ীদের 'ক্লাথিয়ার' রূপে তাঁতীদের প্রতি মর্মান্তিক দুর্বিচার করেছিল। এর কারণ প্রথমত, মুদ্রাশাসিত বুর্জোয়া সমাজে শিল্পপ্রতিভার সঙ্কট এমনি ঘনিয়ে উঠেছিল (মার্কস বলেছিলেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন, চিন্তার রাজ্যের উৎপাদনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, যেমন চিত্রকলা ও কাব্য), যে চাষী, মজুর বা ভদ্রঘরের যেখানেই তার আবির্ভাব হোক, মানুষের বাঁচার অবস্থা এমন হয়ে উঠেছিল যে দেশে কোনমতে বেঁচে থাকার উপায়টুকু আয়ত্ত করতে গেলেও অন্তর্দৃষ্টিকে বা সৌন্দর্যচেতনাকে ঝাপসা হয়ে যেতে দিতে হবে। অথচ জীবিকার জন্য নমনীত হওয়ার অর্থ-নিজেকে অপচয় করা, যা তার শিল্প-সাধনার সুনিশ্চিত ব্যর্থতা।''[৯]

বিশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষপাদে সোমেন মিত্র-এর 'সংকেত' গল্পের দশরথ সংকেত দিয়েছিল নতুন যুগের, সেই যুগ কেমন হতে পারে তা মানিক দেখালেন বিশ শতকের চল্লিশের দশকে 'শিল্পী' গল্পে। এই প্রেক্ষিতে অভিসন্দর্ভে নির্বাচিত চরিত্র মদনের মাসি প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মদনের প্রেক্ষাপট রচনার অংশবিশেষ। শুধু ব্যক্তিজীবনের দু:খকষ্ট নয়, এই পরিসরের মানিকের গল্পগুলিতে রাষ্ট্রিক-স্বাদেশিক ভাবনাও বৃহত্তর ক্যানভাস রচনা করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণে প্রচুর সৈন্যের দেশে আগমন খাদ্যের চাহিদা এক ঝটকায় প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিল। এদিকে ১৯৪২ সাল অজন্মার বছর। সাথে বাংলার দুই জেলা মেদিনীপুর আর চব্বিশ পরগণা বন্যা ও শস্যকীটের আক্রমণে শস্যহানির করাল গ্রাসে ধ্বস্ত। এর সাথে

রয়েছে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর চূড়ান্ত অবহেলা ও ঔদাসীন্য। শুধু তাই-ই নয়। এর সাথে যুক্ত হল ব্রহ্মদেশের দুর্ভাগ্য। ব্রহ্মদেশ থেকে কিছু চাল আসত বাংলায়। Denial Policy, জাপানি আক্রমণের ফলে সে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে গেল। উল্টে বেশ প্রচুর সংখ্যক মানুষ ব্রহ্মদেশ থেকে দলে দলে অনুপ্রবেশ করতে লাগল বাংলায়।

মুনাফালোভী কালোবাজারিরা অতিরিক্ত অর্থলোভে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চাল সংগ্রহ করে গুদামজাত করে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে চালের দাম বাড়িয়ে ফেলতে লাগল। খাদ্যের প্রয়োজনে দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হল। খাদ্যের জন্য পিতামাতাকে ত্যাগ এমনকি স্ত্রীকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে মানুষ এমন উদাহরণও অপ্রতুল নয়। সরকার কর্তৃক খোলা লঙ্গরখানাগুলো মানুষের পেটের জ্বালা মেটাতে পারছে না। অনাহারে মৃত্যুর মিছিলের সঙ্গে শুরু হল নতুন আরেক অভাব। বস্ত্রসংকট। এক শ্রেণীর মানুষের অর্থগৃধনুতায় নরনারী খাদ্যের পর লজ্জানিবারণের বস্ত্রটুকুও হারালো। আর তাঁতিরা কাজের অভাবে আরও চরম দুর্দশায় শিল্পীসত্তাটাই হারিয়ে ফেলেছে। যে বস্ত্রবয়ন বাংলার তাঁতিদের পারদর্শীতায় বিশ্বখ্যাত শিল্পস্থানে উন্নীত হয়েছিল, সেখানে তাঁতি সমাজেরই আজ অন্নবস্ত্রের জোগান নেই পরিমিতভাবে। মদন তারই প্রতিনিধি। তবুও এই সময় মানুষকে একসাথে থাকতে হবে। মদন তাঁতির পরিবারে তার মাসি যেন সেই ভাগ্যহত মানুষগুলির সম্মিলিত সংগ্রামের প্রতিভূ।

১৯৪৬ সাল। অগস্টে ঘোষিত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' থেকেই শুরু হয়ে গেল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। তার সাথে আরও পালে হাওয়া লাগাল ১৯৪০-এ কৃষক সভার ডাকা তেভাগা আন্দোলনের।

১৯৪৬-এ প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' গল্পগ্রন্থের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটি যামিনীর অন্ধ মা চরিত্রের জন্য গবেষণা-অভিসন্দর্ভে নির্বাচিত। গল্পটি সম্পর্কে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন-

''Twice filmed, the story, according to a few observants, bears a touch of magic realism of later days''

''..... a genuine exotic land remote and proximal at the same place, languishing in a blank and exorable despondency. One knows for certain that the young unwed girl in the story will be awaiting these eternally to be taken off her fateful bondage, to rejuvenesce.

(Premendra Mitra, Sahitya Akedemi. First Published 1999, p. 53)''[১০]

প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের রচনার যেমন এক বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য, সেইরকমই প্রেমেন্দ্র মিত্রও নির্বাচিত গল্পটিতে ঐতিহ্যগত দ্বন্দ্বের মুখোমুখি করেছেন পাঠককে। সমালোচক অরূপকুমার দাসের মতে,

> '' 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটা আবার রাশি রাশি পাঠকের মন টেনে নেয় যে বিশিষ্টতায়, তা সত্যিই অভিনব। এখানে যে সমাজতত্ত্ব আছে, তা প্রত্যক্ষত ধাক্কা দেয় না পাঠককে। ধাক্কাটা আসে পরোক্ষে। যে ১৯৪৬ সালে বা তার কিছু আগে লেখা গল্পের বর্ণনায় বাংলা ভূখন্ডের যে গ্রামের দুর্দশালাঞ্ছিত রূপ পড়ছি, তাকে আবার ছুঁয়ে দেখতে চাইলে এবং তার জন্য অনির্দিষ্ট গন্তব্যে বেরিয়ে পড়লে কোথাও না কোথাও পেয়ে যাব আজও প্রধান নগরকেন্দ্র থেকে ৫০-৬০ মাইল বৃত্তাকার পশ্চাদভূমিতে। এর থেকে গ্লানিকর আর কী হতে পারে? এই গ্লানিকর সমাজবাস্তব প্রেমেন্দ্র মিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন বিচিত্র আঙ্গিকে; যা প্রায় অতুলনীয় আমাদের সাহিত্যে, এমনকি দেশ-বিদেশের অন্যান্য সাহিত্যেও।''[১১]

ইতিহাসের পাতায় ১৯৪৬ অনেকগুলি আন্দোলনের সাক্ষী-তেভাগা, পুন্নাপ্রা-ভায়ালার, তেলেঙ্গানা (১৯৪৬-১৯৫১), নৌবিদ্রোহ (১৯৪৬) এবং বিদ্রোহীদের সমর্থনে কলকাতার রেলশ্রমিক ও ছাত্রদের ধর্মঘট (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬), ডাক ও তার কর্মীদের ধর্মঘট (১৯৪৬), বোম্বাই-এ ব্যাঙ্ক কর্মীদের ধর্মঘট (১৯৪৬), বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ধর্মঘট (১৯৪৬), পাঞ্জাবে শিক্ষক ধর্মঘট (১৯৪৬)। এই আন্দোলন ও ধর্মঘটের সময়কালে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পে পাঠকের মগ্নচৈতন্যের আলোড়ন এক অদ্ভুত ম্যাজিক-রিয়ালিটিতে মানুষকে তার শিকড়-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রতি টান অনুভব করায়। গল্পের নির্বাচিত অন্ধ বৃদ্ধা সেই সংস্কৃতির ধারক বাহক এবং আধুনিকতার মধ্যেও শিকড়ের টান জাগানো মানুষ।

১৯৪৬-এ প্রকাশিত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'অদৃশ্যলোক' গ্রন্থের অনুগল্প 'তাজমহল', বনফুল যুগযন্ত্রণার ছবি ভিন্ন প্রেক্ষিতে পরিবেশন করলেন। গল্পকার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় পেশাগত জীবনে ছিলেন চিকিৎসক। ফলে তিনি তৎকালীন সময় ও সমাজকে ব্যাধিমুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন চিকিৎসকের ভূমিকাতেও।'তাজমহল' গল্পের ভিখারী পত্নী ব্যাধিতে বিকৃতরূপা হয়ে পড়েছিল। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে বিকৃতরূপা চরিত্রেরাও আলোচ্য, কারণ বিভিন্ন মিথ-পুরাণে বিকৃত মানুষ শয়তানের প্রতিভূরূপে গণ্য হত, কিন্তু আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় তাদের ভূমিকা ভিন্ন। বনফুলের 'তাজমহল' গল্পের বিকৃতা বৃদ্ধা আসল তার বৃদ্ধ পতির একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচায়ক। আন্দোলন-বিদ্রোহ-ধর্মঘট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী উত্তাল সমাজ-রাজনৈতিক পরিবেশ বনফুলের এ লেখনীর আদর্শ প্রেম সমকালীন সাহিত্যে ভিন্ন স্বাদের সৃষ্টি করে।

১৯৪৭,স্বাধীনতা লাভের বছর, স্বপ্নপূরণের বছর,স্বপ্নভঙ্গের সূচনা। বৃটিশ রাজশক্তির কাছে না পাওয়াগুলো পূরণের প্রত্যাশায় যে স্বাধীনভারতের জন্ম হল এবার শুরু হল নতুন করে সেইসব প্রত্যাশাভঙ্গ। ফল উদ্বাস্তু সমস্যা।

১৯৪৭ স্বাধীনতার বছর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক উত্তালতা এবং স্থানে স্থানে বিভিন্ন বিদ্রোহ, বিশ শতকের তিনের দশকে মূলত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর আত্মমর্যাদা রক্ষার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসটিতে সমকালীন সময়, রেল লাইন পত্তন, নগরায়ন (Urbanisation), প্রাকৃতিক শক্তির সমান্তরালে যন্ত্র-সভ্যতার আগমন, গোষ্ঠী (Clan) ভেঙে জাতি (Caste), আবার জাতি থেকে ব্যক্তি (Individual) বা শ্রেণী (Class) হবার কালজয়ী ইতিহাসবোধ, সাংস্কৃতিক-কৃত্য (Rituals) বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। বাজার ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, রেশন ব্যবস্থা, ব্ল্যাক মার্কেট, রেল-উড়োজাহাজ-মোটর-নতুন যোগাযোগব্যবস্থা, জাপানি বোমার ভয়ে দলে দলে কলকাতা ছেড়ে মানুষজনের পালিয়ে যাওয়া এই সমস্ত কিছুর মধ্যেও তারাশঙ্কর স্থাপিত করলেন যুগবদলের ইঙ্গিত- যার বাহক নসুবালা, নপুংসক-পৌরাহিত্যের স্মারক। সমগ্র উপকথার ধারক বাহক সুচাঁদ সেই ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির রূপান্তরের উপকথার কথক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় নপুংসক পৌরহিত্য আবার ফিরে আসে 'শুকসারী কথা' উপন্যাসে। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৬৭ (ভাদ্র, ১৩৭৪)। উত্তরাধিকারহীন সমাজের অনুবর্তন ঘ-টছে রচনাটিতে। একদিকে সুচাঁদের মধ্য পুরাতন উপকথার ঐতিহ্য, নসুরাম আর পাগলের মধ্য কৃত্য-সচলতা, বসন্তের স্বামীর মধ্যে ক্ষমতার প্রয়োগ, কলকাটার মধ্যে জীবনের সচলতা জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রচিত মানিকের গল্পগুলিতে নিম্নবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত ে-শ্রণির জীবনযুদ্ধ, সমবেত গণ-আন্দোলনের ছবি ফুটে উঠেছে। 'পেরানটা' গল্পের প্রেক্ষাপটে রয়েছে তেভাগা আন্দোলনের চিত্র। তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুমিত সরকার বলেছেন,-

''In September 1946, The Bengal Provincial Kissan Sabha gave a call to implement through mass struggle the Floud Commission recommendation of 'tebhaga': two-thirds of the crop, instead of half or even less, for the sharecropper (Bargadar, bhagchasi or aadhyan) working on land rented from 'jotedars'. Communist cadres, including many urban student militants, went out into the countryside to organise bargadars, who had become a major and growing section of the rural population as poor peasants lost land through depression and famine and were pushed down to the level of share-croppers-they numbered 60% of villagers

in some pockets which became tebhaga strongholds. The movement caught on suddenly from harvest-time in November, which the Central slogan of 'nij-khamare dhan tolo' : sharecroppers taking paddy to their own threshing floor and not to the jotedar's house as before, so as to enforce tebhaga.''[১২]

কৃষকদের দীর্ঘদিনের অপূরিত দাবি নিয়ে শুরু হয় তেভাগা আন্দোলনের,-

''১৯৩৮ সালে ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্যে 'ফ্লাউড কমিশন'গঠিত হয়। এই ফ্লাউড কমিশন ভাগচাষিদের অধস্তন প্রজা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার জন্যে এবং ভাগচাষিদের ভাগ তিনভাগের দুভাগ করার অনুমাদন করে। তখনকার মন্ত্রীপরিষদ বর্গাদারদের ধানের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ দেবার নীতিতে স্বীকার করে একটি খসড়া বিল গ্রহণ করে। কিন্তু তারপর সাত বৎসর অতীত হলেও তা কার্যকর হয়নি।''[১৩]

'পেরানটা' গল্পে সাধু শেখের ঘরে ফেরার মধ্যে এই আন্দোলনের ছবি চিত্রিত হয়েছে। সমকালীন পরিস্থিতিতে 'গায়েন' গল্পও রয়েছে।

১৯৪৮-এ প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্পগ্রন্থ 'ছোটোবড়ো' ও 'মাটির মাশুল' থেকে তিনটি ও একটি গল্প গবেষণা-অভিসন্দর্ভে নির্বাচন করা হয়েছে। সে চারটি গল্প হল যথাক্রমে 'নব আলপনা ', 'পেরানটা ', 'গায়েন' এবং 'ভয়ঙ্কর'। 'নব আলপনা' গল্পে নটুকের পা এবং হাত অকেজো। 'পেরানটা' গল্পে ফুলবানু তোতলা, উত্তেজনায় তার তোতলামি আরও বেড়ে যায়। 'গায়েন' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র রাজেনের স্ত্রী বোবা। 'ভয়ঙ্কর' গল্পে ফুলির গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ১৯১২ থেকে ১৯৪২-৪৩-৪৪-এর রাজনৈতিক পরিস্থিতি। তখনই গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন। সেই অভিজ্ঞতা সতীনাথ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন উপন্যাসটিতে। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বিহারের চম্পারণে চলতে থাকা তিন কাঠিয়া প্রথা (চাষীদের বিঘা প্রতি তিন কাঠা জমিতে নীলচাষ করতে হবে) থেকে মুক্তির বিনিময়ে প্রচুর পরিমাণে খাজনা সাধারণ চাষীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল। গান্ধীজির তৎপরতায় এই প্রথা অবলুপ্ত হয় এবং চাষীরা ২৫% অর্থ ফেরৎ পায়। এটা ১৯১৮। এরপর ১৯১৯ জালিয়ানওয়ালা বাগের নারকীয় হত্যাকান্ড, ড. কিচলু ও সত্যপালের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে জনসভায় ও'ডায়ারের হত্যাকান্ড, প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধিত্যাগ, রাওলাট আইন পাশ ও তার প্রতিবাদে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কীস্তান ছিল জার্মানীর পক্ষে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় ও জার্মানীর হার হলে ভারতের মুসলিমরা ইংরেজের (কারণ ইংরেজ ছিল যুদ্ধে মিত্রশক্তি) কাছে আবেদন করল

তুর্কীস্তানের ধর্মগুরুর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য। কিন্তু ইংরেজরা তাতে কর্ণপাত না করায় আজমল খান প্রমুখের নেতৃত্বে খলিফার গৌরব পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য শুরু হল খিলাফত আন্দোলন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যস্থাপনকল্পে এবং অসহযোগ আরও জোরদার হবার বিরাট দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গান্ধীজী ব্যষ্টিস্বার্থে খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করলেন। সতীনাথ ভাদুড়ী মধ্যবিত্তের আত্মসংকট, বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করলেন সমকালীন সমাজ রাজনীতি। ভিন্ন নীতিবোধ, হার-জিত, খারাপ-ভালো সব কিছু মিলিয়ে এক নতুন পরিবেশ প্রেক্ষাপট রচিত হল।

গান্ধীজীর এ সময়ের অসহযোগ আন্দোলন একেবারেই অহিংস ছিল। মূলত বিলাতী (দ্রব্য, খেতাব, স্কুল) বর্জন এবং স্বদেশী (দ্রব্য, শিক্ষা, চরকার ব্যবহার) গ্রহণ এবং পাশাপাশি অস্পৃশ্যতা বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদের প্রচেষ্টাই ছিল এ আন্দোলনে গান্ধীজীর মূল লক্ষ্য। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই অসহযোগ আন্দোলন জোরদার হল। ঘটল ঐতিহাসিক চৌরিচৌরা ঘটনা। পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন। ১৯২২ আন্দোলন তুঙ্গে। গান্ধীজীর মনে হল অহিংস আন্দোলন ক্রমশই সহিংস হয়ে যাচ্ছে, তাই গান্ধীজী তার আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এটাই প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন, এতে দেশের মানুষ কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি সম্পর্কে কিছুটা আস্থা পেল। মানুষ বুঝল ঔপনিবেশিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার মত প্রত্যয় তাদেরও আছে। মানুষ এই অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ এসব ব্যাধির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে পারছে, এটা একটা সামাজিক লাভ। গান্ধীজী মানুষের মনে এই বিশ্বাসটা আনতে পারছেন এবং জনমত গঠন করছেন।

মধ্যবর্তী সাতবছর সময়কালে গান্ধীজীর সহকর্মীরা গ্রামেগঞ্জে একেবারে তৃণমূল স্তরে সংগঠিত করছে মানুষকে। মদ্যপান বিরোধী প্রচার, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, স্ত্রীনির্যাতন রোধ তাদের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল।

১৯২৭ সাইমন কমিশন। উদ্দেশ্য ভারতীয় সংবিধানের সংস্কার। এই কমিশনে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল না। তাই বিক্ষোভ জানাল জাতীয় কংগ্রেস। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় লাঠির আঘাতে লালা লাজপত রায় আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনায় পুরো পাঞ্জাব উত্তাল হয়ে ওঠে। পুলিশ প্রধান স্যান্ডারসকে হত্যার অপরাধে ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়।

একই বছরে ১৯২৭, কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে দুটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাইমন কমিশন বয়কট ও খসড়া সংবিধান রচনা। এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণে মতিলাল নেহেরু খসড়া সংবিধান রচনা করেন। এর নাম নেহেরু রিপোর্ট। ১৯২৮-এ এটি কলকাতায় পেশ করা হল। তখন সাম্প্রদায়িক দলগুলি (হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লিগ, শিখ লিগ এবং আরোও অনেক) সবাই একে প্রত্যাখ্যান করে। ফলে এই সংবিধানের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হল না। কংগ্রেস তখন একটি

গণ আন্দোলনের ডাক দিল। ১৯২৯-এ কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে স্বরাজ নয়, পূর্ণ স্বরাজের দাবি, শুধু স্বাধীনতা নয়, পূর্ণ সার্বভৌমিকতার দাবি উঠল। ফলে ২৬ জানুয়ারি, ১৯৩০ স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন শুরু হল। এদিকে ইংল্যান্ডের ইলেকশনে লেবার পার্টি ক্ষমতায় এলে বড়লাট রাউলিং গোলটেবিল বৈঠকের ডাক দেয়। ১৯২৯, লর্ড লারবির প্রথম বৈঠকের প্রস্তাবে কোনো খসড়া চেহারা স্পষ্ট না থাকায় এখানের নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৩০ শুরু হল আইন অমান্য আন্দোলন। ভূমিরাজস্ব হ্রাস, বন্দিমুক্তিসহ এগারো দফা দাবির সনদ লর্ড আরউইনের কাছে পেশ করা হলে, ইংরেজরা তাকে পাত্তা না দেওয়ায় আইন অমান্যের ডাক পড়ল, যার প্রথম পদক্ষেপ লবণ সত্যাগ্রহ।

১৯৩০, ১২ মার্চ গান্ধীজী সবরমতী আশ্রম থেকে ৩২০ কিলোমিটার পথ হেঁটে ডান্ডিতে গিয়ে লবণ তৈরী করে সত্যাগ্রহ ভঙ্গ করেন। এই আন্দোলন সমস্ত দেশজুড়ে উদ্দীপনা তৈরি করে, সরকার নড়েচড়ে বসে। সাধারণের মনোবল কোনোমতেই ভাঙা যাচ্ছে না দেখে সরকার নমনীয় হল। ১৯৩২ দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও মূলত ইংরেজ সরকারের নীতির জন্য দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকও ব্যর্থ হয়। ১৯৩২-এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড আনলেন সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার মারাত্মক প্রস্তাব। এর বিরুদ্ধে গান্ধীজী আমরণ অনশনে বসেন। এর ফল পুণাচুক্তি। ১৯৩৩-৩৪ নাগাদ আন্দোলন করার মত তেমন কোনো issue না থাকায় গান্ধীজী মনোনিবেশ করেন অস্পৃশ্যতাদূরীকরণে। গান্ধীজীর মূল লক্ষ্য ক্ষমতাদখল নয়, অবকাশ মতই তিনি জায়গায় জায়গায় হরিজনদের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে হওয়া তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগ দিল না।

১৯৩৫ এল Govt. of India Act। এর আগে ভারত সরকারের যে আইন ছিল তার নাম ছিল মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইন। ১৯৩৫-এ তুষ্টিবিধানের প্রচেষ্টায় প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার ক্ষমতা বাড়ানো হল। কিন্তু একই সঙ্গে ছোটোলাট বা রাজ্যপালের হাতে যেকোনো সময়ে যেকোনো প্রস্তাব নাকচ করার ক্ষমতা দেওয়া হল। ফলত: অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজের হাতেই কুক্ষিগত রইল। নেহেরু, সুভাষ এমনকি কমিউনিস্টরাও এই আইন প্রত্যাহারের কথা বলেন এবং এরপর আসে নির্বাচনে না যাবার প্রস্তাব- অসহযোগ। কিন্তু সবাই এতে সহমত হয় না। ১৯৩৭-প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে কংগ্রেসের বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কংগ্রেস সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ভূমিরাজস্ব, বন্দিমুক্তির মত কিছু সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছিল। ক্রমে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই ভাঙন ধরে, একটি বিভেদ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এসময়ে কংগ্রেসের ভিতরে একটি দল শক্তিশালী হয়ে উঠছে, কংগ্রেস সোসালিস্ট, যারা বামপন্থী ভাবধারায় পুষ্ট, এদের সঙ্গে মতাদর্শগত মিলে এল কমিউনিস্টরা।

১৯৩৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। সুভাষ আগেই এই যুদ্ধসম্ভাবনার কথা বুঝেছিলেন। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি বিরোধে যেতে চলেছে বুঝে সুভাষচন্দ্র আন্দোলন জোরদার করার কথা বলেছিলেন, কারণ ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির মধ্যে ভাঙন ধরলেই তাদের বিরুদ্ধে লড়া সহজ। তবে এই সময় সুভাষ ও গান্ধীবাদীদের মতবিরোধ ঘটলে সুভাষ পদত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর ভারতকে স্বাধীনতাদেবার শর্তে অনিচ্ছুক ভারত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন। ইংরেজ বাধ্য হয়ে স্ট্রিপশ মিশন প্রস্তাব আনল ভারতের কাছে ইংরেজের অধীনে স্বায়ত্তশাসনের। ভারত এই প্রস্তাবে রাজী হয় নি। গান্ধীজী ডাক দিলেন অগষ্ট আন্দোলনের- ১৯৪২। কমিউনিস্টরা সর্বতোভাবে এর বিরোধিতা করল। কংগ্রেসের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতাদের পর জাতীয় নেতারা, ছাত্রসমাজ, সাধারণ মানুষ সবাই একে একে জড়িয়ে পড়তে লাগল। সরকারি সম্পত্তি লুঠ করে গরীবদের মধ্যে তা বিতরণ করা হতে লাগল। গান্ধীজী কারাবরণ করেন। এরপর ১৯৪৪-এ গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতাদের মুক্তির পর স্বাক্ষরিত হয় সিমলা চুক্তি ১৯৪৫।

কমিউনিস্ট, কংগ্রেস ও কংগ্রেস সোসালিস্টের মধ্যে বিরোধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তুঙ্গে উঠলে সতীনাথ ভাদুড়ী ব্যক্তিজীবনেও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সতীনাথ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাক্ষী থেকেছেন। ১৯৪২ অবধি সতীনাথ তিনবার কারারুদ্ধ হন। জেলে বসবাসকালে সতীনাথ বিহার তথা উত্তরভারতে সবথেকে গ্রহণযোগ্য বই 'রামচরিত মানস' পড়েন। আসলে সতীনাথ সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছুঁতে চেয়েছিলেন বলেই এমন একটা মাধ্যম খুঁজছিলেন যা সাধারণের কাছে সহজে বোধগম্য। স্বাধীনতা লাভের পর যেমন গান্ধীজী ছিলেন না, তেমনি সতীনাথও বেরিয়ে এলেন দল থেকে। রাজনীতি থেকে চিরকালের মত বিদায় নিয়ে ১৯৪৯-এ সতীনাথ ইউরোপ চলে যান। জীবনের শেষ বয়সে অত্যন্ত নি:সঙ্গ জীবন কাটান সতীনাথ। 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' সতীনাথ একজন মানুষের গল্পে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছেন অন্ত্যজ মানুষদের মধ্যে। সমকালীন সংকট, সতীনাথের জীবনের অভিজ্ঞতা মিলে লেখক দেখালেন বাইরের ইতিহাসের ধারা কিভাবে পাল্টে দিচ্ছে মানুষের জীবন, ব্যক্তিমানুষের কাহিনির মধ্যে চিরকালীন জীবনের tension একীকৃত হয়ে রয়েছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে, ঢোঁড়াই-এর জীবনবৃত্তে আসলে সতীনাথ দেখালেন অনার্য সভ্যতার উপর আর্যসভ্যতার বিস্তৃতি। ঢোঁড়াই-এর জন্মের সময় ১৯১০-এ দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর, ১৯১৩-তে হাওয়াগাড়ি, ১৯১৪ এ ইংরেজ-জার্মানের মক্ ফাইট, যুদ্ধের সময়

বস্ত্রসংকট, ঢোঁড়াই এর অসুস্থতার সময় আদমসুমারী, মাদকদ্রব্য বর্জনের ডাক, গান্ধীজীর আগমন এবং বিভিন্ন জায়গায় সভাসমিতি করা, লবণ সত্যাগ্রহ, ভলেন্টারি প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন, ভোট, সাধারণ মানুষদেরও যুদ্ধে যোগদান, অগষ্ট আন্দোলনের ডাক, গান্ধীজী ও তার সমর্থকদের আত্মসমর্পণের ডাকে সাড়া দিয়ে ঢোঁড়াই-এরও আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত ১৯৪৪-এ কাহিনির পরিসমাপ্তি। এর মধ্যে বোবা বৌকা বাওয়া , খোঁড়া চখুরী ,রামিয়ার বাবা, ফুলঝরিয়া ও পাক্কীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখিয়েছেন সতীনাথ ভাদুড়ী।

১৩৫৭ যুগান্তর পত্রিকার পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প 'অভিনেত্রী' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী শহর কলকাতার এক অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের প্রতিমুহূর্তের জীবন সংগ্রামের কাহিনি। এই পরিবারের বাচ্চা ছেলে বিন্তু, যার চলাফরার প্রতিবন্ধকতা আছে, সে আসলে অসুস্থ সময়েরই প্রতিবিম্ব।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ পাঁচের দশক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়র লেখা 'ফেরিওলা' (১৯৫৩) গল্পগ্রন্থের 'লেভেল ক্রসিং' গল্পের অবলা এবং 'লাজুকলতা' (১৯৫৪) গল্পগ্রন্থের 'মীমাংসা' গল্পের বিভা-দুজনই খোঁড়া। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের উত্তাল জীবনজিজ্ঞাসা, যাকে বলা যায় মানুষের identity crisis খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নায়কের দারিদ্রতা নায়িকাকে তথা নারীকে যথাযথ সম্পর্কের স্বীকৃতি জানাতে সাহস পায় না। স্বাধীন ভারতের যুবসমাজের অস্থিরতা মানিক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকাল স্বপ্নের স্বাধীনতা লাভের পর তা নিয়ে উল্লাসের সঙ্গে অব্যবহিত কিছু সমস্যার মুখোমুখি হল। যার নিট ফলশ্রুতি আর্থিক সঙ্কট, পারস্পরিক সম্পর্কহীনতা, নীতিহীনতা-সব কিছু মিলিয়ে মানুষজনের আত্মিক-সঙ্কট, এক তীব্র হতাশা ও নিরাসক্তি। নতুন রীতির গল্পরচনার ধারার সূত্রপাত ঘটার লগ্নে বিমল কর 'আঙুরলতা'য় বিকৃতরূপ প্রভুলাল সমাজ প্রেক্ষিতে অন্তর্লোকের উন্মোচন ঘটালেন অসাধারণ মুন্সিয়ানায়।

বিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্পটি পশুকেন্দ্রিক গল্প হলেও পঙ্গু চন্দ্রচৌধুরী চরিত্রে নবীন এবং প্রবীণের দ্বন্দ্ব সমকালীন যুগ পরিসরে তুলে ধরেছেন - লেখক। গল্পে সাঁওতালদের মাদলের শব্দ, বেবি অস্টিনের গর্জন পাঠকের সামনে এক ইতিহাসের ছবি তুলে ধরে।

সুবোধ ঘোষ 'শ্মশানচাঁপা' গল্পে এক প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যার চিত্রাঙ্কন করলেন। বিশ শতকের চার থেকে আটের দশকের সময় যখন মানুষের আত্ম-অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, অধিকার ছিনিয়ে নেবার পন্থা এবং স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের মধ্য দিয়ে বহুবর্ণরঞ্জিত এক সময়ের সাক্ষ্যবহন করে সেই

সময়কালের লেখক সুবোধ ঘোষ ‘শ্মশানচাঁপা’ গল্পে জীবন-মৃত্যুর ধ্রুবসত্যের দোদুল্যমানতায় ভিন্ন জগতের ছবি প্রতিস্থাপিত করলেন। পাগল ঘাটবাবু চরিত্রটির জীবনের খন্ডসীমা পেরিয়ে মরণের ওপারে সুখী জীবনের কল্পনায় মৃত্যুর আশায় দিন যাপনের মারাত্মক সত্য ছবি অঙ্কন করলেন। সুবোধ ঘোষ নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত বা বলা যায়, প্রায় সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধি ঘাটবাবুর মাধ্যমে সমস্ত শ্রেণীসংঘর্ষ, রাজনৈতিক প্রভাব, ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া অর্থনীতি সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে মানবিকতাবোধের জয়গান করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়, চোরাকারবার-কালোবাজারী-মুদ্রাস্ফীতিতে-ভন্ডামি এবং প্রতারণায় যে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতায় যে নিজেকে ছাড়া বাকি সব কিছুই বাঁকা চোখে দেখে তার নির্মম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সুবোধ ঘোষের ‘শ্মশানচাঁপা’ গল্পে।

কমলকুমার মজুমদারের পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে লেখা ‘মতিলাল পাদরি’ গল্পটিতে বাংলাদেশ ও বিহার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এক সাঁওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চলে দীক্ষিত খৃষ্টান মতিলাল পাদরির গির্জাঘর তৈরি এবং সেখানে আদিবাসী, প্রান্তীয় মানুষজনদের আশ্রয়লাভ ,বদনচাঁদ মনে করায় ইতিহাসের ঘটনা। দেশজ জমিদার ও শিক্ষিত মানুষজনদের অবহেলার শিকার আদিবাসীরা চিরকালই আশ্রয় পেয়েছে মিশনগুলিতেই।

ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ভাষা তামিল। তামিল সাহিত্যে রামকথার এক ভিন্নতর দার্শনিক তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয়েছে খ্রিষ্টীয় ১১ শতকের মহাকবি কম্বন রচিত ‘কম্বারামায়ণ’-এ। গবেষণা অভিসন্দর্ভের অভিমুখ্য চরিত্র কথাসাহিত্যের প্রতিবন্ধী চরিত্র আলোচনা সাপেক্ষে তামিল সাহিত্য থেকে জয়কান্তন দন্ডপাণির ‘কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা’ গল্পটি আলোচনা করা হয়েছে Protagonist শ্মশানকর্মী ক্ষ্যাপা চরিত্র আলোচনা সাপেক্ষে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এই কাহিনিতে বাংলার প্রতিবেশী তামিল সাহিত্য-সমাজ প্রেক্ষিত ও খুব বেশি আলাদা কোনো সময়কালের কথা বলেনি। পাগল ক্ষ্যাপা চরিত্রে ‘ম্যাজিক রিয়েলিটি’, ‘হ্যালুশিনেশন’-এর রূপায়ণে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুপ্রবেশ যেমন রয়েছে, তেমনি উঠে এসেছে সমাজের উপেক্ষিত মানুষরা। শ্মশানকর্মীর অন্তর্বেদনা অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে জয়কান্তনের লেখনীতে।

রূপদর্শী ছদ্মনামে বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় গৌরকিশোর ঘোষের রচনাগুলিতে সময়ের চিত্র ছবির মত স্পষ্ট। জীবনের বহুবিচিত্র গতিপথে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, হোটেলের বেয়ারা, মেয়েদের নাচের দলের ম্যানেজার, মাস্টারি, সীমান্তে শুল্ক আদায়ের কেরানীবৃত্তি করে ১৯৫৩ তে যোগ দেন ‘সত্যযুগ’ কাগজে সাংবাদিকতার পেশা নিয়ে। আলোচ্য উপন্যাস ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’-র ভূমিকায় ঔপন্যাসিক নিজেই বলেছেন,-

‘‘জল পড়ে পাতা নড়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হলেও, এটা আমার ‘‘দেশ ও মাটি মানুষ’’

নামক এপিক উপন্যাসের প্রথম খন্ড। এই উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯২২ থেকে ১৯২৬। রচনাকাল ১৯৫৯।''[১৪]

এই সময় পরিসরে হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ বাংলার প্রেক্ষিতে পরিকেন্দ্রীক জটিলতা, ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতি, পরিবারে নারীর অবস্থান, নারীর অন্দরমহল, পুরুষের বহুগামিতা, নগরসংস্কৃতির প্রতি পুরুষের তীব্র আকর্ষণ, বারবণিতাদের প্রবলভাবে উপস্থিতি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসহায়তা, নারীদের কুসংস্কার এবং রীতি-নীতি এসব কিছুর ছবি এবং ভয়ঙ্করতার ফলাফল গিরিবালার উন্মাদগ্রস্ত ছোটকাকীমা অসাধারণ মুন্সিয়ানায় চিত্রিত হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রচিত ড. নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' উপন্যাসটি একই সঙ্গে মানুষের মনের অন্ধ কিছু বিশ্বাস এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের সংঘাত। ইংরেজ আগমনের সাথে সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বার উন্মাচিত হয় মানুষের সামনে। সুদীর্ঘ প্রায় ২০০ বছর রাজত্ব করার পর ইংরেজ বিদায় হয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলেও মানুষের মন তখনও বেশ কিছু ক্ষেত্রে অন্ধ গোঁড়ামি-তেই ডুবে ছিল, একজন চিকিৎসকের দৃষ্টিতে এক ভিন্নধারার রচনার নাম 'উল্কা'। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র 'অরুণাংশু'র বিকৃতরূপ মানুষের বিকৃত মানসিকতারই পরিচায়ক। লেখক জীবনযুদ্ধ একই উপন্যাসে অরুণাংশুর পাশাপাশি ফুটপাতবাসী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বিকৃতরূপী মানুষটির চিত্রও তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী কলকাতার নাগরিক জীবন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এখানে।

উনবিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশক অনেকটাই পাল্টে গেল। ১৯৫৯-এ খাদ্য আন্দোলন। গোটা দশক ব্যাপী চলা উদ্বাস্তু কলোনীর পুনর্বাসন ও স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন। ১৯৬২ ও ১৯৬৭ এর দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করায় মিলিজুলি সরকার গঠনে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। ১৯৬২ ও ১৯৬৫ তে চীন-এর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার প্রভাবে ভারতের অর্থনীতির কাঠামোয় অস্থিরতা এল। ভারত থেকে বাংলার রাজনীতির দিকে চোখ ফেরালে দেখব সেখানেও ১৯৬৫-তে বাংলা-কংগ্রেস স্থপয়িতা অজয় মুখার্জী বামবিরোধী পক্ষে যোগদান করে ১৯৬৭-এর নির্বাচন জিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেন। ১৯৬৮ তে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবার পর ১৯৬৯ মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার জয়ী হল। কিন্তু মতাদর্শগত বিরোধের ফলে কমিউনিস্ট পার্টি দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল- সি. পি. আই ও সি. পি. আই (এম)।

১৯৫৪, ১৬ ফেব্রুয়ারি শিক্ষকরা বেতন ও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দাবিতে এক মিছিল করেছিলেন। যা শেষপর্যন্ত গণবিক্ষোভে পরিণত হয়েছিল। পুলিশের লাঠিচার্জে সাতজনের মৃত্যু হয়। বহু শিক্ষক গ্রেপ্তার বরণ করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হলে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এ আন্দোলনের সব দাবি শেষ অবধি পূরণ হয়নি। শিক্ষক সমাজের অসহায় দারিদ্র্যের ছবি

রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘সামনে চামেলি’ গল্পে। গল্পে কথক তথা কেন্দ্রিয় চরিত্র এক প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। সেই চাকরির বেতনে তার পক্ষে সংসার চালানো কষ্টসাধ্য। তাইজন্য তার খোঁড়া পা নিয়ে ক্র্যাচে ভর করে সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে আরও অতিরিক্ত উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়। এ সময়ে শুধু আর্থিক নয়, সামাজিক অবস্থানগত দিক থেকেও শিক্ষকদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। স্কুলের বাচ্চারাও মাস্টারমশাই-এর অসহায়তা নিয়ে আলোচনা করে। এখানে শিশুদের মানবিকতার পাশাপাশি ফুটে উঠেছে নির্মম সমাজ-অর্থনীতির দুরাবস্থা-সংকটকালের চিত্র। উত্তাল ষাটের দশকের জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘সামনে চামেলি’র কথক চরিত্র স্বাধীনতা পরবর্তী সমস্ত আন্দোলন-বিদ্রোহ-ধর্মঘ-টের শিকার এক অসহায় মানুষের প্রতিরূপ।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য আলোচনার প্রেক্ষিত শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের সমাজপ্রেক্ষিতে বিবেচ্য, সেই কারণে প্রতিবেশী সাহিত্যের গল্প ফণীশ্বরনাথ রেণুর ‘জ্বলবা’ অভিসন্দ-র্ভে আলোচিত। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের তুলনামূলক ছবির সাথে এখানে মর্মস্পর্শী হয়েছে একজন রাজনৈতিক কর্মী, যিনি নারী এবং সংখ্যালঘু রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনি যখন ক্ষমতাসীন দলের বিপক্ষমতাদর্শের মানুষ হন, তখন তার কি ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে, তারই প্রতিচ্ছবি ফাতিমাদির জীবনালেখ্য।

‘‘ইতিহাস আমাদের জানায়- ৩১ আগষ্ট ১৯৫৯-এ খাদ্য আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশি অভিযানের নির্মমতার কথা।

‘‘সোমবার প্রধানত কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির পূর্বঘোষিত খাদ্য আ
ন্দোলনকারীদের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানকে কেন্দ্র করে রাজভবনের দক্ষিণ পূর্ব পার্শ্বে ওল্ড কোর্ট
হাউস
স্ট্রীটের মুখে এক হাঙ্গামাজনিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।পুলিশ অশান্ত বিক্ষোভমুখীন আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকবার লাঠি চালনা করে এবং অন্যূন ১০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। অপরদিকে উত্তেজিত জনতার একাংশ পুলিশকে লক্ষ্য করিয়া ইট পাটকেল বর্ষণ করে, কয়েকটি হাত বোমাও সশব্দে বিস্ফারিত হয়।.....
সম্মুখের দিকে যখন পুলিশের লাঠিচালনা ও কাঁদুনে গ্যাস ছাড়া হইতে থাকে তখন কার্জন পার্ক এবং এসপ্ল্যানেড ইস্টের দিকে জনতার মধ্যে থেকে হাতবোমা বিস্ফোরিত হয়। ঐ অঞ্চলের বিপুল জনতা ভীতবিহ্বল হইয়া অন্ধকারের মধ্যে পলায়ন করিতে থাকে। এর ফলে যে হুড়োহুড়ির সৃষ্টি হয় তাতে জনতার পদতলে পিষ্ট হয়ে অনেকে আহত হয়।.....
উপরোক্ত ঘটনার পর পুলিশ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া বহুসংখ্যক বিক্ষোভকারী মিশন রো এক্সটেনসন, সেন্ট্রাল আভিনিউ, ম্যাডন স্ট্রিট, ধর্মতলা স্ট্রিটের চাঁদনী চকের নিকটবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।কয়েকস্থানে বিক্ষোভকারীরা রাস্তার বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে দেয়, বাস ঘেরাও করার

চেষ্টা করে এবং দুটি একটি স্থানে পুলিশের গাড়ির উপর ইট ছোঁড়ার চেষ্টা করে। পুলিশের বিভিন্ন দল ঐ সমস্ত এলাকায় বিক্ষোভকারীদের তাড়া করে, কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চালায়। এই উপলক্ষ্যে অধিক রাত্রি পর্যন্ত গ্রেপ্তার চলে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং দুই একটি আলো নিভে যাওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকার নাগরিকদের মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।.....

খাদ্য অভিযানকারীদের বাধা দেবার জন্য ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে প্রচুর পুলিশ-বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পূর্ব হইতে ঠিক ছিল অভিযানকারীরা পাঁচটি পথে শোভাযাত্রা পরিচালনা করবে। কিন্তু পরে ওল্ড কোর্ট হাউস থেকে রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখ অগ্রসর হয়। ঐ স্থানে অভিযোগকারীদের মধ্যে থেকে দুইটি দল পুলিশ বেষ্টনী অতিক্রম করে গ্রেপ্তার হয়। এদের নেতৃত্ব দেন শ্রী অমর বসু ও মোহিত মৈত্র।

তাঁরাও আহত হন। এরপরই মিছিলকারীরা বেষ্টনী অতিক্রম করার জন্য প্রবল চাপ দেয়। এই চাপ প্রতিরোধের জন্য পুলিশ লাঠি চালায়।''

(রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান সম্পর্কে কলিকাতায় হাঙ্গামা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯। Food Movement of 1959, Documenting A Turning Point in the History of West Bengal, ed. by Suranjan Das & Premansu Kumar Bandopadhyay, Dept. of History, University of Calcutta, Monograph 24, K P Bagchi & Company, Kolkata, 2004)

৩১ আগস্ট, ১৯৫৯-এর এই ঘটনার প্রতিবাদে বামপন্থী ছাত্রসংগঠন পরদিন, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। দুপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীট চত্বরে ছাত্ররা জমায়েত হয়। তারপর বিশাল মিছিল বেরোয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির সামনে পুলিশ বাহিনী ছাত্র মিছিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের গুলি চালানোর খবর ছড়িয়ে পড়লে সন্ধ্যা থেকেই শহরের বহু এলাকায় জনতা পুলিশে খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯-এ অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়,

''Many Schools and College students responded to the Strike and assembled at University Campus, College Street. This was followed by a procession towards Mr. B. C. Roy's house which the people sought to stop by lathicharge. Clearly, peaceful demonstrators were given chase by the Police, making students fall in to confusion. After some time the students came back throwing stones and soda-water bottles. They even picked up smoking gas shells and through them back at the Police. Students further pulled out hand-carts from shades and use them as barricades to keep off Police vehicles. A brief reprive came in the trouble with heavy down pour in the evening. One that subsided, the disturbance resume. Pitched battles took place near Subod Mullick Square area. Scene of disturbance soon shifted to University Campus, College Street, were students responded to lathis and teargas with bricks and other missiles....

Turbans and batons were snatched from Police men and lit into a bonfire ..... ambulance vans were set alight after dusk....

The opposition leader Mr. Jyoti Basu hailed the movement as a "mighty people's up surge". The C.M., Dr. B. C. Roy on the other hand denounced it as being under the control of the goondas and approved imposition of Section 144 in the city.``

(Amrita Bazar Patrika, 2 September 1959, দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ)''[১৫]

সাতের দশক মূলত 'মুক্তির দশক' রূপেই চিহ্নিত। ১৯৬৭ থেকে নকশালবাড়ি এলাকাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সাতের দশকে তা আঞ্চলিকতার গন্ডী অতিক্রম করে বিস্তার লাভ করে। দেশীয় রাজনীতিতে ১৯৬৭ ইন্দিরা গান্ধীর আমলে আর্থিক মন্দা মোকাবিলায় ইন্দিরা সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল। ১৯৭২-এর মাঝামাঝি চারু সরকারের মৃত্যুতে নকশাল আন্দোলন হঠাৎ স্তিমিত হয়ে যায়। ১৯৭৫ এর দেশব্যাপী জরুরী বাংলার অবস্থা পঙ্গুপ্রায় ১৯৭৭ থেকে বামপন্থী শাসনব্যবস্থার আগে দশবছরে বাংলা চারটি নির্বাচন দেখে নিয়েছে। তার আগে অপারেশন বর্গা, বেনামে থাকা সমস্ত জমি উদ্ধার করে বন্টন করে দেওয়ার পর নতুন জরীপ ব্যবস্থা গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা পরিবর্তনের আঁচ এনেছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সাথে সাথে গ্রামবাংলা পরিচিত হল বিদ্যুৎ এবং বৈদ্যুতিন যন্ত্রব্যবস্থার সঙ্গে।

বিমল করের ছোটগল্প 'জননী'র রচনাকাল ১৯৬২। গল্পটিতে যে মাতৃমূর্তি বিনির্মাণের কাহিনি রচনা করলেন বিমল কর ,তার আসল প্রেক্ষাপট আসলে ষাট ও সত্তরের দশকের কৃষক আন্দোলনের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ নকশাল আন্দোলনের আবেগহীন কঠোর বাস্তবের রুক্ষভূমি। দীনেন্দ্র ও শচীনবাবুর নাতনি তার রূপায়ক ।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু' (১৯৬০) গল্পে নিত্যচরণ চরিত্রে স্বাধীনতা পরবর্তী দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, নারীর ইজ্জত রক্ষা, দারিদ্র্য, অর্থলিপ্সায় যুবসমাজের বিপথগমন এবং সর্বোপরি সমালোচনামুখর সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে। দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে মণীন্দ্রনাথ ভৌমিকের উন্মাদগ্রস্ততায় ব্যক্ত হয়েছে দেশভাগের অসহ্য যন্ত্রণার কথা। একই যন্ত্রণার ছবি আছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'গাছ' ছোটগল্পে বোবা গঙ্গামণির স্বামীকে ছেড়ে চলো আসয়।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'জলবা' গল্পের অ্যাসিড আক্রান্ত ফাতিমাদি স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশভাগের পরও পাকিস্তান যাননি, থেকে গেছিলেন বাংলায়-ভারতবর্ষে। দেশভাগ রাজনৈতিকদের কাছে অন্য মানে রাখলেও সাধারণ মানুষের কাছে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হওয়া, চেনা প্রতিবেশীদের উষ্ণসান্নিধ্য ত্যাগ করা, স্বজন-বন্ধুর চোখেও জাতিগত কারণে সন্দিহান হয়ে পড়া ছাড়া

আর কিছুই নয়। উর্দু লেখক সাদাত হোসেন মান্টোর ব্যক্তিজীবনও এই দেশভাগের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছিল। এই রুধিরাসিক্ত প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর ছোটগল্প 'টোবা টেক সিং'-এর পাগল বিশন সিং যেন মান্টোরই প্রতিরূপ, যার একটাই জিজ্ঞাসা, দেশভাগ তো হল, কিন্তু দেশের কোন ভাগটা আমার।

স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে সেখ আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে রচিত শওকত ওসমানের রূপক-উপন্যাস 'ক্রিতদাসের হাসি'-ও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র বিদূষক তাতারী সাময়িকভাবে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পড়ে প্রতিবাদ স্বরূপ।

স্বাধীনতার তিরিশ বছর পর ১৯৭৭-এর প্রথমদিকে প্রবল জনরোষের চাপে আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়া হল এবং সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের একদলীয় শাসনব্যবস্থার পরাজয় সূচিত হয়ে অনেকগুলি দল ও মত মিলে জনতা দলের সূচনা হল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পটপরিবর্তনের সঙ্গে বাংলার মন্ত্রীসভাতেও পরিবর্তন সূচিত হল-শুরু হল বামপন্থী জমানা। সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, মিশ্র অর্থনীতির ব্যর্থতায় সাধারণ মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হয়েছে আর্থিক সংকটকে, যা জনমানসে তীব্র বেদনার দাহ সৃষ্টি করেছিল। সুবিধাবাদী ধূর্ত রাষ্ট্রনীতির প্রভাবে সাহিত্যে উঠে আসতে থাকে আত্মমগ্নতা, ক্লেদাক্ত যৌনতা, হতাশা, বিকারগ্রস্ততা; আবার এসব কিছু থেকে পালিয়ে গিয়ে লেখক আশ্রয় খুঁজেছেন মিথ-পুরাণ-উপকথার ঐতিহ্যে। এই বঞ্চনা-অবজ্ঞার আরেক প্রতিনিধিত্বকারী আদিবাসীদের নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে থাকল এই সময়। এই পটভূমিকায় লেখা মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে সময়চেতনা, আদিবাসীদের চিরবঞ্চিতের ব্যথাবেদনা নিদারুণভাবে ফুটে উঠল শিবন মেথরের উন্মাদগ্রস্ত প্রলাপে। এই কালপর্ব নির্দেশক অন্যান্য কয়েকটি উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে দেবেশ রায়ের 'মাটি মানুষ খুন করে', অসীম রায়ের 'আবহমান', সমরেশ বসুর 'টানাপোড়েন'-এর নাম। ১৯৭৮-এ আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে পঁচিশ বছরের বীরসার নির্মম মৃত্যুর মধ্যে সমকালীন রাজনীতিতে ঐতিহাসিক বীরসার কাহিনি তুলে ধরলেন। সত্তরের দশকের ভূমিসংস্কার কেন্দ্রিক আন্দোলনের একটা ধারা আদিবাসী আন্দোলন মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার'এ পাই।

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক বেতার জগতে। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯৭৯-এ মহাশ্বেতা দেবী গ্রন্থটির জন্য 'একাদেমি পুরস্কারে' ভূষিতা হন। উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৭৫ হলেও আসলে উপন্যাসটি রচিত ১৮৯৫-১৯০০ সাঁওতাল বিদ্রোহের রক্তাক্ত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের

ইতিহাসে আদিবাসীদের বিদ্রোহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা, বিহার, ওড়িশায় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-বিস্তারের সময়কাল থেকেই মুন্ডাদের বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ক্যামাক পার্লামেন্টের শাসনকর্তা হিসাবে কাজ শুরু করে প্রথমেই ছোটনাগপুর অঞ্চলে খুঁটকাট্টি জমিদারী প্রথার বিলোপের পরিবর্তে নতুন জমিদারিতন্ত্র স্থাপন করলেন। এই বহিরাগত জমিদাররা ইংরেজ প্রভুদের সুনজরে থাকার প্রচেষ্টায় আদিবাসী প্রজাদের উপর বিভিন্ন করের বোঝা দিনে দিনে বাড়িয়ে চলতে থাকেন। এই অত্যাচারের মাত্রা দিনের পর দিন বাড়তে থাকায় শেষে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মুন্ডারা ছোটনাগপুর অঞ্চলের তামার নামক গ্রামে শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেই বিদ্রোহ ইংরেজ দমন করলেও আদিবাসী মুন্ডাদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন চাপা পড়ে রইল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ছোটনাগপুরের জমিদার দেওনাথ সাহির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গোবিন্দনাথ শাহিকে ইংরেজ সরকার সেই আসনে বসান। কিন্তু ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারের অনুমতি ছাড়া ইংরেজ সরকার জমিদারীতে থানাদার এবং চৌকিদারকে বসালে গোবিন্দনাথ শাহি ইংরেজের দুরভিসন্ধির আঁচ করে মুন্ডাদের সঙ্গে গোপনে সংযোগ স্থাপন করেন। এ খবর ব্রিটিশের গোচরে আসায় ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দশাহিকে সিংহাসনচ্যুত করে ইংরেজ সরকার মাত্র ১৯ বছরের একটি ছেলেকে জমিদার করেছিলেন। এই জমিদার বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বহুমূল্য উপহারের বিনিময়ে জমি দান করতেন। প্রতিবাদে আদিবাসী প্রজাদের ভয়ঙ্কর শাস্তির সম্মুখীন হতে হত। দীর্ঘদিন ন্যায্য জমি বঞ্চিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রাগদেও বারুদান ওরফে রুদু এবং কোন্তা ওরফে কান্ত নামক দুই মুন্ডার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। এ বিদ্রোহ দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজ কারাগারে তাদের মৃত্যুর মাধ্যমে দমন করা গেলেও ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মুন্ডা বিদ্রোহের আগুন আবার নতুন করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই আগুন থেকে বাঁচতে সেরঘাট্টি আদালত ঘোষণা করেছিল যে আদিবাসীরা লুঠতরাজ বন্ধ করলে তাদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বিদ্রোহীরা একজনও বিদেশীকে এই বিদ্রোহ থেকে বাদ দিল না। সামান্য তীর ধনুক এবং কুড়ুল নিয়েই তারা ইংরেজের অস্ত্রশক্তিকে পরাহত করেছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীতে ক্যাপ্টেন ইমপের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল এই বিদ্রোহের কাছে। শেষে ১৮৩২-এর মার্চে ক্যাপ্টেন টমাস উইকিন্‌সন কূটকৌশলে মুন্ডাদের শান্ত করে বিদ্রোহ দমন করেছিল। এরপর ১৮৩৩-এর গোড়ার দিকে বিহারের মানভূম ও ধলভূমে গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল ভূমিজ বিদ্রোহ। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুন্ডারা খ্রীষ্টান মিশনে যোগদানের ফলে দীর্ঘদিনের অত্যাচারের পর তারা স্বজাত্যবোধ ফিরে পাবার দিকে এগোতে থাকে। ফলে ভীতসন্ত্রস্ত জমিদাররা এবার খ্রীষ্টান মিশনারীগুলো আক্রমণ করতে থাকে। ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাই ব্যাপকহারে রাঁচিতে জার্মান গির্জা ও খ্রীষ্টান মিশনারীগুলির উপর আক্রমণের ঘটনা রয়েছে। এরপর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সর্দার বিদ্রোহ ইংরেজ পুলিশ-বাহিনীর বিশেষ সতর্কতায় খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে না পারলেও

১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দের কৃষি আন্দোলন মুন্ডাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে এক প্রশান্তি এনে দিয়েছিল, যা ইংরেজদের মনে মুন্ডা বিদ্রোহ আর না হওয়ার আশা ও স্বস্তি সঞ্চার করেছিল। কিন্তু অচিরেই ইংরেজদের সে আশা নিরাশায় পরিণত হয়ে ১৮৯৫, জুলাই-আগষ্টে পঁচিশ বছরের যুবক বীরসার নেতৃত্বে আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। দীর্ঘ পাঁচবছর ধরে সংঘটিত এই আগুনে 'ধরতি আবা' বীরসা মুন্ডাদের শিখিয়েছিল নিজেদের অধিকার আদায়ের মন্ত্র। ব্রিটিশ কারাগারের অত্যাচারে বীরসার মৃত্যুতে এ বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটলেও ১৯২৯-এর তিন আইন এবং পাঁচ আইন জায়গীরদার ও ঠিকাদারদের হাত থেকে মুন্ডাদের রক্ষাকবচ হয়েছিল, বীরসার বিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকার এই আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়েছিলেন। আদিবাসী বিদ্রোহের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের ভিত্তিভূমিতে রচিত মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার'। আর উপন্যাসের চরিত্র শিবন মেথরের উন্মাদগ্রস্ততায় লেখিকা এই সত্যোচ্চারণ করিয়েছিলেন।

১৯৭১-এর পশ্চিমবঙ্গে ঘোষিত জরুরি অবস্থা এবং তার সাথে বাংলাদেশে ঘোষিত মুক্তিযুদ্ধ বাংলার সাহিত্যে প্রভাব ফেলতে থাকে। ১৯৭২ থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়ে জায়গায় জায়গায় নতুন নতুন সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে।

সমরেশ বসু (প্রকৃত নাম-সুরথ বসু) এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ হিসাবে জীবনরক্ষার তাগিদে ফেরিওয়ালা, ডিমবিক্রেতা, জুটমিলের কর্মচারী এরকম বহুবিধ পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার সমসময়ে নকশাল আন্দোলনের অনেক অন্তর্গূঢ় রূপ নিয়ে লিখলেন সমরেশ বসু উপন্যাস 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৭)। গান্ধীবাদকে পাশে রেখে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নতুন ধারায় বিবর্তমান দেশীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘূর্ণাবর্তের জীবন্ত রূপ উপন্যাসটি। ষাটের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে থাকা নকশালবাড়ি, খৈরিবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, বিজনবাড়ির মত প্রসিদ্ধ আঞ্চলিক স্থানগুলির নাম উঠে এসেছে উপন্যাসটিতে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক পরিমন্ডলের সাথে আরেকটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তা হল ১৯৭৭-এ সারা দেশব্যাপী ব্যাপকহারে কুষ্ঠ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে প্রচার। সমরেশ বসু পরপর দুটি উপন্যাসে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষের একাকীত্বের যন্ত্রণা এবং উত্তরণের কাহিনি দেখালেন যথাক্রমে রুহিতন কুরমি 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৭) ও শাম্ব 'শাম্ব' (১৯৭৮)।বামপন্থা রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লেখা 'শাম্ব' (১৯৮০ সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত) উপন্যাসে লেখক নারদ মুনির ষড়যন্ত্রে শাম্বর সুস্থ জীবন লন্ডভন্ড হয়ে যাওয়া দেখালেন। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব নারদমুনির চক্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসে সূর্যোপাসনায় রোগমুক্ত হলেন, সমসাময়িক সময়কালে সমরেশ বসুর এ রচনা বিশেষত্বের দাবিদার।

স্কুলে পড়াকালীনই ছাত্র-নীতিতে যোগদান করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হলেন। দেশ-সমাজ-রাজনীতির সমস্ত উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় সংগ্রামী চেতনার বলিষ্ঠরূপ প্রতিষ্ঠিত। বিংশ শতাব্দীর আটের দশকে বিশ্বায়নের সময়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ উপন্যাস 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পেরিয়ে সম্মিলিত শক্তিতে অনগ্রসর মানুষদের প্রতিষ্ঠা পাবার ছবি দেখিয়েছেন। যদিও দলের সাথে মতানৈক্য হওয়ায় ১৯৮১ সালে পার্টির সদস্যপদ থেকে সুভাষ ইস্তফা দেন। তারপর বামপন্থা ত্যাগ করে দক্ষিণপন্থা সমর্থনকারী হিসাবে তিনি সমকালের সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব হয়ে পড়েন। ১৯৮৩-এ তাঁর উপন্যাস 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ'- এ তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষদের সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার কথা বললেন। কমিউনিস্টবাদীরা সোভিয়েতকে যেমন ধনতান্ত্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চেয়েছিল, কমিউনিস্টবাদী সুভাষের কলমেও যেন উঠে এল 'নবজীবনগড়' অন্তরীপ রূপে সভ্যসংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা।

আটের দশক থেকে মোটামুটিভাবে স্থিতিশীলতায় আসতে থাকে। বাংলায় নয়ের দশকে শুরু হয় নারীবাদের, আসতে থাকে বিজ্ঞাপন। আবার নতুন করে অন্য অবমূল্যায়ণের সম্মুখীন হল বাংলা। মানবিক এর থেকে অনেকবেশি স্বনির্ভর হয়ে পড়তে থাকল সমাজ।

১৯৮৪-২০০০ পর্যন্ত দেশের সর্বত্র এক ভয়ঙ্কর অশান্তির ঝড় বয়ে গেল। শিখ জঙ্গী সম্প্রদায়ের উত্থান, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দেহরক্ষীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু, বাবরি মসজিদ ধ্বংসকান্ডে এসবের সাথে ভোটরাজনীতি এবং পঞ্চায়েতী রাজের জোরজুলুম খুনোখুনিতে বিভীষিকাময় অন্ধকারযুগের সাক্ষ্যবহন করেছে এই সময়।

বিশ্বায়নের যুগে প্রজন্মগত ব্যবধান পরিবারে কি ভয়ানক রূপ বিভেদ সৃষ্টি করে, ভাঙন ধরায় তার উদাহরণ ১৯৯২-এ অনুষ্টুপ পত্রিকায় প্রকাশিত সাধন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প 'স্টীলের চঞ্চু'র রুণু ও রঞ্জনা।বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ভাই-বোন রুণু-রঞ্জনার গল্প সাধন চট্টোপাধ্যায়র 'স্টীলের চঞ্চু' ১৯৯২-এ অনুষ্টুপ পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও গল্পের সময়কাল তার বেশ কিছুটা আগে-পরে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গল্পসংগ্রহ'-এ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকথা থেকে আমরা জানতে পারি ১৯৬৬-এর খাদ্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে হঠাৎই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত। এরপর বিভিন্ন রাজনৈতিক বাঁক-বদলের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে জীবনকে দেখেছিলেন সাধন চট্টোপাধ্যায়। চারের দশকের অতিবামপন্থা বুদ্ধিজীবীর থেকে জনসংযুক্তিকরণের পথে অগ্রসর হয়েছিল, পরবর্তীকালে সাত ও আ-টের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের শেষে এক রাজনৈতিক মোহ মুক্ত বামপন্থা আদর্শবাদের সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় মানুষের মধ্যে। এই প্রজন্মগত ব্যবধান প্রতিফলিত হয়েছে 'স্টীলের চঞ্চু' গল্পে। রুণুর বাবা ভূপতিবাবুও স্বাধীনতা ও দেশভাগের মধ্য দিয়ে যৌবন কাটিয়ে কলেজ শে-

ষে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর সংসার এবং চাকরির প্রয়োজনটা সব কিছুর থেকে বড় হয়ে উঠেছিল। তারই সন্তান রুণু ও রঞ্জনা, ভবিষ্যৎ সম্প্রদায় কঠোর বিশ্বাসহীন সন্দিগ্ধ বাস্তবে দাঁড়িয়ে পূর্ববর্তী প্রজন্মকেও দোষারোপ করতে ছাড়ে না।

বাণী বসুর উপন্যাস 'অমৃতা' (২০০১) বইটির ফ্ল্যাপে লেখা-

''অমৃতা ও তার বন্ধুরা। ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, পুরনো রীতি আর নতুন প্রয়োজনের মাঝখানে প্রাণপণে ধরে আছে হাত। সেই কেউ গতানুগতিকের থেকে ছিটকে গেছে ভিন্ন বৃত্তির টানে। কেউ চাকরি করছে, কেউ চাকরি খুঁজছে, কেউ ভাবছে খুঁজবে। কারও বিয়ে হয়েছে, কেউ বিয়ে করছে, কেউ বিয়ে করবে। এক সময়ের সৌদামিনী-মৃণালিনী বা তার পরেকার নমিতা রমলাদের থেকে কি আলাদা ওদের জীবন? যদি বা আলাদা হয়, আলাদা কিসে? এ স্বাতন্ত্র কি প্রকরণের, না পরিস্থিতির, না চরিত্রের? কোথায় এর আধুনিকতা? সবটাই কি আদৌ আধুনিক? উত্তর আধুনিক? না যুগ-যুগান্তের সামান্য সূত্রও কিছুয় আছে তাতে? অমৃতা আর ওর বন্ধুরা কি আগের থেকে বিপন্ন? কেউ কেউ তুলোর বাক্সে আঙুরের মত নিরাপদ, কেউ কেউ দৃঢ়চেতা আবার কারও কারও স্বাবলম্বন নেতৃত্বই নিরুপায়ের। তবু যখন ঝড় আসে, ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় কাঁপিয়ে দিয়ে যায় পায়ের তলার মাটি তখন আত্মসচেতনতা ও সমর্পণের কী অনুপাত ব্যবহৃত হয় তাদের জীবনে? মননে? চারিত্রে? জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে জীবনগ্রন্থি। এই দুর্বোধ্য জটিলতার মোকাবিলা কীভাবে করে ওরা?''

একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নের এই ভয়ঙ্কর দ্বিধাদ্বন্দ্ব-একদিকে বাড়ির মেয়েকে শিক্ষিত করা, কিন্তু তবুও বিবাহই যেন ভবিতব্য, আরেকদিকে চাকুরীরতা শাশুড়ীর পুত্রবধূকে বাড়ির ঝিয়ের মত খাটানো, আবার কিনা যে শাশুড়ী নিজে স্কুলটিচার এবং বউমা অমৃতা স্নাতকোত্তর পাঠরতা,- শিক্ষিত শ্রেণীর ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে অমানবিক সমাজরূপ অসাধারণ মুন্সীয়ানায় ফুটে উঠেছে বাণী বসুর 'অমৃতা' উপন্যাসে। জয়িতা বাগচী নিজে গাড়ি চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন, তার দাপুটে ব্যক্তিত্বে বিভাগীয় প্রধানা হিসাবে নিজের যোগ্যতার পরিচয় রাখেন, কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর গভীর অসুখে এই উচ্চশিক্ষিতা নারীও বাড়িতে উচ্চশিক্ষিত কলেজের অধ্যাপক বর দ্বারা মানসিক এবং শারীরিকভাবে চরম নির্যাতিতা। সম্পর্কহীনতা-বিশ্বাসহীনতার গভীর ভাঙ্গন যখন একবিংশ শতাব্দীর সূচনা করছে, দোলা-শম্পা-লাবণী-তটিনীদের প্রজন্মগত ব্যবধান সীমার সাথে কোথাও যেন সেই দাম্পত্য-স্বামীত্বের একাধিপত্যে সংকুচিত হয়ে যায়, সেই সময় রম্ভার মত উচ্চপ্রশিক্ষিতা ডাক্তারও নারীত্বের ক্ষুদ্র সীমানা অতিক্রম করতে পারেন না, তখন অমৃতা এক নতুন বাণী প্রতিষ্ঠার কথা বলে। একজন কন্যাহিসাবে- একজন স্ত্রী হিসাবে- একজন বন্ধু হিসাবে- একজন মা হিসাবে- সর্বোপরি একজন মানুষ হিসাবে তার ব্যক্তিত্ব সময়ের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। কাহিনির শেষে অ্যাসিড-আক্রমণও তাই অমৃতাকে তার স্থানচ্যুত করতে পারেনি। কিন্তু আধুনিক-উত্তর আধুনিক সময়-

পরিসরে আর্থিক-স্বাচ্ছন্দ্য-বিলাসিতার মধ্যেও অমৃতাকে অ্যাসিড-বাল্ব ছুঁড়ে মারা মনুষ্যত্বহীনতারই স্বাক্ষর বহন করে।

উত্তর-সত্তর কথাসাহিত্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মিশ্রণ ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের দেখা মুক্তির স্বপ্ন কল্পনাই থেকে গেছে। আশির দশক থেকে টানা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা বামফ্রন্টের শাসনকাল, অপারেশন বর্গা, উদ্বাস্তু কলোনি ভেঙে বড় বড় হাই-রাইজ বিল্ডিং ও শপিং মল, শিল্পাঞ্চল গঠন এবং তা ভেঙে আবার ফ্ল্যাট তৈরি, একান্নবর্তী পরিবারের স্বাদ, এক বাথরুম ভাগাভাগি করে থাকা অনেকজন ভাড়াটের একত্রবাসের বদলে নিজেদের ছোট্ট ছোট্ট ফ্ল্যাটে জীবন আরও সংকুচিত করে ফেলা, শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং আদর্শ ও মূল্যবোধের অবনমন, পাঠশালা-গুরুগৃহের বদলে কোচিং সেন্টার, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঢেউ-এ তৃতীয় লিঙ্গের সামাজিক স্বীকৃতি, সবুজ বনাম ধূসরতার দ্বন্দ্ব শুধু পরিবেশের প্রেক্ষিতে নয়, মানুষের মনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, প্রথাভাঙার খেলা, ফ্যান্টাসি, অ্যালিগরি, কল্পবিজ্ঞান, উত্তর আধুনিকতা, উত্তর উপনিবেশবাদ, উত্তর নারীবাদ মিথ পুরাণের নবনির্মাণ বাস্তবায়িত হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর ‘পশ্চাৎপট’ (২০০৫), কমল চক্রবর্তীর ‘ব্রহ্মভার্গব পুরাণ’ (১৯৯৩), সোমনাথ (মানবী) বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা’ (২০০২), স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘হলদে গোলাপ’ (২০১৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু সিরিজের গল্প-উপন্যাসগুলিতে (১৯৭১-২০১২) আঞ্চলিকতার সুন্দর রূপায়ণ নলিনী বেরার ‘অপৌরুষেয়’ (২০০৭) উপন্যাসটিতে গ্রাম এবং শহর মেলবন্ধন, সমাজ পরিকাঠামোর ভিত্তিতে ব্যক্তিত্ববোধের সংকট পেরিয়ে মনুষ্যত্বের উত্তরণের চিত্র রয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের মানবিকতার তলানিতে এসে ঠেকেছে।সমাজ প্রতিবন্ধীদের গ্রহণে সংকোচযুক্ত।শ্বেতী ছোঁয়াচে বা জীবননাশক না হয়েও কি মারাত্মকভাবে জীবন দুর্বিষহ করে তোলে তার ছবি রয়েছে প্রদীপ রায়গুপ্তর ‘প্রজাপতির আকাশ’ গল্পে অরুণ চরিত্র ।প্রদীপ রায়গুপ্ত ‘সমান্তর’ গল্পে গঞ্জাটারের ভূমিপুত্র ও স্প্যাস্টিক রাপ্তি চরিত্রে দেখালেন মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির স্বার্থচরিতার্থতায় একটা সমাজকে প্রতিবন্ধী করছে যা পরবর্তী প্রজন্মতে থেকে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. ঘোষ তপোব্রত, ‘রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ’, দে’জ, কলকাতা, আগস্ট ২০০৩। ISBN 81-7612-806-6. পৃ. ৬১ ।

২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ১৪৯ সংখ্যক পত্র, ছিন্নপত্রাবলী, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খন্ড, পৃ। ১৬৬ ।

৩. ঘোষ তপোব্রত। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ। দেজ পাবলিশিং। কলকাতা ৭০০০৭৩। আগস্ট ২০০৩। ISBN-81-7612-806-6 পৃ. ১৫৩।

৪. যে জন রয়ে গিয়েছিল অন্তরালে। আনন্দ বাজার পত্রিকা। ২৩ ফেব্রুয়ারি,২০১৯ ।

৫. সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার, অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী (২) গ্রন্থালয় প্রা: লি:। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯।. ভূমিকা ।

৬. তদেব পৃ. ৩৬৫ ।

৭. তদেব পৃ. ৩৫৮ ।

৮. পাল, ড: শ্রাবণী (সম্পাদিত)। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯। মে, ২০০৮ পৃ. ষোলো-সতেরো।

৯. চট্টোপাধ্যায়, ড. পার্থ। বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা (প্রাচীন-মধ্য- আধুনিক যুগ। তুলসী প্রকাশনী। কলকাতা-৯। আগষ্ট, ২০১১। ISBN 81-89118-04-8. পৃ:৭০৮ ।

১০. পাল, ড. শ্রাবণী (সম্পাদিত)। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা : বিশ শতক। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯। মে. ২০০৮, পৃ. ১১৮, ১২৫ ।

১১. দাস, অরূপকুমার। তেলেনাপোতা আবিষ্কার : পুরোনো পাঠের উজান ঠেলে কিছু কথা। পাল, ড. শ্রাবণী (সম্পাদিত)। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা : বিশ শতক। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯ মে. ২০০৮,পৃ.১১৫ ।

১২. Sarkar Sumit, Modern India (1885-1947),MACMILLAN INDIA LIMITED.Delhi Bombay Calcutta Madras. 1959,SBN 33390 425 7. pg.439-440 ।

১৩. মিত্র, ড. সরোজমোহন। শতবর্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ.৭১।

১৪. ঘোষ, গৌরকিশোর।জল পড়ে পাতা নড়ে ।ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। ২,শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,কলিকাতা-১২। ভূমিকা ।

১৫. পাল, ড: শ্রাবণী (সম্পাদিত)। রেকর্ড : কালের নথি, কালের দর্পণ। শ্রাবণী পাল।। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯। মে, ২০০৮ পৃ.২২৬-২২৮ ।

পঞ্চম অধ্যায় :

আইনের অনুশাসনের কালান্তর ও নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

প্রতিবন্ধী চরিত্র আলোচনার অভিসন্দর্ভে আইনের অনুশাসন উল্লেখের কারণ সমাজ ইন্দ্রিয়-বিকল মানুষদের স্বীকৃতি জানাচ্ছে, প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের সাম্য ও অধিকারের কথা বলছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগপ্রেক্ষিতে এই অধিকার ভিন্নতার ছবি বিভিন্নভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রাচীন আর্যসভ্যতায় এইসব মানুষদের প্রতি উদারতা থাকলেও সময় যত অগ্রসর হয়েছে প্রতিবন্ধকতার প্রতি সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যের যুগে মানুষের অঙ্গহীনতা সামাজিকভাবে তার সম্মানহানি করেছে। স্মৃতিতে প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন মানুষদের গ্রাসাচ্ছাদনের দায় স্বীকার করে একপ্রকারে তাদের প্রতি করুণাবর্ষণ করা হয়েছে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন মানুষরা সমাজের চোখে উপহাস্যাস্পদ, করুণার পাত্র হয়েছে, কখনো ভাঁড়ুদত্তের মত ধুরন্ধর মানুষ তাদের কমজোরিকে কাজে লাগিয়ে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করেছে। 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় বসন্তের স্বামী, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় মোহন তাদের প্রতিবন্ধকতার জন্য অন্যের স্বার্থ চরিতার্থ করেছে। চরিত্ররা এখানে স্বাভাবিক-সমাজ দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে।

অক্ষম, দুর্বল, প্রতিবন্ধী সব মানুষরাই সমাজের অঙ্গ। তাই সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য সমস্ত মানুষদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা রাষ্ট্রের নৈতিক কর্তব্য। তাই একেবারে প্রথমদিকে কেবলমাত্র শিশুর পিতা-মাতা বা বলা ভাল কেবলমাত্র মা-ই এই অক্ষমতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চাইত, কিন্তু পরবর্তীকালে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-রাষ্ট্র এই মানুষগুলির জন্য বিশেষ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা সূচিত করে। প্রথম পর্যায়ে 'Instinctive Darwinism' এর যুগে মানুষ প্রতিবন্ধকতাকে ভগবানের দেওয়া শাস্তি বলে মনে করত। ফলে তখন তারা 'Sin theory'র উপর ভিত্তি করে অক্ষমদের সমাজ থেকে বিতাড়িত করত। এই 'Social Darwinism'এর পর্যায় থেকে আধুনিকযুগে মানুষ অনেকটাই বেরিয়ে এসে এখন অক্ষম মানুষদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে সবাইকে নিয়ে মিলিতভাবে সুন্দর সমাজ গঠনের প্রয়াসে ব্রতী হয়েছে। এই 'Social Darwinism'-এর educational darwinism-এর শ্লোগান হল- ''এস যদি পার (come if the person can), পারলে মোকাবিলা করতে চেষ্টা কর (try to cope if he/she can), যদি পার শিখতে চেষ্টা কর (attempt for learning if they can)''[১]

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিশ্বপ্রেক্ষাপটে অক্ষমদের প্রতি রাষ্ট্রের ইতিবাচক মনোভাবের উদাহরণ বেশ কয়েকটি পাওয়া যায়। খৃ: পূ: ১৯৫২ অব্দের ক্ষীরস্-এর প্রাপ্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের পাণ্ডুলিপি, দ্বাদশ শতকে ইংলন্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরী কর্তৃক মানসিকভাবে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন, ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের বেথেলহেম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষপাদে পোপ প্রথম গেগরীর খঞ্জ, পঙ্গু লোকেদের বিশেষভাবে সাহায্যদানের বিধানপ্রদান, সপ্তদশ শতাব্দীতে চার্চ কর্তৃক অক্ষম মানুষদের দায়িত্ব গ্রহণ সবই রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি বিশেষ ইতিবাচক ব্যবস্থাগ্রহণেরই দৃষ্টান্ত।

এই ধারা আধুনিক বিশ্বপ্রেক্ষিতেও সমানভাবে চলে আসছে। ফ্রান্সে Jean Gaspard Itard-কর্তৃক Paris শহরের কাছে Aveyorn-এর উদ্ভট বন্য এক খাপছাড়া ছেলেকে তুলে এনে অক্ষম শিশুদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা- এর পথ ধরেই একে একে আসে ১৮৬৬ সালে লিখিত Itard-এর বই 'Idiocy and its treatment by physiological methods', Itard-এর অনুচর Seguin Madam Montessori-র সাহায্যে অক্ষম শিশুদের জন্য স্কুলস্থাপন, ফ্রান্স সহ ব্রিটেন, জার্মানি, আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে Compulsory mass education ব্যবস্থা প্রচলন, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দৃষ্টিহীনদের জন্য বিদ্যালয়স্থাপন প্রথমে লন্ডনে ও পরে বার্মিংহাম-এ, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে Part House, High Gate-এ Asylum for Idiots স্থাপন, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে Hogan Guggenbuhl- কর্তৃক সুইজারল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলে মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, ১৮৭০ সালে ব্রিটেনের Education Act বা Forster Act , ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের Education Act, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের Neuro physiologists সহ বিভিন্ন চিন্তামূলক আন্দোলনের উদ্ভব, ১৮৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে Lord Egerton-এর সভাপতিত্বে Royal Commission গঠন, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় Dorothea Dir, Samuel Howe, Horvy Wilbar এর প্রচেষ্টায় AAMD গঠন, ১৮৯১-১৯০০ সময়কালে Egerton commission-এর শিক্ষা আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে Elementary Education Act, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে Royal Commission-এর সুপারিশ, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে Royal Commission Mental Deficiency Bill (MBD) পাশ করে অক্ষমদের সারাজীবন বিদ্যালয়ে যাবার ব্যবস্থাপনা, এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য সাময়িক বিরতি এবং তারপর আবার ১৯৫০ সালে আমেরিকায় National Association for Retarded Children (NARC) প্রতিষ্ঠা, ১৯৫৯ সালে ব্রিটেনে Mental Health Act পাশ,(এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মানসিক প্রতিবন্ধী মহিলার সঙ্গে যৌনমিলন আইন বিরুদ্ধ করা), ১৯৮৩ সালের আইনে "Mental Deficiency" শব্দটি বদলে "Mental Handicap" শব্দ প্রয়োগ, ১৯৭০-এর দশকে আমেরিকায় Vocational Rehabilitation Act (PL-93-112) সংশোধন এবং Education for all Handicapped

Children Act (PL-94-142) পাশ, ১৯৯০-এ Disabilities Education Act পাশ এবং পরবর্তীকালে আমেরিকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য Civil rights সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ জোরদান, United Nations Organisation-এর তরফে বিভিন্ন ব্যবস্থাগ্রহণ এই ক্রম-অগ্রগতির বিভিন্ন পদক্ষেপ।

ভারতের প্রেক্ষাপটে দেখতে গেলে, আমরা দেখব, প্রাচীন ভারত যখন Social Darwinism-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তখনকার সময়কালে ''Theory of Karma''য় বিশ্বাসী ভারত অক্ষমতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভাল কাজ করার কথা বলে থাকে। খৃ: পূ: ৫০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে রামায়ণে বেশ কয়েকজন অক্ষমের উল্লেখ রয়েছে। খৃ: পূ: ১০০০ অব্দের গর্ব উপনিষদে বলা আছে ত্রুটিযুক্ত সন্তান জন্মের পিছনে রয়েছে দুর্দশাগ্রস্ত পিতামাতা। খ্রী: পূ: ১৮৫ থেকে ৭১ অব্দে পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রেও দুর্বল অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে রয়েছে পঙ্গুদের জন্য আশ্রম ও হাসপাতাল নির্মাণের কথাও। সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মৌর্যযুগে কৌটিল্য একদিকে পঙ্গুদের প্রতি বিদ্রূপ যেমন বন্ধ করতে পেরেছিলেন তেমনি তার সাথে পঙ্গুদের তিনি গুপ্তচরের কাজে নিয়োগ করেছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (দ্বাপরযুগে?) রচিত 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'-র উপর রচিত বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা'-টীকার ২৭ সংখ্যক শ্লোকটি হল-

''ক্লীবোহ্থ পতিতস্তজ্জ: পঙ্গুরুন্মত্তকো জড়:।

অন্ধোহ্ চিকিৎস্যারোগাদ্যা ভর্তব্যা: স্যুর্নিরংশকা:।।২৭''[২]

প্রাক্-রঘুনন্দন যুগের সূচনা ধরা হয় খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক থেকে ভবদেব ভট্টকে দিয়ে। তাঁরই সমসাময়িক জীমূতবাহন তাঁর 'দায়ভাগ' গ্রন্থে যাজ্ঞবল্ক্যের ২৭ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,- পুং বা স্ত্রী চিহ্নবর্জিত তৃতীয়া প্রকৃতিকে এখানে 'ক্লীব' বলা হয়েছে। পতিত থেকে 'তজ্জ' অর্থাৎ উৎপন্ন বা জাত। গমনে বিকল তথা খোঁড়াকে 'পঙ্গু' অ্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। উন্মত্ত শব্দটিকে বোঝাতে বলা হয়েছে বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা বা সন্নিপাত থেকে উৎপন্ন অথবা গ্রহের আবেশ দ্বারা উন্মাদ ব্যক্তি। বিকলচিত্ত অর্থাৎ যিনি হিতাহিত ভালমন্দ বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা রাখেন না এখানে তিনি 'জড়' রূপে আখ্যাত। যার দর্শনেন্দ্রিয় অর্থাৎ নেত্র বিকল সে অন্ধ। অচিকিৎস্যরোগ বলতে সেই ব্যক্তিদের বোঝানো হয়েছে যাদের রোগের কোনো প্রতিকার নেই। 'আদ্য' শব্দটি দ্বারা সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হল যারা দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য ত্যাগ করে অন্য আশ্রমে প্রবেশ করেছেন, যারা হয়েছেন উপপাতকী বা পিতৃদ্বেষী বা যেকোনো রোগের জন্য যাদের ইন্দ্রিয়ের গ্রহণশক্তি নষ্ট হয়েছে অর্থাৎ মূক বা বধির তথা নিরিন্দ্রিয় মানুষজন।

যাজ্ঞবল্ক্যের ২৭ সংখ্যক শ্লোকের ব্যাখ্যার পর জীমূতবাহন 'মনুসংহিতা' থেকে শ্লোক উদ্ধার করেছেন,-

''অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।

উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রয়া:।।৯/২০১[৩]

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় অব্দের মধ্যে রচিত মনুসংহিতায় উল্লিখিত শ্লোকটিতে যারা স্বাভাবিক সক্ষম নন তাঁদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যেসব ব্যক্তি নপুংসক, পতিত, জন্ম থেকেই অন্ধ, জন্ম থেকে বধির, উন্মাদগ্রস্ত, কথা বলতে পারে না, দৃষ্টিগত সমস্যা আছে অর্থাৎ কানা, খোঁড়া বা পঙ্গু তারা পিতার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবেন না। অর্থাৎ সমাজ অনুশাসন ইন্দ্রিয়হীন ব্যক্তিদের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীভুক্ত করল। রোগবিসুখ বা যেকোনো কারণে কোনো মানুষের ইন্দ্রিয় নষ্ট হলে সে 'নিরিন্দ্রিয়' ব্যক্তি রূপেই পরিচিত হবেন। তবে এই সমস্ত ব্যক্তিদের রিক্থ থেকে বঞ্চিত করলেও যাবজ্জীবন গ্রাসাচ্ছাদনের নিরাপত্তাটুকুট দিয়েছিল সমাজ ও আইন। মনুসংহিতার শ্লোকের কথায়-

গ্রাসাচ্ছাদনমত্যন্তং পতিতো হ্যদদদ্ভবেৎ।।৯/২০২[৪]

আধুনিক ভারত এই পথে আরও অগ্রসর হল অনেকটা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক ধরে পৃথিবীব্যাপী পরিবর্তনের জোয়ারে ভারতবর্ষেও এল শিক্ষা এবং বিশেষ করে special education-এর প্রতি বিশেষ কিছু প্রকল্প এবং সনদ। ১৮২৯ খ্রী: উত্তর বারাণসীতে রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল অন্ধদের শিক্ষাদানের জন্য আশ্রম স্থাপন করেন। ১৮৪১ খ্রী: চেন্নাইতে মানসিক রোগীদের পাশাপাশি বোকাদের (idiot) জন্য পৃথক আশ্রম স্থাপিত হয়। এরপর ধীরে ধীরে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন স্থানে বহু Integrated School স্থাপিত হতে থাকে প্রতিবন্ধীদের জন্য। ১৮৮৪ সালে মুম্বইতে Institute for the deaf & mute স্থাপিত হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের আম্বালায় দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় ও Brail ব্যবস্থার সূচনা করা হয়। এদিকে ১৯১৮ খ্রী: উত্তর-পূর্ব ভারতের কার্শিয়াং-এ স্থাপিত হল শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম শিশুদের প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচিতে স্থাপিত হল Psycho medical ratardation centre । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ভয়াবহ রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যস্ততার মধ্যেও মাদ্রাজে সরকারি মানসিক হাসপাতালের রোগীদের নিয়ে বিদ্যালয় স্থাপন নি:সন্দেহে এক মাইল ফলক বলা যায়।

এবার উল্লেখ করব ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ব্রিটিশ ভারতে প্রচলিত হওয়া India Act XII-

THE HINDU INHERITANCE (REMOVAL OF DISABILITIES) ACT (1928)

India Act XII, 1928

20 September 1928

Whereas it is expedient to amend the Hindu Law relating to exclusion from inheritance of certain classes of heirs, and to remove certain doubts; It is hereby enacted as follows:-

1. This Act shall not apply to any person governed by the Dayabhaga School of Hindu Law;
2. Notwithstanding any rule of Hindu Law or custom to the contrary, no person governed by the Hindu Law, other than a person who is and has been from birth a lunatic or idiot, shall be excluded from inheritance or from any right or share in joint family property by reason only of any disease, deformity, or physical or mental defect;
3. Nothing contained in this Act shall affect any right which has accrued or any liability which has been incurred before the 20th September, 1928, or shall be deemed to confer upon any person any right in respect of any religious office or service or of the management of any religious or charitable trust which he would not have had if this Act had not been passed.[5]

The Hindu Inheritance (Removal of Disabilities) Act, 1928 was enacted to abolish the exclusion from inheritance of certain classes of heirs, and to remove certain doubts regarding their ability to inherit property. The Act specifies that persons who are diseased, deformed or physically or mentally handicapped cannot be disqualified from their right to own or share joint-family property unless the law specifies otherwise. This Act essentially abolishes the ancient Hindu legal practice that those who are handicapped are ineligible to inherit property from their family**.**[6]

স্বাধীন ভারতের সংবিধানের ৪৫ নং ধারা অনুসারে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সমস্ত শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা যে উল্লিখিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রতিবন্ধী শিশুদের উল্লেখও রয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে Education Commission-এর রিপোর্টে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদেরও সাধারণ শিশুদের সঙ্গেই একই বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুপারিশ অনুমোদন পায় ১৯৬৮-তে পার্লামেন্টে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত Federation for the welfare of the mentally Retarded মানসিকভাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষদের বিভিন্ন পরিষেবার মধ্যে আনার কাজ শুরু করে। মানসিকভাবে স্থিতিহীন মানুষদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করেন

National Institute for the Mental Handicapped। ১৯৯২ সালে ভারত সরকার Rehabilitation Council of India স্থাপন করে শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম বা প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন মানুষদের পুনর্বাসন প্রকল্প স্থাপনা করে। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নকল্পে ভারতসরকার কর্তৃক গৃহীত আরোও কয়েকটি পদক্ষেপ হল ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাসংক্রান্ত National Policy on Education (NPE), ১৯৮৩তে National Building Code of India, ১৯৮৭ সালে Bureau of India standard code on "Building and Facilities for the Physically Handicapped, ১৯৮৭ সালে গঠিত Behrul Islam কমিটি এবং তার কার্যের জন্য ১৯৯৫-এ Persons with Disabilities Act.

দেশের সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের চেষ্টায় শিশু শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া বিশেষ ইতিবাচক দিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারপর?' গল্পে গজেন দেখি বিশেষ শিক্ষার অভাবে বিপথগামী হতে বাধ্য হল। আর রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' উপন্যাসে রয়েছে মূক ও বধিরদের জন্য রাষ্ট্রের বিশেষ ব্যবস্থাপনার উদাহরণ।

১৯৫৯-৬১, ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭২-৭৪-এর ন্যাশনাল স্যাম্পল্ সার্ভে (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা)- অনুসারে দেখা গেছিল ভারতের মোট জনসংখ্যার ৫ শতাংশ মানুষ বিভিন্নরকম প্রতিবন্ধকতার শিকার। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী দ্বারা উপকৃত। ধীরে ধীরে যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় প্রতিবন্ধী মানুষরাও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তাদের পুনর্বাসন সমস্যাও জটিলতর আকার নিয়েছে।

প্রতিবন্ধী কল্যাণে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি বিশেষ আইনের উল্লেখ করা যায়,

i) Rehabilitation Council of India Act,1992

ii) The Persons with Disability Act,1995

iii) The National Trust Act, 1999

১৯৯২ এর আইনানুসারে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের ওপর জোর দিতে সরকার পেশাদার প্রশিক্ষক নিয়োগে সচেষ্ট সন।বিশেষ জোর দেওয়া হয় অডিওলজিস্ট ও স্পিচ থেরাপির ওপর।

Summary. This act came into being to regulate the training of rehabilitation professionals and to maintain a Central Rehabilitation Register to certify rehabilitation professionals. ... According to this act, the term "rehabilitation professionals" refers to: Audiologists and speech therapists.[7]

১৯৯৫-এর আইনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষিত করা এবং বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে ভারত সরকার। যার মধ্যে সূত্রাকারে বলা যায়,-

প্রথমত:, ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ কমিটি গঠন করে কিছু প্রকল্প প্রণয়ন,

i) প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন মানুষদের জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ।

ii) এই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প গঠন এবং সরকারী সহযোগিতা ও মতামতের ব্যবস্থাপনা ।

iii) বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা ।

iv) গৃহীত নীতির পুনর্মূল্যায়ণ ।

v) শিক্ষা-কর্ম-সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাপনকে সহজ করে তোলার প্রচেষ্টা ।

vi) সমগ্র নীতি এবং প্রকল্পগুলির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ, বিচার নিয়মিতভাবে করা ।

দ্বিতীয়ত:, ভারত সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের সেক্রেটারীর নেতৃত্বে এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা।

তৃতীয়ত:, কেন্দ্রীয় স্তরের মতই রাজ্যস্তরে রাজ্যসরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীনে কমিটি গঠন।

চতুর্থত:, রাজ্য সরকারের কল্যাণ মন্ত্রকের সেক্রেটারীর নেতৃত্বাধীন এক্সিকিউটিভ কমিটি দ্বারা কেন্দ্র এবং রাজ্যস্তরে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী স্বার্থরক্ষার্থে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করা।

১৯৯৫ সালের এই আইনে প্রতিবন্ধী মানুষদের শিক্ষা-জীবিকা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেগুলি নিশ্চিত করা হয়। সেগুলি হল-

শিক্ষাক্ষেত্রে,

i) ১৮ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা ।

ii) স্কুলছুটদের চিহ্নিত করে বিদ্যালয়মুখী করার প্রচেষ্টা ।

iii) স্কুলছুটদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করে মূলত কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ।

iv) মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান ।

v) শিক্ষার যাবতীয় সরঞ্জাম বিনামূল্যে বিতরণ ।

vi) শিক্ষাকে আকর্ষণীয় এবং প্রয়োগমুখী উন্নততর করে তোলার জন্য নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ।

vii) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা ।

viii) প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে যাতায়াতের ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থাগ্রহণ ।

জীবিকাক্ষেত্রে,

i) প্রতিবন্ধী মানুষদের উপযোগী কাজের ক্ষেত্র শনাক্তকরণ ।

ii) চাকুরিক্ষেত্রে ৩০% পদ প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ করা এবং তার মধ্যে আবার ১% সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন- আংশিক দৃষ্টিহীন, শ্রবণক্ষমতাহীন অথবা সেরিব্রাল পালসি আক্রান্ত মানুষদের জন্য সংরক্ষিত করা ।

iii) বিশেষভাবে সক্ষম এই সমস্ত মানুষদের জন্য বিশেষ কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপন ।

iv) নিয়োগকারী সংস্থাগুলির এই সমস্ত মানুষদের উপর বিশেষ নজরদারি ।

v) সরকার অনূদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩% আসন প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষণ ।

vi) প্রতিবন্ধীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃত্ব বা প্রশাসনের নিয়োগকারীদের বিশেষ সহায়তা দানের ব্যবস্থা ।

অন্যান্যক্ষেত্রে,

i) প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরকার কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ii) স্থানীয় এবং সরকারী নেতৃত্বাধীনে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন ও স্বনির্ভর প্রকল্পে গৃহনির্মাণ, দোকানঘর তৈরী, বিশেষ বিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র, শিল্পাদি স্থাপনের জন্য ন্যূনতম বিনিময় মূল্যে জমি প্রদান ইত্যাদি বহুবিধ কল্যাণমুখী প্রকল্পগ্রহণ এবং বাস্তবায়ন।

iii) সড়ক এবং পরিবহনে বৈষম্যহীনতা

iv) সরকারি চাকরি এবং পদোন্নতিতে সব বৈষম্য দূরীকরণ

v) স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পেশাগত শিক্ষার দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ,পুনর্বাসন নিশ্চিত করা, সর্ববিধ সহায়তা প্রদান এবং গবেষণায় যাবতীয় সাহায্য নিশ্চিতকরণ।

vi) নথিভুক্ত সংস্থাগুলির দ্বারা প্রতিবন্ধীদের পরিষেবাদান।

vii) প্রতিবন্ধীদের প্রদেয় পরিষেবার সমন্বয়, তদারকি এবং রিপোর্ট তৈরীর জন্য সরকার কর্তৃক মুখ্য কমিশনার নিয়োগ ।

viii) সরকার কর্তৃক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা।

এছাড়া পুনর্বাসনের অন্যান্য পদক্ষেপ,

- দরিদ্র বা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের গৃহনির্মাণ প্রকল্পে প্রদত্ত সরকারী সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

- চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রতিবন্ধকতা জয় করার জন্য সরঞ্জামের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে
- প্রতিবন্ধীদের বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসাপ্রদানের ব্যবস্থা।
- যানবাহন ভাড়া বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে করার ব্যবস্থাবিধি।

শুধু রাষ্ট্র নয়, পেশাগত সমাজকর্মীরাও এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা পালন করেন,-

i) জনসাধারণকে সচেতন করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ।

ii) প্রতিবন্ধী মানুষরা যেসব পরিষেবা পেতে পারেন, সে বিষয়ে তাদের বিশেষভাবে সচেতন করা ।

iii) প্রতিবন্ধী মানুষদের খুঁজে খুঁজে নিকটবর্তী কেন্দ্রে পাঠিয়ে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাগুলি পাবার ব্যবস্থা করা।

iv) প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন মানুষদের পরিবারের লোকজনকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করা এবং কাউন্সিলিং করা, কিভাবে প্রতিবন্ধী মানুষদের সাথে ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে সাহায্য করা।

v) প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ।

vi) সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক-সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং তাতে প্রতিবন্ধী এবং সাধারণ মানুষদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

vii) পরিবার বা সমাজের চোখে ঘৃণার দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের প্রতি যেন না থাকে সেটাও দেখা।

১৯৯৯ সালের আইনেও প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষিত করা হল।

The objectives of the National Trust in particular are :-

- to enable and empower persons with disability to live as independently and as fully as possible within and as close to their community as possible;
- to facilitate the realisation of equal opportunities, protection of rights and full participation of persons with disability;
- to extend support to its registered organisations to provide need based services; and
- to evolve procedures for appointments of guardians and trustees for persons with disabilities.[৪]

২১ ধরণের Disability স্বীকৃত RPWD ACT 2016 অনুসারে[৯],

১. Blindness
২. Low-vision
৩. Leprosy Cured Persons
৪. Hearing Impairment
৫. Locomotor Disability
৬. Dwarfism
৭. Intellectual Disability
৮. Mental Illness
৯. Autism Spectrum Disorder
১০. Cerebral Palsy
১১. Muscular Dystrophy
১২. Chronic Neurological Conditions
১৩. Specific Learning Disabilities
১৪. Multiple Sclerosis
১৫. Speech and Language Disability
১৬. Thalassemia
১৭. Hemophilia
১৮. Sickle Cell Disease
১৯. Multiple Disabilities Including Deaf-blindness
২০. Acid Attack Victims
২১. Parkinson's Disease

জীমূতবাহন রচিত 'যাজ্ঞবল্ক্যে'র টীকায় প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন মানুষজনদের প্রসঙ্গে গার্হস্থ্য-আশ্রম পরিত্যাগের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এই মানুষগুলি সাধারণের সমাজের থেকে স্বতন্ত্র তার উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে দেখি তেমনভাবে সমাজ পরিত্যাগের উল্লেখ নেই প্রতিবন্ধী চরিত্রদের। একমাত্র মানসিক প্রতিবন্ধী অর্থাৎ পাগলদের ঠাঁই হয়েছে পাগলাগারদে। যেমন- 'তিরোলের বালা'র পূর্ণিমা, গৌরকিশোর ঘোষের 'জল পড়ে পাতা নড়ে'তে সুধাময়ের ছোটকাকীমা, বা প্রতিবেশী সাহিত্য সআদত হোসেন মন্টোর 'টোবা টেক সিং'-এর বিশন সিং-কে পাগলাগারদে থাকতে দেখেছি। বাকি প্রতিবন্ধী চরিত্ররা আলাদা থাকেনি। লীলা মজুমদারের শিশুসাহিত্যের ধারায়

প্রতিবন্ধী চরিত্ররা সমাজের মধ্যে থেকেই নিজের দু:খ অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে, তবে ব্যতিক্রমী চরিত্র 'চিড়িয়াখানা' গল্পের বুড় আঙ্গুল ছ্যাঁচা লোকটা, যে জঙ্গলে থাকত, কারণ তার প্রতিবন্ধকতার শিকার পোষ্য পশু-পাখিরা তো আর মানুষের সঙ্গে বাস করতে পারে না। লীলা মজুমদারের 'অহিদিদির বন্ধুরা' আবার অনেকে ভূতের জগতেরও প্রতিনিধিত্ব করেছে, কিন্তু ভূতরাও তাদের স্বাভাবিক সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুষ্ঠরোগীর বউ'তে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে যতীন বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করেছে এবং পরবর্তীকালে মহাশ্বেতা এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন মানুষদের জন্য একটি ঠিকানা করতে পেরেছে। সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্' গল্পে হাবু বোষ্টম তার ছোঁয়াচ ব্যাধির জন্য নগরের উপপ্রান্তে থেকেছে। সমরেশ বসুর 'শাম্ব' উপন্যাসে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে তপস্যা করেছে ,রুহিতন কুরমি ('মহাকালের রথের ঘোড়া') সমাজ পরিত্যক্ত হয়েছে।আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখে' ভিন্নপল্লি গঠনে বাধ্য হয়েছে এরা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রজনী'র রজনী,'রাজসিংহ'তে মাণিকলাল,রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা'র সুভাষিণী, 'দৃষ্টিদানে'র কুমু,'মহামায়া'র মহামায়া, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র মালা, সুবোধ ঘোষের 'শ্মশানচাঁপা'র ঘাটবাবু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সামনে চামেলি'র মাস্টারমশাই দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু'র নিত্যচরণ, বিমল করের 'জননী'র দীনেন্দ্র, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'-এ মণীন্দ্রনাথ সবাই কিন্তু সমাজেই থেকেছে এবং তাইজন্যই সমাজের দ্বারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। একমাত্র তৃতীয় লিঙ্গের চরিত্র যারা, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর কাফ্রি খোজা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'আরাবল্লীর আড়ালে'র খুশ্ নজরজী, কমলকুমার মজুমদারের 'মতিলাল পাদরী'র বদন, কমল চক্রবর্তীর 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণে'র হিজড়েরা সমাজ থেকে ভিন্নস্থানে বাস করেছে। কিন্তু এই তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা সমাজে আইন দ্বারা স্বীকৃতি পাচ্ছে তখন তারা সমাজেই বাস করছে- গার্হস্থ্য আশ্রমেই রয়েছে। এর উদাহরণ রয়েছে স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে। সেখানে দুলাল সাধারণ গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করলেও পরি কিন্তু গার্হস্থ্য আশ্রমেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' উপন্যাসে শ্যামলীকে স্বামী অনিল বোবাদের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল এবং নিজেও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করেছিল।রমাপদ চৌধুরী 'পশ্চাৎপট' উপন্যাসে দেখিয়েছেন সুশান্ত-জুঁইকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য মূক-বধিরদের স্কুলে পড়ানো হচ্ছে, তাদের জন্য স্বনির্ভরতার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ সমাজ যত উন্নত হয়েছে প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও করেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে নসুবালা যে শুধু সমাজের মধ্যে থেকেছে, তাই-ই নয়, কৃত্যগুলির পালন করেছে নসুই। 'শুকসারী কথা'তেও তারাশঙ্কর নসুকে গার্হস্থ্য আশ্রমেই রেখেছেন। অর্থাৎ বলা যায়, প্রাচীন কাল থেকে চলে

আসা আইনগুলি ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছে আধুনিক সমাজ। নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যের চরিত্রগুলি সে স্বাক্ষর বহন করে।

জীমূতবাহনের লেখায় সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হত শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম মানুষরা, কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা থাকত প্রতিবন্ধীদের।মহাভারতের কাহিনিতে দেখি,অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র নাবালক পান্ডুর অভিভাবক হিসাবে রাজ্যশাসন করেছিলেন,কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য তাকে মহারাজ পদে অভিষিক্ত করা হয়নি। কিন্তু আধুনিককালে ১৯২৮-এ সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত হিন্দু আইনটি (The Hindu Inheritance Act) সংশোধন করে, ইন্দ্রিয়বিকল মানুষদেরও সম্পত্তির অধিকারভুক্ত হবার কথা বলল। বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' উপন্যাসে রজনীকে এক বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী করেছিলেন। । অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'খাখ্'-এ ভোম্‌রা মায়ের জমিয়ে রাখা টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অর্থমনর্থম্' গল্পটির ভিত্তিই সম্পত্তিঘটিত ব্যাপার। ফণিভূষণের অপরাধী হয়ে ওঠার অন্যতম কারণই সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' গল্পে ভুবনের প্রসঙ্গে এর উল্লেখ রয়েছে। 'তিরোলের বালা'র পূর্ণিমার ক্ষেত্রেও পিতার দায়দায়িত্ব পালনের উল্লেখ রয়েছে।বিমল কর 'দেওয়াল' উপন্যাসে উমাকে পিতৃ সম্পত্তির অধিকারিণী না করলেও গিরিজাপতিবাবু তার উপার্জিত অর্থ উমার হাতে তুলে দিয়েই নিশ্চিন্ত থেকেছেন। গৌরকিশোর ঘোষের 'জল পড়ে পাতা নড়ে'তে দেখি শীতল তাদের পৈতৃক বাড়ি সারানোর প্রসঙ্গে নিজের সন্তানহীনতার জন্য নিজের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসাবে ভাবতে থাকে ভাইপোর কথা।শীতলের স্ত্রী উন্মাদরোগগ্রস্ত হওয়ায় শীতলের অবর্তমানে তার স্ত্রীর স্বামীর সম্পত্তির ওপর কোনো অধিকার দাবি থাকতে পারে না সমাজে তারই ছবি পরিস্ফুট হয়েছে।তবে শীতলের স্ত্রীর ভরণপোষণ ও চিকিৎসা একান্নবর্তী পরিবারে করা বাধা হত না । নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা'-তে অরুণাংশুকে প্রথমে তার পিতা রাজীব অস্বীকার করলেও, পরে স্বীকৃতিস্বরূপ অর্থসাহায্য করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আর্থিক দিক থেকে সাহায্যের কথা রাষ্ট্র আইনের স্বীকৃতিতে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইছে।

জ্যেষ্ঠ কন্যা বা পুত্রের বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠ পুত্র বা কন্যার বিবাহে বাধার কথা সমাজ বার বার বলেছে। তবে রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্র বলেছে শারীরিক বা মানসিক ইন্দ্রিয় বৈকল্য অগ্রজ অবিবাহিত থাকলে কনিষ্ঠের বিবাহ সম্ভব। অর্থাৎ এখানে দুটি কথা বলা হচ্ছে, এক, প্রতিবন্ধী চরিত্রের বিবাহ না হওয়া, এবং দুই, সেক্ষেত্রে কনিষ্ঠের বিবাহ আগে হওয়া মানে, জ্যেষ্ঠ পরে বিবাহ করতেও পারেন। এই সামাজিক কুপ্রথার জন্য নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' উপন্যাসে শ্যামলীর বিবাহ ছলচাতুরিতে অনিলের সাথে দিতে বাধ্য হয়েছিল কন্যাদায়গ্রস্ত অসহায় পিতা। মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মহাকালের জটার জট’ গল্পে সুচিত্রার মানসিক উন্মাদগ্রস্ততার ভিত্তিতে রয়েছে বয়সে ছোট ছেলের সাথে কল্পিত দাম্পত্য সম্পর্ক রচনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পেরানটা’ গল্পে ফুলবানুর রূপলাবণ্য এবং কাকার ক্ষমতার বলে তোতলা হওয়া সত্ত্বেও তার বিয়েতে কোনো সমস্যা হয়নি বা বিবাহ পরবর্তী জীবনেও তার শারীরিক অক্ষমতার জন্য তাকে কোনোরকম গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি। তৎকালীন সমাজে বরের তুলনায় মেয়ের বয়স বেশি অসঙ্গত ছিল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘সামনে চামেলি’র মাস্টারমশাই-এর একটা পা নেই বলে যে তার বিয়ে হবে না, সেটা তার প্রাইমারী স্কুলের ছাত্ররাই বলছে। ‘তিরোলের বালা’ গল্পে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন পূর্ণিমার মাথার গন্ডগোল থাকার জন্য তার বিবাহসংক্রান্ত বিষয়টি স্পর্শকাতর হয়েছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘গাছ’ গল্পে দেখি বোবা হওয়া সত্ত্বেও গঙ্গামণির বিবাহ ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কারণ তার পরে ছোট একটি বোন আছে। কোনো আইনী অনুশাসন নয়, শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ভালোবাসা-বিয়ে কোনোটাই বাস্তবায়িত হয়নি অচিন্ত্যকুমারের ‘খাখ্’-এ ভোম্‌রার, শরদিন্দুর ‘অর্থমনর্থম্’-এর ফণিভূষণের, বিমল করের ‘দেওয়ালে’র উমার, নীহাররঞ্জন গুপ্তের ‘উল্কা’য় অরুণাংশুর। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বিবাহে বাধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন না করলেও রমাপদ চৌধুরীর ‘পশ্চাৎপট’-এ সুশান্ত জুঁই-এর প্রতিবন্ধকতা পুত্রের বিবাহের প্রতিবন্ধক হয়েছে।শ্বেতী রোগাক্রান্ত মানুষদের বিয়ের ব্যাপার সমাজে এখনও খুব সহজ নয় প্রদীপ রায়গুপ্তর ‘প্রজাপতির আকাশ’ গল্পের কথক অরুণ তার নিদর্শন ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর ‘পরাশরসংহিতা’র যে শ্লোক উদ্ধার করেছিলেন, তার মূল বক্তব্যই ছিল, স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, সংসারত্যাগী হলে, ক্লীব বা পতিত হলে স্ত্রীর পুনর্বিবাহে বাধা থাকে না।

> ‘‘নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্য বিধীয়তে।।’’[১০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ প্রসঙ্গে বক্তব্যটি-

> ‘‘রঘুনন্দন ও গোপাল প্রভৃতি পরবর্তী লেখকগণ কর্তৃক উদ্ধার রচনাদি হইতে মনে হয় যে, বধিরতা, উন্মাদ, জড়তা, এমনকি ক্লীবত্ব প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক বিকারযুক্ত পাত্রেরও বিবাহে নিষেধ ছিল না। জীমূতবাহন দায়ভাগে নিয়োগপ্রথার উল্লেখ করিয়া ক্লীবের বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। হয়ত তাহার যুগে ঐ প্রথা বঙ্গ সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু, তৎপরবর্তীকালে ইহার প্রচলন ছিল কিনা তাহার কোন প্রমাণ নাই।’’[১১]

অভিসন্দর্ভের আলোচিত চরিত্রগুলির মধ্যে দেখব হামিদা-হাবু বোষ্টম, সুশান্ত-জুঁই এদের প্রতিবন্ধকতা বিবাহে বাধা সৃষ্টি করেনি।

২০১৯ এর আগে অবদি ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে,তার জন্য ডির্ভোসের আইনও ছিল।শিক্ষিত যতীন-মহাশ্বেতার ('কুষ্ঠরোগীর বৌ' : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) সংসার ভেঙে যাচ্ছে এই রোগের জন্য।এর বিপরীতে দেখি সমাজের নিম্নবিত্তীয় মানুষজনদের মধ্যে জীবনসাথী বাছার ক্ষেত্রে কুষ্ঠ কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি তার উদাহরণ সুবোধ ঘোষের সুন্দরমের হাবু-হামিদার সংসার,সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখে'র কুষ্ঠরোগীরা।

নপুংসক, ক্লীবদের নিয়ে প্রাচীন আইনের অনুশাসনে অনেক কিছু বিধিনিষেধ ছিল।

> ''১৮৭১ সালে ব্রিটিশরা ভারতে 'ক্রিমিনাল ট্রাইবস' নামক একটি আইন তৈরী করেন, যেখানে কোনো নির্দিষ্ট জনজাতিগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে অপরাধী জনগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করা যায়। এটি একটি জামিন অযোগ্য আইন ছিল। ১৮৯৭-এ ব্রিটিশরা এই আইনটিকে সংশোধন করে হিজড়েদের এর সঙ্গে যুক্ত করেন, যেখানে হিজড়েরা সন্দেহভাজন শিশু অপহরণকারী জনজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৩৬-এ পন্ডিত জওহরলাল নেহরু 'ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্টে'র এই অপরাধমূলক বিচারব্যবস্থাকে ভয়ঙ্কর মনে করে এই আইনটি সংশোধন করেন।''[১২]

বর্তমানে এই অনুশাসন আরোও আধুনিকমনস্ক হয়েছে।

LGBT rights in India

Lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) rights in India have evolved in recent years. However, Indian LGBT citizen may face social and legal difficulties not experienced by non-LGBT persons. Same-sex sexual activity legalization in India commenced in 2018. The country has repealed its colonial-era laws that directly discriminated against gay sex and transgender identification and also explicitly interpreted Article 15 of the constitution to prohibit discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, but many legal protections have not been provided, including same-sex marriage. Transgender people in India are allowed to change their legal gender post-sex reassignment surgery under legislation passed in 2019, and have a constitutional right to register themselves under a third gender. Additionally, some states protect *hijras*, a traditional third gender population in South Asia, through housing programmes, and offer welfare benefits, pension schemes, free operations in government hospitals, as well as other programmes designed to assist them. There are approximately 480,000 transgender people in India.

In 2018, in a landmark decision Navtej Singh Johar v. Union of India, the Supreme Court of India decriminalised consensual homosexual intercourse by reading down Section 377 of the Indian Penal Code and excluding consensual homosexual sex between adults from its ambit. Homosexuality was never illegal or a criminal

offence in ancient Indian and traditional codes but was criminalised by the British during their rule in India.

Despite recent political movements in favour of LGBT rights, there remains a significant amount of homophobia present among the Indian population, with around half of Indians objecting to same-sex relationships according to a 2019 opinion poll. In the 2010s, LGBT people in India increasingly gained tolerance and acceptance, especially in large cities. Nonetheless, most LGBT people in India remain closeted, fearing discrimination from their families, who might see homosexuality as shameful.[13]

এই আইনের প্রতিফলন বাংলা কথাসাহিত্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র খোজা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'আরাবল্লীর আড়ালে'র খুশনজরজী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ও 'শুকসারী কথা'র নসুরাম, কমলকুমার মজুমদারের 'মতিলাল পাদরী'র বদন, এবং অপরপক্ষে কমল চক্রবর্তীর 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণে'র কিমপুরুষদের পরিচয়, নলিনী বেরার 'অপৌরুষেয়'র আনন্দী, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ'এ পরী-দুলালীদের সমাজে আত্মস্বাতন্ত্র্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা সমাজবির্বতনের ধারায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের আইনি স্বীকৃতির ছবিই সূচিত করে। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ সোমনাথ ওরফে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা' এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তমূলক রচনা।

তথ্যসূত্র

১. B. Ed (SE-DE) BANGLA PROGRAMME, SECP-04: INTRODUCTION OF DISABILITIES. A collaborative Programme of Netaji Subhas Open University and Rehabilitation Council of India. অক্টোবর ২০১৩। পৃ.৭৪ ।

২. Persons with special needs and Rehabilitation Management (International Research Journal) Volume I, March 2013; Special Education & HEPSN Cell, Jadavpur University, Kolkata-700032, পুরাণ ও সাহিত্যে অক্ষম প্রতিস্পর্ধী চরিত্রেরা, ড. দীপান্বিতা ঘোষ, পৃ. ১২।

৩. তদেব পৃষ্ঠা- ১২ ।

৪. তদেব পৃষ্ঠা- ১৩ ।

৫ (http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/THE-HINDU-INHERITANCE-REMOVAL-OF-DISABILITIES-ACT-1928.pdf) ।

6 https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_Inheritance_(Removal_of_Disabilities)_Act,_1928#:~:text=The%20Hindu%20Inheritance%20(Removal%20of,their%20ability%20to%20inherit%20property.) । ৭.https://www.google.co.in/search?hl=en-IN&gbv=2&q=RCI+Act+1992+summary&sa=X&ved=2ahUKEwjU6JTpg4XvAhWEf30KHYYFC9IQ1QJ6BAgJEAQ ।

For details : https://www.google.co.in/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://www.dwdsc.kar.nic.in/docs/Sahaya%2520Hastha/15.pdf&ved=2ahUKEwjU6JTpg4XvAhWEf30KHYYFC9IQFjAJegQICBAB&usg=AOvVaw15y4Zg1jrm2xE-DnC7fq63 ।

৮. https://www.thenationaltrust.gov.in/content/innerpage/introduction.php ।

৯. https://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/rights-persons-disabilities-act-2016।

১0 Persons with special needs and Rehabilitation Management (International Research Journal) Volume I, March 2013; Special Education & HEPSN Cell, Jadavpur University, Kolkata-700032, পুরাণ ও সাহিত্যে অক্ষম প্রতিস্পর্ধী চরিত্রেরা, ড. দীপান্বিতা ঘোষ, পৃ. ১৩।

১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, 'স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী' এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা.লি. কলিকাতা, ১৯৩৮, পৃ: ৫০ ।

১২. http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL ।

১৩. https://en.m.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_India ।

ষষ্ঠ অধ্যায় :

নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র : চরিত্রকেন্দ্রিক আলোচনা

এই অধ্যায়টিতে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতিবন্ধী চরিত্রগুলি আলোচনা করব। প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবিন্যস্ত করে আলোচনা করা হল। কালান্তরে সমাজ-পরিসরে চরিত্রগুলির বিবর্তন, সমাজের চোখে তাদের অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস রয়েছে।

চরিত্র হল বাস্তবের মানুষগুলির লেখক কর্তৃক বিশ্লেষণ।

''যাকে বা যাদেরকে নিয়ে কাহিনী গড়ে ওঠে, তাকে বা তাদেরকে বলা হয় ঐ কাহিনীর চরিত্র বা 'Character' : জনৈক ভাষ্যকারের শব্দবন্ধে 'Character' হোলো "an extended verbal epresentation of a human being, the inner self that determines thought, speech, and behaviour."। অর্থাৎ 'চরিত্র' বলতে ব্যক্তিবিশেষের বহিরাঙ্গের বৈশিষ্ট্যই নয়, তার অন্তরঙ্গের সেই গূঢ়তাকেও বোঝায় যা তার ভাবনা, অভিব্যক্তি ও আচরণকে নির্ধারণ করে। কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে সম্পর্ক তো থাকেই, তবে এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টির আপেক্ষিক গুরুত্ব থাকবে সেটা সূত্রাকারে স্থির করে দেওয়া অসঙ্গত।''[১]

যদিও কথাসাহিত্য নবীনতম সদস্য বাংলা সাহিত্য জগতে তবুও তার পরিসর মোটেই ছোটো নয়। বহুবিচিত্র চরিত্র সমৃদ্ধ করেছে বাংলাসাহিত্য ভান্ডারকে। এখানে নায়কচরিত্ররা সক্ষম সবল সুন্দর। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে নায়কের অন্যতম গুণ হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে বীররসের। বীররসের স্থায়িভাব উৎসাহ। নায়ক চরিত্ররা চিরকাল দেখেছি সমস্ত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে জয়লাভ করে। আমাদের রূপকথাগুলোতে দেখি রাজকুমার সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করেন। এই পথ মোটেই সুমসৃণ হয় না। পথে অনেক রাক্ষস-খোক্কসরা আসে। রাজকুমারকে জয়ের প্রতি পদক্ষেপে বাধা পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। তবেই সে কাঙ্খিত সাফল্য লাভ করে। এই সন্দর্ভটিতে এমনই কিছু রাজকুমারদের জীবনপথের কঠোর সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেছি। এই রাজকুমাররা শুধুমাত্র পুরুষচরিত্র নন। আছে বেশ কিছু নারীচরিত্রও। পরম সাহসিকতায় বীরদর্পে এরা জীবনের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে পেরিয়ে এগিয়ে গেছে। হয়ে উঠেছে বিশেষভাবে সক্ষম। বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গন থেকে কয়েকটি এরূপ চরিত্র চয়ন করা হল। প্রসঙ্গত প্রতিবেশী সাহিত্য থেকেও এরূপ গুটিকয় চরিত্র আলোচিত হয়েছে।

দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

সাহিত্যে দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার শিকার চরিত্রের সংখ্যা নিতান্তই কম নয়। তার মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় কিছু চরিত্র নির্বাচন করে আলোচনা করা হল।

রজনী (রজনী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রথম প্রতিবন্ধী চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রজনী ।বাংলা ১২৮১-৮২ সনে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'রজনী' উপন্যাসটির বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন,-

> ''লিটনের Last days of Pompeii উপন্যাসের অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়াকে অবলম্বন করে তিনি রজনী চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন।আর চরিত্রের জবানীতে কাহিনী বর্ণনার রীতি তিনি গ্রহণ করেছেন উইলকি কলিন্সের Woman in White নামক গ্রন্থ থেকে ।''[২]

কাশীনিবাসী হরেকৃষ্ণ দাসের একটি মাত্র কন্যাসন্তান। কিন্তু তাকে নিয়ে হরেকৃষ্ণ দম্পতির চিন্তার অন্ত নেই। কারণ কন্যাটি জন্মান্ধ। কন্যার শৈশবেই তার মার মৃত্যু হলে পিতা একা জন্মান্ধ কন্যার দায়িত্বভার গ্রহণে অপারগ হওয়ায় কলকাতা নিবাসী শ্যালিকাপত্নী রাজচন্দ্র দাসকে কন্যাভার সমর্পণ করেন। নিঃসন্তান রাজচন্দ্র দম্পতি দারিদ্র্যতা সত্ত্বেও অন্ধবালিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সামান্য ফুল বিক্রি করে তাদের সংসার অতিবাহিত হচ্ছিল। তারা জন্মান্ধ কন্যাটিকে কোনোদিনের জন্যও জানতে দেননি যে রাজচন্দ্র দম্পতি biological parent নন রজনীর। বরং দীর্ঘ কুড়ি বছর পরম আদর যত্নে প্রতিপালন করেছেন। মেয়ের বছর দুইদশক হয়ে যাওয়াতেও তারা নিজেদের খুব বেশি কন্যাভারদায়গ্রস্ত বলে চিন্তিতও বোধ করেননি। রজনীও কোনোদিন জানত না যে এক ফুলওয়ালী-মালি দম্পতির কন্যা সে নয়।

অন্ধত্বের কারণে যথাবয়সেও রজনীর বিবাহ হয়নি। কিন্তু রজনী পরমাসুন্দরী ।রজনীর যে বিয়ে হয়নি-হবেও না অন্ধত্বের কারণে সেটা খুব ভাল করেই জানে সে নিজে। এই বিবাহ প্রসঙ্গে রজনীর সমান্তরাল দুটি মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। একবার সে বলেছে তার যে বিয়ে হয়নি তাতে নাকি ভালই হয়েছে। কত বিবাহিতা রমণীরা বলেছে কাণা ফুলওয়ালীই বরং ভাল। চক্ষুষ্মতী রমণীরা তাদের কটাক্ষপাতেও পুরুষমনে প্রবেশ করতে পারেনি বা দাম্পত্যজীবনে খুশী নয়। এটা রজনীর জবানীতে-

> ''কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না।সেটা দুর্ভাগ্য, কি সৌভাগ্য, যে চোখেরমাথা না খাইয়াছে,

সেই বুঝিবে। অনেক অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিণী, আমার চিরকৌমার্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে,''আহা আমিও যদি কাণা হইতাম।''[৩]

কিন্তু ঠিক এর পরই রজনী আবার জানাল,-

''বিবাহ না হউক-তাতে আমার দুঃখ ছিল না। আমি স্বয়ম্বরা হইয়াছিলাম।''[৪]

অন্ধ রজনী। ১৭ বছর বয়স। তার মনে যে প্রেমের উন্মেষ ঘটেছে তারই স্ফূরণমাত্র দৃষ্ট। রজনীও কাউকে ভালোবাসতে চায়। কারো ভালোবাসা পেতে চায়। মজার বিষয়, রজনী যে স্বয়ম্বরা হল, সেই বিবাহ একটি নয়, দুটি ঘটল। একটি কলকাতার রাস্তার উচ্চস্তম্ভ মনুমেন্ট, আরেকটি চারবছরের বালক বামাচরণ। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন দোষ কাটানোর প্রথা উল্লিখিত হয়েছে। রজনীও হয়ত তার প্রথম বিবাহ মনুষ্যেতর প্রাণী একেবারে অজীবের সাথে সম্পন্ন করে তার বিবাহজনিত দোষ বাধা কাটালো। দ্বিতীয় বিবাহ বয়সে অনেক ছোট এক বালকের সঙ্গে রজনীর সম্পন্ন হল। এর মধ্যে রজনীর মনে জন্মান্তরের কোনো দোষ কাটানোর স্পৃহা জাগরিত। মনে পড়ে মদন-রতি উপাখ্যান-এর অনুষঙ্গ। দৈব-অভিশাপে আজ রজনী জন্মান্ধ। কিন্তু তার মনে রয়েছে প্রেমাকাঙ্খা। তাই সে এজন্ম-গত জন্ম সমস্ত বিবাহজনিত বাধা কাটিয়ে উঠতে উন্মুখ।

এ হেন রজনীর মনে এল প্রেমের পরশ। যে রামসদয়বাবুর বাড়ি রোজ ফুল দিতে যায় কাণা ফুলওয়ালি তাদেরই বাড়ির ছোট ছেলে শচীন্দ্রনাথ। ঘটনা পরম্পরায় একদিন হঠাৎই শচীন্দ্র-রজনীর সাক্ষাৎ ঘটে। সেখানে শচীন্দ্র প্রথম দর্শনেই রজনীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন, কিন্তু তার রূপ দেখে নয়, শচীন্দ্র রজনীর দৃষ্টিহীনতার বিষয়ে বিশেষ সহমর্মী হয়ে ওঠে। জানা জায় রজনীর এই দৃষ্টিহীনতা সারবার নয়। সে জন্মান্ধ। কিন্তু কাহিনির অন্তিমে দেখি রজনীর তমসাবৃত জীবনের অবসান ঘটেছে। যথাযথ চিকিৎসায় রজনী চোখের আলো ফিরে পেয়েছে।

রজনী দৃষ্টিহীন হলেও তার জগতে আছে শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় অনুভূতির জগৎ। ফুলে ফুলে ভরা তার জীবন। শচীন্দ্রর রজনীর চক্ষু-পরীক্ষার জন্য প্রথম পরশ রজনীর জীবনে এক শিহরণ জাগিয়ে তোলে। রজনীর দৃষ্টিহীনতা শব্দ এবং গন্ধ দ্বারা পূরিত হয়। রজনীর জীবনে আছে গানের সুরমূর্চ্ছনাও।

শচীন্দ্র রজনীর সাক্ষাতে একই সঙ্গে রজনীর জীবনে প্রথম পুরুষের আবির্ভাব এবং পাশাপাশি শচীন্দ্রর মনে রজনীর প্রতি প্রেম নয় করুণার উদ্রেক। শচীন্দ্র কাণা ফুলওয়ালীর চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারবে না, তাই তার বিবাহে প্রবৃত্ত হল। যত টাকাই লাগুক না কেন রজনীর জীবন গড়ে দিতে চাইল। একটি পাত্রও ঠিক করল। কিন্তু শচীন্দ্রর প্রতি প্রেমাসক্ত রজনী গৃহত্যাগ

করে সেই বিবাহ আটকালো। এখান থেকে রজনীর জীবনেও বাঁকবদল ঘটল। চেনা পরিচিত ছকের বাইরে বেরিয়ে নতুন পরিমন্ডলের সাথে পরিচয় ঘটল তার।

পরিচয় ঘটল অমরনাথের সঙ্গে। বিপন্ন অন্ধনারীকে সমস্ত সামাজিক প্রতিকূলতা থেকে উদ্ধারই করলেন না অমরনাথ, পাশাপাশি রজনীর প্রকৃত পিতৃপরিচয় অবগুণ্ঠন মোচন করল এবং এক বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হল কপর্দকহীনা রজনী। শুধু আর্থিক সৌভাগ্যেরই যে অধিকারী হলেন রজনী তা নয় শেষাবধি স্বামী-পুত্র এবং দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নতুন এক জীবন পেল রজনী। শচীন্দ্র রজনীর বিবাহ শেষাবধি হলেও রজনী এবং অমরনাথের মধ্যেও এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে সম্পর্ক ছিল সম্ভ্রমতার। অমরনাথ রজনীর কাছে জীবনত্রাতা-জীবনদাতা। তাই অমরনাথের উপস্থিতিতে শচীন্দ্র ও রজনীর বিবাহের প্রস্তাব এলে রজনীর মনে যতই শচীন্দ্রর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা থাকুক না কেন অমরনাথের অভিভাবকত্ব ভেঙে বেরয়নি। রজনীর মনের কৃতজ্ঞতাবোধ অন্ধপ্রেম আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

রজনীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চাইলেন এক জন্মান্ধ নারীর পুরুষের প্রতি সক্রিয় প্রেমানুরাগ এবং তার প্রণয়ানুভূতির বিকাশ ও উন্মীলন। নারী হৃদয় মানেই প্রেমাতুর। সেখানে প্রণয়ানুভূতির স্ফূরণে চক্ষুষ্মান বা জন্মান্ধতার কোনো বিশেষ ভূমিকা নেই। বরং চক্ষুহীনা নারী তার অন্তরের শক্তিতে মানব-অন্তরের রূপ বেশি উপলব্ধি করতে পারে। জন্মান্ধ নর-নারী শব্দ ও স্পর্শের মাধ্যমে অধিকতর সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি ঠিকঠাক উপলব্ধি করতে পারে।

জন্মান্ধ মানুষের কাছে শব্দ এবং স্পর্শ কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা রজনী চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে।রজনী শচীন্দ্রের সুকোমল পরশ বুঝেছে। শুধু স্পর্শ নয়, শব্দও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে জন্মান্ধ রজনীর জীবনে। শচীন্দ্ররও শব্দও অতি সুমধুর ঠেকেছে রজনীর কানে। এই সুকোমল স্পর্শ এবং সুমধুর কণ্ঠস্বরই অন্ধ রমণীর মনে প্রেমের স্ফুরণ ঘটিয়েছে। প্রেম মনের ব্যাপার। সাধারণ নরনারীর মনে যেমন প্রেম আসে প্রতিবন্ধীর মনেও আসে প্রেম। বরং শারীরিকভাবে কোনো একটি অঙ্গের প্রতিবন্ধকতার দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে ওঠে তাদের মনের চোখ দিয়ে। মানুষ সদাসর্বদা বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় না। হৃদয়দৌর্বল্য মনের কথা দ্বারাও অনেক সময় মানুষকে চালিত হতে হবে। ‘রজনী’র মাধ্যমে সেই হৃদয়াবেগের কথাই উচ্চারিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই নীতিবাগীশ। কর্মফলবাদ নিয়তিবাদ প্রায় প্রতি রচনাতেই থাকে বঙ্কিমচন্দ্রের। গঙ্গাতীরে আত্মবিসর্জনে উদ্যত অন্ধ রজনীর নবজীবনলাভ ঔপন্যাসিকের সেই নিজস্ব কিছু নিয়মনীতিবাদেরই প্রতিফলনমাত্র। নিষ্কাম কর্ম এবং তার সুফল লাভের আদর্শ প্রতীক হয়ে উঠেছে রজনী।

কুমু (দৃষ্টিদান: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'দৃষ্টিদানে' অষ্টমবর্ষীয়া গৌরী কুমুর সঙ্গে বিবাহ হয় অবিনাশের। চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম মা হল কুমু। মা হবার কষ্টটুকু পেলেও মা হবার গৌরবটুকু লাভ করতে পারেনি। মৃতশিশুর জন্ম দিয়েছিল কুমু। অল্পবয়সে মা হবার কারণেই হোক বা যেকোনো কারণেই হোক না কেন কুমু এই সন্তানপ্রসবের পর প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আপাত শারীরিক কষ্টের লাঘব হলেও আঘাতটা গিয়ে পড়েছিল চোখের উপর। প্রথমে অল্প চোখের জ্যোতি থাকলেও ধীরে ধীরে পুরো অন্ধকারে চলে যায় কুমু। কুমুর স্বামী নতুন ডাক্তারির ছাত্র। তিনিই কুমুর চিকিৎসা করছিলেন।

বাপের বাড়ির তরফে কুমুর এক দাদা আছে। কুমুর দাদাও পড়াশোনারত। ওকালতির পড়া করছে। কলেজের ছাত্র। বোনের সুবিধা-অসুবিধার যথেষ্ট দেখাশোনা করে দাদা। বোনের চোখের চিকিৎসা যখন বোনের স্বামী শুরু করেছিল, তখন কুমুর দাদা বলেছিল কলেজের বড়ো-সাহেব ডাক্তারকে দিয়ে কুমুর চোখের চিকিৎসা করাতে। নবিশি হাতের চিকিৎসার থেকে অভিজ্ঞ হাতের চিকিৎসায় হয়ত কুমু পুরোপুরি দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ত না। কিন্তু কুমুর স্বামী এ বিষয়ে নিজের মতকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। কুমুর দাদা তাতেও হাল ছাড়েনি। যখন কুমুর স্বামী কলেজ গেছিল তখন স্বামীর অবর্তমানে বিকেলে এক বড় ডাক্তার নিয়ে এসেছিল কুমুর দাদা কুমুকে দেখানোর জন্য। ডাক্তার যথাবিধ পরীক্ষা করে কুমুর জন্য ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কুমুর জন্য দাদার যত্নের কোনো অভাব ছিল না।

কিন্তু গোড়াতেই গলদ। দাদা এবং স্বামী ,কুমুর চোখের চিকিৎসাকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিপক্ষ। এদিকে বিবাহ পূর্বজীবনের দাদা এবং বিবাহপরবর্তী জীবনের স্বামী-দুজনই কুমুর দুই ভালোবাসার মানুষ। কিন্তু এখানে কুমু স্বামীর পক্ষই নিল। নিজের ভালোমন্দ বুঝল না। বোঝার বয়সও নয় তখন কুমুর। আবেগে ভেসে গেল কুমু। কুমুর মনে হয়েছে তার দাদা তো তাকে পাত্রস্থ করে দিয়েছে। সুতরাং গোত্রান্তরিত হয়ে যাবার পর মেয়েরা স্বামীর সম্পত্তি। মেয়েদের ভালোমন্দ বোঝার দায়িত্ব স্বামীদেরই উপর। পতি পরম গুরু। পতিপরমেশ্বর। তাই দাদা ও স্বামীর দ্বন্দ্বে কুমু বুদ্ধি দ্বারা নয়, আবেগ দ্বারা চালিত হল। দাদার কথা কুমুর পক্ষে হিতকর হতে পারত জেনেও স্বামীর পক্ষ নিল কুমু।

এখানেও ছলনার আশ্রয় নিল কুমু। দাদা তো ডাক্তার ও ওষুধের ব্যবস্থা করে কুমুকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেলেন নিজের বাড়ি। আর কুমুর বাড়িতে কুমুর সাথে রইলেন কুমুর স্বামী। কুমু দাদার আনা ডাক্তারের ওষুধ মোটেই সেবন করল না। স্বামীর চিকিৎসাতেই রইল। এদিকে সে

বুঝতে পারছে চোখে ঠুলি পরে, চশমা পরে, চোখে ফোঁটা ফোঁটা ওষুধ ঢেলে, গুঁড়ো লাগিয়ে বা দুর্গন্ধ মাছের তেল থেকেও কোনোও ভাবেই চোখের দৃষ্টির উন্নতিবিধান হচ্ছে না। বরং আরোও অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। এদিকে কুমুর স্বামীও বুঝতে পারছে তার বিদ্যায় আর কুলাচ্ছে না, বড় ডাক্তার আনা উচিত। কিন্তু পুরুষের পৌরুষে ঘা লাগবে তাতে। একে তো নিজের চিকিৎসার অক্ষমতা তার উপর সম্বন্ধীর সাথে মতবিরোধে সম্বন্ধীর মতামতকে মেনে নেওয়া- এই অহং-এর আঁতে ঘা দিয়ে কুমুর স্বামীর অবস্থা যখন বিপন্ন তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী কুমু সমস্যার সমাধান করে দিল সহজভাবে। কুমু অত্যন্ত সহজভাবেই বলল স্বামীর চিকিৎসার পাশাপাশি দাদার কথামত ডাক্তার আনার কথা। কারণ দাদার সাথে মনোমালিন্য হওয়াতে কুমুর মন নাকি ভারাক্রান্ত। ডাক্তার আনা হলে দাদার মন ও মান রক্ষাও হয়। কিন্তু হ্যাঁ, চিকিৎসাপদ্ধতি কুমু মানবে তার স্বামীর।

ছলনাময়ীর ছলনায় ডাক্তার এসে কুমুর অবস্থা পরীক্ষানিরীক্ষা করে কুমুর স্বামীকে ভর্ৎসনা করেছিলেন । কুমু ভর্ৎসনার শব্দ বুঝতে না পারলেও বুদ্ধিমতি এটুকু বুঝেছিল ওষুধের পর্যায় অতিক্রান্ত। চোখের যা অবস্থা তাতে অস্ত্রোপচার অবশ্যম্ভাবী। আবার কুমুর স্বামীর সম্মানহানিকর পরিস্থিতি উপস্থিত। কিন্তু এখানেও সহায় কুমু। নিজেই স্বামীর হাত ধরে কুমু জানায়, সে জানে যে ডাক্তার অস্ত্রোপচারের বিধান দিচ্ছেন, কিন্তু কুমু অস্ত্রোপচারের নামে ভয় পেতে পারে এই আশঙ্কায় আশঙ্কিত হয়ে স্বামী তাকে কিছু বলতে পারছেন না। যদিও কুমু এটাও খুব ভাল করে জানে যে, নিজের শিক্ষার নবিশি করতে গিয়ে স্বামীদেবতাটি কুমুর দৃষ্টিশক্তির পুরোপুরি বলিদান দিয়েছে,তাই-ই এখন কুমুর সামনে দাঁড়ানোর বা মুখ তুলে কথা বলার মত সৎসাহস বা মেরুদন্ডের জোর পাচ্ছে না কুমুর স্বামী। সবই কুমুর- কুমুদেবীর কৃপা ।

এবার এল কুমুর দাদা ।দাদাকেও কি অসাধারণ সাবলীলতার সঙ্গে কুমু জানাল যে সে দাদার আনা ডাক্তারের চিকিৎসাধীনই ছিল। তাতে সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। চোখের বেশ উন্নতিও হচ্ছিল। কিন্তু নিজের দোষেই একদিন খাবার ওষুধ চোখে লাগিয়ে ফেলেছিল। তাতেই চোখ যায় যায় অবস্থা । এখন স্বামী বলছেন অস্ত্রোপচার ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই।

ফলত হলটা কি। কুমুর দাদাও মরমে মরে গেল। তার মনে হতে লাগল নিজে অন্য ডাক্তার এনে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল, তার জন্যই কুমুর আজ এই দুর্দিন। ভগ্নীপতির কথা মত চললেই বোধ হয় ভাল হত। আর ওদিকে কুমুর স্বামীও মরমে মরে ছিল।-

‘‘ছলনার ফল হইল এই যে, অন্ধ হইবার পূর্বে আমার দাদা এবং স্বামীর মিলন দেখতে পাইলাম। দাদা ভাবিলেন, গোপন চিকিৎসা করিতে গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিল, স্বামী ভাবিলেন, গোড়ায় আমার দাদার পরামর্শ শুনিলেই ভালো হইত। এই ভাবিয়া দুই অনুতপ্ত হৃদয় ভিতরে ভিতরে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া

পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী হইল। স্বামী দাদার পরামর্শ লইতে লাগিলেন, দাদাও বিনীতভাবে সকল বিষয়ে আমার স্বামীর মতের প্রতিই নির্ভর প্রকাশ করিলেন।''[৫]

ফল আরও একটা হল, এরপর কুমুর দুই শুভাকাঙ্ক্ষী স্বামী আর দাদা একত্রে পরামর্শক্রমে বড় ইংরেজ ডাক্তার তো আনলেন। তাতে কুমুর বাম চোখে প্রথমে অস্ত্রোপচার করা হল। কিন্তু দুর্বল চোখ সে আঘাত নিতে পারল না। জ্যোতি স্তিমিত হয়ে গেল। আর তারপর ডানচক্ষুও ধীরে ধীরে অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল। কুমু পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেল। তার চোখের সামনে স্বামীর তরুণমূর্তিই চিরছবি হয়ে রয়ে গেল।

মনে পড়ে, 'তাসের ঘরে'র শৈল-র কথা। যে বাপের ঘর এবং শ্বশুরঘর দুই-এরই মান-সম্মান বজায় রাখতে তৎপর। কারণ দুটোই যে তার নিজের। এই মানসম্মান বজায় রাখার জন্য নারী হয়ে ওঠে ছলনাময়ী। তবে এ ছলনাময়ী কুমু মোটেই ঊর্বশী নয়, সে কল্যাণী-গৃহলক্ষ্মী। কুমু নিজেই বলেছে-

''স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিথ্যাও বলিতে হয়! দাদার মনেও কষ্ট দিতে পারি না, স্বামীর যশও ক্ষুণ্ন করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশুকে ভুলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশুর বাপকে ভুলাইতে হয়- মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন।''[৬]

দৃষ্টিশক্তিরহিত হয়ে কুমু স্বামীকে চোখে দেখতে না পেলেও স্বামীসান্নিধ্য সবসময় পেতে থাকল। অনুতপ্ত স্বামী নিজের চোখ দিয়ে কুমুর অন্ধত্বের পূরণ করে দিতে লাগল।কুমুর কাছে কুমুর স্বামী আর স্বামীর কাছে কুমু - দু'জনেই দু'জনকে দেবত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করলেন। দেবতাকে ঘরে স্থান দেওয়া হয় উচ্চাসনে, কিন্তু দেবদেবী নিয়ে কি আর ঘরকন্না করা চলে!

কিছুদিন অতিবাহিত হল। প্রথম প্রথম কুমুর স্বামী সান্নিধ্য বেশ ভালই লাগত। এরপর অন্ধকারের জগতেই কুমু বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল। নিজের কাজকর্ম নিজে নিজেই বেশ করে নিতে সক্ষম হল। ভগবানই মানুষকে বিপদে ফেলেন, আবার তিনিই শক্তি দেন সেই বিপদ থেকে উদ্ধার হবার। কুমুও দৃষ্টিহীনতাকে জয় করতে পারল তার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির আরও প্রখরতার সাহায্যে। কুমু যে অত্যন্ত সাহসিনী এবং বুদ্ধিমতী, জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য সবসময় যেকোনো সংগ্রামে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রতি মুহূর্তে হাসিমুখে প্রস্তুত তা তার চরিত্রের দার্ঢ্যতাই প্রকাশ করে। কুমুকে কাউকে counselling করাতে হয়নি, বরং কুমু নিজেই উপলব্ধি করেছে,-

''অল্পকালের মধ্যেই কেবল শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যস্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমন-কি, আমার অনেক গৃহকর্ম পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নৈপুণ্যের সহিত নির্বাহ করিতে

পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল, দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশি বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। যতটুকু দেখিলে কাজ ভালো হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কান তখন অলস হইয়া যায়, যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্তমানে আমার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহাদের কর্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে করিতে লাগিল।''[৭]

কুমু স্বামী-অন্ত-প্রাণা। স্বামীকে সে ভালোবাসে। স্বামীর মান-সম্মান রক্ষা বিষয়ে সে সদাসচেষ্ট। নিজের সবটুকু দিয়ে সে স্বামীকে সবদিক থেকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু কখনোই কুমু মানসিকভাবে দুর্বল নয়। কুমু অন্ধ হয়ে যাবার পর তার স্বামী সর্বদা তার পাশাপাশি থাকল। কিন্তু কুমু কিছুদিন পরই স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল। স্বামী সে প্রস্তাব গ্রহণ না করায় কুমু গর্ব অনুভব করেছিল। কারণ স্বামী মনে করত, কুমুর অন্ধত্বের কারণ তারই অপরিণত বুদ্ধির ফল। কুমুর স্বামী যদি নিজের বিদ্যে-বুদ্ধির ডাক্তারি-শিক্ষার জারিজুরি কুমুর উপর প্রয়োগ না করে প্রথম থেকে বড় ডাক্তার দেখাত, তাহলে হয়ত, হয়ত কেন সত্যিই, কুমুর দৃষ্টিশক্তি অন্ধকারে নিভে যেত না। তাই প্রতি মুহূর্তে অনুতপ্ত স্বামী কুমুর প্রতি পূর্বের থেকে বেশি যত্নশীল। কিন্তু অনুকম্পা তো দাম্পত্যের ভিত হতে পারে না। কুমু কিশোরী থেকে যুবতী হয়েছে। বুদ্ধিও অনেক পরিণত হয়েছে। কুমু বুঝেছিল এভাবে স্বামীকে আটকে রাখা যায় না।

সদ্য যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া কুমুর কি অসামান্য মানসিক জোর।কুমুর নিজের ভাষায়-

''.....আমি একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার এই অনন্ত অন্ধতা দ্বারা স্বামীকে আমি আমার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিব না।''[৮]

বাস্তবিকই কুমু যখন নিজের কাজ নিজেই করে নিতে লাগল, তখন স্বামীর উপর দায়িত্বের বোঝাও অনেকটাই কমে গেল। কুমু যে তার স্বামীকে খুব ভালোভাবে চিনত বা বলা ভাল স্বামীর মন যে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কুমু বুঝতে পারত, তার পরিচয় আরও একবার পাওয়া গেল। প্রথমবার কুমুর চিকিৎসা করার সময় পরিস্থিতি যখন জটিলতর হয়ে পড়েছিল, বড় ডাক্তারের প্রয়োজন হল, তখনও স্বামী মুখ ফুটে কিছু বলতে না পারলেও কুমুই পরিস্থিতি সামলেছিল, আর এখনও কুমু বুঝতেই পারল স্বামীকে যখন অন্ধ স্ত্রীর সমস্ত কাজ করার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হল তখন যেন সে মুক্তির নি:শ্বাস নিল। কুমুর জবানিতে এই ছবিটি অত্যন্ত জীবন্ত,-

''এখন আমার স্বামীকে আর আমার কোনো কাজ করিতে দিলাম না, এবং তাঁহার সমস্ত কাজ আবার পূর্বের মতো আমিই করিতে লাগিলাম।''[৯]

এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় কুমু যে শুধু নিজের কাজটুকুই করে নিচ্ছে তাই-ই না, স্বামীর কাজগুলোও করে দিচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া-

''স্বামী আমাকে কহিলেন, '' আমার প্রায়শ্চিত্ত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছ।''[১০]

এখানে বিশেষভাবে বলা দরকার, স্বামী কুমুর প্রতি যে দায়িত্ববোধ দেখাচ্ছেন তা তার মনের অনুতাপজনিত। কুমুর প্রতি করা অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় স্বামী। কুমুকে ভালোবেসে কুমুর অভাববোধটুকু পূরণ করছেন না স্বামী। ভালোবাসার অভাবটুকু দৃষ্টিহীন কুমুর অনুভব করতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। তাই তো সে স্বামীকে বলেছিল,-

''আমি কহিলাম, ''তোমার প্রায়শ্চিত্ত কিসের আমি জানি না, কিন্তু আমার পাপের ভার আমি বাড়াইব কেন।''[১১]

আসলে ভালোবাসার সম্পর্কে পাপ-পুণ্যের বোধ আসে না। দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তি হল মধুররস। যেখানে থাকবে বিপ্রলম্ভস্য শৃঙ্গার এবং সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার। এখানে কুমু এবং তার স্বামীর সম্পর্ক সেই রসপর্যায়ের শ্রেষ্ঠতম উচ্চতম পঞ্চমস্তরে উন্নীত হতে পারেনি। তাই জন্যই তো কুমুর উপলব্ধি -

''যাহাই বলুন, আমি যখন তাঁহাকে মুক্তি দিলাম তখন তিনি নি:শ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অন্ধ স্ত্রীর সেবাকে চিরজীবনের ব্রত করা পুরুষের কর্ম নহে।''[১২]

কুমু এবং কুমুর স্বামী দুজনেই দুজনকে মানব-মানবী থেকে দেব-দেবীর পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম যদিও দেববাদের মোড়কে মানবতাবাদের জয়গান, কিন্তু মীরাবাঈ যে কৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন সেখানে তো মধুররসের উৎসারই ছিল সমধিক। কুমুর দাম্পত্যও যেন দেবত্ব আর কর্তব্যের নিগড়ে বেঁধে রাখতে চাইল না। মুক্তির নি:শ্বাস দিল। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তারিণী মাঝির কথা। স্ত্রী সুখীকে তারিণী মাঝি সবথেকে বেশি ভালোবাসলেও আত্মরক্ষার আদিম জৈবিক প্রবৃত্তিতে আত্মপ্রেমই এক এবং একমাত্র থাকে।

কুমুর স্বামী বিবাহকালে ডাক্তারির ছাত্র ছিল। এতদিনে তিনি ডাক্তারি পাশ করে ফেলেছেন। কিন্তু যতদিন অন্ধ স্ত্রীর ভার তাঁর উপর ছিল ততদিন ডাক্তারিতে পসার ততটা জমে ওঠেনি। এতদিন পর মফস্বলে গিয়ে ডাক্তারির পসার বাড়তে লাগল কুমুর স্বামীর। কুমুও মফস্বলে এসে নিজের শৈশব খুঁজে পেল। রবীন্দ্রনাথের বধূর সবসময়ই 'পাষাণ-কায়া' 'রাজধানী'র ইঁট-কাঠ-পাথরের মধ্যে অস্তিত্ব-সঙ্কট হয়। কুমুও শৈশবে পল্লীপ্রকৃতির সান্নিধ্যেই বাল্যকাল অতিবাহিত করেছে আটবছর। তারপর বিবাহের পর শহরবাসী হয়েছে। তারপর আবার দশবছর পর স্বামী হাসিমপুরে

চলে এলে দীর্ঘদশ বছর পর কুমু আবার প্রকৃতিমাতার কোলে স্থান লাভ করে।। এই দশবছরে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতি মাতারও, কুমুরও। কুমু এখন আর বালিকা নেই। অষ্টাদশী কুমু এখন দশবছরের গৃহিণী। অন্ধ হলেও কুমুর এখন অতিরিক্ত বোধক্ষমতা রয়েছে। যা দ্বারা সে সমগ্র জগৎকে আরও বেশি ভালভাবে প্রতীয়মান করতে পারে।

কুমুর স্বামী অবিনাশ মফস্বলে এসে ডাক্তারিতে বেশি মন দিল। এ যেন স্ত্রীর অনন্ত অন্ধত্ব থেকে পালিয়ে যাবার এক নেশা। এ নেশায় বিসর্জিত হল অবিনাশের মনুষ্যত্ববোধও। এতদিন যে ছিল শুধুই কুমুর স্বামী, এখন হাসিমপুরে এসে তার নতুন পরিচয় তৈরি হল, ডাক্তারবাবু- অবিনাশ ডাক্তার। অন্ধ কুমু স্বামীর এই পরিবর্তন ধরতে পেরেছিল। স্বামী ডাক্তার বলে কুমুর মনে স্বামীকে নিয়ে এই গর্ব অনুভব হত। কারণ স্বামী যে ডাক্তারি করে, তা শুধু পেশাগত কারণে জীবিকাসংস্থানের জন্য নয়, স্বামীর কাছে ডাক্তারি ছিল মানুষকে সেবা করার এক মহৎ ব্রত। কিন্তু হাসিমপুরে কুমুর স্বামী হয়ে উঠল অর্থ পিশাচ অবিনাশ ডাক্তার। স্বামীর এই পরিবর্তন কুমুকে বড়ই আঘাত করত। স্বামী অবিনাশ বড় আমলাদের সাথে উঠাবসায় যতটা স্বচ্ছন্দ এবং স্বত:স্ফূর্ত ছিল, গরীব মানুষদের সেবার ব্যাপারে ততটাই অনীহ ছিল। কুমুই একবার মাথার দিব্যি দিয়ে দরিদ্র এক রমণীর একমাত্র ছেলেকে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছিল। কিন্তু সময় যত এগোল সেটাও আর সম্ভব হল না কুমুর পক্ষে। তাই ওলাওঠা আক্রান্ত বাচ্চা মেয়েটির চিকিৎসায় যেতে নাকচ করে দিল যখন অবিনাশ শুধুমাত্র টাকার অভাবে, তখন কুমু সেই বাচ্চা মেয়েটির বৃদ্ধ দাদুকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিল। বৃদ্ধটি ছিল মুসলমান। কুমু তাকেও সাহায্য করে নাতনীর আরোগ্য এবং স্বামীর মঙ্গলকামনার প্রার্থনা জানিয়েছিল।

জীবন মানেই উত্থান-পতন। জীবন মানেই প্রতিদিন নতুন কিছু। হতে পারে তা ভাল, আবার হতে পারে তা ভালো নয়। ভালো না মন্দ- এ শব্দ দুটিও পারস্পরিক পারিপ্রেক্ষিত। ভালো বা মন্দ আপাত ফল দেয় মাত্র। সুদূরবিস্তারী ফল হয়ত অন্য কিছু হতে পারে। এবার কুমুর জীবনে এল এক নতুন ঘটনা। হাসিমপুরে ভাইপোর খোঁজখবর করার জন্য কুমুদের বাড়িতে এলেন অবিনাশের পিসিমা। আগমনের আসল উদ্দেশ্য ভাইপো অবিনাশের আবার বিয়ে দেওয়া। একে তো অবিনাশের বউ কুমু অন্ধ। অবিনাশের বয়স কম। জীবিকার পসার ভাল। সুতরাং এ হেন পুরুষ মানুষের এমন অন্ধ স্ত্রী! তার উপর আবার পিসিমার ঘরেই রয়েছে ভাসুরের বয়স্থা কন্যা হেমাঙ্গিনী। চোদ্দ-পনের বছরের হেমাঙ্গিনী এবং অবিনাশের বিবাহ ঘটানোই পিসিমার আগমনের মূল উদ্দেশ্য।

কুমুর অন্তর্দেশ উত্তাল। হেমাঙ্গিনীর সাথে আলাপ পরিচয় হল কুমুর। ভারী মিষ্টি মেয়ে হেমাঙ্গিনী। কিন্তু এই অবস্থাতেও একমাত্র প্রার্থনা-

''ভগবান আমার স্বামীকে রক্ষা করো।''[১৩]

কুমু অন্ধ চোখেও বেশ বুঝতে পারছিল অবিনাশের আচরণের পরিবর্তন। যে অবিনাশ হাসিমপুরে এসে অর্থের পিছনে ছুটছিল সেই অবিনাশই এখন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে ঘরে চলে আসেন, দূরে ডাক পড়লে শুধুমাত্র পারতপক্ষে যানই না, শুধু তাই-ই নয় , যে অবিনাশ আগে শুধুমাত্র কর্ম অবসরে এবং মধ্যাহ্ন আহার ও নিদ্রার সময় অন্তপুরে থাকত, সেই এখন যখন তখন পিসিমার খবরাখবর নেবার জন্য অন্তপুরে এসে হাজির হয় আর পিসিমারও তখনই হেমাঙ্গিনীকে সবিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যদিও বুদ্ধিমতী হেমাঙ্গিনীকে এভাবে অবিনাশের সাথে বাঁধা দুরূহতর হয়ে ওঠে ক্রমান্বয়ে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে হেমাঙ্গিনী ফিরে গেল নিজের বাড়ি। এরপর থেকে অবিনাশের আচরণেও বেশ কিছু পরিবর্তন ধরা পড়ল কুমুর কাছে সে স্বামী যতই কুমুর কাছে বিশেষ প্রফুল্লতা দেখিয়ে বলুক যে হেমাঙ্গিনীরা চলে যাওয়াতে স্বস্তির পরিবেশ ফিরেছে। অবশ্য এই কথার মধ্যে অজান্তেই অবিনাশের স্বীকৃতি রয়েছে যে হেমাঙ্গিনীরা থাকাতে তার কাজের বিঘ্ন ঘটত। কুমুর অন্ধ চোখ সবই দেখতে পেত।

আসলে হেমাঙ্গিনী কুমুর জীবনে এক নতুন জীবনীশক্তির সঞ্চার করেছিল। হেমাঙ্গিনীর সান্নিধ্যে কুমুর প্রাণের মধ্যে এক সৌন্দর্য সঙ্গীত সুগন্ধিত হয়ে অনুরণিত হয়েছিল। কুমুর প্রাণে এক উজ্জ্বল আলো এবং কোমল তরুণতার সঞ্চার করেছিল হেমাঙ্গিনী। হেমাঙ্গিনী কুমুর সংসারে আসার আগে পর্যন্ত কুমু ছিল অসপত্নস্বামীসুখগর্বিতা নারী। কুমু তার স্বামীকে দেবত্বে বরণ করেছিল। কুমুর মনে এক সূক্ষ্ম অসূয়া কোথাও হয়ত কাজ করেছিল যে কুমুর স্বামীও কুমুকে দেবীত্বের আসনে বসিয়েছেন । কুমু যেমন স্বামীর সম্মানকে বড় করার জন্য নিজের দৃষ্টিদান করেছিল, অবিনাশ তেমনই প্রতিমুহূর্তে ছিল স্ত্রীর প্রতি নিবেদিত এবং অনুতপ্ত। তাই অন্ধত্বের কিছুদিনের মধ্যেই অবিনাশ যখন কুমুর দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল তখন কুমুর মধ্যে আত্মতৃপ্তি অনুভূত হয়েছিল। স্বামীসৌভাগ্যবতী কুমু। হেমাঙ্গিনী এসে কুমুর সেই মর্যাদাতেই আঘাত হেনেছিল।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে দেখি মৃণাল বলেছিল মা হবার যন্ত্রণাটুকু পেয়েছিলাম কিন্তু গৌরবটুকু লাভ করতে পারিনি। তাই মৃণালের সেই মৃতা কন্যার স্থানটুকু দখল করে নিয়েছিল বড় জায়ের বোন বিন্দু। এই বিন্দু অবলম্বনে মৃণাল আত্মমুক্তি নারী-স্বাতন্ত্র্যের জয়ধ্বনি ঘোষণা করতে পেরেছিল। 'দৃষ্টিদান'-এ কুমুও সন্তান হারানো, দৃষ্টি হারানোর শোক ভুলেছিল অসপত্নস্বামী প্রেমে। হেমাঙ্গিনীর

উপস্থিতিতে কুমুর সেই গৌরবের অমর্যাদার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তখন কুমুর মধ্যে জাগরণ ঘটে এই নব নারীত্বের।

কুমু বুঝতে পারত তার স্বামী হেমাঙ্গিনীদের খবরাখবর বেশ ভালই রাখত। নিয়মিত চিঠি পত্রের লেনদেন চলত। কিন্তু অবিনাশ তার কাছে সেই সত্য লুকিয়ে যেত। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন কুমু ঝি-র থেকে খবর পায় যে অবিনাশ দূরে কোথাও যাবার আয়োজন করছে। কুমু অবিনাশকে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অবিনাশ প্রথমে রুগী দেখতে যাওয়ার কথা বললেও পরে কুমুর তেজস্বীতার সামনে স্বীকার করে যে অবিনাশ বিবাহ করতেই যাচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে পাত্রী অবশ্যই হেমাঙ্গিনী। সত্যের উপর থেকে পর্দা যখন উঠে গেল, তখন কুমুর সমস্ত বাঁধ ভেঙে পড়ল। বেশকিছুক্ষণ নৈ:শব্দ্যের পর কুমু মাটিতে পড়ে স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে স্বামী দেবতাকে প্রশ্ন করে-

> ''.....আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি, কিসে আমার ত্রুটি হইয়াছে, অন্য স্ত্রীতে তোমার কিসের প্রয়োজন।''[১৪]

অথচ এই কুমুই একদিন তার অন্ধত্বের কয়েক মাসের মধ্যে স্বামীকে বলেছিল-

> ''তুমি যে তোমার ঘরকন্নাকে একটি অন্ধের হাসপাতাল করিয়া রাখিবে,সে আমি কিছুতেই হইতে দিব না। তোমাকে আরেকটি বিবাহ করিতে হইবে।''[১৫]

অবিনাশ সেই প্রস্তাব সমূলে উৎপাটিত করে দেওয়াতে এই কুমুই বলেছিল-

> ''আমি কি তোমাকে নিজের সুখের জন্য বিবাহ করিতে বলিয়াছিলাম। সতীনকে দিয়া আমি আমার স্বার্থসাধন করিতাম। চোখের অভাবে তোমার যে কাজ নিজে করিতে পারিতাম না, সে আমি তাহাকে দিয়া করাইতাম।''[১৬]

তাহলে অবিনাশ সত্যই বিবাহে উদযোগী হলে কুমুর এই হৃদয়-বিপর্যয় কেন?

ওভিদের হেরোইদাস এর অনুসরণে মাইকেল মধূসুদন দত্ত পৌরাণিক নারীদের মুখে ভাষা দিয়েছিলেন বীরাঙ্গনার পত্রগুলিতে। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে উপেক্ষিতা'তে সেই সব নারীদের নিয়েই বলেছিলেন যারা নিজেদের যুগে প্রাপ্য সম্মান মর্যাদাটুকু পাননি। রবীন্দ্রনাথের কুমু তার স্বামী দেবতাটিকে প্রশ্ন করেছে কেন অবিনাশ তাকে ছেড়ে অন্য বিবাহে যাচ্ছে। একদিন যে অবিনাশ কুমুকেই একক ভার্যাত্বে স্থাপিত করেছিল, আজ সেই অবিনাশের এই মতিবদল কেন? কোথায় গেল কুমুর দেবীত্ব?

পুরুষ চায় আশ্রয়। নারীর সাথে সে সুখনীড় রচনার স্বপ্নজাল বয়ন করে। অবিনাশও যৌবনের প্রথম ভুলে স্ত্রীকে দেবীত্বে আরোহণ করিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবের কঠোরতার সঙ্গে অবিনাশ জীবনের দেবী এক নয়। এক মানবীর প্রেম বুভুক্ষু হয়ে পড়েছিল। কুমুকে সে সত্যই বলেছিল,-

''সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভয় করি। তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারিনা! যাহাকে বকিব,ঝকিব, রাগ করিব, সোহাগ করিব, গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।''[১৭]

এই শব্দগুলিই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল 'শেষের কবিতা'য়। দিঘির জল আর ঘরায় তোলা জল প্রেমের রোম্যান্টিকতা আর দৈনন্দিনতার কথা দ্যোতিত ও ব্যঞ্জিত করে।

কুমু স্বেচ্ছায় মানবী থেকে দেবী হয়নি। তার স্বামী তাকে দেবীত্বে অধিষ্ঠিত করেছিল। কুমু চিরকালই স্বামীর কথা, ইচ্ছাকেই সম্মান দিয়ে এসেছে। তাই কুমুর মানবী হতে ইচ্ছে হলেও স্বামীর ভালো লাগাকে মর্যাদা দিয়ে সে আবরণ ছিন্ন করতে পারেনি। শেষে অবিনাশের মানবী স্ত্রীর কামনা বাসনার কথা জানতে পেরে কুমুর মধ্যে থেকেও বেরিয়ে এসেছে এতদিনকার রুদ্ধ সমস্ত আবেগ-

''আমার বুকের ভিতরে চিরিয়া দেখো! আমি সামান্য রমণী, আমি মনের মধ্যে সেই নববিবাহের বালিকা বৈ কিছু নই, আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, পূজা করিতে চাই; তুমিই নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দু:সহ দু:খ দিয়া তোমার চেয়ে আমাকে বড়ো করিয়া তুলিয়ো না- আমাকে সর্ববিষয়ে তোমার পায়ের নীচে রাখিয়া দাও।''[১৮]

নিজের সবটুকু উজার করে দিয়েছে কুমু তার স্বামী দেবতাকে। এরপর এক নতুন কুমুর আবির্ভাব। এ কুমু দেবী নয়। রক্ত মাংসের মানবী। স্বামীসুখ সে কারোর সাথে ভাগ করে নিতে পারবে না। তাই শেষে সে বলেছিল-

''যদি আমি সতী হই, তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনোমতেই তোমার ধর্ম শপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া থাকিবে না।''[১৯]

বিশেষ লক্ষ্যণীয় কুমু অসপত্নস্বামীঐশ্বর্যশালিনী হতে চায়। স্বামী দ্বিতীয় বিবাহে উদ্‌যোগী। ত্রিকোণ এক সম্পর্কের সম্ভাবনায় কুমু নিজের মৃত্যুবাঞ্ছা কিন্তু একবারও করেনি। হয় হেমাঙ্গিনী নয় স্বামীর মৃত্যু কামনা করে বিবাহে ভন্ডুল কামনা করেছে। কারণ সে জানে, তার স্বামীকে তার থেকে ভাল আর কেউ রাখতে পারবে না। কুমুর স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই। তাই কুমু

আবেগের বশেও হেরে যাবার কথা একবারও বলেনি। নারীসুলভ হৃদয় দৌর্বল্য প্রকাশ করেনি। প্রবল আত্মবিশ্বাস তার। বলেনি জীবনসংগ্রাম থেকে পালিয়ে যাবার কথাও। তাই ভাগ্যলক্ষ্মী শেষপর্যন্ত বিজয়মাল্যে কুমুকেই বরণ করে নিল।

ঘটনা পরম্পরায় জানা যায়, অবিনাশ কুমুকে অতিক্রম করে হেমাঙ্গিনীকে বিবাহের উদ্দেশ্যে জলপথে যাত্রা করেছিল বটে। কিন্তু তার নৌকো প্রকৃতির রোষে পড়েছিল। কালবৈশাখীর ঝড় সামলে অবিনাশ মথুরাগঞ্জে পৌঁছে খবর পান যে তার আগের দিন কুমুর দাদার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। কুমু এবং অবিনাশের পুনরায় মিলন হয়। কিন্তু এখানে দুজনেরই দেব-দেবীত্বের মোড়ক মোচন হয়। দুই মানব-মানবীর মিলন সুমধুর হয়।

কুমুর দাদা যে হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করল তাও একপ্রকার সাধিত হয়েছিল কুমুর দ্বারাই। মা মারা যাবার পর কুমুর দাদার বিবাহ দেবার মত আর কেউই ছিলনা। এদিকে কুমুর দাদাও পণ করেছিলেন বিবাহ করবেন না। হেমাঙ্গিনী মেয়েটিও ভারী মিষ্টি। সে কুমুকে নিজের দিদির মতই যত্ন আত্তি করার মানসিকতা সম্পন্ন ছিল। এসব কিছুরই শুভ সমাপতন ঘটেছিল কুমুর জন্যই। কুমুর অন্তরের প্রখরতা বহির্দৃষ্টির অন্ধকারকে আবৃত করে সবার জীবনেই এক নতুন আশার আলোক প্রজ্জ্বলিত করেছিল।

সেনদিদি (পুতুলনাচের ইতিকথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে গাওদিয়া গ্রামের অপরূপ সুন্দরী নারী সেনদিদি। বয়স এই তিরিশের কোটায়। সেনদিদি হল বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। তার স্বামী যামিনী কবিরাজ বৃদ্ধ। সাধারণত নারীর পরিচয় হয় পুরুষের পরিচয়ে। শৈশবে বাল্যে অমুক বাবুর কন্যা, তমুকের ভগিনী, যৌবনে অমুক বাবুর স্ত্রী এবং বার্ধক্যে অমুকবাবুর মা। পুরুষশাসিত সমাজে এর উল্টো ঘটনা তথা নারীর পরিচয়ে পুরুষের পরিচয় সাধারণত: ঘটে না। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে মানিক যামিনী কবিরাজের আগে সেনদিদিকে পাঠকমহলে পরিচয় করিয়েছেন। সেনদিদি - যামিনী কবিরাজের উপাখ্যান উপন্যাসে এভাবেই শুরু হয়েছে যে, শশী যাকে সেনদিদি বলে ডাকে সেই সেনদিদি জ্বরে আক্রান্ত এবং নিজের স্বামী কবিরাজ হওয়া সত্ত্বেও সেনদিদি যামিনী কবিরাজের ওষুধ খায় না। সেনদিদির চিকিৎসার ভার ন্যস্ত শশী ডাক্তারের উপর।

চিকিৎসা করতে এসে শশী বুঝতে পারে শরতের গোড়ায় অসময়ে গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়েছেন সেনদিদি। শেষপর্যন্ত শশীর অক্লান্ত সেবা ও চিকিৎসায় সেনদিদি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসে। গুটি শুকাতে গোটা কার্তিক এবং অগ্রহায়ণের কয়েকটা দিন কেটে যায়। সেনদিদির বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের লালিত রূপ নষ্ট হয়ে যায় এবং সব থেকে বড় কথা সেনদিদি তার একটা চোখ

হারায়। সেনদিদির একচোখের দৃষ্টি এবং আরেক চোখের দৃষ্টিহীনতা তার চরিত্রের দ্বিমুখীনতারই দ্যোতনা। একদিকে শশীকে স্নেহ আবার অপরদিকে শশীকে প্রতিপক্ষ মনে করা এই দুই চারিত্রিক বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনা রয়েছে একচক্ষুহীনতায়। সেনদিদির এই প্রতিবন্ধকতা শারীরিক হলেও অন্তিমে তা মানসিক এবং চারিত্রিক-ভাববাহী।

যামিনী কবিরাজ এবং সেনদিদির এই অসম বিবাহের পিছনে গোপালের হাত আছে বলে সবাই মনে করে। বৃদ্ধ যামিনী কবিরাজকে সেনদিদির মতো এরকম অপরূপা তরুণী ভার্যা জুটিয়ে দেবার জন্য যামিনীর কাছ থেকে গোপাল অনেক টাকা নিয়েছে বলে লোকে মনে করে। শুধু তাই-ই নয় গোপালের সাথে সেনদিদির এক অবৈধ সম্পর্ক আছে বলেও অনেকে মনে করে এবং এ নিয়ে কুৎসাও রটায়।সেনদিদি ছিল নি:সন্তান। আর যেকোনো কারণেই হোক না কেন, শশীর প্রতি সেনদিদির বাৎসল্যের উৎসার ছিল অবাধ। শশীকে সন্তানজ্ঞানেই স্নেহ করত সেনদিদি।

বাৎসল্যের অধিকারবোধেই সেনদিদি শশী ডাক্তারের কাছে ওষুধ নিয়ে মুখে বসন্তের দাগ মিলিয়ে যাবার উপায় খোঁজে। সেনদিদিকে সুস্থ করে তোলার পর ডাক্তার শশীর নামডাক বেড়ে যায়। গ্রামের একজন বৃদ্ধার ছানি অপারেশনের কথা জানতে পেরে সেনদিদি তার নিজের পেটের সন্তানের থেকেও বেশি ভালোবাসার আধার শশীর কাছে চোখ ভালো করে দেবার আবদার জানায়। কিন্তু শশী যখন জানায় তার একটা চোখ চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে গেছে তাই দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, কিন্তু শারীরিক কুরূপতা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কাঁচের চোখ লাগানো যেতে পারে। কিন্তু শশীর এই কথায় সেনদিদির বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। শশীর সমস্ত ঋণ ভুলে সেনদিদি শশীকে তিরস্কার করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে জানান, তাঁর স্বামী যামিনী কবিরাজই হয়ত ঠিক বলেন, শশীর চিকিৎসাতেই বুঝি বা সেনদিদির চোখ নষ্ট হয়ে গেছে।

সেনদিদির এই আচরণ শশীকে ব্যথিত করে। শশীর মনে হয়, যে সেনদিদির সঙ্গে তার সম্পর্কের ভিত্তিতে রয়েছে এত সুদৃঢ় ভালোবাসা, অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা তা কি করে ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদের মতো কৃতঘ্নতায় উদ্বায়ী হয়ে যেতে পারে? কিন্তু আসলে সেনদিদির এই আচরণের পশ্চাতে ক্রিয়া করছে এক জটিল মনস্তত্ত্ব। একদিকে রয়েছে বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে অসম দাম্পত্যের অসুখ, যা প্রতিমুহূর্তেই অন্তর্দ্বন্দ্ব করেছে তরুণী ভার্যাটিকে। স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তিভূমি যেখানে নিশ্ছিদ্র বিশ্বাস, সেখানে যামিনী কবিরাজ এবং সেনদিদির দাম্পত্যে রয়েছে শুধুমাত্র পারস্পরিক সন্দেহ এবং অবিশ্বাস। তার উপর দাম্পত্যের যোগসূত্রস্বরূপ নেই কোনো সন্তানও। সমস্ত নারীই নারীত্বের পরিপূর্ণতার তৃপ্তি লাভ করে সন্তানস্নেহে। সেনদিদি সেই স্নেহরসেও বঞ্চিত। তার ঊষর মনোভূমিতে একমাত্র মরুদ্যান শশীর উপর বাৎসল্য অভিস্নাত। তাই শশীর উপর অধিকারবোধ প্রবল সেনদিদির।

সেই অধিকারবোধেই শশী ডাক্তার সেনদিদির কাছে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ। তাই সেনদিদি প্রবল আকাঙ্খা করেছে শশীর কাছে। আর সেনদিদির জীবনের একমাত্র সম্পদ বলা যেতে পারে তার রূপটুকুই। তাই সেটুকু ফিরে পাবার উদগ্র বাসনা তার মধ্যে প্রকটিত। তাই শশীকে বলা তার কথাগুলি যে তার স্বামী যামিনী কবিরাজ ঠিকই বলেছেন যে শশী মোটেই সুচিকিৎসক নয়। বরং সেনদিদির চোখ যে নষ্ট হয়েছে তার কারণ শশীর ভুল চিকিৎসা বা চিকিৎসার গাফিলতি- এ সেনদিদির প্রবল অভিমানের কথা।

সেনদিদির কথাগুলি তার চরিত্রের সারল্য এবং অকপটতার প্রমাণ দেয়। শশীকে যে সে ভালোবাসে সে কথাও যেমন সে স্বীকার করেছে অম্লান বদনে, ঠিক তেমনি আবার শশীর প্রতি জমে থাকা ক্ষোভও সে উগড়ে দিয়েছে। মনের মধ্যে জমিয়ে রেখে আপাত ভালো ব্যবহার করে কারো মন ভোলানোর চেষ্টা সে করেনি।

যামিনী কবিরাজকে গোপাল খুড়ো সম্বোধন করে। সেই সম্পর্কসূত্রে গোপালপুত্র শশী যামিনীকে বলে ঠাকুরদা আর তার স্ত্রীকে ডাকে সেনদিদি বলে। এই সেনদিদির সঙ্গে গোপালের অবৈধ সম্পর্ক গ্রামে কারো অবিদিত নয়। আবার শশীর সেনদিদির প্রতি বিশেষ সেবাযত্ন গোপাল এবং যামিনীর উভয়ের চোখেই অশ্লীল। উপন্যাসের শেষার্ধে দেখা যায় যামিনী কবিরাজের মৃত্যুর পর সেনদিদির শরীরে মাতৃত্বের লক্ষণ স্পষ্ট হতে থাকে। শেষাবধি শশী ডাক্তারের হাতেই পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে সেনদিদি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে। আর একেবারে শেষধাপে গোপাল শশীকে গ্রামের সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করে সেনদিদির এই পুত্রসন্তানকে নিয়ে কাশী চলে যান।

সেনদিদির চরিত্রের আরেকটি দিক একবার ব্যথিত করেছিল শশীকে। শশীর মেজবোন বিন্দুর খবর নিতে গিয়ে শশী বিন্দুকে কলকাতা থেকে গাওদিয়ায় নিয়ে আসে বিন্দুর প্রকৃত জীবন পরিস্থিতি সম্পর্কে সত্যোদ্‌ঘাটন হওয়ায়। গ্রামে আসার পর সেনদিদি বিন্দুর শরীরে গহনা ইত্যাদির অভাব দেখে সিদ্ধান্ত করে যে বিন্দুর স্বামী নন্দলাল আরেকটা বিয়ে করে বিন্দুকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বিন্দুর প্রতি বর্ষিত সেনদিদির প্রশ্নবাণগুলি আসলে যেন বিদ্ধ করছিল শশীকে। শশীর মনে হয়েছিল যে সেনদিদিকে শশী অক্লান্ত পরিশ্রম করে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে সেই মানুষটি কি করে শশীর বোন সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করতে পারে? আসলে সেনদিদির এই আচরণের মধ্যে রয়েছে নিজের জীবন-যৌবনের ব্যর্থতা এবং সর্বোপরি বিকৃত ব্যথিত মনোবৃত্তি।

আসলে সেনদিদির মধ্যে অচরিতার্থ কামনা এবং ইন্দ্রিয়জ বিকৃত বাসনা বঙ্কিমগতিতে প্রকটিত হয়েছে আর এর ফলেই সেনদিদির জীবনে নেমে এসেছে অমোঘ নিয়তি। যামিনী কবিরাজকে গোপাল খুড়ো সম্বোধন করে, সেই সূত্রে সেনদিদি গোপালের মাতৃস্থানীয়া। আর গোপালের

ছেলে শশীকে সেনদিদি সন্তানজ্ঞানে স্নেহ করে। দুটি সম্পর্কে মা এবং পুত্রের মধ্যে কাজ করছে ইডিপাস কমপ্লেক্স। আবার লোকসাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে দেখতে গেলে দাদু-নাতনির বিবাহ-সম্পর্ক কল্পিত হয়। এক্ষেত্রে গোপালকে মাঝখানে যোগসূত্র হিসাবে প্রতিস্থাপন করলে সেনদিদি এবং শশীর মধ্যে রয়েছে ঠাকুরমা এবং নাতি সম্পর্ক।

সনাতন (অন্ধ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'অন্ধ'তে সনাতন চক্রবর্তী জন্মান্ধ নয়, মদ্যপানের ফলে পঞ্চান্ন বছর বয়সে দৃষ্টি শক্তি পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। অত্যন্ত বিষয়ী মানুষ সনাতন চক্রবর্তী। মাতৃহীনা একমাত্র কন্যার বিবাহ নামমাত্র পণে তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। কারণ তিনি ভেবে রেখেছিলেন তার অবর্তমানে তার বাড়িটির মালিক হবে তার একমাত্র কন্যাই। সেই সূত্রে জামাতা বাড়ির অধিকারস্বত্ত্ব ভোগ করবে। তাই অতিরিক্ত কন্যাপণের অর্থ আর ব্যয় করতে চায়নি সনাতন। সেই অর্থ নিজের বৃদ্ধবয়সের অবলম্বন হিসাবে গচ্ছিত রেখেছেন। যতই সেই অর্থ দ্বারা মদ্যপানের জোগান বজায় রাখাই আসল উদ্দেশ্য হোক, কিন্তু তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় যেখানে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা সর্বহারা হয়, সেখানে সনাতন চক্রবর্তী এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ।

এই ব্যতিক্রম আসলে সনাতন চক্রবর্তীর চারিত্রিক দার্ঢ্যতার পরিচায়ক। বাংলাদেশে মেয়ে সন্তানের পিতার একটি বিশেষ পরিচয়ই হল কন্যাদায়গ্রস্ত। মেয়ে এবং মেয়ের বাড়ির লোকজন ছেলের বাড়ির কাছে যেন সবসময় দয়াপ্রার্থী- করুণার পাত্র। সেই পরিস্থিতি সনাতন চক্রবর্তীর কাছে পদানত তার জামাতা গিরিজাকুমার। তার কারণ অবশ্যই গিরিজাকুমারের ওকালতি করেও কম পয়সা উপার্জন এবং সনাতন চক্রবর্তীর অবসরজীবনেও আর্থিক স্বচ্ছলতা। সনাতনের বাড়িতে গিরিজাকুমার শুধুমাত্র সনাতনের মেয়ে মোহিনীকে নিয়েই আসেনা, সাথে আসে গিরিজাকুমারের মা শীতলাদেবী এবং গিরিজাকুমারের খুড়তুতো বোন আনু। তাই কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর সনাতন চক্রবর্তী মেয়ে-জামাই-এর কাছে মাসোহারা চাইতেও কুণ্ঠিত নন। বরং, খুব সুন্দরভাবে হিসাবী মানুষের মত সনাতন তার জামাই গিরিজাকে বলেছে যে বাড়িভাড়ার টাকাটা তো তাদের বেঁচে যাচ্ছে। সপাটে যেন চাবুক মারল সনাতন জামাইকে যে তোমাদের নিজেদের বাড়ি নেই, আর সনাতন দোতলা বাড়ির মালিক।

কাহিনিসূত্রে জেনেছি, বিয়ের পর মোহিনী তাঁর স্বামীর বাড়িতে গিয়ে অত্যাচারিত হয়েছিল। এতে নতুন কিছু নেই। গ্রামবাংলায় বধূনির্যাতন স্বাভাবিক ঘটনা। মানিক চমক সৃষ্টি করলেন সনাতনের অন্ধত্ব এনে। প্রথমদিনই গিরিজার মা যখন সনাতনের বাড়িতে আশ্রিতা হয়ে এসে সনাতনকেই গালমন্দ করছিলেন তখন প্রথমে চোখে দেখতে না পাওয়ার কারণে শীতলার বাতে

ব্যথা পায়েই বিশাল শরীর নিয়ে সনাতনের পড়ে যাওয়া এবং বলা যে, ভাগ্যিস মুখের উপর পড়ে যাননি এবং কিছুক্ষণ পরই বিড়ালের শব্দ মনে করে হাতের লাঠি চালনায় শীতলার মাথা ফেটে যাওয়া এবং কিছুদিন বাদে শীতলার আঘাত কতটা কমল জানতে চেয়ে শীতলার চোখে আঙ্গুলের খোঁচা-সবটাই সনাতনের অন্ধত্বের ফলাফল। এককালে মোহিনী অত্যাচারিত হয়েছিল গিরিজার বাড়িতে। কিন্তু জামাই-আদর গিরিজার একেবারেই ভিন্নমাত্রায় পরিবেশিত হয়েছে সনাতন চক্রবর্তী চরিত্রে। অন্ধত্বের মোড়কে সামাজিক কুপ্রথার যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া কন্যার পিতাদের প্রতিবাদের ভাষা হলেন সনাতন চক্রবর্তী। নামটি বেশ লক্ষ্যণীয়। 'সনাতন' শব্দটির অর্থ যা চিরন্তন চলে আসছে। আর চক্রবর্তী অর্থে রাজা বা অধিপতি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চিরকাল চলে আসা কু-প্রথাকে শাসন করালেন সনাতন চক্রবর্তীর মাধ্যমে।

হামিদা (সুন্দরম্ : সুবোধ ঘোষ)

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প 'সুন্দরম্' হামিদা পশ্চিমা বেদিয়াদের মেয়ে। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে একটা চোখ হারায় হামিদা। কানা হামিদাকে দল ত্যাগ করে। তখন থেকেই হামিদা আর হাবুর একসঙ্গে জীবনচলা শুরু হয়।

দশরথ (সংকেত : সোমেন চন্দ)

সোমেন চন্দের 'সংকেত' গল্পের এক ছোট চরিত্র দশরথ। গল্পকার পাঠকের সঙ্গে তার পরিচয়ই করায় অন্ধ দশরথ নামে। 'সংকেত' গল্পটির সূত্রপাতই হচ্ছে অন্ধ দশরথের দূরে কিছু একটা আসছে সেটা দেখার মাধ্যমে। অন্ধ দশরথের দর্শন শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্য।

দশরথের দুই ছেলে। এক ছেলে গেছে বেহালে। আর এক ছেলে রাম। রামের বয়স অল্প। সে বাবার সাথেই থাকে। বনগ্রামের মরা নদীতে পিতাপুত্র জীবিকার সন্ধানে সংগ্রামরত। অন্ধ দশরথের হাতে জাল। আর পুত্র রামের হাতে বৈঠা। রাম অন্ধ পিতার জন্য তামাক সাজতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎই দশরথ রামকে বলে স্টিমার আসার কথা।

'সংকেত' গল্পে সোমেন চন্দ দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষদের জীবনসংকট ফুটিয়েছেন কাপড়ের কলের শ্রমিকদের ধর্মঘট ও উপরতলার মানুষদের বুদ্ধির খেলায় অস্তিত্ব সংকটের মাধ্যমে। কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে লেখক সোমেন চন্দ নিজে ব্রিটিশ শক্তির অত্যাচারের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করেছিলেন-সক্রিয়ভাবে। দশরথও ব্রিটিশ অত্যাচারের দ্রষ্টা। 'সংকেত' গল্পের প্রেক্ষাপট হিসাবে রয়েছে সেই ভারতের দু:সময়ের ছবি, যখন ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষ থেকে তুলো নিজেদের দেশ ব্রিটেনে নিয়ে গিয়ে যন্ত্রচালিত তাঁতে বস্ত্র উৎপাদন করতে

শুরু করেছিলেন। কাঁচামাল জোগাচ্ছে ভারত, আবার ব্রিটেনে তৈরী সেই বস্ত্রের বিক্রির বাজারও ভারত। ফলে ভারতের নিজস্ব স্বদেশী তাঁতীরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছিলেন। 'সংকেত' গল্পের পটভূমিকাতেও এই বিপন্ন বস্ত্রশিল্প।

শ্রমিক-মালিক সংগ্রামে আগত নতুন যুগের সংকেত বহন করেছে 'সংকেত' গল্পটি। কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় নব্য-প্রবিষ্ট যন্ত্রশিল্পসভ্যতার পদধ্বনি যে সংকট-সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে তার ফলে মানুষ হৃদয়ের কথা না শুনে বাধ্য হয়েছে পেটের ক্ষুধার জ্বালার কথা শুনতে। বাংলা মায়ের হিরণ্যপীত অঞ্চল হয়েছে ধূলিধূসরিত। এই পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশের আশুসম্ভাবনার ইঙ্গিত 'সংকেত'। এর অন্যতম বাহন স্টিমার-বাণিজ্যিক শোষণ নিপীড়নের সংকেতবাহী। এই স্টিমারের আগমন প্রথম বুঝেছিল দশরথ।

> ''তখনও আকাশ ভালো করিয়া পরিষ্কার হয় নাই, নানারকমের পাখি। আগামী দিনের ঘোষণায় প্রাণপণে ডাকাডাকি করিতেছে, বনগ্রামের মরা নদীর কঠিন বুকেও ভয়ানক ঝড় তুলিয়া কাহাদের এক লঞ্চ তীরে আসিয়া ভিড়ল।''[২০]

প্রত্যেক কটি শব্দ এখানে দ্যোতনাবাহী। যখনকার সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখনও আকাশের বুকে পাখি রয়েছে। নানারকমের পাখি। সে পাখি হতে পারে পথ-প্রদর্শক ব্যঙ্গোমা-ব্যঙ্গোমি; আবার হতে পারে বাজ বা শকুনির মত দুষ্ট কোনো আত্মা। তখনও আকাশ অর্থাৎ জীবনযাপন স্পষ্ট প্রতিভাসিত হয়নি। আলো পুরোপুরি ফোটেনি। শিল্প ও কৃষি সভ্যতার সংঘর্ষময়তায় দ্বিধাদ্বন্দ্বময়তা জনজীবন সংকটাপন্ন। আগামী দিন অর্থাৎ নতুন দিন আসতে চলেছে। কিন্তু এই নতুন দিন কিসের বার্তাবহ হবে? 'মরা নদী'র 'কঠিন বুক'-দীর্ঘ সংগ্রামে সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীর মানুষরা আজ হৃদয়হীন হয়ে পড়েছে। মন নয় পেটের খিদে তাদের আগে ভাবায়। ভয়ানক ঝড় সেই উত্তালসময়ের কথা বলে। আর স্টিম-ইঞ্জিন-স্টিমার সে তো যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসীনীতির বাহন।

এই চিত্র-

> '' প্রথমে দেখিয়াছিল অন্ধ দশরথ। তাহার দুই ছেলে- এক ছেলে গিয়াছে বেহালে, আর এক ছেলে যার বয়স অল্প, হাতের বৈঠাটি একপাশে রাখিয়া সে তখন অন্ধ পিতার জন্য এক ছিলিম তামাক ভরিতেছিল, আর দশরথও তখন তাহার হাতের জালটি গুটাইয়া গলাটি একটু ভিজাইবার আশায় পশ্চিমের প্রায়ান্ধকার আকাশের দিকে পালকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া ছেলের তামাকের প্রতীক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ কেমন একটা গুম্ গুম্ আওয়াজ তাহার কানে বাজিতে লাগিল, কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগে কান পাতিয়া শুনিয়া সে ডাকিল, 'রাম?' ''[২১]

গল্পকারের বয়ন-নৈপুণ্যে অন্ধ দশরথ দেখতে পায়। আসলে চোখ হল মানুষের প্রথম জ্ঞানেন্দ্রিয়। দশরথের অনুভূতিতেই প্রথম ধরা পড়ে নতুন যুগের আসার সম্ভাবনা। যার চোখ নেই, ভগবান তার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিতে আরোও বেশি শক্তিশালী করে তোলে বাহ্যজগতকে সঠিকভাবে গ্রহণ করার শক্তিসমৃদ্ধময়তায়। তাই দশরথ স্টিমারের গুম্ গুম্ শব্দ প্রথম কান পেতে শুনতে থাকে। উল্লেখ্য পশ্চিমের আকাশ প্রায় অন্ধকার। ইংরেজ প্রভুদের কায়েমী শাসন প্রায় ডুবতে বসেছে। সেই দিকেই তাকিয়ে ছিল পলকহীন অন্ধ দশরথ। আসলে দশরথ চোখ দিয়েই শোনে। চোখের পলকহীনতা অখন্ড মনোযোগের ব্যঞ্জনাবাহী। তামাক অর্থাৎ নেশা, জীবনসংগ্রাম থেকে ক্ষণিক জ্বালা জুড়ানোর আশা, এর মধ্যেই দশরথের পুত্রকে সম্বোধন।

দশরথের ছেলের নাম রাম। রামায়ণেও রাজা রামের পিতা রাজা দশরথ। দশরথ অন্ধকমুনি দম্পতির একমাত্র অবলম্বনকে হত্যা করার পাপে অভিশপ্ত হয়ে পুত্রলাভ করেছিলেন। আধুনিক দশরথ নিজেই অন্ধ। তারও ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী রাম। রামরাজত্ব সুসময়ের নামান্তর। রামায়ণের রাম পিতৃসত্যপালনে বনবাস গ্রহণ করেছিল।আর এই রাম দেবতা নয়, আধুনিক অরন্তুদ সমাজের রক্ত-মাংসের মানুষ,

''দশরথ-পুত্র রাম তখন তামাক ভরিতে ব্যস্ত, তাহার কিছুই ভালো লাগিতেছে না, রাগিয়া

বলিল, 'ক্যান?'

দশরথ বলিল, 'কিছু শুনস্‌নি?'

রাম মুখ না তুলিয়াই বলিল, 'না।'

দশরথ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,'দ্যাখ তো চাহিয়া, ইস্টিমার তো না?'

-'তা অইলে তুমি কিছু দেখতে পাও, না বাবা?'

রামচন্দ্রের বিশ্বাস, তাহার বাবা তেমন করিয়া না দেখলেও কিছুটা নিশ্চয় দেখিতে পায়, কিন্তু

দশরথ ইহা শুনিলে আর রাগ সামলাইতে পারে না। এবার হয়তো শুনিতে পায় নাই, তাই রক্ষা।''[২২]

এক অসহায় অন্ধ প্রৌঢ়ের অসহায়তার করুণ চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। একে জগৎকে পুরোপুরি বুঝতে না পারার অপারগতাজনিত কষ্ট, তার উপর পুত্রের বিশ্বাসহীনতায় সেই কষ্টের উপর আরও বেশি প্রদাহসৃষ্টি করা। কিন্তু দশরথ তার অঙ্গহীনতার ঘাটতি পূরণে এতটাই মনোযোগী যে পুত্রের চির আঘাতকারী অবিশ্বাসী প্রশ্নযাণে সে আজ আর দগ্ধ নয়। বরং নতুন রামরাজত্বের সম্ভাব্যতায় উদগ্রীবপ্রাণ। তাই তো-

''.....কোনো উত্তর না পাইয়া আবার সে ডাকিল, 'রাম!'

-'কী'। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাম একবার সেদিকে তাকাইল। দশরথের কথা মিথ্যা নয়, সত্যই একটা ছোটো জাহাজের মতো চোখে পড়ে, এখন আওয়াজ আরও স্পষ্ট-

দারুণ খুশি হইয়া সে বলিল, 'হে, বাবা।'

-'দ্যাখ্ আমার কথা মিছা কিনা!' দশরথ হাসিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক গল্প জুড়িয়া দিল।''[২৩]

এই হাসির মধ্যে অন্ধ দশরথের দেখতে পাওয়ার ছবি রয়েছে। অঙ্গহীনতাকে প্রতিস্পর্ধিত করে অতিরিক্ত সক্ষমতার তথা প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বিশেষ সক্ষমতার বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠেছে দশরথের ঠোঁটে।

দশরথের বলা সেই গল্প শুধু গল্প নয়, সমাজবিবর্তনের রূপরেখার ইতিকথা।

''..... সে অনেকদিন আগেকার কথা, বেলতলির জমিদার বাড়ির বড়ো ছেলে সদ্য বিলাত হইতে ফিরিয়া সেই প্রথম যখন নিজ গ্রামে প্রবেশ করিলেন, তখন আসিবার পথে বিস্তর দুর্ভোগ ভুগিয়া এত বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তার কিছুদিন পরেই দেখা গেল, মস্ত এক স্টিমার ভীষণ হাঁকডাকের সঙ্গে আশপাশের গ্রামের সমস্ত লোককে আনিয়া হাজির করিয়াছে নদীর পারে। স্টিমার কোম্পানির নূতন লাইন খুলিয়াছে, তখনকার নদী কি আর এখন আছে! দশরথ সেই দৃশ্য দেখিয়াছে তাহার জীবনে। আজকাল কি আর সেরকম ঘটনা ঘটে! সেসব দিনের মানুষও আজ আর নেই, তাহাদের কীর্তিও নাই। এবং পরক্ষণেই এই অদ্ভুত খবরটি শ্রীরামচন্দ্রের মুখে সারা গ্রামে রটিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে লঞ্চের সিঁড়ি বাহিয়া যে লোকটি সদলবলে নামিয়া আসিল, তাহার গায়ে চমৎকার পাঞ্জাবি আর সিল্কের চাদর, পায়ে চকচকে পামপ-শু, মুখে একটি সিগারেট আর মৃদু হাসি।''[২৪]

আদপে একজন জেলে দশরথ। এই দশরথই জানিয়েছে বেলতলির জমিদার বাড়িতে প্রথম বিলেত-ফেরৎ মানুষের পদার্পণ আর তারপর তার হাত ধরেই গ্রাম্য পরিবেশে পশ্চিমের হাওয়া এল। আর শেষে কাপড় কলের ম্যানেজারের আগমন। এই নতুন দিনের বার্তাবাহক দশরথ। প্রতিস্পর্ধিত বিশেষ সক্ষমতার অধিকারী দশরথ।

যামিনীর মা (তেলেনাপাতা আবিষ্কার : প্রেমেন্দ্র মিত্র)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পের কাহিনি অংশ অতি সামান্য। তিন শহুরে যুবকের এক অখ্যাত গ্রাম তেলেনাপোতায় ঘুরতে যাওয়া এবং সেখানে কাটানো কিছু সময়, বিভিন্ন

অভিজ্ঞতার ডালি নিয়ে সাজানো তেলেনাপোতা। বেড়াতে যাওয়া তিনযুবকের একজন গল্পকথক, আর একজন মণি। মণিরই পরিচিত গ্রাম তেলেনাপোতা। সেখানকার যে জীর্ণ পুরাতন জমিদার বাড়িতে কথকদের থাকার ব্যবস্থা হয়, সেই জীর্ণ বাড়িরই একটি অংশে থাকে মণির দু:সম্পর্কীয় আত্মীয়া যামিনী এবং তার বৃদ্ধা মা।

যামিনীর মা অন্ধ। অসুস্থ বৃদ্ধা একটি ঘরেই শুয়ে থাকেন। তার দেখাশোনা করেন তার মেয়ে যামিনী। গল্প কথকদের মতই এ গ্রামে কোনো এককালে বেড়াতে এসেছিল নিরঞ্জন। সে যামিনীকে বিয়ে করবে বলেছিল। কিন্তু ফিরে যাবার পর আর ফিরে আসেনি। আর যামিনীর বৃদ্ধা মা এই নিরঞ্জনের পথ চেয়েই দিন গুনতে থাকেন। এই অসুস্থ বিধবা বৃদ্ধা অনেক ছোটবেলাতেই তার দু:সম্পর্কীয় বোনপো নিরঞ্জনের সঙ্গে কন্যা যামিনীর বিবাহের কথা বার্তা সেরে রেখেছিলেন। শেষ চারবছর আগে নিরঞ্জন এই বৃদ্ধার কাছে এসে সেই পূর্বসম্পর্কানুযায়ী বিবাহের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে বৃদ্ধার কাছে সে প্রতিশ্রুতি পূরণের শুভদিনটি আর আসে না। বৃদ্ধাও কন্যার বিবাহের চিন্তায় অস্থির অধৈর্য হয়ে ওঠেন। কখনোও তার আক্ষেপের অত্যাচারের বলি হয় কন্যা যামিনীও।

'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' গল্পটির ভৌগোলিক সীমা হয়ত নেই, কিন্তু চরিত্রগুলি কাল্পনিক হলেও একান্ত বাস্তব। আর যামিনী এবং তার বৃদ্ধা অন্ধ, শয্যাশায়ী মা বাংলাদেশের হতদরিদ্র করুণ গ্রামবাংলার কথাই বলছে। কি অসম্ভব সরল যামিনীর মা। নিরঞ্জন আসবে বলেও এল না। এটা বোঝার মত বাস্তববুদ্ধির বিকাশ হয়নি তার অপরিসীম বিশ্বাসে। যামিনীর মা যে বিশ্বাস করে নিরঞ্জন তাকে ঠকাতে পারে না। তাই শেষবয়সেও তিনি নিরঞ্জনের পথ চেয়েই অপেক্ষা করতে থাকেন।

কিন্তু সে যে নিরঞ্জন। বাংলাদেশে এরকম আরও কত নিরঞ্জন রয়েছে। গ্রামবাংলার দরিদ্র মেয়েদের জীবন যামিনী করার জন্য যারা কথা দিয়েও কথা রাখে না। যামিনী-নিরঞ্জন চরিত্রদুটি নামাঙ্কিত হলেও 'মা' চরিত্রের কোনো নাম নেই। কারণ- বাংলার ঘরে ঘরে নারীদের নিজস্ব কোনো পরিচয় তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় ছিল না। নারীদের জীবনের তিনটি পর্যায়ে সে তিনটি নামে পরিচিত হত- শৈশবে অমুকের মেয়ে, যৌবনে অমুকের স্ত্রী এবং প্রৌঢ়ত্বে/ বার্ধক্যে অমুকের মা। যামিনী বাস্তবসত্য জানত- বুঝে ছিল। কিন্তু তার মা বাস্তব বুঝতেন না। তাই যামিনী নামাঙ্কিত হলেও বৃদ্ধাটি যামিনীর মা নামেই পরিচিত। আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, বৃদ্ধার পরিচয় 'যামিনীর মা'। অমুকবাবুর স্ত্রী নন। কারণ শুধুমাত্র তার বৈধব্যজীবন নয়, কারণটা হল বৃদ্ধার বেঁচে থাকার একমাত্র concern তার মেয়ে যামিনী। তাই চরিত্রটি যামিনীর মা।

যামিনীর মা অন্ধ। তার এই অন্ধত্ব অনেকটাই রূপকায়িত। তাঁর দৃষ্টিশক্তিহীনতা - বাস্তবদৃষ্টিহীনতারই স্মারক। গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরেই কন্যার বিবাহ দিতে পারা পুণ্যের কাজ। কিন্তু কি প্রচন্ড নির্মম এক দু:খযাতনা এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। একদিকে বলা হয় হিন্দুধর্মে মেয়ের বিবাহদান-কন্যাদান পুণ্যের কাজ- আবার কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাদের করুণ আর্তি গ্রামবাংলার আসল মর্মদাহটি পরিস্ফুট করে তোলে। মেয়ের বিয়ে দেওয়া-সুন্দরভাবে - বাবামায়ের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নই দু'চোখে রয়েছে অন্ধ মায়ের। যামিনীর মা অন্ধ কন্যাস্নেহে এবং কন্যার-বিবাহের উজ্জ্বল ভবিষ্যভাবনায়। এ চিত্র গ্রামবাংলার অতি পরিচিত সমাজচিত্র। এই যামিনীর মা বাংলাদেশের হাজার হাজার যামিনীর মা।

বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ তাঁর লেখাতেও এই গ্রামবাংলার কথাই বলেছিলেন,-

''City of Calcutta was founded by traders of British East India Company in 1960 around a nucleus of Hooghly River Village in the Ganges delta some 70 miles inland of the Bay of Bengal....

the rust of the urban area all along both banks of the river grow without benefit of plain. Some parts lie below high-water level; the plate terrain makes drainage in general difficult... the rest of the countryside offers nothing to one's sight that is either new or healthy. Poverty stricken villages consisting of neglected hovels huddle together with increasing destiny upto the uncertain limits of the city.`` [২৫]

দীনেন্দ্র (জননী : বিমল কর)

মৃত্যু ও অসুখ বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে বিমল করের ভাষায়। নির্জনতা, একাকীত্ব, বৌদ্ধ দর্শন জীবনের দু:খকে যেভাবে দেখে বিমল করও সেইভাবেই দেখে। সমাজ থেকে রোগী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চোখের অসুখ, মনস্তাত্ত্বিক গভীরভাবে অনুপ্রবেশ, নিছক ঘটনার বিবৃতি থেকে সাহিত্যকে বের করে আনার চেষ্টা বিমল করের ধারা। বিমল করের 'জননী' গল্পের পাঁচ সন্তানের মধ্যে তৃতীয় দীনেন্দ্র ওরফে দীনু ছোটবেলা থেকে ছিল সুঠাম, দীর্ঘবাহু, তামাটে গাত্রবর্ণ। মার প্রথম দুই সন্তান বড় পুত্র আর বড় কন্যা যেমন মায়ের মত সুশ্রী চেহারা পেয়েছিল, সেখানে মেজদা পেল বাবার আদল- পুরুষের কাঠিন্য। পাঁচ ভাই-বোন-ই কোনো না কোনো দুর্ভাগ্যের শিকার হলেও মেজদার দুর্ভাগ্য শারীরিক প্রতিবন্ধকতা।কথকের ভাষায়-

''মেজদা দানাপুর যাচ্ছিল কাজে। ট্রেনে বড় ভিড়। যাত্রীরা ঢোকার দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। মেজদা পান কেনার জন্য জানলা খুলে পানঅলাকে ডাকছিল। এক দঙ্গল বেহারীকে আসতে দেখে গোলমালের ভয়ে কাচের জানালা নামিয়ে চুপ করে বসে থাকল। তারা প্রথমে দরজার কাছে গিয়ে

ধাক্কাধাক্কি করল, পরে জানালার কাছে এসে ক্ষিপ্তভাবে কী বলছিল। কামরার লোক মেজদাকে জানলা খুলতে বারণ করল। তখন খুব আচমকা বাইরে থেকে একটা লোক তার টিনের সুটকেশ জানালায় ছুঁড়ে মারল। কাঁচ ভেঙে তার ধারালো ফলা মেজদার চোখে মুখে ঢুকে গেল, রক্তে সর্বাঙ্গ লাল হল। ...হাসপাতালে একটানা ছ'মাস কাটিয়ে বেচারা মেজদা ফিরে এল বাড়িতে, তার দু'চোখ সেই নির্বোধ সুটকেশঅলা অন্ধ করে দিয়ে ভিড়েই মিশে থাকল।''[২৬]

মায়ের মৃত্যুর মাসান্তে যখন পাঁচ ভাইবোন একত্রিত হয়েছে মায়ের স্মৃতিচারণে তখন মেজদা দীনুর মনে পড়ে সাঁওতালদের একটি বিশেষ রীতির কথা। যেখানে মৃতমানুষকে পারানি হিসাবে বিশেষ কিছু জিনিস দেওয়া হয়। রাঁচী নিকটবর্তী মুন্ডা বা মুঙরীদের গ্রামে দীনুর দেখা সেই বাড়ির ছবিটি ছিল,-

''মাটির বাড়ি, বাইরের দেওয়ালে রঙ গুলে একটা বাচ্চা ছেলের ছবি আঁকা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাচ্চাটা চলেছে, এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে লাগাম; কাঁধে খাবারের পুঁটলি, মাথায় তেষ্টা মেটাবার জন্যে জলের ঘটি রাখা..... ওই ছবির মানে বলে দিল ফরেস্টবাবু। ও-বাড়ির ছেলে মারা গেছে, তাই ওই ছবি।'' [২৭]

দীনু দেখার ক্ষমতা হারিয়েছে এক দুর্ঘটনায়। বাহ্যিক দৃষ্টিহীনতা দীনুর অন্তর্দৃষ্টিকে উন্মোচিত করেছে। পাঁচ সন্তানের জননী অত্যন্ত দাপটের সঙ্গেই সংসার সামলে সন্তানদের মানুষ করেছেন। আজ যথাবয়সে যখন জননীর মৃত্যু হল তখন সন্তানরা তার মায়ের সান্নিধ্যেই থাকার বাসনায় মায়ের দাহকাজ এবং মরণোত্তর বেদীও তাদের বাড়ির বাগানেই বানালো। বড়দার প্রস্তাবমত প্রতি মাসে সেই বিশেষ দিনে সবাই মিলে মায়ের বেদীতে একত্রিত হবার প্রস্তাব বাড়ির নিয়ম হয়ে পড়ল। তখনই কথাপ্রসঙ্গে উঠে এসেছিল তাদের বাবাকে তারা এভাবে তাদের মধ্যে রাখতে পারেনি- কারণ তাদের মা হয়ত অনুমতি দিত না। মায়ের অনুমতি না পেলে সন্তানদের পক্ষে কোনো কাজ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সবসময় যে মায়ের মতটাই সন্তানদেরও স্বতস্ফূর্ত মতামত হত তাও না। অনেককিছু চাপা ইচ্ছা অনুভূতি সুপ্ত ছিল সন্তানদের মনে। যা মায়ের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। 'জননী'র মৃত্যুর মাসান্তে পাঁচসন্তান যখন একত্রিত তখন তাদের প্রত্যেকেরই মনের কোথাও না কোথাও এই না-পাওয়ার কথাটা অনুক্ত ছিল। সেই না-বলা বাণীকে ভিতর থেকে জাগিয়ে তুলল তৃতীয় সন্তান দীনু। সেই প্রথম মুন্ডাজাতির মৃত্যুপরবর্তী ritual টির উল্লেখ করে মাতৃমূর্তির বিনির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল।

'জননী' সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন। তিনি নিজেও রূপসী ছিলেন আর তার প্রথম সন্তান বড়দাও মায়ের রূপের রাজি নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। তাই বিবাহকালে জননীর ইচ্ছা ছিল অপরূপ সুন্দরী কনকের সাথে বড়পুত্রের বিবাহ দেবার। কিন্তু বন্ধু অবনীর সাথে কনকের সম্পর্কের কথা জানায় বড়ছেলে সে বিয়েটা আপত্তি জানায়। তার মা সেটা জানা সত্ত্বেও সুন্দর বংশধরের কামনায় বড়ছেলের সাথে কনকের বিবাহ দিতে চেয়েছিল। তিনটি জীবন নষ্ট হবে জেনেও সেই বিবাহ সম্বন্ধে এগিয়ে গিয়েছিল। তাই বাবা আশীর্বাদ করে আসা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভালোবাসার কথা ভেবে বড়দা অবিবাহিতই থেকেছে। সে জানত তার এই বিবাহ না করার অভিমান রাগ আজীবন জননীর মনে থেকে গেছে। তাই বড়দা মাকে দিতে চেয়েছে-

''আমি মাকে আমার সেই ভালবাসার মন দিতে পারি।''[২৮]

এবার পালা দ্বিতীয় সন্তান অনুপমার- মাকে হাতে কিছু দেবার। অনুপমার জন্যও মা অনেক কষ্ট পেয়েছে। অনুপমা বিবাহের পর স্বামীর খারাপ অসুখের জন্য স্বামীকে ত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। আর স্বামীর কাছে ফিরে যায়নি। অনুপমার এই জীবনাচার মেনে নিতে কষ্ট হয়েছিল তাদের মায়ের। অনেকবার স্বামীর কাছে ফিরে যাবার জন্য বলেছিল। মা চেয়েছিল বিয়ের পর স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ি এসে থাকার জন্য অনুপমা বা তার পরিবার যেন কারো কাছে কুকথা না শোনে। মায়ের কাছে বংশমর্যাদা কৌলিন্যবোধ বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু মা মেয়ের মন বুঝল না। মেয়েকে স্বামী-সংসার নিয়ে সুখে ঘর করতে দেখতে তো সব মা-ই চায়। কিন্তু স্বামী মানে কি? স্বামী মানে তো মনের মত সঙ্গী-জীবনসঙ্গী। মা তো অনুপমাকে তার কথা বলেনি কখনো। অনুপমা আজও লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। কারণ-

'' মা-বাবা যদি বলত, আমি আবার বিয়ে করতাম। ..... চামড়ার ব্যবসাদার সেই লোকটাকে ত্যাগ করে এসে আমি শুধু নিজেকে বাঁচিয়েছিলাম, কিন্তু আমার দরকারটুকু তো পাইনি।''[২৯]

বড়দি জানত সেই সমাজ হয়ত এরকম নারীকে দুকথা শোনাতে ছাড়বে না। সমাজের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। অনুপমার দ্বিতীয় বিবাহ হয়ত কষ্টসাধ্য হত, কিন্তু অসম্ভব তো ছিল না। কারণ-

''সংসারে এমন মানুষ ছিল যে আমায় বিয়ে করত।... মা-র সাহস হল না। .... একদিন আমি মাকে বলেছিলাম, রোগ, নোঙরামি, কষ্ট সব সহ্য করি তাতে তোমার আপত্তি নেই; আপত্তি, মুখ পাবার ব্যবস্থা করতে। ....মা মর্যাদা চাইত, আমি সাহস চাইতাম।''[৩০]

সন্তানের কাছে বাবা-মাই হল সবচেয়ে বড় শক্তি। সন্তানের যেকোনো বিপদে পাশে থাকবে বাবা-মা। কিন্তু এখানে সেই বাৎসল্যরসের থেকে বড় হয়ে উঠল জননীর মর্যাদাবোধ। তাই অনুপমা বলেছিল-

''মাকে আমি মানুষের উচিত সাহস দিতে পারিনি। মা যেন সেই সাহস পায়।''[৩১]

এবার মাকে কিছু দেবার পালা তার তৃতীয় সন্তানের। দীনু এই মাতৃপ্রতিমা নির্মাণের কান্ডারী। নির্মাণকল্প শুরু করেছিল দীনু। তার হাতেই মাতৃপ্রতিমা নির্মাণকর্ম পূর্ণতা পায়। তাই মার পাঁচটা আঙ্গুল মার হাতে কিছু কিছু দেবার খেলায় তৃতীয় নম্বরে মাকে দিচ্ছে তৃতীয় সন্তান দীনু নয়, চতুর্থ সন্তান নিরুপমা।

নিরুপমা সম্পর্কে কথক আমাদের জানাচ্ছেন,-

''ছোট বড় জেদী। চিরকালই সে যখন যা ঝোঁক ধরেছে, করতে গেছে। আমি তাকে কত বলেছি, ওভাবে জেদ ধরে কাজ করতে যাস না। তুই সব পারবি এমন কোনো কথা নেই।.... ছোট এসব বুঝত না। বুঝতে চাইত না। অকারণে সে মেতে মেতে থাকত। তার কাজের অন্ত ছিল না, খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের বালাই ছিল না। সকালে মিশনারীদের অনাথ-আলয়ে গৃহিণীপনা করত, দুপুরে বড়দির সঙ্গে শখের চাকরি করতে যেত স্কুলে, বিকেল আর সন্ধ্যেবেলায় ফুলবাজারের সেই ঝুপসি ঘরটায় লণ্ঠনের টিমটিমে বাতির আলোয় বসে ওর দলের ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে রাজনীতির কাজ করত।.... এখন তার জীবনের কলসি প্রায় ফাঁকা! ডাক্তারবাবু স্পষ্টই বলে দিল, আর ওঠা-চলা নয়, বেশী কথা বলাও না। বিছানায় শুয়ে থাকা। ইনজেকশান ওষুধ, ভাল ভাল খাওয়া আর চুপ করে পড়ে থাকা।.... সেই থেকে ছোট বিছানায়।''[৩২]

নিরুপমার জীবনীশক্তি কমে গেছিল। অসুখ বাঁধিয়েছিল। কিন্তু তাতেও সে কোনো অ-সুখে ছিল না। তার অসুস্থতার সময় তার বন্ধুবান্ধবরা আসত তার সাথে দেখা করতে। তাদের মধ্যে ছিল নিরুপমার বিশেষ বন্ধু সুশান্তও। অসুখের জন্য মনের মানুষের সান্নিধ্য লাভ এককথায় শাপে বর হয়েছিল নিরুপমার। জননীর চোখ এড়ায়নি ঘটনাটি। তিনি ঘটনাটিকে প্রশ্রয়ের বদলে সুশান্তকে আসতে বারণ করে দিয়েছিলেন। মা মনে করত অসুখ সারানোর জন্য ডাক্তারের ভূমিকাই একমাত্র। কিন্তু ওষুধের সাথে যে পথ্যও দরকার, সুস্থতার জন্য যে মরমি মনের স্নেহার্দ্র ভালোবাসার সংস্পর্শ দরকার, সেটা বুঝতেন না জননী। তাই নিরুপমা তার মার দীর্ঘ পথের জন্য দিতে চেয়েছিল আশা ভরসাপূর্ণ মন-মানবিকতা।

এবার পালা পঞ্চম সন্তান কড়ির। তার অভিজ্ঞতাটি বড়ই বেদনাদায়ক। পিতার মৃত্যুর পর জননী কড়িকে নিয়ে কাশীযাত্রা করেছিলেন। উদ্দেশ্য তীর্থভ্রমণ নয়। বাবার ব্যবসার অংশীদার শচীনবাবুকে দিয়ে অংশীদারী পত্রে ভাগ নাকচ করার সই করানো। কড়ির কথাতেই জানা গেল হতদরিদ্র শচীনবাবুর পরিবারের কথা,-

> ''বাঙালীটোলার অন্ধকার গলিতে নরকের মতন ছোট ছোট খুপরি ঘরে ওঁরা থাকেন; উনি (শচীনবাবু) স্থবির হয়ে পড়েছেন, স্ত্রী শ্বাসরোগে শয্যাশায়ী, বড় ছেলে হোটেলের গাইডগিরি করে, দুটি মেয়ে- একটি পা খোঁড়া হয়ে গেছে টাঙা থেকে পড়ে, অন্যটি কোন্ বাড়িতে যেন রান্নাবান্নার কাজ করে দেয়। ছেলের বউ মারা গেছে দুটি বাচ্চা-কাচ্চা রেখে।''[৩৩]

একসময়ে যে শচীনবাবু ছিল কড়িদের পিতার ব্যবসাদারির সঙ্গী আজ তাদের চূড়ান্ত অসহায়তার দিনে সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও কড়ির মা শচীনবাবুদের পাশে এসে দাঁড়াল না। বরং নিজের স্বার্থটা খুব ভালভাবে বুঝে নিল। অংশীদারী কাগজপত্রে শচীনবাবুর আর কোনো দখলদারী ছিল না বলে আইনী কাগজপত্রে লিখিয়ে নিল। জননী কোনো কাজে ফাঁক রাখতে চান না। হয়ত এতদিন তার স্বামীর জন্য একাজটা তিনি করে উঠতে পারেননি। কিন্তু স্বামী গত হবার প্রায় সাথে সাথেই শোক কাটিয়ে উঠিয়ে বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে চূড়ান্ত দক্ষতার পরিচয় দিলেন যা তাঁর চূড়ান্ত স্বার্থপরতারই পরিচায়ক। তাই কড়ি মাকে দিতে চায় স্বার্থত্যাগ করার মন।

এবার বৃত্ত সম্পূর্ণ হবার পালা। এবার দেবে মেজদা-মাকে-তার অন্তহীন যাত্রাপথে এগিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু আশ্চর্য মেজদা বলল তার কিছু দেবার নেই মাকে। বাকি চার সন্তান মাকে নিয়ে তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু অভিজ্ঞতা যার স্মৃতি বেদনাদায়ক সেগুলো সবার সাথে ভাগ করে নিয়েছে। এতদিনে মাকে কেন্দ্র করে যা তাদের ব্যক্তিগত অভিমান-দু:খ-কষ্ট ছিল এখন তারা সেগুলি পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। দীনু যেন তৃতীয় পান্ডব। পঞ্চ পান্ডবের কাছে মাতৃ আজ্ঞা ছিল শিরোধার্য। সেখানে তাদের কোনো মতামতের অস্তিত্বই তারা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারত না। মাতৃ আজ্ঞায় যেমন তৃতীয় পান্ডবের অর্জনের সঙ্গে পঞ্চ পান্ডব নিজেদের জড়িত করেছিল এখানেও যেন তেমনই দীনেন্দ্রর স্মৃতি কিংবা মাতৃতর্পণে সমান অংশীদার হয়েছিল বাকি চার জনে।

দীনুই শুরু করল মায়ের হাতে দেবার খেলাটি। যেখানে মাতৃমূর্তি শ্রদ্ধার আড়ালে ভেঙে খানখান হয়ে গেল, সেখানে দীনু তার মায়ের প্রতি কোনো অভিজ্ঞতার উল্লেখ করল না। শুধু বলল,-

''সৎকার শেষ হয়ে গেলে মানুষ আর কি দিতে পারে। তোমারা মার সৎকার শেষ করেছ। আমার কিছু দেওয়ার নেই।''[৩৪]

কিছুক্ষণ সময় নিয়ে আরো বলল,-

''আমাকে যেমন একটা নির্বোধ সুটকেশঅলা অন্ধ করে দিয়ে গেল, তেমনি মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল। মা যে কত অন্ধ আমি জানতাম।..... এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে ইচ্ছে করে না।''[৩৫]

দীনেন্দ্রর সঙ্গে মার সম্পর্কের প্রত্যক্ষ interaction আমাদের দেখাননি লেখক। দীনু বুঝেছিল মায়ের সন্তানদের মনে মায়ের প্রতি ক্ষোভ অভিমান জমাট বেঁধে আছে। মা তার সংসার ও সন্তানদের জন্য যা যা করেছিল সেটা তার ভাল মনে হয়েছিল বলেই করেছিল। বাহ্যিক হিতাকাঙ্খায় জননীকে কোথাও কোথাও হতে হয়েছিল কঠোর-সন্তানদের মনের খবর জানতে চাননি তিনি। সংসারের ভাল করার জন্য সংসারের কাছে সন্তানদের ভাল রাখার জন্য জননী চরিত্রের এই রূঢ়তা। দীনেন্দ্র বুঝতে পেরেছিল সন্তানদের মনে জমে থাকা ক্ষোভ কোথাও হয়ত জননীর অনন্তধামে যাত্রাপথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। জননী ইহজীবনে এমন অনেক কাজ করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন যেখানে তিনি অন্যের অপ্রিয় পাত্রী হয়েছেন। কারণ কারোর মনের হায় দীর্ঘশ্বাস যাতে তার পরলোকের যাত্রাপথটি কন্টকাকীর্ণ করতে না পারে সেই ব্যবস্থাই করেছিল দীনেন্দ্র।

দীনেন্দ্র শুধু এটুকুই বলেছে যে মা কতটা অন্ধ ছিল তা দীনেন্দ্রর অজানা ছিল না। কিন্তু এ অন্ধত্ব কিসের তা দীনেন্দ্র স্পষ্ট করেনি। মা আজ যা করে গেছেন তা সবই তার সন্তানের সংসারের হিতার্থেই করেছেন। মা তো চির জীবন থাকবে না। সন্তানের জীবনে সন্তানকে সমস্ত দু:খ কষ্ট ঝড়ঝাপটা থেকে আড়াল করতে, তাই তার প্রচেষ্টার কোনো খামতি ছিল না। অনেক মানুষের হিত তিনি করতে পারেননি। তার কাছে সন্তানরাই তার জীবনের সবটুকু ছিল এটা আবিষ্কার করেছে দীনেন্দ্র। তাই দীনেন্দ্র মাকে দিতে চেয়েছে মনের চোখ।

জননীর দাহকার্য সম্পন্ন হবার সময় বাকি সন্তানরা কাছাকাছি থাকলেও তারা ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। একমাত্র দীনেন্দ্রই ছিল শান্ত সমাহিত ।

''যখন আগুন তার অকলুষ শিখা বিস্তার করে মার শরীর আগলে রেখেছিল তখন আমি আমাদের পাঁচজনকে দেখছিলাম। বড়দা খানিক রোদ খানিক ছায়ায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চিতার দিকে তাকিয়ে ছিল, মাঝে মাঝে কি বলছিল; বড়দি কদমতলার মাটিতে গালে হাত দিয়ে বসেছিল; মেজদা বড়দির পাশে আসন পা করে বসে দুহাত বুকের কাছে - তার অন্ধ চোখ

চিতার দিকে; কাঠ চাঁপার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ছোট ফোলা-ফোলা মুখ করে বসে; আমি ছোটর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম।''[৩৬]

''অন্ধ চোখ''''চিতার দিকে তাকিয়ে''[৩৭]

বিরোধাভাস অলংকারের অসাধারণ প্রায়োগিক দক্ষতায় বিমল কর দীনেন্দ্র চরিত্রের মূল স্তোত্রটি বললেন। দীনুর বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। কিন্তু তার মনের দৃষ্টিতে নেই কোনো প্রতিবন্ধকতা।

''বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা''[৩৮]

'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে কাঙালীচরণ যেমন মাতৃশবদাহ করার সময় কুন্ডলায়িত ধোঁয়ায় কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিল মাকে নিতে স্বর্গ থেকে রথ এসেছে। তেমনি দীনেন্দ্র তার মনের চোখে দেখতে পাচ্ছিল মার পরলোকে যাবার যাত্রাপথ,যা মাকে একাকী পার হতে হবে। জগৎ বড়ই মায়াময়। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ইন্দ্রিয়াসক্তিই মায়াপ্রপঞ্চ। চর্যাপদকারের লেখায় পেয়েছি,

''কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।

চঞ্চল চিএ পইঠ কাল।।''[৩৯]

দীনেন্দ্র ইন্দ্রিয়জিৎ হতে পেরেছে এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগৎকেও উপলব্ধি করতে পেরেছে। জননীর জীবিত অবস্থায় অনেক সময় মনের বিরুদ্ধে গেছে। সেইজন্য দীনু জননীর অনন্তলোকে যাত্রার পথ কুসুমাস্তীর্ণ করেছে সন্তানদের মনের ক্লিন্নতাকে অবদমিত না রেখে বের করে দিয়ে। সবার মায়ের প্রতি ক্ষোভ দীনু উপশমিত করল একটিমাত্র শব্দবন্ধে,-

'' সংসারের শনি''[৪০]

সংসার বড়ই জটিল জায়গা। মা তার জীবৎকালে নিজেকে অন্যের কাছে খারাপ করেও সন্তানদের প্রতি কোনো খারাপের আঁচ আসতে দেয়নি। এই কথাটা বাকি চার সন্তান না বুঝলেও বুঝেছে দীনেন্দ্র।

দীনেন্দ্র সন্ধিবিচ্ছেদে হয় দীন+ইন্দ্র। দীন অর্থাৎ গরিব দু:খী মানুষজন। দারিদ্রতা এখানে মনের। কষ্ট অর্থজনিত নয়, কষ্ট মনের। দীনেন্দ্র একদিকে তার অন্য ভাইবোনদের এবং অন্যদিকে জননী-এই দুই তরফের মানসিক ক্লিন্নতা মোচন করেছে। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জানা যায় না, মাতৃমূর্তির বিনির্মাণ-নির্মাণের খেলায় আর নতুন কোনো সংযোজন-বিয়োজন হল কিনা। কিন্তু পাঠকচিত্তে সনাতন মাতৃমূর্তি বিনির্মাণ-নববিনির্মাণ সম্যক সম্পন্ন করেছে দীনেন্দ্র। মানসিক দীনতার

থেকে মুক্তি ঘটিয়েছে দীনেন্দ্র। দেবরাজ ইন্দ্র বীররসের দেবতা। বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ। দীনেন্দ্র মায়ের প্রতি সন্তানদের বিতৃষ্ণা জানা সত্ত্বেও সবাই মিলে মায়ের স্মৃতিচারণ এবং নবরূপায়ন ঘটাল। দীনেন্দ্রর কাছে জগৎ-

''নয়নসমুখে তুমি নাই,

নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।''[৪১]

হিন্দুধর্মশাস্ত্রে সৎকার করা মানে মুক্তি ঘটানো। জননীর শবদাহ যখন করা হল তখন তার সৎকার কার্য সমাধা হয়নি। হল দীনেন্দ্রর উপস্থাপকতায়। দীনেন্দ্রর কথার সমাপ্তিতে কথক জানিয়েছে,-

''মেজদা আর কিছু বলল না। কাশীর সাদা পাথরে বাঁধানো মার বেদীর ওপর আমরা পাঁচটি সন্তান বসে থাকলাম। শব্দহীন সেই চরাচরে বসে অনুভব করলাম, আমাদের মার সৎকার যেন এইমাত্র সমাধা হল।''[৪২]

যে অভিমানের বোঝা এতদিন চেপে বসেছিল সন্তানদের মনের গভীরে সবার সামনে বেরিয়ে গেল। কথকের উপলব্ধি হল-

''সর্বগ্রাস এই দু:খেও আমরা মার নির্বিঘ্ন যাত্রা কামনা করছিলাম। আমাদের যা দেবার সাধ্যমত দিয়েছি। মা সেই অন্তহীন পথ অতিক্রম করুক।''[৪৩]

সম্পূর্ণ কর্মটির কান্ডারী দীনেন্দ্র মাতৃপ্রেমে অন্ধ। অন্য সন্তানেরা মায়ের প্রতি যে অভিমান জমিয়ে রেখেছে দীনেন্দ্রর মনে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তার কাছে মায়ের সমস্ত কাজই সঠিক। মায়ের কোনো কাজ তার কাছে ভুল হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষেই সে মাতৃপ্রেমে অন্ধ।

কথাশেষ

বাংলা সাহিত্যে প্রথম দৃষ্টিহীন চরিত্র 'রজনী' সম্ভবত: বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম প্রতিবন্ধী চরিত্র এবং সে একজন নারী। রজনী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটনাপ্রবাহে ভেসে গেলেও একমাত্র শচীন্দ্রনাথের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমাবেগ রজনীর মধ্যে সুপ্ত থাকা নারীত্বের স্ফুরণ ঘটিয়েছে। নিদিয়ার মতো প্রেমের প্রগাঢ় অনুভূতি তার মধ্যে না থাকলেও শচীন্দ্রের অন্ধকন্যা রজনীর প্রেমের অনুরাগসৃষ্টি বাংলাসাহিত্যে নারীর প্রেমস্ফুরণের অভিনব প্রয়াসের সূচনা করেছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসধারায় যে নতুন রীতি আত্মকথনমূলক রীতি (interior monologue)-এর প্রবর্তন করেছিলেন তার সূচনা ঘটেছিল 'রজনী'র স্বগতোক্তির মধ্যেই। প্রায় ডায়েরিধর্মী গঠনে বঙ্কিম অন্ধনারীর অনভূতিগ্রাহ্যতা, প্রেমের রূপপিপাসা অসাধারণ মুন্সিয়ানায় ফুটিয়ে তুলেছেন রজনী চরিত্রে। বিষয়বস্তু নয় চরিত্রের কথনরীতিতে প্রেমবাদিতার উন্মোচনেই রজনীর অনবদ্যতা।

বঙ্কিমের 'রজনী' পরবর্তী আলোচ্য অন্ধ নারী রবীন্দ্র-লেখনীর কুমু। রবীন্দ্র-ছোটগল্প 'দৃষ্টিদানে'র কুমু রজনীর মত জন্ম-অন্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথ দেখালেন কুমু তার স্বামীর চিকিৎসায় স্বামীর মানসম্মানের চাপে আস্তে আস্তে অন্ধত্বের অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। কুমুর বহির্জগতের আলো যত নির্বাপিত হচ্ছে, অন্তর্জগতের আলো ততবেশি পরিমাণে উজ্জ্বল হয়ে ব্যক্তিত্বের প্রাখর্য্য দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। উনবিংশ শতকের একেবারে শেষদশকের নারী কুমু সংস্কারের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-কলমে নারীর এই চোখ বারবার অন্যরকম কথা বলে যায়। রবীন্দ্র-নারী-দৃষ্টি সুদূরের পিয়াসী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা ছবিগুলিতে যেমন আলো এবং অন্ধকার দুই বৈপরীত্য অদ্ভুত প্যাটার্নে ফুটিয়ে তোলেন, রবীন্দ্রনাথ নরনারীর দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং অনুভূতিগ্রাহ্য অর্থাৎ আপাতদৃশ্য এবং অবচেতন জগৎকেও সেই অদ্ভুত বৈপরীত্যের প্যাটার্নেই স্থাপন করেন। 'রজনী' (১৮৭৭) তে কেবলমাত্র মনস্তাত্ত্বিক জগতের উন্মোচন ঘটেছে, কুমুর (১৮৯৮) মধ্যে নারীর অন্তর্লোক উন্মোচনের সাথে সমকালীন সমাজপ্রেক্ষিতে নারীর জাগরণও সূচিত হয়েছে। দুই শতকের ব্যবধানে নারীত্বের জাগরণ এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসের আগে-পরে বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি উপন্যাস- 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)- সামাজিক সমস্যাকেন্দ্রিক উপন্যাস। দুটি উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিধবা-বিবাহ। দুটির ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দনন্দিনী এবং রোহিণীকে বৈধব্য পরবর্তী বিবাহ অব্দি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীকে বিষপানে আত্মহত্যা এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ রোহিণীকে গুলি খেয়ে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়েছিল। সুখী দাম্পত্য জীবন তারা যাপন করতে পারেনি। তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছিলেন উভয়ক্ষেত্রেই নগেন্দ্র এবং গোবিন্দলালের

প্রথমা পত্নীরা সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে জীবিত ছিলেন। সুতরাং সেক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ নতুন অনেক সমস্যা বহুবিবাহের এবং তৎজনিত গৃহকোন্দল, সতীনসমস্যা এসবের সূচনা হত। রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে অন্তিম লগ্নে কুমুর নারীত্বের স্ফুরণের আড়ালে এ সমাজনীতির প্রতিও দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। কুমুর দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি চলে যাওয়ায় স্বামীর সুবিধার জন্য দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু শেষে সেটা বাস্তবিক হবার প্রাক্‌লগ্নেই নারীত্বের চূড়ান্ত জাগরণ ঘটে কুমুর। মঙ্গলকাব্যের যুগে ফুল্লরাও যেমন দারিদ্র্য বরণ করে নিয়েছে, কিন্তু অসপত্নস্বামীসোহাগিনী হতে চেয়েছে, ঠিক তেমনি কুমুরও অনুভবীসত্তার জাগরণ ঘটল অন্ধত্বের পটভূমিকায় স্বামীর দ্বিতীয়বিবাহ উদ্যোগে। কুমু শেষাবধি বলেছে চোখ না থাকাতে তার নিজের বা স্বামীর জন্য কাজ করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আসলে রবীন্দ্রনাথ চোখের সঙ্গে হৃদয়ের এক অন্তর্গূঢ় সম্পর্কসন্ধি স্থাপন করলেন। তাই বঙ্কিমের বিধবা-বিবাহ শেষ পর্যন্ত 'চোখের বালি'তে (১৯০৩) বিনোদিনীর 'আঁতের কথা'র উপর ভিত্তি করে 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)-তে দামিনীর স্বল্প সফল দাম্পত্যজীবনে সার্থকতা পেল। নরনারীর দাম্পত্যকেন্দ্রিক জটিলতার সময়কার কুমুরা স্বামীর মনতুষ্টি,যথাযথ সম্মানরক্ষা, পুত্রলাভেচ্ছায় পুরুষের একাধিকবিবাহ প্রভৃতি ঘটনায় বিধ্বস্ত। রবীন্দ্রনাথের কুমু প্রশ্ন তুলল মানভঞ্জনের সব দায়িত্ব কি শুধু মেয়েদেরই। 'মধ্যবর্তিনী' (১৮৯৩) গল্পের শৈল এবং 'নিশীথে' (১৮৯৫) গল্পের দক্ষিণাবাবুর প্রথমা স্ত্রীর পর্যায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৯৮-তে কুমুর ক্রমে দৃষ্টিশক্তি হারানো এবং মনোজগতের অনুভবীসত্তার ক্রমজাগরণ ঘটেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্ধত্বের শিকার দুই নারীচরিত্রের অন্তর্লোক উন্মোচনের পর কল্লোলযুগের এক নারী চরিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) উপন্যাসের পার্শ্বচরিত্র সেনদিদি। বঙ্কিম উপন্যাসে সমকালীন সমাজসমস্যা মূলত আলোচিত হলেও 'রজনী'তে নারীমনস্তত্ত্বের তীব্র আলোড়ন, প্রেম-সঙ্কট-সংশয়-প্রতিহিংসার মন মানবিক প্রবৃত্তিগুলি সমাজের শত বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কুমুর মধ্যে সেই নারীত্বের অনুভবীসত্তার ক্রমপরিস্ফুটন ঘটেছে। মানিক ফ্রয়েড-মনস্কতায় লালিত হয়ে প্রেম-বুভুক্ষু নারীর দুর্বার কামনা-বাসনা অবলোকন করলেন। সেনদিদি চরিত্রটির পরতে পরতে রয়েছে নারীর অবদমনজনিত মানসিক বিক্ষোভ। সেনদিদির সন্তান আসলে গোপালের সঙ্গে শশীর পিতাপুত্রের সম্পর্কের এক অদ্ভুত জটিল রসায়ন কাজ করেছে। গোপালের সেনদিদির সঙ্গে অবাধ অবৈধ যৌনাচারও শেষপর্যন্ত আত্মজের প্রতি নিম্নগামী স্নেহের কাছে মর্মান্তিকভাবে ভেঙে পড়েছে। সমাজ-সংস্কার সমস্ত কিছুর মধ্যেই মানবমনের টানাপোড়েনের নিরিখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেনদিদি চরিত্রটির মধ্যে জীবনের অস্তিবাচকতা এবং বাৎসল্যক্ষুধার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। শশীকেন্দ্রিক সেনদিদি, গোপাল এবং সেনদিদির সন্তানের ত্রিকোণ সম্পর্কের নিরিখে মানিক ফ্রয়েড কথিত libido-অবচেতন মনের মধ্যে

সুপ্ত থাকা বাসনাগুলির পূরণের কথা বলেছেন। নেতিবাচকতার মধ্যেও ইতিবাচকতার সন্ধান সেনদিদির সন্তান।

কল্লোলের যুগপ্রেক্ষিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরেকটি চরিত্রের উল্লেখ করা যায়, 'অন্ধ' ছোটগল্পে মোহিনীর পিতা সনাতন চক্রবর্তী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ফ্রয়েডের অনুগত যেমন ছিলেন তেমনই বিশ্বাস করতেন মার্কস-এর সমভোগবাদ তত্ত্বটিকে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে অনেকসময় জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছিলেন মদ্যপানে। অদ্ভুতভাবে, আলোচ্য 'অন্ধ' ছোটগল্পে সনাতন চক্রবর্তী মদ্যপানে দৃষ্টিশক্তি হারালেন এবং সেইটাই তার প্রতিবাদের, সমাজের প্রতি কুঠারাঘাতের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ালো। কল্লোল-আদর্শের অন্যতম মূল বক্তব্য ছিল নরনারীর মধ্যেকার প্রেম হবে মর্ত্যের প্রেম- যে প্রেমে যৌনতাও এক অতি স্বাভাবিক চাহিদা। সেনদিদির মধ্যে মানিক তাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আবার সনাতনের মধ্যেও সেই বাৎসল্যেরই প্রচ্ছন্ন প্রকাশ ঘটালেন। সনাতন একদিকে মার্কসকথিত অসাম্য দূরীকরণের কাজ করলেন এবং মানবমনে লুক্কায়িত পিতার স্নেহময়তাও ফুটিয়ে তুললেন। হাতিয়ার হল মদ। আগে সনাতন কেবল রাতে মদ খেতেন। অন্ধ হবার পর তার কাছে আর রাত-দিনের পার্থক্য কোথায়? তাই সকালেও মদ খেতে শুরু করলেন। এই যে চিত্র সনাতনের আঁকলেন মানিক, তাতে আসলে সমগ্র সমাজচিত্রই ফুটে উঠল।

কল্লোলের যুগ পেরিয়ে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের আরেক পিতৃচরিত্র আলোচ্য। সোমেন চন্দর 'সংকেত' (১৯৪২) ছোটগল্পের পার্শ্বচরিত্র দশরথ দৃষ্টিহীন। 'সংকেত' গল্পটিতে দেখি সুতাকলের কর্মীদের দাবিদাওয়া না মেটায় ধর্মঘট, তার প্রতিক্রিয়ায় মালিকপক্ষের গ্রাম থেকে কৃষক মানুষদের এনে শ্রমিক তৈরী প্রচেষ্টা এবং শেষে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রমিকদের জোটবদ্ধতায় গল্পের পরিসমাপ্তি। দিনবদলের সম্ভাবনা প্রথম টের পেয়েছিল অন্ধ দশরথ ম্যানেজারের আগমনে। জমিদারপুত্রের আগমন এবং কাপড়-কলের ম্যানেজারের আগমন দুই সময়কাল, দুই সমাজব্যবস্থা-সামন্ততান্ত্রিক প্রথার ইঙ্গিতবাহী। অন্ধ দশরথের মাধ্যমেই সোমেন চন্দ দিনবদলের সংকেতধ্বনি শুনিয়েছিলেন।

বিংশশতাব্দীর চার-এর দশকে সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্' (১৯৪০) ছোটগল্পের এক অতি ছোট চরিত্র ভিখারী হামিদার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। আসলে সেই সময়কাল একদিকে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ, আরেকদিকে মানুষের মনোবিকলনের কথা বলে। সুবোধ ঘোষ 'সুন্দরম্' গল্পে 'কপ্রোফিলিয়া'র প্রভাবে সুকুমারের কুৎসিত কুষ্ঠরোগীর হতদরিদ্র কন্যা তুলসীকে সম্ভোগ এবং পরবর্তীকালে নিজের কৃতকর্ম ঢাকার জন্য গর্ভসঞ্চার হলে তুলসীকে বেলেডোনা প্রয়োগে হত্যার মধ্যে একইসাথে সমাজের উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সমাজের এবং নিম্নবিত্ত সমাজের গভীরে প্রবেশ করেছেন।

তুলসীর মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য দায়ী অবশ্যই সুকুমার, কিন্তু পাশাপাশি মা-হামিদার ভূমিকাও অগ্রাহ্য করা যায় না একেবারে। হামিদা এমন এক সময়ের মানুষ যখন মানুষ শুধুমাত্র নিজেকে বাঁচাতেই আগ্রহী, যখন মানুষ নিজের যুবতী কন্যার উপার্জিত ধনে জীবনধারণে বাধ্য। এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ন্যায়-অন্যায়, নীতিভ্রষ্টতা-নৈতিকতা, সঙ্গত-অসঙ্গত এসমস্ত ভেদরেখাগুলি ভুলতে বাধ্য হয়েছে মানুষ। হামিদাও ভুলে গেছে সম্পর্কের উষ্ণতা। প্রবল জৈবিক তাড়নাই মানুষকে প্রতিমুহূর্তে তাড়িত করছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি' গল্পটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। তারিণী তার স্ত্রী সুখীকে তার নিজের থেকেও ভালোবাসত। কিন্তু গল্পের শেষের ট্র্যাজিক পরিণতি প্রমাণ দেয় মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি কিভাবে কখন ভয়ঙ্করভাবে ফণা তুলে ওঠে। মানুষের মৌলিক বৃত্তি এবং প্রবৃত্তির সহজাত উপাদান মানুষকে বাধ্য করে ক্ষুধা এবং আত্মরক্ষার তাড়নাকেই প্রাধান্য দিতে। এই দুই-ঈপ্সাই একদিকে তুলসীকে বাধ্য করেছিল সুকুমারের সাথে সঙ্গমে এবং হামিদাও এই তাড়নাতেই বাধ্য হয়েছিল তুলসীকে ছেড়ে দিতে। মানুষের আদিমতম urge-গুলির মধ্যে ফ্রয়েড এবং ফ্রয়েডীয়রা যৌনতাকে প্রাধান্য দিলেও সুবোধ ঘোষ আত্মরক্ষা এবং ক্ষুধাকেও তার সমতুল করে দেখালেন।

রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' (১৯৪৬) ছোটগল্পে যামিনীর অন্ধ বৃদ্ধা মা আসলে সমকালীন ঘটনাপ্রেক্ষিতে সেইসব গ্রামীণ মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যারা আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজ ভাঙা-গড়ার ইতিহাস এবং তার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল বুননে প্রতিদিন একটু একটু করে ধ্বস্ত হয়েছেন। এই নবসমাজ মেনে নিতে পারছে না প্রতিমুহূর্তে হয়ে চলা সংস্কার ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব। পার্শ্বচরিত্র হিসাবে অন্ধ যামিনীর মা সেই সংঘাতময়তার রূপ চিত্র অঙ্কন করেছেন। একদিকে দৈনন্দিন নিত্যনৈমিত্তিকতা, আরেকদিকে ফ্যান্টাসির আকর্ষণ, প্রতিদিনকার কর্মব্যস্ততার ক্রমবর্ধমান চাপ যা মধ্যবিত্ত যুবসম্প্রদায়কে বাধ্য করে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্তব্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান, প্রতিশ্রুতিদান ও রক্ষা, আবেগ-অনুভূতিগুলিকে ভুলে যেতে। এ এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থান যেখানে চেতন-অচেতন-অর্ধচেতন-অবচেতন-মগ্নচেতন সবকিছুই তেলেনাপোতার মতই ভৌগোলিক সীমানা-ঠিকানা লুপ্ত হয়ে যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই সব কিছু ধ্বস্ত সময়ের ঘোরলাগা ঝিম্‌ধরা বৈকল্য ফুটিয়ে তুলেছেন অন্ধ বৃদ্ধা যামিনীর মা চরিত্রে।

এই অধ্যায়ে আমার নির্বাচিত শেষ চরিত্র বিমল করের ছোটগল্প 'জননী' (১৯৬২)-এর দীনেন্দ্র। অন্ধ পুত্র দীনেন্দ্রর জবানিতে বিমল কর মাতৃমূর্তির গঠন করলেন, তা আসলে তাঁর দশবছর পর লেখা উপন্যাস 'ভুবনেশ্বরী'র বীজস্বরূপ। বিমল করের প্রায় লেখাতেই বারবার ঘুরে ফিরে আসতে থাকে, অসুখ-বিশেষত: চোখের অসুখ এবং মৃত্যু। 'জননী'র দীনেন্দ্র চোখের দৃষ্টি

হারিয়েছে এক দুর্ঘটনায়, সে কিন্তু জন্মান্ধ নয়। বিমল করের গল্পবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তার ছেলেমেয়েদের স্মৃতিরোমন্থনে অর্থাৎ গল্পের সূচনাতেই মৃত্যু। সময়ের দিকে তাকালে আমরা দেখব বিশ শতকের ষাট-সত্তরের দশক কতটা আবেগহীন কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন করাল মানুষজনকে। সূচনায় নকশাল আন্দোলন, আদপে যা ছিল নিতান্তই কৃষক আন্দোলন পরিণতির পথে তা হয়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট আদর্শে উদ্বুদ্ধ সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন। 'দীনেন্দ্র'র পরিচালনায় 'জননী' মূর্তির বিনির্মাণ আসলে সেই সময়চেতনারই ফলাফল। অন্ধত্বের কারণ সমাজ-পরিবার থেকে হঠাৎ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া দীনেন্দ্রর নির্জনতা, একাকীত্ব বৌদ্ধদর্শনকেও স্মরণ করায়।

মূক ও বধির

মূক ও বধির শব্দদুটি দুই স্বতন্ত্র মানুষকে বোঝায়, আবার একই মানুষকেও বোঝায়। জন্মগত কারণে, জন্মাবধি যে শিশু কানে শুনতে পায় না, সে কথা বলতে শেখে না। কারণ শিশু অনুকরণপ্রিয়। কিন্তু কোনো কোনো সময়ে এর অন্যথাও দেখা দেয়। বাংলা কথা সাহিত্যের আঙ্গিনা থেকে এরকম কিছু চরিত্র আলোচনা করা হল এ অধ্যায়ে যাদের কেউ শুধুমাত্র মূক, কেউ শুধুমাত্র বধির, আবার কেউ মূক ও বধির।

সুভা (সুভা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা' গল্পে

''মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে।''[৪৪]

পিতা বাণীকণ্ঠ অনেক সাধ করে বড় দুই মেয়ে সুকেশিনী ও সুহাসিনীর সঙ্গে নামসাদৃশ্যে কনিষ্ঠাটির নাম রেখেছিল সুভাষিণী। কিন্তু ভগবানের নিদারুণ পরিহাসে সু-ভাষিণী হল নির্ভাষ-বাকহীনা। সকলে মেয়েটিকে ডাকে সংক্ষেপে সুভা নামে।

''সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ ছিল-এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মতো কাঁপিয়া উঠিত।''[৪৫]

ভাষাহীন প্রকৃতিদুহিতার ভাষার অভাব পূরণ করে দিত প্রকৃতিমাতা। সুভার কণ্ঠে বাণী নেই। বাণী নেই মনুষ্য চরাচরের জন্য। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য অবলা প্রাণী যাদের মুখেও ভাষা নেই তাদের মধ্যে তো সংযোগসাধনের কোনো অভাব নেই। প্রকৃতির এই সব নির্ভাষ প্রাণীগুলির সঙ্গে ভারি ভাব সুভার।

''প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর-সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়,বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা-বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার, ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গি, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।''[৪৬]

সুভার সমবয়সী পল্লীমানুষরা সুভার বন্ধুত্ব স্বীকার না করলেও সুভার সুহৃৎ ছিল তাদের গোয়ালের দুটি গাভী- সর্বশী ও পাঙ্গুলি, ছাগল, বিড়ালছানা। লক্ষ্য করার বিষয় পশুগুলি সবই গৃহপালিত এবং অত্যন্ত আদরপ্রিয়। গাভী, ছাগল, বিড়াল এর পরিচিতি হিংস্রপশু বলে নয়। সমমনভাবাপন্নের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠে। সুভার মনেও যে এক অস্তিত্বসংকট অসহায়তা ছিল তার দরুণই সে এই নিরীহ গৃহপালিত পশুগুলির মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসির মতই প্রকৃতিকন্যা সুভার অবয়ব প্রকৃতির বক্ষ থেকে তুলে এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেই 'ছিন্নপত্রাবলী'র কালেই। ছিন্নপত্রাবলীতে (পত্রসংখ্যা-২২০) লেখা প্রকৃতিচিত্র-

''এই ছোটো খামখেয়ালি নদী, দুই ধারে সবুজ চালু ঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত আর আখের ক্ষেত, আর সারি সারি গ্রাম.....।তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের দৈনিক কর্মপ্রবাহগুলি বেশ সুন্দরভাবে এসে মিশছে।''[৪৭]

বঙ্গদুহিতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে 'সুভা'তে বাণীরূপ পেল-

'' নদীটি বাংলাদেশের একটি ছোটো নদী, গৃহস্থঘরের মেয়েটির মতো;.....দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চ তট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে প্রফুল্ল হৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্যে চলিয়াছে।''[৪৮]

উপমা এবং সমাসোক্তি অলংকারের অসাধারণ প্রয়োগ-নৈপুণ্যে প্রকৃতিই সুভা হয়ে উঠেছে। মানব এবং প্রকৃতির সম্পর্ক স্থাপন রবীন্দ্রসাধনার লক্ষ্য।রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ এবং প্রকৃতি কখনোই বিচ্ছিন্ন নয়। পরস্পরের পরিপূরক।

পাশাপাশি মাতৃহীন বলাই মায়ের স্নেহ-সান্নিধ্য উপলব্ধি করার চেষ্টায় প্রকৃতির বুকে লগ্ন হচ্ছে। বাড়ির সামনে থাকা ঘন সবুজ ঘাসের ঢাল তার কাছে একান্ত নিজস্ব-

''প্রায়ই তারই সেই ঢালু বেয়ে ও নিজেও গড়াত- সমস্ত দেহ দিয়ে ঘাস হয়ে উঠত-গড়াতে গড়াতে ঘাসের আগায় ওর ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি লাগত আর ও খিল্ খিল্ করে হেসে উঠত''[৪৯]

প্রকৃতির দিকে দুহাত বাড়িয়ে বলাই বলছে,-

''আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্র-বাদলে- দিনে রাত্রে।.....সেই বিশ্বপ্রাণের বাণী কেমন-এক-রকম ক'রে আপনার রক্তের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল ঐ বলাই।''[৫০]

বলাই এবং সুভা দুজনেই প্রকৃতির সান্নিধ্যে খুঁজে নিয়েছিল নিজের জগৎ।

সুভা আর ফটিক- চরিত্রের এ পিঠ আর ও পিঠ। উন্মুক্ত আকাশ, নদীতীর, বনজঙ্গল, ঝোপঝাড়, ঝিল্লিরব, শৃগালের ডাক, আমবাগান, খেলার মাঠ, একদল পল্লীবালক- এই পল্লীমাতারই এক দামাল ছেলে ফটিক। তাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলকাতা শহরে নিয়ে যাওয়ায় সে প্রকৃতিমাতার সঙ্গে বন্ধনছিন্নতা সহ্য করতে পারল না। পৃথিবীর সমস্ত বাঁধা ধরা নিয়মের গন্ডি থেকে ফটিক চিরদিনের মত ছুটি পেয়েছে। এক অসাধারণ বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ পল্লীপ্রকৃতির দুই সন্তানের মধ্যে। ফটিকের প্রকৃতি উচ্ছল শব্দময়তায় তরঙ্গায়িত আর সুভার প্রকৃতি শব্দহীনতার নৈস্তব্ধ্যে নিস্তরঙ্গ অনুভূতিময়। ফটিকের মত 'সুভার জীবনেও একদিন পল্লীবাংলা ছেড়ে শহুরে নাগরিক জীবনে পদার্পণ করার আহ্বান আসে। ফটিক প্রথমাবধি কলকাতা যাওয়া নিয়ে পরম উৎসাহে উত্তেজিত থাকলেও সুভা গভীর আশঙ্কায় পল্লিমায়ের কাছেই আশ্রয় নিয়েছিল-

''সেদিন শুক্লাদ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল- যেন ধরণীকে, এক প্রকান্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, 'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা, আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমি আমাকে ধরিয়া রাখো।''[৫১]

সুভাকে বিধাতা বাক্‌শক্তি দেননি। কিন্তু তাতে কি! পল্লীবালা। বয়ঃপ্রাপ্ত হতেই বাপমায়ের চিন্তা আরও বাড়িয়ে চলেছে। একে তো পল্লীবাংলার মেয়েদের বিবাহের বয়স হলে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার রাতের ঘুম উড়ে যায়, তার উপর এ কন্যা তো আবার বোবা! আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও বাণীকণ্ঠ কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারছে না, ছিঃ ছিঃ ধ্বনিতে বাণীকণ্ঠদেরও থাকা দায় হয়ে উঠেছে। তাই সুভাকে পাত্রস্থ করার জন্য সপরিবারে বাণীকণ্ঠের কলকাতাযাত্রা। সেই কলকাতা যাবার আগের রাত্রে সুভার পল্লীজননীর কাছে আশ্রয় খোঁজা সীতার কথা স্মরণ করায়। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও কন্যাকে নিজের কাছে রাখতে পারছেন না। কন্যাকে বিবাহের নামে অন্যকে গচিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুভার বিবাহ দেওয়া হবে সুভার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা গোপন করে। এ তো মানবতার চূড়ান্ত অপমান! এমন কোনো পুরুষ কি নেই যে সুভার জীবনের সমস্ত সত্যি

জেনে তাকে সসম্মানে স্ত্রীর মর্যাদায় গ্রহণ করবে? সীতাও তো তাঁর সতীত্ব প্রমাণের জন্য একবার অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু কতবার? এ কেমন পুরুষ সমাজ যেখানে নারীর কোনো মর্যাদা নেই? সেই সমাজের থেকে মুখ ফিরিয়ে সীতাও মাতা ধরিত্রীর বুকে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুভাও তেমনিই তার আগামী বিবাহিত জীবনের পরবর্তী গ্লানির হাত থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় চেয়েছিল পল্লীমায়ের কাছে। কিন্তু হায় রে পল্লীবালা! সে তো আর সীতামা নয়। সে যে এই পোড়া গ্রামবাংলার এক অবলা। তাই তো তার মুখে ভাষা নেই। সে যে বোবা!

কলকাতায় এসে দেখাশোনা করে পঞ্জিকা মিলিয়ে খুব একটা শুভ দিন দেখে সুভার বিবাহ দিয়ে তার বাবামা দেশে ফিরে গেল। তাদের জাতি এবং পরকাল দুই-ই তারা রক্ষা করতে পারল। যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হল সুভা। প্রত্যাশা মতই বর পশ্চিম দেশে নববধূকে নিয়ে যাবার সপ্তাহখানেক পর যখন বুঝতে পারল বধূ বোবা তখন বুঝল না বধূর তাতে কোনো দোষ নেই। অগ্নিসাক্ষী করে বিবাহ করার সময়কার উচ্চারিত মন্ত্রগুলি ভুলে গেল বর। স্ত্রীকে বোঝার চেষ্টা করল না। বরং-

''এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।''[৫২]

ইঁট-কাঠ পাথরের 'পাষাণ-কায়া' রাজধাণীতে নববধূটি পেল না মনের দোসর। সুভা-

''চারি দিকে চায়-ভাষা পায় না-যাহারা বোঝার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না----''[৫৩]

কলকাতায় আসার আগে সে যে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে এসেছে চির তরে-

''সুভা গোয়লাঘরে তাহার বাল্য-সখীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল-দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।''[৫৪]

দৃশ্যটিতে মনে পড়ে কন্বমুনির আশ্রম থেকে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার ছবিটি। শকুন্তলাও এ যাত্রায় পতিগৃহে সাদর অভ্যর্থনা পাননি- প্রত্যাখ্যাতা হয়েছিলেন। সুভারও কপালে সেই প্রত্যাখ্যানই জুটল। সুভার বাকশক্তিহীনতা কোনো দৈবাদেশ দ্বারা পূরিত হয়নি। কোনো দেবতা বাণী জোগায়নি বাণীকণ্ঠের বাণীহীনা আত্মজা সুভাষিণীর কণ্ঠে। এটাই সুভার জীবনের নিদারুণ ট্র্যাজেডি।

শ্যামলী (শ্যামলী : নিরুপমা দেবী)

নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' উপন্যাসের নামচরিত্র শ্যামলী মূক ও বধির হওয়ায় সাধারণ সমাজের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে পারে না। ফলে সে মানুষ না হয়ে, সুস্থ মানুষদের কাছে 'জন্তু' স্বরূপ। ছোট বোন বিজলীও তাকে সম্মান দেয় না, একমাত্র মা-ই তার এই শ্যামলীকে সাহায্য করে বেঁচে থাকতে। এই মূক বালিকার আদর-ভালোবাসা-আবেগ সমস্ত কিছুর শরিক প্রকৃতি এবং তার গর্ভধারিণী। তৎকালীন সমাজের রীতি অনুযায়ী বড় মেয়ে অনূঢ়া থাকলে ছোট মেয়ের বিবাহ দিলে সেই পরিবারকে সমাজ একঘরে করবে। ফলে শ্যামলীর পিতা বাধ্য হয়ে বিজলীর সাথে যার সম্বন্ধ স্থির হয়, সেই অনিলের সাথে ছলনা করে আগে শ্যামলীর বিয়ে দেয়, যদিও পরের লগ্নে বিজলীর সাথে অনিলের দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে বা অনিলের দৃঢ় মানসিকতায় অনিল সেই শ্যামলীকেই স্ত্রী বলে গ্রহণ করায় তার বোন বিজলীকে দ্বিতীয় বিবাহে প্রবল আপত্তি জানায়।

> ''নিজে হাতে খেতে জানে না, নাইতে জানে না, খিদে তেষ্টা বুঝতে জানে না, ওটা একটা জন্তু। নইলে কানা মেয়েও শুনেছি হাতড়ে হাতড়ে আন্দাজে-আন্দাজে কত শিল্পকাজ করে। মথুর মুচির জন্মান্ধ মেয়েটা ঘরকন্নার কাজ পর্য্যন্ত করতো, আর এ তোমার কি যে মেয়ে? হাবা কালা হলেই কি অমনি বুদ্ধিহীন হয়?''[৫৫]

শ্যামলীর পিতা নিজের প্রথম সন্তান সম্পর্কে এতটাই রূঢ় মনোভাবাপন্ন হলেও তার মায়ের কোমল স্নেহচ্ছায়ায় শ্যামলী আশ্রয় পেয়েছে। কনিষ্ঠা বিজলীর বিয়ের পথ সুগমের জন্য শ্যামলীর বিবাহ জন্তুর সাথে দেবার প্রস্তাবে তার মা প্রবল আপত্তি জানায়। আরও একবার এক খোঁড়া ছেলের সাথে শ্যামলীর বিবাহের প্রস্তাবে ছেলের মা আপত্তি জানিয়েছিল। এই শ্যামলীই বিজলীর দেখাদেখি বিবাহের সমস্ত রীতি-অনুষ্ঠান পালন করেছিল, বুঝতে পারছিল। বিজলী ও শিশিরের দাম্পত্য সম্পর্ক দাগ কাটতে পেরেছিল শ্যামলীর মনেও।

অনিলের ঔদার্য তার মায়ের মধ্যে ছিল না, তৎকালীন বাংলাদেশের পক্ষে না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই বিবাহের পরও শ্যামলী তার মায়ের নিশ্চিন্ত স্নেহচ্ছায়াতেই থাকতে পেরেছিল। শ্যামলীর মাও তাতে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। মায়ের মৃত্যুর পর শ্যামলীর জীবনের পরিবর্তন সূচিত হয়। অনিল অসহায়া স্ত্রীর প্রতি যথাযথ স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেছিল। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণ দেওয়াই নয়, পরিবারেও শ্যামলীকে বধূ হিসাবে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করেছিল অনিল। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের

শ্যামলী শুধু যে নিজের জীবনই নিজে স্বচ্ছন্দে চালাতে পেরেছে তা নয়, সমাজের সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষজনদের সঙ্গে ঠিকঠাক communicate ও করতে পেরেছে।

বগলী (পদ্মানদীর মাঝি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের একাধিক চরিত্রের এক অতি ক্ষুদ্র চরিত্র হাবা-তোতলা বগলী সিধুর মেয়ে। কুবের পত্নী মালার কথকতার আসরের অন্যতম বিমুগ্ধ শ্রোতা বগলী। জেলে পাড়ায় কুবের -পত্নী মালার গল্পবলার আসর অতি দুর্লভ। মালা আর পাঁচটা ধীবর-রমণীর মত নয় বলেই তার নিজস্ব জগৎ-পরিবেশ-পরিমন্ডলও স্বতন্ত্র। আর তাই মালার শ্রোতৃমন্ডলীও আর পাঁচজন সাধারণের একটু বাইরে। বগলীও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য অন্যান্য সমবয়সীদের সঙ্গে মিশতে পারে না। তাই তার আশ্রয় এই কথকতার আসর। এই রূপকথার জগৎই বগলীর না পাওয়াকে পূরণ করে।

গণশা (বরযাত্রী : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়)

বাংলা ১৩৪৯ (ইংরাজী ১৯৪২-এ) প্রকাশিত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বরযাত্রী' নামক গল্পগ্রন্থের অর্ন্তগত মজার গল্প 'বরযাত্রী'- মূলত: হিন্দু সনাতন বিবাহরীতি কেন্দ্রিক অল্পবয়স্ক যুবকদের কৌতুকের কাহিনি।ত্রিলোচনের বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম গণশা। সে বোবা নয়; তোতলা। সম্পূর্ণ বাক্‌রহিত নয়; কথা বলতে গেলে আটকায়। প্রথম আবির্ভাবেই বিভূতিভূষণ তার পরিচয় করিয়েছেন এইভাবে-

''ছোকরা একটু তোতলা; রাগিলে কিংবা উৎসাহিত হইলে এক-একটা অক্ষর দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয়। ডান দিকের ভূটায় একটা হেঁচকা টান দিয়া সামলাইয়া লয়।''[৫৬]

যুবকটি চাকরির সন্ধান করছে। বেকারত্বের বাজারে তার চাকরিহীনতা তার প্রাণোচ্ছলতাকে খাটো করতে পারেনি। বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী যাওয়া এবং আনন্দ উপভোগ করাটাকেই বেছে নিয়েছে। গণশা জানে জীবনধারণের জন্য চাকরি, কিন্তু চাকরির জন্য জীবনধারণ কখনোই নয়।

অসাধারণ জীবনীলিপ্সা তার। বন্ধুদের সেই জীবন উপভোগেরও পথপ্রদর্শক সে।

''সে ত্রিলোচনকে তাস খেলিতে শিখাইয়াছে, সিগারেট খাইতে শিখাইয়াছে, চলন্ত ট্রামে উঠা-নামা করিতে শিখাইয়াছে এবং নিয়মিতভাবে বায়স্কোপের সিরিয়াল-অসিরিয়ালে লইয়া গিয়া পৃথিবীর যত সিনেমা-জ্যোতিষ্কদের নাম মুখস্থ করাইয়া তাহাকে সকল দিক দিয়া লায়েক করিয়া তুলিয়াছে।''[৫৭]

গণশা নিজে জীবনকে উপভোগ করতে জানে আর বন্ধুদেরও সে জীবন উপভোগ করায়। জীবন মানেই প্রতিমুহূর্তে বেঁচে থাকার লড়াই-Challenge। জীবনের প্রতিই সে সবসময় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। তাই চলন্ত গাড়িতে ওঠা-নামা তার কাছে মজা, হোক না সে গাড়ি ট্রাম, তবুও গাড়িই তো।

এই গণশাই বন্ধু ত্রিলোচনকে দাম্পত্যনীতি সম্পর্কে পাঠ দিয়েছে, যদিও গণশা এখনও অবিবাহিত। এটাই গণশা চরিত্রের ম্যাজিক্যাল আকর্ষণ। গণশা এখনও জীবনের অনেক কিছুই পায়নি-জানে না। কিন্তু কোনোও কিছুতেই সে ভয়ে পিছপা নয়। তাই অবিবাহিত হলেও বন্ধুকে দাম্পত্য-বিবাহ-বাসর প্রভৃতি নিয়ে যথাসম্ভব পাঠ দিয়েছে।

বন্ধু ত্রিলোচনকে বাসরে গাইবার জন্য গানও শিখিয়ে দিয়েছে গণশা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে গানের তালিমও দিয়েছে। গানটির কথা রাজেনের হলেও সুরারোপ করেছে গণশাই।

গণশার সমস্যা, কথা বলাতে। কিন্তু তবুও সে নিশ্চুপ নয়। বরং বন্ধুরাই তার প্রবল জীবনী-উচ্ছ্বাসের কাছে চুপ করে যায়। যে তোতলামিতে গণশার আরও কম কথা বলাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এখানে বিভূতিভূষণের লেখনীতে গণশার তোতলামি পাঠকহৃদয়ে প্রবল হাস্যরসের উৎসার ঘটানোর পাশাপাশি গণশা চরিত্রের সুঠামতার পরিচয় দিয়েছে।

ত্রিলোচনের বিয়ের বরযাত্রীরা সংখ্যায় বেশ কম। বরকর্তা ত্রিলোচনের বাবা ভবতারণবাবু , বরের মেসো অনন্তবাবু, সেজ পিসেমশাই, সহায়রাম চ্যাটার্জ্জী, দীনে নাপিত আর মূল পুরোহিতের কাকা ন্যায়রত্ন মশাই। এই ছয়জন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের সাথে ছেলের পাঁচবন্ধু কবি স্বভাব রাজেন, আবাঙালি কে. গুপ্তা, খাদ্যলোলুপ ঘোঁৎনা, গোরাচাঁদ এবং গণশা। বয়:জ্যেষ্ঠরা প্রত্যেকেই পানাসক্ত। ফলত: দেখা গেল প্রকৃত বরকর্তা গণশাই। ত্রিলোচনের ঠিকঠাক বরবেশের প্রতি তার যেমন নজর তেমনই বরযাত্রীদের জন্য মালা, গোলাপজল, এসেন্সের তদারকিও সে করেছে যথাযথভাবে। বিবাহসভায় গিয়েও যথাসম্ভব ত্রিলোচনের পাশে থেকে সাহস দিয়ে গেছে।

গল্পের সবচেয়ে মজার অংশ ত্রিলোচনের বাসর। স্ত্রী আচারে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তার উপর ত্রিলোচনের যেখানে বিয়ে হয় সেই গোকুলপুর 'কালসিটে গোকুলপুর' নামে কুখ্যাত। লেখকের ভাষায়,

> ''যেখানে বিবাহ সে গ্রামটার মূল নাম গোকুলপুর; পরে 'কালসিটে গোকুলপুরে' দাঁড়ায়; কবে নাকি গ্রামের লোকেরা এক মাতাল গোরার দলকে উত্তম-মধ্যম দিয়া এই সামাজিক খেতাবটা অর্জন করে; মুখে মুখে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এখন শুধু 'কালসিটে'তে দাঁড়াইয়াছে। বরযাত্রীর দলও

প্রায় গোরার মতই শত্রুস্থানীয়, তাই গ্রামে কোনো বরযাত্র আসিলেই ছেলে-ছোকরারা সুযোগমত কানে তুলিয়া দেয়, 'এ যার নাম কালসিটে মশাই, একটু সমঝে চলতে হবে।''[৫৮]

তাই প্রথম পর্যায়ে রাজেন ত্রিলোচনের বাসরঘরে স্ত্রী আচারের সন্ধান নিয়ে এসে যখন জানায়-

''স্ত্রী-আচার দেখবার নাম করো না।''[৫৯]

জানায় কনের কাকা জগুদার কথা, তখন বাকিরা ভয় পেয়ে গেলেও গণশা বলেছিল,

''ইডিয়েট! ভী-ভ্ভীরু কোথাকার! বি-ঝিয়ে দেখতে এসে যদি স্ত্রী-আচারই দেখলাম না তো-। চল সবাই, দে- দ্দেখি কে কি করে!''[৬০]

বাকিরা গণশার সাহস এবং উৎসাহ আগু-পিছু অগ্রসর হতেই জগুদার মুখোমুখি হয়ে পড়ে। সেখানে জগুদাকে দেখে সবাই-ই ইতস্তত অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে। ঘোঁৎনা তার স্বভাবসিদ্ধ খাদ্যসন্ধানে ব্যাপৃততার কথা বলে। জগুদার সঙ্গে পূর্বেই সাক্ষাৎ হওয়া রাজেন জগুদার গুণকীর্তন করতে শুরু করে। কিন্তু এখানে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গণশা। তাদের আসার উদ্দেশ্য জগুদার সাথে আলাপ-পরিচয়। শত্রুর মোকাবিলা করতে মোটেই ভয়ভীত নয় গণশা। এমনকি শত্রু যখন অনেকবেশি শক্তিশালী এবং একেবারেই সামনে দাঁড়িয়ে তখনও গণশা সদর্পে তার উপস্থিতির ভয়ঙ্করতাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে। শত্রুকে, বিপদকে ভয় পেলে যে এগোতে পারা যায় না, এ জ্ঞান আছে গণশার। গণশার চরিত্রের সবথেকে বড় ইতিবাচকতা হল তার এই প্রবল উৎসাহ এবং অকুতোভয় মানসিকতা।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর যখন বাকিরা সবাই ইতস্তত ইতিউতি গড়াগড়ি দিচ্ছে আর খাবার সম্পর্কে আলোচনায় আহার্য আরও বেশি উপভোগ করছে তখন গণশা দু:সাহসিক অভিযান করে খোঁজ নিয়ে আসে ত্রিলোচনের বাসরঘরের। তারপর বন্ধুদেরও সেখানে নিয়ে যায়। বেশ চলছিল জানলা দিয়ে তিলুর বাসরের আনন্দ উপভোগ। হঠাৎই বাধ সাধল তিলুর গণশাকে ডাকা এবং তার থেকেও বড় বিপর্যয় হল-

''পাশেই হঠাৎ দুয়ার খোলার আওয়াজ হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একরাশ এঁটো পাতা, থুরি, গেলাস দুইজনের মাথায় কাঁধে পিঠে সজোরে আছড়াইয়া পড়িল।''[৬১]

এই হঠাৎ আঘাতে তারা ফিরে তাকাতেই

''ওগো বাবা গো, ডাকাত!''- বলিয়া স্ত্রীকণ্ঠে একটা চিৎকার, ঝনাৎ করিয়া দুয়ার বন্ধ, সশব্দে পতন, গোঙানি, বিভিন্ন কণ্ঠে হাঁকাহাঁকি, বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি, সবগুলা যেন এক মুহূর্তে

সংঘটিত হইয়া বাড়িটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল।''[৬২]

পাঁচযুবকও তখন বাসরঘরে স্ত্রী-আচারের আনন্দ-উপভোগের বদলে প্রাণ বাঁচাতে সচেষ্ট হল।

''কে. গুপ্ত যেদিক হইতে আসিয়াছিল, সোজা সেই দিকে ঘুরিয়ে ছুট দিল; সদরের দিকে নয় একবারে সোজা।''[৬৩]

ঘোঁৎনা পালাতে গিয়ে সামনে পেঁপে গাছ পেয়ে তার উপরই চড়ে বসে। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য গণশার আচরণ। সে কিন্তু শুধু নিজে পালিয়ে বাঁচার কথা ভাবেনি। পাশে থাকা আর দুই বন্ধু রাজেন এবং গোরাচাঁদকে নিয়ে পাশে মাঠে যাবার উদ্যোগী হয়। যদিও পরে জানা যায় যে সেটি ছিল পানাপুকুর। মনে পড়ে যায় শ্রীকান্ত আর ইন্দ্রনাথের কথা। ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে নিয়ে অন্নদাদিদির জন্য মাছচুরির দু:সাহসিক অভিযানে গেছিল। সেখানে ইন্দ্রনাথও শ্রীকান্তকে জীবনরক্ষার অপূর্ব তালিম দিয়েছিল। জীবনটাকে সহজভাবে গ্রহণ করা। গণশাও তাই-ই করল। বিপদের সময় বন্ধুদের নিয়েই উদ্ধারের চেষ্টা করেছিল গণশা। তাই যখন বুঝল তিনজন মাঠ নয় খিড়কির-পুকুরে পড়েছে, তখন গণশা বলে-

''ঘা-ঘ্ ঘাস ভেবেছিলাম। ডুব-সাঁতার কাট।''[৬৪]

শেষপর্যন্ত অনেক হাঁকডাক সন্দেহ জল্পনার অবসানে শেষাবধি কন্যাপক্ষের কাছে ধরা দিল বরযাত্রীরা। কিন্তু সবার শেষে উঠল গণশা। একেবারে বিপর্যস্ত অবস্থা। কন্যাপক্ষের ফাজিল ছোকরার ভাষায়-

''কম্যান্ডার-ইন-চীফ।''[৬৫]

কারণ তার মাথায় কচুরিপানার চূড়া তাকে নেতৃত্বের শিরোপা দিয়েছে। যে ছেলে বিপদের সময়ও বন্ধুদের ত্যাগ করে না নেতৃত্বের শিরোপা তো তারই প্রাপ্য।

এরপর কন্যাপক্ষের কাছে সদলবলে আত্মসমর্পণ করার পর পুকুর থেকে উঠে আসার জন্য তাদের চিনতে সমস্যা হচ্ছিল। চাপে পড়ে গণশার তোতলামি আরও বেড়ে গিয়েছিল। তাই প্রাথমিকভাবে কন্যাপক্ষের তোপের সামনে পড়ে-

''গণশা মুখটা খিঁচাইয়া বিরক্তভাবে..... আরে ধুৎ, আমার কথা বে-ব্বেশি আটকে যাচ্ছে,বি-ব্বিশ্বাস করবে না''[৬৬]

বললেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার প্রবল আত্মবিশ্বাসে ফিরে আসে এবং সেই আটকাতে আটকাতেই কথা বলতে থাকে এবং কন্যাপক্ষের সামনাসামনি হয়।

কাহিনিটির মূলরস হাস্যরস। কাহিনিতে একটি ফাজিল ছোকরা চরিত্র আছে। যার সময়জ্ঞান মারাত্মক। হাস্যরসের কমেডির মূল সূত্রই হল timing। সঠিক সময়ে সঠিক শব্দের প্রয়োগ। হাসির উদ্রেক হচ্ছে পাঠক হৃদয়ে ঠিকই, কিন্তু এক নির্মম সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে এখানে। বরের তিনবন্ধুকে যখন পুকুর থেকে তোলা হল, তাদের যখন ডাকাত সন্দেহ করা হচ্ছে, সত্যি-মিথ্যার আলো-আঁধারির খেলা চলছে, তখন হঠাৎই জগুদা বলেছিল বরযাত্রীদের মধ্যে একজন তোতলা ছিল। তখন গণশা নিজের উপস্থিতি জানাতেই ভিড়ের মধ্যে কিছু মানুষ -

''ধূর্তামি করিয়া বলিয়া গেল, ''একজন বোবা ছিল।''

একজন খোনা ছিল।

একটা খোঁড়া ছিল।''[৬৭]

এটাই নির্মম সমাজ। সুস্থ সবল স্বাভাবিক মানুষরা সেইসব মানুষদের নিয়ে হাসি-মস্করা করতে ভালোবাসা, যারা স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে ব্যাহত। কিন্তু বোঝে না তাদের দু:খকষ্ট। উল্টে সেই কষ্ট থেকে মজা নেয়। আর মজার খোরাক হওয়া এই মানুষগুলি তাদের প্রবল জীবনীশক্তিতে হয়ে ওঠে বিশেষভাবে সক্ষম।

গণশা হল এমনই এক চরিত্র। যার মধ্যে অক্ষমতার অপারগতার হীনমন্যতার অস্তিত্ব ছিটেফোঁটাও নেই। অন্যরা বলে সে তোতলা, তার কথা আটকে আটকে যায়। কিন্তু সে একবারও তার জন্য মানসিক দিক থেকে দুর্বল নয়। বরকর্তা যখন বলেছিল গণশা অতোটা তোতলা ছিল না তখন সে কথা বলতে চায়নি কারণ তার কথা বেশি আটকে যাচ্ছে টেনশনে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই-ই বলেছে,

''ম-মশাই, আমি পারলে সো-স্সোজা করেই বলতাম, কি-কিন্তু সত্যিই তোতলা,''[৬৮]

সে যে তোতলা সেটা স্বীকার করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই তার মধ্যে। সে সৎ। যারা এই মানুষদের নিয়ে হাসির খোরাক বানায় তাদের তুলনায় মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে অনেক উচ্চস্তরীয় এরা। গণশা তারই প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র।

সাধারণত: কৌতুকরসাত্মক রচনার প্রধান অভিমুখ থাকে সমাজ-রাজনীতি এবং নারী-পুরুষের আকর্ষণ। হাসি মজার আড়ালে আসলে বিশেষ কোনো নীতির বা মানুষ সমাজের প্রতি ব্যঙ্গের চাবুক হানা হয়। বিভূতিভূষণের 'বরযাত্রী' গল্পটি নির্মল হাসির গল্প। বাঙালির বিবাহে স্ত্রী

আচারকে কেন্দ্র করে অল্পবয়স্ক যুবকদের প্রবল উৎসাহ এক নির্মল কৌতুকের সৃষ্টি করে। বিংশ শতাব্দীর তিন-চারের দশকের উত্তাল পরিস্থিতিতে একদল যুবকের একত্রে বিবাহ উপলক্ষ্যে যাওয়া নি:সন্দেহে ভিন্নমাত্রা আনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতে মানুষের মন যখন বিধ্বস্ত তখন একদল যুবকের নির্মল বন্ধুত্ব অভিযানের মূল পান্ডা গণশা এক দমকা ঠান্ডা বাতাস যেন।

গণশা তোতলা। কিন্তু তাতে লজ্জা না পেয়ে সে দমে থাকে না। বন্ধু ত্রিলোচনের বিয়ে রাজেন, কে. গুপ্ত, গোরাচাঁদ, ঘোঁৎনা নিয়ে জমিয়ে দেয় গণশা। গণশা পাঠকদের বিবাহের আনন্দ অনুষ্ঠানে সামিল করে নিয়েছে তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বে। সময়প্রেক্ষিতে মানুষ যখন হয়ে পড়ছে একাকীত্বের ঘোরাটোপে বন্দি, তখন গণশা-কেন্দ্রিক এই যুবকদলের বন্ধুত্ব যা শুধুমাত্র বাঙালির সীমারেখাতেই বন্দী থাকেনি এটিও লেখকের উদ্দিষ্ট বিশেষ অভিপ্রায়।

তোতলা গণশার গলার স্বরের ওঠানামা, ভূয়োবাক্‌ভঙ্গীর মাধ্যমে লেখক শুধু হাস্যরস নয় অসাধারণ মননশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন চরিত্রটির। এখানেও চরিত্রটি তার সমাজ-আরোপিত ভ্রূকুটি, লজ্জা, সহানুভূতি ছেড়ে বীরদর্পে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। হাস্যরসাত্মক রচনার মূল অভিঘাত সমাজ সমস্যার প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে প্রতিবাদ।

ন্যায়রত্ন (বরযাত্রী : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বরযাত্রী' গল্পের অতি ছোট চরিত্র ন্যায়রত্ন মশাই। তাঁর পরিচয় হল তিনি বরযাত্রী দলের ছেলের বাড়ির তরফের যিনি পুরোহিত তাঁর কাকা। বয়স্ক মানুষ। কানে শোনেন না। আবার রাত্রে ভালো চোখে দেখতেও পান না। অদ্ভুত কারণে তাঁকে এনেছেন লেখক। ন্যায়রত্নের কর্মদক্ষতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ ঘোঁৎনা। আসলে বরযাত্রী দলের বয়স্ক মানুষজন সকলেই পানাসক্ত। হিন্দু সমাজব্যবস্থার রীতিনীতির অন্ত:সারশূন্যতা প্রকাশ করার জন্যই এই চরিত্রটির অবতারণা।

চরিত্রটির আচার-আচরণ নি:সন্দেহে হাস্যরসের উদ্রেক করে। নির্মল হাস্যরস। কিন্তু যখন বলা হয় ন্যায়রত্ন মশাই বিয়ের পাত্রপাত্রী গন্ডগোল করে ফেলতে পারেন তখন ভাবী বর ত্রিলোচনের ভরসার স্থল দীনে নাপিত। একটা গোষ্ঠীবদ্ধতা একসাথে মানিয়ে গুছিয়ে কাজ উদ্ধার করার ছবি ফুটে উঠেছে এখানে।Team- spirit দ্বারা যে সমস্ত কাজকর্ম উদ্ধার করা যায় তাই যেন দেখাতে চেয়েছেন বিভূতিভূষণ।

এখানে বলা যায়, ন্যায়রত্ন মশাই যে কানে কালা বা রাতকানা সেটাকে তার বয়সোচিত স্বাভাবিক ধর্ম বলে গ্রাহ্য করা হবে নাকি শারীরিক প্রতিবন্ধকতার আওতায় আনা হবে, সেক্ষেত্রে

বলা যায়, যদি বয়সজনিত প্রতিবন্ধকতাই হত তাহলে গল্পের অন্যান্য বয়স্ক চরিত্রের ক্ষেত্রেও সে ত্রুটি দেখানো হত। সুতরাং, এই শারীরিক ত্রুটি লেখক সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেছেন গল্পটিতে নির্মল হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

সুচাঁদ (হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অনেক কিছু। হাঁসুলী, বাঁক, উপকথা তিনটি শব্দই অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত। 'হাঁসুলীবাঁক' যার প্রতিশব্দ নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব। 'হাঁসুলীবাঁক' নামটা শুনলেই কানে বাজতে থাকে বনওয়ারি - করালী, পাখি-সুবাসী, গোপালীবালা,কালোশশী। আর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুচাঁদ-নসুবালা।'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসের মুখপাত্র সুচাঁদ। সুচাঁদবুড়ীর কথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর তার স্মৃতিকথায় বলেছেন-

''ওই সুচাঁদ এবং আমি গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি।''[৬৯]

কাহারদের পল্লীসমাজ ও সংস্কৃতির ধারক ও কথক সুচাঁদ বুড়ী।বনওয়ারীর কর্তাবাবা হলেন সুচাঁদের বাবার বাবা। সেই সম্পর্কে বনওয়ারীর পিসিমা সুচাঁদ। শুধু তাই নয়, এককালে যে বনওয়ারীকে স্তনদানও করেছিল।তাই বনওয়ারী পিসিমা বলে ডাকলেও বনওয়ারীর কাছে সুচাঁদ মা-ও বটে। সুচাঁদের মেয়ে বসন্ত-বসন যে ভালোবেসেছিল চৌধুরীবাড়ির ছেলেকে আর তারই ভালোবাসার ফসল পাখি।সুচাঁদের আদরের নাতনি পাখি আর নাতিন জামাই হল করালী-কাহার সংস্কৃতির নবীনতার আবাহক। লজ্জা নিবারণের জন্য শতচ্ছিন্ন একখানি বস্ত্রই কোনোরকমে তার সম্বলমাত্র। আর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কখনোও কাহার পাড়ার মাতব্বর বনওয়ারীর মত অন্য কারো মাঠে কাজ করে, আবার কখনো মোষডহরির বিলেতে ঘাস কেটে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেয়। তবুও সে কিন্তু betterment of life এর টানে উন্নততর জীবনচর্যার প্রলোভনে অন্যত্র পাড়ি দেয় না। বরং লোকসংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় আগলে রাখে উপকথাকে। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি সুচাঁদ ইনিয়ে বিনিয়ে বলে চলে হাঁসুলীবাঁকের উপকথা।

কাহার পল্লীর অতীত সংস্কৃতি সুচাঁদ মৌখিক পরম্পরায় পুঞ্জীভূত করেছে। সে বর্তমানে বাস করলেও তা কেবলমাত্র শারীরিকভাবেই ,বর্তমানের চলমান জগৎ তাকে ছুঁতেও পারে না। কারণ সুচাঁদবুড়ি বদ্ধকালা। শ্রবণক্ষমতা তার বড়ই ক্ষীণ। সে বয়সোজনিত কারণেই হোক বা যে কোনো ভাবেই হোক না কেন তার স্মৃতির জগতেই আমরা পাই. উপকথার কাহিনি আবর্তন- তবে শুধুমাত্র আখ্যান ব্যাখ্যান মাত্র নয়, সেই ঘটনার যথাযথ সম্ভাব্য ভবিষ্যতের রূপায়ণ আছে সুচাঁদের কথায়।

কাহার সংস্কৃতির প্রবীণ নায়ক বনওয়ারীও কখনও সুচাঁদ পিসীর কোনো শাসন অগ্রাহ্য করে না। আদিম ডাকিনী বিদ্যায় সুচাঁদ ছিল নেত্রীস্থানীয়া। Function- এর মাধ্যমে Narrative- এর Ritual এ রূপান্তরীকরণে সুচাঁদই এক ও একমাত্র ঐতিহ্যধারক ও বাহক। সুচাঁদের সময়কার কাহার সমাজ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস ও পুরাণের অনুশাসনে আবদ্ধ ছিল। যার উল্লেখ পাই সুচাঁদের কথিত অসুরের-কাঁড়ির আখ্যানে। কিন্তু করালীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার সময়ে ভেঙে খান খান হয়ে যায় এই প্রাচীন লোকবিশ্বাস। তার জায়গায় আসছে দুর্গোৎসব-নবান্ন-পৌষলক্ষ্মীর উৎসবগুলি- urban culture।

উপন্যাসের সূচনায় যেখানে তারাশঙ্কর আমাদের জানাচ্ছেন-

''কাহারপাড়ার আদ্যিকালের যত বিধান সুচাঁদের কাছে। সেই বিধানই চিরদিন বলবতী হয়েছে এখানে।''[৭০]

সেই সুচাঁদ কয়েক প্রজন্মের ব্যবধানে হয়েছে হাসির খোরাক।এখন আর করালী সেভাবে মানে না সুচাঁদবুড়ীকে। সুচাঁদের কাছে ব্যাঙ মৃত্যুদূত। তা জানা সত্ত্বেও সুচাঁদের সংস্কার-বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করে সুচাঁদের গায়ে ব্যাঙ দিয়ে দেয় করালী। এরপরই শুরু হল সুচাঁদের শতকোটি দেবদেবীকে সাক্ষী মেনে অভিশাপবর্ষণ-

''হে বাবা কত্তা, হে মা মনসা, হে বাবা জাঙলের 'কলেরুদ্দু',হে মা চন্ননপুরের চন্ডী, হে মা বাকুলের বুড়ী কালী, হে বাবা বেলের ধম্মরাজ.....''[৭১]

সুচাঁদের কথা আর কেউ শোনে না, মানে মানেও না, আর বসে বসে তার উপকথা শোনার মত সময় বা মানসিকতা কোনোটাই আর নেই বর্তমান প্রজন্মের। লোকে শুনুক বা নাই শুনুক, তাতে কিছু এসে যায় না সুচাঁদের। তার বধিরতা এক্ষেত্রে যেন তার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। বর্তমান সমাজের ঐতিহ্য থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাওয়া তাকে শুনতে হচ্ছে না। তবুও সে তার নিজের জগতের কথাই বলে যাচ্ছে। বরং কথা না বলতে পারলে, মানুষকে উপকথার গল্প শোনাতে না পারলেই তার কষ্ট হয়। অত্যন্ত আবেগ নিয়ে আত্যন্তিকতার সঙ্গেই প্রত্যাশাহীনভাবেই সে অনর্গল শুনিয়ে চলে উপকথা - কখনো তা হয় আধ্যাত্মিক আবার কখনোও হয় অনুবৃত্তিময় অতীতচারিতা। সুচাঁদের ভাষ্যে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে - নীলকুঠি ও সাহেব-মেমদের হরিয়ে যাওয়া; জাঙল বাঁশবাদিতে চৌধুরীদের মালিক হওয়া ; পায়ে খড়ম-হাতে দন্ড-গলায় রুদ্রাক্ষের মালা-বুকে ধবধবে সাদা পৈতা-কাহার সমাজের অনুশাসক কত্তাবাবা। শুধু কাহার সমাজ গঠনই নয়, কাহার সমাজ-সংস্কৃতির ভাঙনের সাক্ষীও প্রবীণা সুচাঁদ।

সুচাঁদ যে শুধুই বকেই যায় তাই-ই নয়, তার কথনশৈলীর শৈল্পিক সুষমাও প্রশংসনীয়। লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান ছড়া তার কথকতার একটি অংশ। যেমন করালী সম্পর্কে তার কাটা ছড়ার কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়,-

''বেগুন কেন খাড়া?

না বংশাবলীর ধারা।''[৭২]

এখানে একদিকে যেমন সুচাঁদের মৌখিক পরম্পরার সংস্কৃতিমনস্কতার পরিচয় রয়েছে, ঠিক তেমনই রয়েছে মানবচরিত্র সম্পর্কে তার বাস্তবজ্ঞানবুদ্ধির পরিচয়। সুচাঁদ বুড়ী অভিজ্ঞতায় প্রাচীনা। তাই হাঁসুলীবাঁকে সুচাঁদ কোনো character তথা চরিত্র নয়, সুচাঁদ একটি প্রতিষ্ঠান- যেখানে একটি সমাজ গঠন-বির্বতন-পরিবর্তন-পরিবর্ধন-সমস্ত কাল ও সময়ের জীবন্ত দলিল প্রতিষ্ঠিত।

আখ্যানের শেষভাগে সুচাঁদের চিত্রটি বেশ symbolic ।

''লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়ায় ভিক্ষে ক'রে।''[৭৩]

একবার এক প্রবল ঝড় আসে হাঁসুলীবাঁকে। সেই ঝড়ে বেরিয়েই পা ভাঙে সুচাঁদের। তারপর রেলের সরকারী হাসপাতালের আধুনিক চিকিৎসায় সুচাঁদের পা কেটে বাদ যায়নি। সুস্থ হয়ে উঠেছে সুচাঁদ। আবার নিজের পায়েই হাঁটছে সে, কিন্তু লাঠি হাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। হাঁসুলীবাঁকে আসা সেই প্রবল ঝড় পাশ্চাত্ত্যের ঝড়, যা সবকিছু প্রাচীনকে ভেঙে তছনছ করে দিল। শেষপর্যন্ত সুচাঁদকে আশ্রয় করতে হল আধুনিকতার কাছে- আধুনিকতার প্রতিনিধি করালীর আশ্রয়কে। কিন্তু তবুও সুচাঁদ নিজের ঐতিহ্যকে সংস্কৃতিকে ছাড়েনি। ঐতিহ্য হল সেই লাঠি যাতে ভর করে মানুষ সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে পেরিয়েও চলতে পারে নিজের পায়ে ভর করে। হোক না কেন তা খুঁড়িয়ে। আধুনিকতা ও রক্ষণশীলতার এই অভিঘাতে রক্ষণশীলতা তার ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে পেরেছে। এরই জীবন্ত প্রতিমূর্তি সুচাঁদ। হাঁসুলীবাঁকের পল্লীসমাজের উপকথার লোককবি তথা bard এর ভূমিকায় narrator সুচাঁদ অবিস্মরণীয়। সুচাঁদ উপকথা কথন কালে চলচ্ছক্তিবিহীন কিন্তু কন্যা বসন্ত যখন চৌধুরীবাড়ির সন্তান গর্ভে ধারণ করল তখন এক খোঁড়া কাহারকে রীতিমত ঘুষ দিয়ে অনাগত নাতনি পাখির পিতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করে সমাজকাঠামো রক্ষা করেছে। সেই জঙ্গমতার কাহিনিই সে বলে গেছে অনলসভঙ্গিতে।

চিরাচরিত উপাদানের আখ্যান উপকথা। 'উপকথা' শব্দটির সঙ্গে নীতিকথা শব্দটিও কোথাও না কোথাও এসে যায়। নীতিকথা মানে কথা বা কাহিনির শেষে একটি শিক্ষামূলক উপদেশ। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র কথক সুচাঁদবুড়ীও উপকথাছলে প্রাকৃতিক-অতিপ্রাকৃতিকের সঙ্গে

মানবজাতির বিশেষত আদিম সংস্কারে বিশ্বাসী মানুষের পারস্পরিক চক্রাকার সম্পর্কের কথা বলেছে। আদিম মানুষ ছিল প্রকৃতিলগ্ন। প্রকৃতি থেকে রসদ গ্রহণ করে আমরা বেঁচে থাকি আর মৃত্যুর পর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতেই বিলীন হয়ে যায়। চাষের সময় বনওয়ারীর শরীর থেকে রক্ত মাটিতে পড়লে উপকথার নীতিশিক্ষা শোনা যায় সুচাঁদের জবানিতে। জীব ও প্রকৃতির পারস্পরিক ভারসাম্য চক্র রক্ষা করে এগিয়ে চলে জীবনপথে। সেখানে আদিমতাও তাদের সঙ্গে জড়িত।-

> "Primitive man recognizes both the natural and the supernatural forces and agencies, and he tries to use them both for his benefit." [৭৪]

প্রাকৃতিক শক্তি এবং জাদুবিশ্বাস দুই শক্তিতে সাঙ্গীকরণ করে গড়ে ওঠা উপকথাই সুচাঁদ শুনিয়েছে। ইতিহাস যেখানে শেষ হয় সেখান থেকেই শুরু হয় উপকথার যাত্রাপথ। তবে দুটির মধ্যে জল-অচল ভেদ নয়। মানবমন বহুবিচিত্র। তাই একই কালে একই পরিবেশে একই পরিস্থিতিতে থাকা মানুষজনরাও বাস করে বিভিন্ন স্তরে। বিবর্তনশীল সংস্কৃতিপ্রবাহেরই সুবক্তা সুচাঁদ। সে কানে শোনে কম, কিন্তু অনর্গল কথা বলেই চলে। প্রতীকধর্মিতার মধ্যে উপকথার আড়ালে নতুন সংস্কৃতির পদধ্বনি এখানে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পুল পেরিয়ে যাওয়া গাড়ির ভারী শব্দও সুচাঁদের কানে সুমিষ্ট মধুর বোল ধ্বনিত করে-

> ''ঘরে চোখ বুজে শুয়ে... মনে হয় কেওনের দলের খোল বাজছে।'' [৭৫]

সুচাঁদ-এর মত মানুষকে আধুনিকতা সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারেনি বলেই আজও উপকথার অস্তিত্ব রয়ে গেছে। একান্ত আন্তরিকতার সমর্থতাতেই সুচাঁদ ধরে রেখেছে ইতিহাসের সমান্তরালে বয়ে চলা উপকথার স্মৃতি। সে বলেছে-

> ''বাবা, ছেলেবেলায় শুনেছে, হিয়ের জিনিস যা- তা মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিপড়ে ধরে, হাতে রাখলে নখের দাগ বসে, ঘামের ছোপ লাগে। তাই হিয়েতে রেখেছি। হিয়ের জিনিস নিয়ে হিয়েতে যদি কেউ রাখত- তবে থাকত।''[৭৬]

সুচাঁদ যে শুধু এই উপকথার কথক তাই-ই নয় জীবনের চলমানতায় আসা সংকট -ব্যাখ্যা ও মোচন উভয় ব্যাখ্যানই অনুরণিত হয়েছে সুচাঁদের oral transmission-এ।

ফুলবানু (পেরানটা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পেরানটা' গল্পে এন্তে আলীর বউ ফুলবানু সাধু সেখের ভাইঝি।

'বোবা হাবা তোতলা মেয়ে ফুলবানু'[৭৭]

তার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং রূপসৌন্দর্যে অতুলনীয়। সতীনের সংসারে ছোটবউ হয়েও ফুলবানু মুখ বুজে গার্হস্থ্য অত্যাচার সহ্য করে না- প্রতিবাদ জানায় সোচ্চারে বা নিরুচ্চারে। বিশ শতকের চারেক দশকে লিখিত গল্পটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপরবর্তী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের গণ-আন্দোলনগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্বদানের প্রেক্ষাপটে মানসিক দুর্বলতার দিকটি পরিস্ফুটিত হয়েছে ফুলবানু চরিত্রটিতে। সাধুর একদিকে দলীয় রাজনীতি, একদিকে ফুলবানুর প্রতি টান- এই দুই-এর মধ্যে ফুলবানুরই জিত হল। মানিক দেখালেন গণবিদ্রোহ, গণ-আন্দোলনগুলি আসলে ঘরে ফেরার টান-ঘরের মানুষকে ভাল রাখার জন্য প্রতিবাদ- সবাইকে নিয়ে ভালো থাকার প্রয়াস- সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্নজালরচনা।

রাজেনের স্ত্রী (গায়েন : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিশ শতকের চারেক দশকের ছোটগল্প 'গায়েন'-এ রাজেনের স্ত্রী বোবা। গল্পটিতে তার ভূমিকা খুবই সামান্য। তাদের দুটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে। নটবরের বোবা মেয়েটিকে বিয়ে করার কারণ গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,-

''সেই কবে অতল দয়ার রূপে প্রেম এসেছিল কবির খেয়ালে''[৭৮]

রাজেনের বৌটি এখন অসুস্থতায় শয্যাশায়ী, রাজেনের জনপ্রিয়তাও কমছে, তার উপর রয়েছে বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে দিতে না পারার চাপ, সব মিলিয়ে রাজেনের মুখ যখন গোমড়া, তখনও বোবা বৌ-এর ইশারা সে বোঝে এবং মুখে হাসি ফোটে রাজেনের এই ষাট বছর বয়সেও। সত্যিকারের শিল্পী মানুষ রাজেন আসর জমাতে পারলেও নিজের আখরটা গুছিয়ে নিতে পারেনি। নটবরের বোবা মেয়ে আসলে রাজেনের কোমল দয়ালু মনের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য বোঝানোর উদ্দেশ্যকল্পে লেখক কর্তৃক সৃষ্ট।

বৌকা বাওয়া (ঢোঁড়াই চরিত মানস : সতীনাথ ভাদুড়ী)

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে পার্শ্বচরিত্র বৌকা বাওয়া জন্মাবধিই মূক, কিন্তু বধির নয়। উপন্যাসে শুধুমাত্র প্রথম চরণেই তার উপস্থিতি। রামায়ণের আদলে লিখিত উপন্যাসটিতে কাহিনির গঠনানুযায়ী বহু ছোটোখাটো প্রসঙ্গ-ঘটনা-চরিত্রের অন্যতম বৌকা বাওয়া। এক

অর্থে উপন্যাসের কাহিনি সূচিত হচ্ছে বৌকা বাওয়াকে ঘিরেই। আদিকান্ডে বিষয় পরিচিতির সূত্রে এসেছে বৌকা বাওয়া চরিত্র। সতীনাথ বৌকা বাওয়াকে জিরানিয়া বা তাৎমাটুলি থেকে অভিন্ন করেই ভেবেছেন। ঢোঁড়াই চরিতের ভিত্তিও বলা যায় বৌকা বাওয়াকে।

ঢোঁড়াই জীবনে অনেক কিছু পেলেও, পাচ্ছে না নিশ্চিত জীবন, যা রামচন্দ্রেরও ঘটেনি। বৌকা বাওয়াই ঢোঁড়াইকে মানুষ করে। ফলে তাদের মধ্যে এক পিতাপুত্রের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। রামচন্দ্রের সঙ্গে ঢোঁড়াই-এর যোগ কৌশলে তৈরি হচ্ছে যখন বৌকা বাওয়া ঢোঁড়াই-এর পেটে তিনটি রেখাচিহ্ন দেখে। তাৎমাদের বিবর্তন, সংস্কারগুলি নিজেদের মত পাল্টে যাওয়া দেখাবেন যে লেখক, তার সেই উদ্দেশ্যে সিদ্ধ করছে বৌকা বাওয়া।

প্রথমে বৌকাকে নিয়ে বৌকামাইয়ের আহ্বান, তারপর গোঁসাই থানকে আশ্রয় করে বৌকার নিজের ব্যবস্থাটুকু করে ফেলা এবং অত:পর পাকুড়-বৃত্তান্ত, এসবের মধ্যে সতীনাথ অলৌকিকতার উপর নির্ভরতা এবং অলৌকিকতাকে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধিতে ব্যবহার দেখালেন বৌকা বাওয়া চরিত্রে। এরপর থেকেই বৌকাকে কেন্দ্র করে ঢোঁড়াই-এর জীবনে একটি নির্দিষ্ট পথে বইতে শুরু করে।

বৌকা বাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ঢোঁড়াইকে তার থানের উত্তরাধিকার হিসাবে স্থাপন করা। অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী বৌকা বাওয়ার প্রবল বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় ঢোঁড়াই-এর অসুস্থতায় ঢোঁড়াই-এর জন্য দুধের ব্যবস্থা করার ঘটনায়।

এই চরিত্রটি কথা বলতে পারে না। কিন্তু তার বাঙ্‌হীনতা তার উপস্থিতি নস্যাৎ করে দিচ্ছে না, বরং কখনো কখনো তা আরও বেশিভাবে সোচ্চার করে দিচ্ছে। যেমন- ঢোঁড়াই-এর মাটি খোঁড়ার সময় বৌকা বাওয়ার জটায় আগুন না দেওয়া, অর্থাৎ তাৎমারা তাকে হয়ত কিছুটা মানে।

ঢোঁড়াই-এর ভিক্ষাবৃত্তি খুব একটা পছন্দ নয়। এবার আসে বুধনীর ঢোঁড়াই-এর পাখা টানার প্রস্তাব। কিন্তু তা ঢোঁড়াই বা বৌকা কারোরই পছন্দ নয়। এবার পাগলাকুকুরের উপদ্রবে বৌকার প্রাপ্ত টাকাতেই ঢোঁড়াই-এর নতুন জীবন শুরু হল। বৌকার প্রাপ্ত টাকায় কেনা গাড়ীতেই ঢোঁড়াই-এর জীবনের ভৌগোলিক পরিধি বৃদ্ধি পায়। ঢোঁড়াই-এর স্বাধীন জীবনযাত্রা আরম্ভের সুযোগটাও ঢোঁড়াইকে করে দিচ্ছে বৌকা বাওয়া।

ঢোঁড়াই-এর জীবনে তাৎমাটুলির সীমা পেরিয়ে অন্যজীবন তৈরি হচ্ছে, বৌকা যে ঢোঁড়াইকে ছেড়ে গেল, তার কারণটা বেশ interesting। ঢোঁড়াই-এর সংসার বৌকা নিজে হাতে পেতে দিয়েছে। ঢোঁড়াই-কে অবলম্বন করে অদ্ভুত এক structural মিল। খুব ভালবাসা। বৌকা যখন একা হয়ে যাচ্ছে

তখন তার রামজীর কথা মনে পড়ছে, আর ঢোঁড়াই যখন শেষে একা হয়ে যায়, তখন সে রামায়ণটা ছেড়ে যায়। দশরথ পিতৃত্বের স্বাদ পায় বেশ বৃদ্ধ বয়সে। বৌকা বাওয়া এবং ঢোঁড়াই এর মধ্যেও বেশ সুন্দর এক বাৎসল্য সম্পর্ক। রামায়ণে দশরথ কৈকেয়ীর জন্য রামকে বনবাসে পাঠান আর বৌকা ঢোঁড়াই-এর জন্য নিজেই অজ্ঞাতবাসে যায়। লবণ সত্যাগ্রহের সময় পাশাপাশি গান্ধীবাবার থান তৈরি হওয়ায় গোঁসাই থানের গুরুত্ব কমে যাবার আশঙ্কা তৈরি হয়।

বৌকা বাওয়ার সঙ্গে ঢোঁড়াই-এর সম্পর্কের এক অদ্ভুত রাসায়ন রয়েছে। যেহেতু ঢোঁড়াইকে ঘিরে কোনো সংসার তৈরি হয় না, তাই বিশেষ কোনো মানবিক সম্পর্কের ছবিও নেই, কিন্তু তবুও বৌকা বাওয়া এবং ঢোঁড়াই-এর মধ্যে এক সুন্দর মানবিক সম্পর্কের ছবি রয়েছে। ঢোঁড়াই এর সঙ্গে এক অদ্ভুত যোগাযোগ রয়েছে বৌকা বাওয়ার। অদ্ভুত সুন্দর গুরু-শিষ্য-সংবাদ। রাগারাগি সব সম্পর্কের বন্ধনকে দৃঢ় করে। দেখা যায়, ঢোঁড়াই এর উপর হওয়া বৌকার রাগ কমে গেলে ঢোঁড়াই সম্পর্কে বৌকার উৎকণ্ঠার অন্ত থাকে না।

ঢোঁড়াই যখন বাওয়াকে বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছে সেখানেও গুরু-শিষ্যের বাৎসল্যের সুন্দর সম্পর্ক দেখি। আর এরই অনিবার্য পরিণতি বোধ হয় বাওয়ার চলে যাওয়ার ঘটনায়। চিমটেটায় যে আংটা লাগানো ছিল তা নিয়ে করা মন্তব্যে 'বাওয়ার অন্তর্ধান' এর মধ্যে একটা জনজাতি দেশের ইতিহাস পুরো মিশে যাচ্ছে উপন্যাসে। এরই মধ্যে বাওয়া চরিত্র এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলী, দু-একটি মুহূর্ত তৈরি সতীনাথের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়।

গঙ্গামণি (গাছ: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষপাদে রবীন্দ্রনাথ এক অসহায় মূক বালিকা সুভাকে প্রকৃতিকন্যারূপে অঙ্কন করেছিলেন। সুভার বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল তার বাবা সমাজের চাপে। বোবা মেয়ে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ভাল থাকতে পারবে না জেনেও বাবা মেয়েকে ঘরে রাখতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আরেক বোবা মেয়েকে আনলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'গাছ' ছোটগল্পে, গঙ্গামণি। তার বিয়ে দেওয়া হল একটা গাছের সাথে।

> ''বোবা মেয়েকে কে বিয়ে করবে? তার উপরে কিছুটা জড়বুদ্ধি। কানেও শুনতে পায় না। দেখতে অবশ্য ভাল। যেন রজনীগন্ধার ফুটন্ত ডাঁটি। কিন্তু শুধু উপর-উপর দেখিয়েই কি মেয়ে পার করা যায়?''[৭৯]

সুভাতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন যে শুধু ওপর ওপর দেখিয়ে বোবা মেয়ে পার করানোর ফল কি মারাত্মক হতে পারে। মেয়ে বোবা জানার পর সুভার শ্বশুরবাড়ির লোকজন ছেলের দ্বিতীয় বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেক্ষেত্রে তারা ভাল করে পরখ করেই মেয়ে আনার কথা বলেছিল।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গঙ্গামণির ক্ষেত্রে অতি সামান্য বদল ঘটল বিবাহের ক্ষেত্রে।

'' কারু সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। মানুষ না জোটে, ছুরি, কাঁচি শিল-নোড়া যা হোক একটা কিছু নিয়ে এস। ছি,ছি, ওদের কাউকে গঙ্গামণির পছন্দ নয়। দরজা-জানলা? দূর! ওদের কি প্রাণ আছে? না, পৌরুষ আছে?

তবে গাছের সঙ্গে বিয়ে দাও। যে সরল সতেজ গাছটা ওর ঘরের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সেই গাছের সঙ্গে।

গঙ্গামণি মাথা উঁচু করে তাকাল গাছের দিকে। অনেক পাতা, অনেক ছায়া। কিছুটা আবার ফুল। কিছুটা আবার গন্ধ।

গঙ্গামণি পছন্দ করল। বেশ নির্ভীক, বলবান গাছ। পুরুষ-পুরুষ দেখতে। একেবারে হাতের কাছটিতে।''[৮০]

যেহেতু গঙ্গামণির পরে আরও একটা মেয়ে আছে গয়ামণি তাই তার সুখের পথ প্রশস্ত করার জন্য বোবা মেয়ের সাথে গাছের বিবাহ হল।

সুভার জন্মকালে তার বাবা নীলকণ্ঠ বড় দুই বোনের নামের সঙ্গে মিল রেখে নাম রেখেছিল সুভাষিণী। আর ভগবানের নির্দয় পরিহাসে সেই মেয়ে হল ভাষাহীনা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গঙ্গামণির নাম গঙ্গা হলেও সবাই তাকে ব্যঙ্গ করে

''গঙ্গা না বলে গোঙা বলে ডাকে।''[৮১]

লেখক দক্ষভাবে বলেছেন,-

''ভাগ্যিস শুনতে পায় না।''[৮২]

লেখকের গঙ্গামণির উপর সহমর্মিতা এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। গঙ্গামণি তার মনের মানুষ পেয়ে গেল গাছের মধ্যে। দুই প্রাণীই কথা বলতে পারে না। তাই নিজেদের না বলা কথাগুলো খুব সুন্দর বুঝে নেয় এরা। সুভার স্বামী এবং মনের মানুষ এই দুই পৃথক সত্তা এক হয়ে দেখা দিল গঙ্গামণির গাছ হয়ে। একবিংশ শতাব্দীতে রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' উপন্যাসে এক বোবা কালা দম্পতিকে পাব, জুঁই-সুশান্ত। গঙ্গামণির নির্বাক বড় গাছ থেকে জুঁই-এর সুশান্ত হল বোবা-কালা।

গল্পটির শেষাংশে দেখব স্বাধীনতা পরবর্তী দাঙ্গা ও দেশভাগ প্রতিবিম্বিত হয়েছে গঙ্গামণির জীবনেও। এক প্রাকৃতিক ঝড়ে সবাই যখন ঘরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে মাথা গুঁজেছে, তখন গঙ্গামণি বাগানে তার স্বামী-গাছটিকে আঁকড়ে ধরে ছিল। সবাই দেখেছে সেই চরম বিপদের সময়ে বোবা মেয়ে কথা বলেছে তার স্বামীর সাথে। অচিন্ত্যকুমার নিজে গল্পটিকে একটি প্রেমের গল্প হিসাবেই দেখাতে চেয়েছেন।

''..... প্রেম গাছের সঙ্গে।''[৮৩]

কিন্তু সেই প্রেমের উপরও আঘাত হানল রাজনৈতিক-সামাজিক ঝড়। দাঙ্গায় গঙ্গামণিরা প্রাণ বাঁচিয়ে এ দেশে চলে আসতে পারলেও তার স্বামীকে সে আনতে পারে নি সাথে, গঙ্গামণির স্বামী ওপারেই রয়ে গেছিল। তাই অঝোরে কেঁদে চলেছে গঙ্গামণি। কিন্তু বর্ডারের অফিসারের কথায় তার সম্বিৎ ফেরে। সে বোঝে সুভঙ্গ কাঁদছে কারণ তার স্বামী খুন হয়েছে। কিন্তু গঙ্গামণির স্বামী তো বেঁচে আছে। আবার কোনো একদিন নিশ্চয়ই দেখা হবে।

অনেক স্বপ্ন নিয়ে এল স্বাধীনতা। কিন্তু তার সঙ্গে অবধারিতভাবে এল দেশভাগ-উদ্বাস্তুসমস্যা-দাঙ্গা। মানুষের নতুন করে স্বপ্নভঙ্গ শুরু হল। কিন্তু তার মধ্যেও আবার মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখবে পুরাতন ঐতিহ্য সংস্কারকে নিয়ে। বোবা মেয়ে গঙ্গামণির বিশ্বাস প্রত্যয়ের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেই স্বপ্নই দেখতে চেয়েছেন।

তাতারী (ক্রীতদাসের হাসি: শওকত ওসমান)

বাংলাদেশের অন্যতম বিখ্যাত সাহিত্যিক ওসমান সাহেব 'আরব্য-রজনী'র রূপকে রচনা করলেন রূপক উপন্যাস 'ক্রীতদাসের হাসি'। এই উপন্যাসের নায়ক ক্রীতদাস তাতারী। বাগদাদের বাদশাহের ক্রীতদাস তাতারী তার স্ত্রী মেহেরজানের সঙ্গে সুখী দাম্পত্যজীবন যাপন করছিলেন। তাদের এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে বাগদাদের বাদশা তাদের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ শুনতে পান। তখন এই প্রাণখোলা হাসি বাদশাহকে শোনানোর উদ্দেশ্যে গোলামকে আমির করে দেন বাদশাহ। বিনিময়ে তাতারীর কাছ থেকে কেড়ে নেন রূপসী মেহেরজানকে। মেহেরজান বাদশাহমহলের অতুল সুখ-ঐশ্বর্যতে মশগুল হয়ে ভুলে যায় তার অতীত জীবন। কিন্তু তাতারীকে কোনো কিছুর বিনিময়েই ক্রয় করতে পারল না বাদশাহ। তাতারীর হাসি নর্তকী বুসায়নার প্রলোভন বা সৈনিকের অত্যাচারকেও হার মানায়। তাতারী তিনবছর ধরে একদিনের জন্যও হাসল তো নাই, বরং হয়ে উঠল মৌনমুখর। সুদীর্ঘ তিনবছর। অবশেষে মেহেরজানকে সামনে দেখে তাতারীর মুখে কথা ফুটে উঠল আবার।

চরিত্রটিকে মূক চরিত্র বলা যায় না। কারণ তাতারী নির্বাক নয়। মাত্র তিনবছরের জন্য সে হয়ে পড়েছিল মৌনমুখর। সাময়িক প্রতিবন্ধকতা। আসলে উপন্যাসটি রূপক জাতীয়। তাতারী, বলা ভাল তাতারীর মৌনতা বিশেষ কিছুর ইঙ্গিতবাহী। উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ। যার প্রেক্ষাপট বলা যায় সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ এবং তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে স্বাধীনতাপরবর্তী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরোধ-সংঘাত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ১৯৫৮ তে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনব্যবস্থার জাঁতাকলে সাধারণ মানুষের দমবন্ধ করা জীবনধারণের চিত্র।

আলমপনা বাদশাহ হারুন-অল-রশিদ আবিসিনিয়া থেকে বন্দী হিসাবে ধরে নিয়ে এসেছিল তাতারীকে। ক্রীতদাস বানিয়ে তাতারীকে দিয়ে রাজসেবা করানো হত। তাতারী রাজার সমস্ত কাজকর্ম আদেশমত করলেও কখনই বিক্রিত হয়ে যায়নি। চিরদিনই তাতারী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেছে।

ঘটনাচক্রে তাতারী একদিন ক্রীতদাস থেকে নিজেই ধনী মনিবে পরিণত হয়। বাদশাহ তাতারীকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দেয়। কিন্তু বিনিময়ে তাতারীর থেকে কেড়ে নেয় তার পত্নীকে। সেনাপতি মশরু এবং এক কবি আবু ইসহাক-এর প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে বাদশাহ তাতারীর মেহেরজানকে নিজে ভোগদখল করার বাসনায় নিজের বেগম বানান। তাতারীকে সমস্ত গোলামী থেকে মুক্তি দিলেন যার শর্ত থাকে মেহেরজানের সঙ্গে যেমন প্রাণখোলা হাসি হাসে তাতারী সেইরকম প্রাণখোলা হাসি! যেখানে প্রাণের স্পর্শমাত্রও নেই, সেইখানে প্রাণখোলা হাসি কি মারাত্মক irony! এমন হাসি হাসতে পারল না তাতারী।

বাদশাহ তাতারীকে ক্রীতদাস থেকে মনিব করে দিল। আজ তাতারী মনিব। এতদিনের ক্রীতদাসের আজ প্রচুর অধস্তন কর্মচারী। হঠাৎ পদমর্যাদাপ্রাপ্ত হয়ে তাতারী কিন্তু নিজের অতীত ভুলে যায়নি। বরং সে তার অধস্তন কর্মচারীদের সাথে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেছে। এক অতি মধুর সুন্দর সম্পর্ক গঠন হয়েছে উভয়ের মধ্যে। তাতারী কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায়নি যে আজ তার পদমর্যাদা সে নিজের ক্ষমতায় অর্জন করেনি। বরং এই ক্ষমতাপ্রাপ্তির বিনিময়ে তাকে বলি দিতে হবে তার আত্মসম্মান। অথচ প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে তাতারী সবকিছু নীরবে মেনে নেয়নি, মোসাহেবি করেনি। নীরবতায় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।

তাতারীর হাসি কিনতে চেয়েছিল বাদশাহ। হাসি কখনও কেনা যায় না। তাও আবার যে সে হাসি নয়, প্রাণখোলা হাসি। তাতারীর হাসির মূল তার ভালোবাসার মানুষের সান্নিধ্য-স্পর্শ-তাপ। মেহেরজানের প্রতি ভালোবাসা। এই ভালোবাসাতেও তাতারী পরম একনিষ্ঠতা বজায় রেখেছে।

মেহেরজানকে হারিয়ে তাতারী অন্য নারীর প্রলোভনও অক্লেশে এড়াতে পেরেছে। এই ভালোবাসার জোরেই একদিকে যেমন বিলাসিনী বিলাসকারিনী রোক্কাসা বুসায়নার চরিত্রের নৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, ঠিক তেমনি শেষ পর্যন্ত তাতারীর এই একনিষ্ঠ ভালোবাসার জোরেই মেহেরজানও ফিরে এসেছে তাতারীর কাছে তাতারীর জীবনে হৃতহাসি উদ্ধার করে। বুসায়না যতই তাতারীকে ছলাকলায় ভোলাতে কসুর না করুক বাদশাহের কথামত, তাতারী যে প্রেমিকাভিন্ন অন্যনারীকে বোনের নজরে দেখেছিল তার প্রমাণ রয়েছে বুসায়নার আত্মহত্যার পর তাতারীর ভেঙে পড়ায়।

তাতারী বাদশাহের দমন নীতির সামনে পরাজয় স্বীকার করেনি। অথচ ভালোবাসার সামনে মাথা নত করেছে। তাতারীর নিজের স্ত্রী মেহেরজানকে বাদশাহ নিজে ভোগ করার জন্য বেগম বানিয়েছে এবং বিনিময়ে তাতারীকে দিয়েছে সুন্দরী রূপসী বিলাসিনী ছলাকলা জানা নর্তকী বুসায়নাকে। তাতারী বুসায়নাকে ভালোবাসেছে, কিন্তু কামনার নারীর চোখে নয়, বোনের চোখে। তাতারী নিজে যখন গোলাম ছিল তখন বাদশাহের অত্যাচার দমন পীড়ন সহ্য করেছে বটে, কিন্তু নিজে মনিব হয়ে সেই জঘন্য ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে দেয়নি।

'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসটিতে ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান এক প্রতিবাদের চিত্র এঁকেছেন রূপক আকারে। ক্রীতদাস তাতারী এখানে পূর্ব-বাংলার জনসাধারণের প্রতীক আর বাঙালীর নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য- মূল্যবোধ-আত্মসম্মান-মৌলিকতা এসব কিছুর প্রতীক তাতারীর প্রাণপ্রিয়া মেহেরজান। আর বাদশাহ আলমপনা পাকিস্তানি শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ।তাতারীকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে ধনবান করে দিয়ে তার হাসি কেনার মধ্যে ফুটে উঠেছে সমানাধিকারের নামে বাঙালীর নিজস্ব সত্তাকে গ্রাস করার ইতিহাস। কাহিনির শেষে মেহেরজানের আত্মসম্বিত ফিরে পাওয়া এবং তাতারীর নীরবতা ভঙ্গ বাঙালীর প্রতিরোধ এবং আত্মবিশ্বাসের প্রতিধ্বনি।

সুশান্ত-জুঁই (পশ্চাৎপট : রমাপদ চৌধুরী)

একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' উপন্যাসের সুশান্ত আর তার স্ত্রী জুঁই বোবা-কালা। দুজনেরই বাবা-মা সম্পূর্ণ সুস্থ এবং তাদের একমাত্র সন্তান অমৃতও পিতামাতার প্রতিবন্ধকতা-প্রাপ্ত হয়নি। দুজনেই অপূর্ব দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী এবং সব থেকে বড় কথা অসাধারণ সুন্দর মনের অধিকারী এই মানুষদুটি।

সুশান্ত এবং জুঁই জন্ম থেকেই বোবা-কালা। তাদের বাবা-মা তাদের জন্য বিশেষ স্কুলে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। ফলে তারা দুজনেই পড়াশোনা জানে। শুধু সাক্ষরতার জ্ঞানটুকুই তাদের আছে তাই-ই নয়, বাড়িতে থাকা বিভিন্ন বইপত্রও তারা পড়েছে, নিয়মিত খবরের কাগজও পড়ে। তার মানে দুনিয়া জগৎ যতই তাদের ভিন্ন নজরে দেখুক, তারা জগৎকে আর পাঁচজন

সাধারণ মানুষের মতই দেখে। তাদের বাড়িতে আসা লোকজন অবাক হয়ে যায় এদের এই কাগজ পড়া বা বইপত্র পড়ার বিষয়টি জেনে। বিশেষত: জুঁই শুধুমাত্র নিজেই যে কাগজের খবর পড়ে তা নয়, বিশেষ কোনো খবর সে বাড়িতে শাশুড়ী বা আর সবার সাথেও ভাগ করে নেয় নিজস্ব ভঙ্গীতে।

সুশান্তর বাবা বড় চাকরি করতেন। তিনি যে শুধু সুউপায়ী অর্থাৎ বিষয়জ্ঞানী মানুষ ছিলেন, তা নয়, বিচক্ষণতাও ফুটে উঠেছিল তার সুশান্তকে প্রতিপালনে। সুশান্তর সাথেই বিশেষ স্কুলে পড়ত জুঁই। তাকে দেখে পছন্দ করে নিজেই ছেলের বউ করে ঘরে আনেন জুঁইকে। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্যণীয় সুশান্ত এবং জুঁই পরস্পরকে নিজেদের মতো জেনে বুঝে নেবার সুযোগ পেয়েছিল। সুশান্ত এবং জুঁই দুজনের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। সমস্ত বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতেও তাই এরা অবিচলিত থাকতে পেরেছে। সে একমাত্র শিশুকে দাদু-ঠাকুমার কাছে থাকা থেকে শুরু করে শিশুর যৌবনে বাবা-মার প্রতি আস্তে আস্তে অমনোযোগিতার ঘটনা যাই হোক না কেন।

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে রমাপদ চৌধুরী দেখিয়েছেন একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষ কতটা অমানবিক হতে পারে প্রতিবন্ধী মানুষগুলির প্রতি। সুন্দরী জুঁই গিনিহারে সজ্জিত হয়ে বিয়েবাড়ি গেলে তার রাজরানীর মত রূপের প্রশংসা না করে সমাজ বরং ব্যঙ্গ করেছে যে, বোবা-কালা মানুষের সাজসজ্জা, শখ-আহ্লাদ, আনন্দ যেন কিছুই থাকতে নেই। এই কথাগুলো শারীরিক প্রতিবন্ধকতার আশীর্বাদে কষ্ট দিতে পারে না জুঁই বা সুশান্তকে। কিন্তু শিক্ষিত তথাকথিত ভদ্রসমাজের শারীরিক অক্ষমতার প্রতি এই ব্যঙ্গ কষ্ট দেয় জুঁই-সুশান্তের পরিবারের মানুষদের, বিশেষ করে ছোট ছেলেটাকে।

সুশান্তর বাবা উচ্চপদস্থ কর্মচারী হলেও সুশান্ত এবং জুঁই-এর নিজস্ব এক জগৎ তৈরী করে দিয়েছিলেন। পড়াশোনা শেখার পর তারা এক সেলাই স্কুলে কারিগরী শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করেছিল। বিয়ের পর দুজনেই সেই নিয়ে স্বাধীন ব্যবসা চালায়। দিনের শেষে আয়ও মন্দ হয় না। জুঁই আবার ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে আসে। আর পরবর্তীকালে সুশান্তর বাবার অবসরগ্রহণের পর কিছুটা সুরাহাও করার চেষ্টা করেছে তারা। যুবক ছেলে যখন কলেজে যাচ্ছে তখন তার জন্য সুন্দর জামা বানিয়ে দিয়েছে এবং হাতখরচের ব্যবস্থাও করেছে।

জুঁই-এর মনে একটা সুন্দর শিল্পীসত্তা ছিল। তার পরিচয় পাই তার হাতে বানানো সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের জামাকাপড়গুলোতে। যার এ হেন শিল্পীমন এবং সর্বোপরি যে নিজেই সুন্দর তার সাজসজ্জার জন্য বিশেষ কোনো অলঙ্করণ বা অন্য কোনো মানুষের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তবুও পাঠকরা অমৃতর জবানিতে জেনেছে জুঁই নিজের পোশাক নির্বাচনের সময় শাশুড়ি এবং স্বামীর

মতকেই প্রাধান্য দিত। আসলে এটা তার বিনয় এবং সবার সাথে মানিয়ে নেবার ক্ষমতার পরিচায়ক।

ছোট্ট বাচ্চা সবকিছু শেখে বড়দের বা বলা ভাল তার আশেপাশে থাকা মানুষজনদের আচরণ অনুসরণ করে। তাই অমৃতের উপর জুঁই-সুশান্ত কখনোই মাতৃত্ব-পিতৃত্বের অধিকার ফলাতো না। বরং তারা বুঝত, তাদের শারীরিক অক্ষমতার তাদের পিতামাতা যে অপরাধবোধ বা হীনণ্মন্যতায় ভুগত অমৃতর মাধ্যমে সেই অতৃপ্তি পূরণের চেষ্টা করত। জুঁই-এর প্রতিটি কাজে শাশুড়ীর প্রতি অনুগতভাব আসলে তারই পরিচায়ক।

শুনতে না পেলেও, বলতে না পারলেও জুঁই-সুশান্তর বোঝার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ঔপন্যাসিক বারবার একটাই কথা বলেছেন, এরা নিজেদের আর পাঁচটা স্বাভাবিক মানুষের মতই ভাবে। আর ঠিক এই কারণেই সারা উপন্যাসে রমাপদ চৌধুরী কখনোও দু:খে বিমর্ষ হয়ে পড়তে দেখাননি চরিত্রদুটিকে। বরং, সবসময় তারা জীবনরসে রসিক। রমাপদ চৌধুরী দেখালেন আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতই এরাও স্বাধীন জীবিকা উপার্জন করে জীবননির্বাহ করতে পারে। শুধু নিজের বা নিজের পরিবারটুকু প্রতিপালনমাত্র নয়, সুশান্ত-জুঁই তাদের বুটিকে বেশ কয়েকজন কর্মচারীও রাখতে পেরেছে। অর্থাৎ সমাজ যতই প্রতিবন্ধী মানুষ হিসাবে এদের করুণার চোখে দেখুক এরা কিন্তু সমাজকে সেবা দিচ্ছেন।

একমাত্র ছেলে অমৃত সুচাকুরে হয়ে আধুনিকমনস্ক পরিবারের সঙ্গে যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইল আর সেই পরিবার অমৃতর বাবা-মায়ের প্রতিবন্ধকতার অপরাধে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করতে অস্বীকার করল, তখন ঔপন্যাসিক আর পারলেন না সুশান্ত-জুঁইকে সেই আঘাত দিতে। রমাপদ চৌধুরী আসল সংবাদটা আড়াল করে রাখার প্রস্তাবে উপন্যাস শেষ করলেন। জীবনযুদ্ধে জিতিয়ে দিলেন সুশান্ত-জুঁইকে।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী ভারি আশ্চর্য ঘটনা দেখালেন, টিভি দেখা। কিন্তু আসলে টিভিতে দেখা এবং শোনা দুটিতে সম্পূর্ণ রসাস্বাদ গ্রহণ সম্ভব হয়। সুশান্ত এবং জুঁই সবার সঙ্গে বসে টিভি দেখে। এই দেখার মধ্যেই তারা শোনার কাজটাও করে ফেলে। মানুষ রেডিওকে নাটক শুনে যেমন দৃশ্য visualise করে থাকে, জুঁই-সুশান্ত টিভি দেখে কথাগুলোও অনুমানে শুনতে পারে। আসল টিভি দেখার আনন্দ তো পরিবারের সবার সাথে একসঙ্গে বসে সুখদু:খ ভাগ করে নেবার মধ্যে দিয়ে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করা। জুঁই-সুশান্তই শুধু নয়, সুশান্তর বাবা-মাও সবসময় তাদের যে স্বাভাবিক মানুষ হিসাবেই ভাবতেন এগুলি তারই প্রমাণ। আসলে রমাপদ চৌধুরী দেখাতে চাইলেন প্রতিবন্ধকতা যখন শারীরিক হয় তখন মনের positivity-র জোরে তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। একবিংশ

শতাব্দীতে জুঁই-সুশান্তর প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবন ছন্দে যাপিত জীবনের মূল কান্ডারী কিন্তু সুশান্তর বাবা-মা।

কিছু কিছু শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জুঁই যেগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে না, সেগুলির মোকাবিলাও কি সুনিপুণভাবে করা যায় তার নিদর্শন জুঁই-এর মাংস রান্না করার ঘটনা। অসাধারণ সুন্দর রান্না করে জুঁই। অমৃতর কথা থেকে জানা যায় মাংস রান্নার সময় প্রেশার কুকারের সিটি শুনতে জুঁইয়ের যে সমস্যা তাও উত্তরণের কায়দা রপ্ত করে নিয়েছিল জুঁই। রান্নার সময় প্রেসার কুকারের সামনেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত এবং মাথার দিকে বাষ্প তুবড়ি মেরে বেরতে থাকা দেখে সিটি বুঝে নিত। আর নাহলে শাশুড়ী মা তো ছিলেনই। এই যে একজন 'বুবি' তার মূকত্বের যন্ত্রণাটুকুর আঁচটাও না পেয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে তার জন্য যে পারিবারিক মানুষগুলোর পাশে থাকা তা প্রতি পদক্ষেপে দেখিয়েছেন রমাপদ চৌধুরী।

সুশান্তর বাবাই একবার বলেছিলেন,

''ওরা তো জানে ওরা নর্মাল মানুষ। যার একটা হাত নেই বা পা নেই সে কি নিজেকে অন্য কিছু ভাবে। বরং অন্যলোকগুলোই একটু অ্যাবনর্মাল।''[৮৪]

এই যে একদিকে বলা হচ্ছে যে সুশান্ত-জুঁই তো স্বাভাবিক এমনকি যাদের একটা হাত-পা নেই, তারাও নাকি অস্বাভাবিক নয়। বরং অন্যরা অস্বাভাবিক। তাহলে স্বাভাবিক বা normal আর অস্বাভাবিক বা abnormal-এর সংজ্ঞাটা কি? রবীন্দ্রনাথের সুভা বোবা হবার জন্য বিয়ের পর স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন চলতে লাগল। আর একবিংশ শতাব্দীর জুঁই বুবি তাতে তার শ্বশুরবাড়িতে কোনো সমস্যা নেই।

রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীতে যখন 'সুভা' লিখলেন তখন মেয়েদের স্থান অন্ত:পুরে। 'স্ত্রীর পত্রে' দেখেছি যে নারীরা পুরুষদের বৈঠকখানা সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে, সেই নারীরাই স্বচ্ছন্দ বোধ করে স্যাঁতস্যাঁতে এঁদো রান্নাঘরে। রমাপদ চৌধুরী একবিংশ শতাব্দীতে দেখালেন 'বুবি' হবার জন্য জুঁই শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্ছনার স্বীকার হয়নি। এটা অবশ্য ঠিক যে জুঁই এর স্বামী সুশান্তও জুঁই-এর মতনই সমান প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ছিল। এক্ষেত্রে 'সুভা'র স্বামীর মত সুস্থ, স্বাভাবিক যদি হত সুশান্ত, তাহলে জুঁই-এ পরিস্থিতি কি হত তা উহ্য রাখলেন রমাপদ চৌধুরী। একবিংশ শতাব্দীর 'বুবি' জুঁই ঘরকন্নার কাজ করে নিজেকে লুকিয়ে রাখে না। বাড়িতে রান্নার লোক আছে। ঘরের বউ ব্যবসা করে। স্বামীকে সাহায্য করে। স্বাধীন জীবনযাপন করে। সুশান্ত-জুঁই-এর প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের পশ্চাতে অবশ্যই সমাজ-অর্থনীতিরও একটা বিশেষ ভূমিকা থেকেছে। সুশান্তর বাবার বড় চাকরি

বারবার করে সেই স্বচ্ছলতার কথাই নির্দেশিত করছে। শুধু সুশান্তের বাবা নয়, জুঁই-এর পরিবারের লোকজনের উদার মানসিকতার চিত্রও এঁকেছেন রমাপদ চৌধুরী। অমৃতর কথায়,-

''ছোটমামা বলল, কথায় বেশ কিছুটা ঝাঁঝ, আমাদের এই পোড়া দেশে শতকরা আশি-ভাগ লোকই তো ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব। কই তাদের তো কেউ অস্বাভাবিক ভাবে না। বরং তাদের এতই স্বাভাবিক ভাবে যে তাদের দিকে কারও চোখই যায় না।'' [৮৫]

সারাজীবন অমৃত বাবা-মার উপর সমাজের উপেক্ষার হাসি দেখেছে। জেনেছে সমাজের নির্মম অন্ত:সারশূন্যতার ছবি। তাই রমাপদ চৌধুরীর কল্পনায় জিতে গেছে সুশান্ত-জুঁই। প্রতিবন্ধকতার গ্লানি শুধু পিতা-মাতার উপরই নয় তার সন্তান এবং অনাগত ভবিষ্যতের উপরও বর্তায়। একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষ বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস না রেখে কতটা মনুষ্যত্বের অবমাননা করে রমাপদ চৌধুরী সেটাই দেখালেন।

সুভা থেকে জুঁই-এর মাঝের সোপান ছিল গঙ্গামণি। সুভা স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগে কোনো প্রতিবাদ জানিয়েছিল কিনা জানা যায় নি। কিন্তু গঙ্গামণি তার স্বামীর অটলতা, সহিষ্ণুতা, একনিষ্ঠতায় বিশ্বাস করত। বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতেও ভেঙে না পড়ে আশায় বুক বেঁধেছিল গঙ্গামণি। একবিংশ শতাব্দীর জুঁই আর নিজেকে মনেই করে না অস্বাভাবিক বলে। সমাজ পরিবেশের বদলের জ্বলন্ত নিদর্শন চরিত্রগুলি।

কথাশেষ

মূক চরিত্র আলোচনায় সবার প্রথম নির্বাচিত চরিত্র রবীন্দ্র-ছোটগল্প 'সুভা'র (১৮৯৩) সুভাষিণী। সামাজিক প্রথার চাপে এক অসহায় মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাবার মর্মস্পর্শী কাহিনি 'সুভা'। সমাজ কিভাবে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তার স্পষ্ট উদাহরণ সুভা। সমাজ মানুষ গঠন করেছে। কিন্তু সেই সমাজের এক কঠিন সময় পটভূমিকার চিত্রাঙ্কন সুভা চরিত্র। বিবাহযোগ্যা কন্যাকে পাত্রস্থ করতে না পারলে কন্যার পিতার পরিবারকে সমাজ 'একঘরে' করে দেবে। তাই কন্যার বাক্‌হীনতার কথা গোপন করেই কোনোক্রমে কন্যাকে পাত্রস্থ করে একপ্রকার বাধ্য হয়ে পালিয়ে আসেন বাণীকণ্ঠ। বলতে গেলে কন্যাকে নিজহাতে বলিপ্রদান করতে বাধ্য হলেন অসহায় পিতা সমাজের যূপকাষ্ঠে। বিয়ের কিছুদিন পর পাত্রপক্ষ যখন জানতে পারল সুভা আসলে বোবা, তখন রীতিমত যাচাই করে দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হল। সমাজের এই নির্মম দিকটি রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন সুভায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুভার মত মূক বালিকার একাত্মতা স্থাপন করলেন সর্বংসহা মূক পৃথিবী এবং পৃথিবীর অবলা প্রাণীদের সঙ্গে। অতি সামান্যই

চাহিদা ছিল সুভার। প্রকৃতির সুনিবিড় সংস্পর্শ, প্রতাপের মত একজন মানুষের সঙ্গে সখ্যতা, পিতা-মাতা বিশেষ করে পিতার সঙ্গে গভীর বাৎসল্যের স্নেহের ভালোবাসার সম্পর্কটুকুর চাহিদাও পূরিত হতে দিল না সমাজের কুনীতিগুলি। পুরুষের বহুবিবাহ এবং তৎজনিত পরবর্তী পারিবারিক সমস্যা রবীন্দ্রলেখনীতে আরোও অনেকবার ফুটে উঠেছে। সুভার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজনে, সুভার পরবর্তী জীবন প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে শেষ হল ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। 'মধ্যবর্তিনী', 'নিশীথে' প্রভৃতি বিভিন্ন গল্পে রবীন্দ্রনাথ পুরুষের বহুবিবাহে নারীর অবস্থান দেখিয়েছেন। 'সুভা' স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ রুখতে পারল না, সমাজের কুপ্রথায় বলি দিতে বাধ্য হল, এ প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ শেষ করলেও পরবর্তী 'দৃষ্টিদানে'র কুমুও অন্ধত্বের 'অপরাধে' স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ মেনে নেয়নি। 'সুভা' বাণীহীন ছিল, কিন্তু কুমু প্রতিবাদের ভাষা বলল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা'র মতই বোবা-কালা মেয়ে শ্যামলী বাবা-মার গলগ্রহ। সুভা বাণীকণ্ঠের কনিষ্ঠা কন্যা হওয়ায় তার বিয়ের জন্য অন্যদের বিয়ে আটকে ছিল না, তবুও বাণীকণ্ঠ বাধ্য হয়েছিল সুভার প্রতিবন্ধকতা লুকিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে। শ্যামলীর বিবাহ নামমাত্র দিতে চাইলেও সুপাত্রের সঙ্গে বিবাহ তার জীবনটাই পাল্টে দিল। সুভার শ্বশুরবাড়ির লোকজনও যদি অনিলের মত হত, তাহলে কি হত, তার প্রমাণ নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' উপন্যাসের নামচরিত্র শ্যামলী।

কল্লোলকালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে মানবমনের অবচেতন স্তরটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। আঞ্চলিকতার প্রেক্ষিতে লিখিত 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে কপিলা-কুবের- মালার তিনজনের মনের গহন গভীর দিক উন্মোচনের পাশাপাশি একদিকে স্বপ্নরাজ্য নিয়ে হোসেন মিঞা যেমন এসেছে, তেমনি বেশ কিছু শিশুচরিত্রের অবতারণা করেছেন মানিক। পদ্মানদীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত জেলে পাড়ার ধীবর চিত্র শুধু পূর্ণবয়স্ক নরনারীদের জীবনালেখ্য মাত্র নয়, সেখানে শিশুদেরও বেশ কিছু ভূমিকা থাকে। অভিসন্দর্ভে এই অধ্যায়ের আলোচ্য চরিত্র সিধুর তোতলা হাবা মেয়ে বগলী।জেলে পাড়ায় বাচ্চাদের মায়েরা প্রথম থেকেই ছেড়ে দেয় প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচা শেখার জন্য। সেখানে ব্যতিক্রমী মা যেমন মালা, তেমনি ব্যতিক্রমী শিশু বগলী। মালার গল্প বলা বগলী অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনে ,উলূপী আর মালার সন্তানদের মতই। মানিক এখানে দেখালেন কুবের-কপিলাদের চোখে যেমন রয়েছে হোসেন মিঞার স্বপ্নদ্বীপের কথা, তেমনি শিশুদের রাজ্যেও রয়েছে রূপকথার রাজ্য। পরম্পরাক্রমে প্রজন্মান্তরে রাজপুত্র-রাজকন্যাদের নাম বদল হয় মাত্র। কিন্তু সমস্ত মানুষের অবচেতনেই লালিত হতে থাকে সুপ্ত বাসনাগুলি।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘বরযাত্রী’ (১৯৪২) গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র গণশার তোতলামি পুরো গল্পে হাস্যরসের সজীবতা সঞ্চার করেছিল। সেখানে একজন রক্ষণশীল সমাজের তোতলা মেয়ের অসম্ভব ব্যক্তিত্ব অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানিকের লেখনীতে ‘পেরানটা’ গল্পে ফুলবানু ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ (১৯৪৭) উপন্যাসের ধারক সুচাঁদ চরিত্রটি আলোচিত হয়েছে বধির চরিত্র রূপে।বৃদ্ধা সুচাঁদের বধিরতা বয়সজনিত নাকি কোনো অসুখজনিত তার উল্লেখ নেই উপন্যাসে। সেক্ষেত্রে বয়সের ভারে বধিরতা স্বভাবসিদ্ধ নাকি প্রতিবন্ধকতা- কোন পর্যায়ে ফেলা যায় তা নিয়ে মতবিরোধ থাকতেই পারে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভটিতে সুচাঁদ চরিত্র বধির চরিত্র হিসাবে আলোচনা করছি কারণ লেখক নিজে তাকে সেইভাবেই পরিচয় করিয়েছেন পাঠকের সাথে। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গনে বয়স্ক চরিত্রসংখ্যা নিতান্তই কম নয়, সবাইকে তাদের বয়সের ভারে বধির হতে দেখা যায় না। তাই বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে বধিরতা এটা স্বাভাবিক হলেও সাহিত্য-চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী নয়। সুচাঁদ আসলে ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির ধারক-বাহক এবং কথক। সুচাঁদ আসলে একটা প্রতিষ্ঠান। পালাবদলের পটভূমিকায় সুচাঁদ প্রাচীন ডাকিনীবিদ্যার ক্ষয়িষ্ণুতার প্রতীক। লোকবিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে, তার বদলে জায়গা করে নিচ্ছে নবান্ন দুর্গোৎসবের মত সংস্কৃতি- এই ক্রম পরিবর্তমানতা, পুরাণ-প্রভাবিত কাহার সংস্কৃতির ক্রমবিলোপের প্রতিনিধি সমাজে সুচাঁদের ক্রমশই গুরুত্ব হ্রাস। সুচাঁদ ততদিন কালে শুনতে পেত যতদিন কাহার সংস্কৃতি তার প্রাচীনত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। নতুন সংস্কৃতির আগমনকালে সুচাঁদ কানে শুনতে পায় না। নিজে কানে শুনতে পায় না, অথচ অনবরত বলে চলে কাহার সংস্কৃতির উপকথা। সুচাঁদের মধ্যে অকৃত্রিমতা ধরে রাখার মানসকল্পে লেখক সুচাঁদের শ্রবণক্ষমতালুপ্ত করে বাইরের জগৎ-সংস্কৃতি তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হতে দিলেন না। তাই সুচাঁদ বলেছে, যতদিন সে জীবিত থাকবে ততদিন এ উপকথা শোনা যাবে। সুচাঁদই কাহার-সংস্কৃতির অকৃত্রিমতার শেষ ধারক। উপকথার সৃজনই সুচাঁদ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ছোটোবড়ো’ (১৯৪৮) গল্পগ্রন্থের ‘পেরানটা’ গল্পে ফুলবানু সম্পূর্ণ বাক্যহীনা নয়- সে তোতলা- উত্তেজনায় তার তোতলামিটা বেড়ে যায়। বাপের বাড়ির বিশেষ করে কাকার আদরের মেয়েটি স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হওয়ায় বড় সতীনের কাছে বকাও শুনতে হয়- স্বামীর শাসনও চলে ফুলবানুর উপর। এসবের মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, বিশেষত: মুসলমান পরিবারে নারীর অবস্থান দেখিয়েছেন মানিক। ফুলবানুর রূপলাবণ্য এবং কাকার ক্ষমতার বলে তোতলা হওয়া সত্ত্বেও তার বিয়েতে কোনো সমস্যা হয়নি বা বিবাহ পরবর্তী জীবনেও তার শারীরিক অক্ষমতার জন্য তাকে কোনোরকম গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি। এর প্রধান কারণ মানিক দেখালেন,

ফুলবানু নিজে কখনো এ নিয়ে হীনন্মন্যতায় ভোগেনি। অসাধারণ আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ফুলবানু তাই তোতলা হয়েও কারোর কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠেনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ 'ছোটোবড়ো' (১৯৪৮)-এর অন্যতম গল্প 'গায়েন'-এ দেখি যে রাজেন তার অসাধারণ বাক্‌চাতুর্যে গাঁয়ের পর গাঁয়ের লোককে গানের আসরে জমিয়ে রাখত, তার ঘরের বৌটিই বোবা। বৌ-এর সাথে বলার বিভিন্ন বিষয়ই হয়ত গান হয়ে উঠে আসত রাজেনের গানে। তবে রাজেন কিন্তু তার বৌ-এর সমস্ত ইশারাই বুঝত। মানিক 'গায়েন' গল্পে বৌটির কোনো নাম দেননি - তার পরিচয় সে নটবরের মেয়ে। বিবাহের পরও সম্পর্কে শ্বশুরকে নাম ধরে ডাকার মধ্যে রাজেনের মনের গহনস্তরে প্রচ্ছন্ন অহং ক্রিয়া করে। নটবরের বোবা মেয়েকে বিয়ে করার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে উদারতা থাকলেও তার মধ্যে লোকদেখানো মহৎ প্রতিষ্ঠাই হয়ত বেশি রয়েছে। সমাজে খ্যাতির আকাঙ্খায় রাজেন বোবা মেয়েকে বিয়ে করে। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস নিজের সুস্থ-স্বাভাবিক মেয়ের বিয়ে দেবার সময় শিষ্যকর্তৃক চূড়ান্ত অপদস্থ হতে হয়েছিল রাজেনকে। বিশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শেষদিকে সমাজে-পরিবারে মেয়েদের অবস্থান যে পুরুষের কারুণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে আলোচ্য মূক চরিত্রটিতে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় মেয়েটি যখন স্ত্রীর ধাপ পেরিয়ে বিবাহযোগ্যা কন্যার মা, তখনও তার পরিচয় সে নটবরের মেয়ে! রাজেন মেয়েটিকে করুণা করেছে মাত্র, ভালোবাসার অধিকারে নিজের পরিচয় প্রদান করেনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানব মনস্তত্ত্বের গহনতার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে রাজেনের আপাত গায়েন চরিত্রের আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকা এক অন্য মানুষের ছবি দেখিয়েছেন তার মূক স্ত্রীর চরিত্রের উপস্থিতিতে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে বৌকা বাওয়া এমনই এক চরিত্র যে গোটা উপন্যাসে একটি কথাও বলছে না, অথচ যার উপস্থিতি অত্যন্ত বাঙ্ময়। ঢোঁড়াই যখন চলে যাচ্ছে তখন পাক্কীর উপর একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে। মহাকাব্যে সুখ-দু:খকে নিয়ে খুব একটা বেশি অবসর দেওয়া হয় না। মহাকাব্যের ধরণানুযায়ী আবার কোনো কোনো জিনিস খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় মহাকাব্যের রচনাকারের কাছে।ঢোঁড়াই-এর চরিত্রের সূচনা এবং ঢোঁড়াই এর জীবনের ভৌগোলিক সীমানার বিস্তার ও ঢোঁড়াই-এর সচলতা সমস্ত কিছুর ভিত্তিস্থাপক বৌকা বাওয়া।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এক অদ্ভুত প্রেমের গল্প লিখলেন 'গাছ' (১৯৬৪)। স্বপ্নের স্বাধীনতালাভ, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা সবকিছুর উর্দ্ধে স্থাপিত হয়েছে বোবা মেয়ে গঙ্গামণির সঙ্গে গাছের প্রেম। বড় মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলে ছোটমেয়ের বিয়েতে সমস্যা- এই যে সমাজের কুপ্রথা, তার জন্য বোবা মেয়ে গঙ্গামণিরও বিয়ে হয়- ঠিক যেমন উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষদশকে বোবা মেয়ে সুভার বিয়ে হয়েছিল বাবা-মাকে

যাতে সমাজচ্যুত না হতে হয় সেইজন্য। সুভার ক্ষেত্রে বাবা-মা সুভার মূকত্ব পাত্রপক্ষের কাছে গোপন করেছিল। কিন্তু গঙ্গামণির ক্ষেত্রে গোপনীয়তার কোনো ব্যাপার ছিল না। কারণ সুভার বিবাহের জন্য বাণীকণ্ঠরা স্থানান্তরে গমন করেছিলেন। গঙ্গামণির ক্ষেত্রে বিবাহ হয়েছিল গাছের সাথে। এক সামাজিক প্রথার সঙ্গে যুক্ত হল আরেক কুসংস্কার। কিন্তু সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে গঙ্গামণির গাছের সঙ্গে প্রেমে একাত্মতাই মূল উপজীব্য।

বিংশ শতাব্দীর ছয়-এর দশকেরই আরেকটি চরিত্র প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছি- ওপার বাংলার সাহিত্য শওকত ওসমানের 'ক্রিতদাসের হাসি' উপন্যাসের নায়ক তাতারী। তাতারী জন্ম থেকেই মূক নয়- পূর্বে আলোচিত সুভা বা গঙ্গামণির মতো, মাত্র কয়েকদিন তাতারী বাক্‌শক্তিরহিত হয়ে গিয়েছিল। উপন্যাসটি আসলে রূপক উপন্যাস- রূপকের আড়ালে ঔপন্যাসিক সমকালীন রাষ্ট্র-রাজনীতির উত্তাল-দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের চিত্র অঙ্কন করেছেন। দেশভাগ পরবর্তী ওপার বাংলায় সমকালের সাহিত্যচরিত্র রূপকাকারে সময়কালের কথাই বলেছে। ১৯৫২র ফেব্রুয়ারি থেকে পুরাতন পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা ভাষার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ অগ্রণী ভূমিকাগ্রহণ করেছিল দেশের ছাত্রসমাজ এবং বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়। 'শওকত ওসমান' ছদ্মনামে শেখ আজিজুর রহমানের তৃতীয় উপন্যাসটির তাতারীর আর্তনাদ আসলে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন আমলে সাধারণ মানুষের প্রাণান্তকর জোরজুলুম, অত্যাচার, শোষণকে রূপকায়িত করেছে। তাতারী ছিল স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা যেখানে মানুষের বাক্-স্বাধীনতাটুকুও হরণ করে নেওয়া হচ্ছে, সেই সময়কার স্বাধীনতাকামী বাঙালীদের প্রতিনিধি। এপার বাংলার সাহিত্য না হলেও চরিত্রটি অভিসন্দর্ভটিতে আলোচ্য তার প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে।

এই অধ্যায়ের শেষ আলোচ্য চরিত্র একবিংশ শতাব্দীর রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' উপন্যাসের সুশান্ত ও জুঁই দম্পতি। এরা মূক ও বধির- জন্ম থেকেই। একবিংশ শতাব্দীতে মূক-বধিরদের শিক্ষাব্যবস্থা, স্বনির্ভরতা সম্পর্কে সচেতনতা এবং পাশাপাশি মানুষের মানসিকতা পরিস্ফুটিত করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। একদিকে সুশান্ত-জুঁই এর বাবা-মা, যারা সন্তানের প্রতিবন্ধকতাকে মেনে নিয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবনছন্দে স্থাপন করতে চেয়েছেন, যা আধুনিক-মনস্কতার পরিচায়ক। অন্যদিকে বাবা-মা, মেয়ের বিয়ে দিতে অসম্মত হয় সুশান্ত-জুঁই এর একমাত্র সন্তান অমৃত-এর সঙ্গে যার মধ্যে বাবা-মার প্রতিবন্ধকতার কোনো কিছুই নেই। একই সময় প্রেক্ষিতে দুইপ্রজন্মের সমাজ-মানসিকতা এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, সুশান্ত-জুঁই, তাদের সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার যে মানসিক শক্তি পায়, তার জন্য তাদের বাবা-মায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত: বলা যায়, বাবা-মার শারীরিক বিচ্যুতি সন্তানের ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব বিস্তার

করে তার দৃষ্টান্ত পেয়েছি নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' (১৯৫৭) উপন্যাসে। 'সুভা' থেকে 'বুবি'দের জীবনকাহিনি যে শুরু হয়েছিল একবিংশ শতাব্দীতে তার অনেকটাই উত্তরণ ঘটল। একটি মেয়ে শুধুমাত্র 'বোবা' এতেই তার পরিচয় সীমাবদ্ধ থাকতে পারল না, এই প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও সে একজন মানুষ- জীবনসংগ্রামে প্রতিনিয়ত লড়াই করে সফলতা লাভ করতে পারে তারই বিবর্তনরূপ রয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীতে রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' (২০০৫) উপন্যাসের সুশান্ত-জুঁই মূক ও বধির দম্পতি। তাদের sign language আয়ত্ত করেছিল শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ তাদের একমাত্র সন্তান অমৃত। আলোচ্য গল্পে রাজেন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হয়েও কেবলমাত্র ভালোবাসার টানে মূক-স্ত্রীর সাথে মনোভাব আদান-প্রদান করত সাবলীলভাবে।

গমন সংক্রান্ত

এই অধ্যায়ের আলোচ্য চরিত্ররা সম্পূর্ণ চলচ্ছক্তিহীন, তা নয়, বরং বলা যায় তাদের স্বাভাবিক গমনাগমনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

ফণিভূষণ (অর্থমনর্থম্ : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অর্থমনর্থম্' গল্পে উত্তর কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সন্নিকটবর্তী এক বাঙালিপাড়ায় নিজের ঘরেই খুন হলেন বাড়ির কর্তা করালীচরণ বসু। তিনি বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান। বেশ অবস্থাপন্ন মানুষ তিনি। কলকাতা শহরে চার-পাঁচখানা বাড়ি এবং ব্যাঙ্কে লাখ দুই-তিন টাকার মালিক তিনি। একাকী মানুষটির পুষ্যির অভাব ছিল না। বাড়িতে থাকত তিন ভাগ্নে- মতিলাল, মাখনলাল, ফণিভূষণ এবং শ্যালিকার দুই সন্তান-পুত্র সুকুমার এবং কন্যা সত্যবতী।

তিন ভাগ্নে তিনপ্রকার যেন। মতিলাল পুরোপুরি উচ্ছন্নে গেছে, মামার অর্থে অন্নধ্বংস করত আর যথেচ্ছ বেলেল্লাপনা করে বেড়াত। আরেক ভাগ্নে মাখনলালও নেশাখোর। কেবল ফণিভূষণ ছিল একটু অন্যরকম। সুকুমার মেডিক্যাল কলেজের ফিফথ ইয়ারের ছাত্র আর সত্যবতীও কলেজে পড়াশুনা করে। এই দুই ভাই-বোনই করালীবাবুর দেখাশোনা করত।

ফণিভূষণের বয়স এই বছর কুড়ি-বাইশ। ছোকরা বয়স। তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় শরীরে কিছু একটা অসঙ্গতি আছে। কিন্তু সেটা যে ঠিক কোথায় তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু হাঁটার ধরণে বোঝা যায় ফণিভূষণের সমস্যা বাঁ পায়ে। তার বাঁ-পাটা অস্বাভাবিক সরু। শারীরিক এই প্রতিবন্ধকতায় হাঁটবার সময় সে একটু খুঁড়িয়ে চলে। শরীর তার হৃষ্টপুষ্ট কিন্তু মুখটা বেশ শুকনো। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যে মানসিকভাবে বিপর্যস্ততায় পর্যবসিত করেছিল ফণিভূষণকে, তার শুষ্ক মুখে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

এই ফণিভূষণই খুন করেছে তার মামাকে। শুধু খুনই নয় খুনের মোটিফ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টাও করেছে সে।

ফণিভূষণের সঙ্গে করালীবাবুর সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। করালীবাবুর সাথে সম্পর্ক কারোরই খুব একটা মধুর ছিল না। করালীবাবু একটু রাগী আর খ্যাপাটে ধরণের মানুষ ছিলেন। বাতে পঙ্গু। নিজের ঘর ছাড়া কোথাও খুব একটা বের হতেন না। তাই তাঁর যত সমস্যা বাড়ির লোকেদের সাথেই হত। অদ্ভুত এক স্বভাব ছিল করালীবাবুর। যার সাথে যখন ঝামেলা হত তখনই

তাকে উইল থেকে বাদ দিয়ে দিতেন। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে তাঁর উইলের উত্তরাধিকার হয়েছেন মতিলাল, মাখনলাল, সুকুমার এবং শেষে ফণিভূষণ।

উইলের জন্যই ফণিভূষণ খুন করেন করালীবাবুকে। করালীবাবু খুন হবার আগের উইলে নাম ছিল সুকুমারের। করালীবাবু খুনের দিন সন্ধ্যেবেলা সুকুমার করালীবাবুকে উইল বিষয়েই কিছু কথা বলতে গিয়েছিল। সুকুমারের বক্তব্য ছিল একার নামে উইল না করে বাড়ির অন্য সবাইকেও সম্পত্তির ভাগীদার করা। সেই নিয়েই একচোট ঝামেলা হয় করালীবাবু এবং সুকুমারের। 'ক্ষপিশ' করালীবাবু স্বভাবসিদ্ধভাবে এরপর এই ঝগড়ার জেরে সুকুমারকেও বঞ্চিত করলেন। সুকুমারের আগে করালীবাবুর উইলে নাম ছিল মতিলাল এবং মাখনলালের। সুতরাং এবার উইলে নাম আসার কথা ফণিভূষণের। হয়েছিলও তাই করালীবাবুর মৃত্যুর আগের উইলে নাম রইল ফণিভূষণের।

এই সম্পত্তির জন্যই ফণিভূষণ খুন করেছিল করালীবাবুকে। ফণিভূষণের সঙ্গে খুব একটা ভাল সম্পর্ক ছিল না করালীবাবুর। তাই আবার যে কোনো মুহূর্তে ফণিভূষণের সঙ্গে করালীবাবুর ঝামেলা এবং তার ফলস্বরূপ ফণিভূষণের হাত থেকে সম্পত্তির মালিকানা চলে যাবার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। তাই ফণিভূষণ আর সময় নষ্ট না করে সাথে সাথেই নিজের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার জন্য অতিদ্রুত খুন করেন করালীবাবুকে।

পায়ের অসুবিধার জন্য ফণিভূষণ ঘরের মধ্যেই সারাদিন থাকত। ঘরের মধ্যে থেকেই এক বিশাল জগৎ গড়ে তুলেছিল ফণিভূষণ। প্রচুর বই পড়ত সে। সুকুমার ডাক্তারির ছাত্র হওয়ার সুবাদে সুকুমারের ডাক্তারির বইগুলিও পড়েছিল সে। সেখান থেকেই ক্লোরোফর্মের প্রয়োগ এবং মাত্র একটি সূচের সাহায্যে অতি সহজে মানুষ খুন করার পদ্ধতিও জেনে ফেলে ফণিভূষণ।

করালীবাবুকে এই হত্যা হঠাৎই রাগের মাথায় করে বসেনি ফণিভূষণ। তার এই হত্যা পরিকল্পনার ছক অনেক দিন ধরেই ঠান্ডা মাথায় করেছিল সে। কারণ ফণির শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। অন্যদের মত স্বাভাবিক জীবনধারণ করতে পারত না এই চিন্তার বশবর্তী হয়েই সমস্ত সম্পত্তি পাবার জন্য ফণিভূষণ খুনি হয়েছে।

খুন করার পর ক্লোরোফর্মের শিশি আর শেষ উইল যেটা কিনা সুকুমারের বদলে ফণিভূষণের নামে করা সেসব পরিকল্পনামাফিক রেখে আসে ফণিভূষণ সুকুমারের অনুপস্থিতিতে সুকুমারের ঘরে। কারণ খুনির সন্দেহের তালিকায় সুকুমারকে খুনি প্রতিপন্ন করা। কিন্তু এর কারণ কি? সুকুমারের সঙ্গে তো যথেষ্ট ভাল সম্পর্কই ছিল ফণিভূষণের। নিজের দুই ভাই মতিলাল এবং মাখনলালের সঙ্গে ফণিভূষণের যা সম্পর্ক তার থেকে বরং অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল সুকুমারের সঙ্গে। মতিলাল, মাখনলাল নেশারুও বটে। কিন্তু সুকুমার এবং ফণিভূষণের মধ্যে জ্ঞানচর্চার সাধনার

যোগ অনেক বেশি। ফণিভূষণের সঙ্গে সুকুমারের সম্পর্কও তাই ভালই ছিল। একলা ফণিভূষণের সঙ্গী যে বিশাল বই-এর জগৎ তাতে অবদান ছিল সুকুমারেরও। সন্ধ্যেবেলা দুজনের মধ্যে গল্পগাছাও হত। তাহলে সুকুমারের প্রতি ফণিভূষণের এই বিদ্বেষের কারণ কি?

কারণ আসলে সুকুমারের বোন সত্যবতী। সত্যবতীর প্রতি এক দুর্বলতা ছিল ফণিভূষণের। কিন্তু নিজের শারীরিক অক্ষমতার জন্য সে কথা সে কোনোদিনই মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারেনি। তাই এই ঘটনার পর যদি সুকুমারের জেল বা ফাঁসি কিছু শাস্তি হত, তাহলে সত্যবতীর অভিভাবকত্বের প্রয়োজন থেকে ফণিভূষণ সত্যবতীকে জীবনসঙ্গিনী করতে পারত। মনের গহনের এই বাসনাও ফণিভূষণকে খুনি করে তুলেছে।

সারা জীবন ফণিভূষণকে শুনতে হয়েছে তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে অনেক অকথা-কুকথা। সমাজের চোখে সে সবসময়ই পেয়েছে উপেক্ষা অনাদর অথবা সহানুভূতি। তার নিজস্ব কিছু করার ক্ষমতা নেই। অথচ জৈবিক নিয়মে ভালোবাসা এসেছে তার জীবনে। কিন্তু সেই শারীরিক অক্ষমতা সেই ভালোবাসাকেও সদর্পে স্বীকৃতি জানাতে পারেনি। এত না পারা-না পাওয়া-নেতিবাচকতা থেকে আজ ফণিভূষণ খুনি।

ফণিভূষণ পড়াশুনা খুব বেশি দূর করতে পারেনি। তার কারণ অর্থাভাবও হতে পারে, আবার শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও হতে পারে। কিন্তু তার জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল প্রবল। যদিও এ দুটি প্রতিবন্ধকতাই বাস্তবে জ্ঞানার্জনের জন্য অতিক্রম করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু যে কোনো কারণেই তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি ফণিভূষণের ক্ষেত্রে। যার ফল ভাল হয়েছে না মন্দ হয়েছে তা বলা যাচ্ছে না, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় ফণিভূষণ কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে পড়াশুনার বদলে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করেছে। তার ঘরের বইয়ের আলমারির বিচিত্র-বিবিধ সম্ভার তারই প্রমাণ দেয়।

কথায় আছে পল্লবগ্রাহিতা মানুষের উন্নতি নয়, অবনতির সহায়ক। ফণিভূষণের জীবনের ট্র্যাজেডির পশ্চাতে এই পল্লবগ্রাহিতাও ক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ফণিভূষণ বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে খুন করেছিল করালীবাবুকে। আর খুনির সন্দেহের তালিকা থেকে নিজেকে দূরে রেখে সুকুমারকে তালিকার একেবারে উপরের দিকে রাখার পরিকল্পনাও ছিল একেবারে নিখুঁত। কিন্তু বাদ সাধল অল্পবিদ্যা। ফণিভূষণ ডাক্তারি ছাত্রের বুদ্ধিতে মেজলা এবং প্রথম কশেরুর সন্ধিস্থলে ছুঁচ ফুটিয়ে করালীবাবুকে হত্যা করল। সেই ছুঁচটা আবার আনা হয়েছিল সত্যবতীর সেলাই-এর বাক্স থেকেই। এ সব তো ঠিকই ছিল। কিন্তু একজন ডাক্তারি পঞ্চমবর্ষের ছাত্রের পক্ষে কি সঠিকস্থান খোঁজার জন্য তিনবার ছুঁচ ফোটানোর দরকার হয়? তাও আবার ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করা এক বৃদ্ধকে? যে বৃদ্ধ আবার নিজেও বাতের ব্যথায় পঙ্গু প্রায়। আর ফণিভূষণের দ্বিতীয় ভুল হল আইন না জানা বা

অল্প জানা। ফণিভূষণ জানত করালীবাবুর করা শেষ উইলটা হবে তারই নামে। হয়েছিলও তাই। হয়ত সেটা দেখার পরই খুনটা করেছিল ফণিভূষণ। কিন্তু ফণিভূষণ এটা জানত না যে সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াও উইল মান্যতা পায় যদি সেটা উইলকারীর নিজের হাতে লেখা হয়, টাইপ করা উইল সাক্ষীর সই ছাড়া মান্যতা পায় না। আর এক্ষেত্রে করালীবাবু সন্ধ্যায় সুকুমারের সঙ্গে ঝামেলার পর নতুন উইল টাইপ তো করে নিয়েছিলেন কিন্তু রাত বারটার মধ্যে আগের উইলগুলোর মত বাড়ির ঠাকুর-চাকরদের সাক্ষ্যস্বাক্ষর করানোর আগেই খুন হন। ফলে উইলটা বাতিল হিসাবেই গ্রাহ্য।

ফণিভূষণ আসলে একজন কাপুরুষ চরিত্র। ভীরু coward। জীবন থেকে পালিয়ে গেছে সে। আততায়ী হিসাবে ব্যোমকেশের কাছে ধরা পড়ার পর ফণিভূষণ আর সমাজের কাছে মুখ দেখাতে পারেনি। নিজেকে সামলানোর সময় চেয়ে নিয়ে নিজের হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করেছে একটা সুইসাইড নোট লিখে রেখে। শারীরিক বা আর্থিক যে কোনো প্রতিবন্ধকতাই থাক না কেন তাকে পেরিয়ে পড়াশুনা শিখে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কোনো প্রচেষ্টা করেনি ফণিভূষণ। সুকুমারও তো পরের আশ্রয়ে থেকেও ডাক্তারি পড়া পড়ছে। সত্যবতীও তাই। তাহলে ফণিভূষণও কি চাইলে আর্থিক সাহায্য পেত না। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তো আর্থিক সহায়তা করা হয় ছাত্রছাত্রীদের। আর রইল শারীরিক প্রতিবন্ধকতা! ফণিভূষণের যেটুকু শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লিখিত হয়েছে সেটা তার পড়াশুনা শেখার পক্ষে মোটেই খুব একটা অসুবিধার সৃষ্টি করত বলে মনে হয় না। এ তো গেল পড়াশুনা শেখার জন্য স্কুল-কলেজ যাবার বিষয়টি! আসলে ফণির সমস্যাটা ছিল মানসিক। যে মানুষ নিজেকে অসহায় বোধ করে যার নিজের চোখেই নিজে ছোট থাকে সে সমাজের কাছেও নিজেকে উপেক্ষণীয় বলেই মনে করে। ছাত্রাবস্থা না হয় গেল। এরপর কর্মজীবনেও কিছু করার কোনো উদ্যম ছিল না ফণিভূষণের। চাকরি না হোক বসে কোনো দোকান বা ব্যবসা-তো করতেই পারত। কিন্তু তাও না করে মামার অর্থেই কি করে সারাজীবন কাটানো যায় সেই চিন্তাই সে করতে লাগল। ফণিভূষণের অন্য দুই ভাই প্রত্যক্ষত: বিপথে গেছিল। ফণিভূষণ সুকুমারের সান্নিধ্য পেয়েও জীবনের মানোন্নয়নের কোনো সৎচিন্তা করতে পারল না। জীবনে ফণিভূষণের প্রেমও এসেছিল। কিন্তু তাকে প্রস্তাব দেবার মত যোগ্যতা ছিল না তার। তাই মুখ ফুটে সে কথা কোনোদিন স্বীকার করেনি ফণিভূষণ।

ফণিভূষণের মৃত্যু ঘটেছে আত্মহত্যায়। যে মানুষটা চিরকাল অন্যের উপরই নির্ভরশীল ছিল, তাকে ব্যোমকেশ যেন বুঝতে পেরেও স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নিতে দিয়েছেন। শরদিন্দু ফণিভূষণের এই মৃত্যুতে ফণিভূষণকে করুণার চোখে দেখেছিলেন, কাপুরুষের মত জীবন বিমুখ হয়ে পালিয়ে যেতে দিয়ে ফণিভূষণ চরিত্রের কাপুরুষতার প্রমাণ দিলেন।

খোঁড়া শেখ (নারী ও নাগিনী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী' গল্পে খোঁড়া শেখের আসল নাম যে কী তা কেউ জানে না। বিকৃত দর্শনই তার পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোটবেলায় পা ভাঙার পর থেকেই সে খোঁড়া নামেই অভিহিত হত। তারপরে যৌবনের কিছু কদাচারের কুৎসিত ব্যাধিতে খোঁড়ার নাক বসে গিয়ে সেখানে এখন শুধু এক বীভৎস গর্ত রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। খোঁড়ার এই বিকট রূপ আরও বীভৎস হয়ে উঠেছে মায়ের দয়ায়। খোঁড়ার নিজের আসল নামটা তার নিজেরও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। খোঁড়া শেখের এই রূপজ বীভৎসতা এবং পরিবারহীন একক সত্তা তারাশঙ্করীয় আদিম প্রেক্ষাপট সৃজন করে। এই ভয়ঙ্কর পরিবেশ পরিস্থিতি আরও নিবিড় হয় খোঁড়ার সঙ্গে বিষাক্ত উদয়নাগ সাপিনীর ঘনিষ্ঠতায়।

খোঁড়ার পেশা এক নয়, একাধিক। তার প্রধান পেশা, পেশা বলা ভুল নেশা হল সাপ। খোঁড়া সাপের ওঝা, সাপ ধরে খেলা দেখায়। খোঁড়ার ঘর ভর্তি চালের আনাচে কানাচে মুখ-বন্ধ হাঁড়িতে সাপ ধরে রাখা থাকে। জরাগ্রস্ত হলে সাপেদের আবার খোঁড়া দূরে কোনো মাঠে গিয়ে ছেড়ে দেয়। অনেক সাপ মারাও যায়। সাপহীন খোঁড়া শেখ তখন ওঝা থেকে হয়ে যায় জনমজুর। সাপ থাকলে শেখ বিষক-ঢাকি আর তুবড়ি-বাঁশি নিয়ে সাপের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। রোজগারপাতি তাতে বেশ ভালই হয়। আর খেলা শেষ হলেই খোঁড়া ঝুড়ি আর বিড়া নিয়ে সম্পন্ন গৃহস্থের দুয়ারে গিয়ে বীভৎস মুখ ব্যদনে জনমজুরী খাটানোর আবেদন জানায়। আর জনমজুরিও যখন জোটে না তখনও বেকার থাকে না খোঁড়া শেখ, ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা উপার্জন করতে থাকে সে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় খোঁড়া শেখের অবস্থান সমাজের তিনটি স্তরেই। প্রথম স্তরে খোঁড়ার শিল্পীসত্তা প্রতিভাত। এই স্তরে সে সাপের ওঝা এবং ওস্তাদ সাপুড়ে। এই পর্যায়ে সে স্বাধীনজীবী এবং নিজের ইচ্ছার মালিক। তার দক্ষতার যথেষ্ট স্মারক রয়েছে এই স্তরে। দ্বিতীয় স্তরে খোঁড়া শেখ জনমজুর, মজুরি যখন খাটে তখন কিন্তু কাজে কোনোরকম ফাঁকি দেয় না খোঁড়া শেখ। কাজ পাবার জন্য এই স্তরে সে সম্পন্ন গৃহস্থদের যথেষ্ট তোশামোদও করে থাকে। তাতে অবশ্য তার বীভৎস মুখ আরও বীভৎসতর হয়ে ওঠে। তোষামুদে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেণীগত অসহায়তাই যেন অসুন্দররূপে প্রকটিত হয়েছে এখানে। তৃতীয় স্তরে খোঁড়া শেখ ভিক্ষাজীবী। এখানে একেবারে সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিনিধি সে। মার্ক্সবাদ বলে, যদিও সমাজ উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত এই তিন শ্রেণীস্তরের উল্লেখ করে, কিন্তু আসলে সমাজে মাত্র দুটি শ্রেণীস্তর আছে। একদল যাদের সবকিছু আছে- বুর্জোয়া; আর একদল যাদের কিছু নেই- সর্বহারা প্রলেতারিয়েত। মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেকে নিম্নবিত্ত নয়, বরং নিম্নবিত্তের থেকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করলেও আসলে তারাও নেই-এর দলেরই মানুষ। তাই জন্যই

তো সম্পন্ন গৃহস্থের কাছে এদের কাজের জন্য তোষামোদ করতে হয়, যদিও এরা কাজ পেলে প্রাণপণে কাজ করে। সম্পন্ন গৃহস্থের কাছে কাজ চাওয়ার সময় খোঁড়ার বীভৎস মুখ বীভৎসতর হয়ে ওঠার মধ্যে আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী মানসিকতার ভয়াবহতা প্রকটিত হয়েছে।

জীবিকা সংস্থানের বিভিন্ন স্তরায়নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে খোঁড়ার জীবনযাত্রার মানও। বাজার অর্থনীতি বলে মানুষের চাহিদার স্তর তিনটি। মানুষের প্রাথমিক চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান। মানুষের হাতে অর্থ এলে প্রথমেই মানুষ এই প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করে। প্রাথমিক চাহিদা পূরণ হয়ে যাবার পরও যখন তার হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তখন মানুষ তার শখ-আহ্লাদ পূরণের দিকে যায়। দ্বিতীয় স্তরের এই চাহিদাও মিটে যাবার পর মানুষের হাতে আরও অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে মানুষ তৃতীয় স্তরে পৌঁছে সঞ্চয় করে। খোঁড়ার জীবনযাত্রায় দেখা যাচ্ছে এই ত্রিস্তরীয় চিত্র। খোঁড়ার রোজগারপাতি যেদিন বেশ ভাল হয় সেদিন সে গাঁজা-আফিম কেনে। তারপরও হাতে যদি কিছু থাকে তা দিয়ে খানিকটা পচাই-মদ আকণ্ঠ পান করে ঘরে ফেরে। শেষে বাড়ি ফিরে স্ত্রী জোবেদার কাছে আত্মসমর্পণ করে। স্ত্রীও খানিক প্রশ্রয়ে স্বামীর জন্য অন্নসংস্থানে তৎপর হয়।

সভ্যতার সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ের চিত্রই এখানে পরিস্ফুটিত। সভ্যতার ঊষালগ্নে নারীপুরুষের সম্মিলিত সমাজ গঠন পরিবারগঠনের প্রক্রিয়ারই এক অঙ্গ খোঁড়া শেখ। খোঁড়া শেখ সেই পুরুষ যে কর্মক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সান্নিধ্যে শান্তিনীড় রচনার স্বপ্ন দেখে। কর্মজীবন ব্যতিরেকে খোঁড়ার বিনোদন -অবসরযাপন বলতে বোঝায় নেশা করা। সেটাই আমোদ-আহ্লাদ। খোঁড়া শেখের মধ্যে সেই আদিমতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

এই আদিমতার সঙ্গে ওতোপ্রোতজড়িত নারী-পুরুষের সম্পর্ক, যৌনজীবন। নেশা-ভাঙের সঙ্গে স্ত্রী-সান্নিধ্য সেই পরিবেশই রচনা করেছে। এই পরিবেশে খোঁড়ার আদিম পাশব মনোবৃত্তির আরেক উদ্বর্তন ঘটে সাপিনীর সঙ্গে সম্পর্কে।

খোঁড়া শেখ সাপের ওঝা। পেশা এবং নেশা খোঁড়ার কাছে দুটোই সাপ। তাই বিরল প্রজাতির উদয়নাগ প্রথমেই খোঁড়ার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিরল প্রজাতির সাপ থেকে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের আশায় লোভাতুর খোঁড়ার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যখন সে জানতে পারে সেটি আসলে নাগিনী। উদয়নাগের প্রথম দর্শনে অদাই যখন সেটাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল তখন অতিরিক্ত পয়সার লোভে প্রাথমিক পর্যায়ে অতিরিক্ত আগ্রহী হয়ে অদাইকে বিরত করেছিল খোঁড়া শেখ। সেই আগ্রহ আরও ভিন্নতর পর্যায়ে উন্নীত হল যখন জানা গেল আসলে সাপটা নাগিনী।

সাপটা ধরার পর খোঁড়া শেখ ছয়মাস সাপিনীকে ঘরে রেখে পুষল। এখন নাগিনী পরিপূর্ণ যৌবনবতী। ঘরে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই খোঁড়া শেখ তাকে আদর করে নথ পরিয়ে মাথায় সিঁদুর দিয়ে বিবি বানাল। লক্ষ্যণীয় নারীকে পুরুষের নথ পরানোর মধ্যে প্রচ্ছন্ন আদিমতার ইঙ্গিত ব্যঞ্জিত। সেই ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হয়েছে সিঁদুর পরানোয়। উল্লেখ্য খোঁড়া শেখ কিন্তু মুসলিম ধর্মাবলম্বী। তার ঘরে জোবেদা বিবিও আছে। নাগিনী যৌবনবতী হওয়ায় সঙ্গমগন্ধ ছড়িয়ে পুরুষকে আকর্ষণ করতে থাকে। সেই গন্ধ জোবেদা বিবি সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে না পারলেও খোঁড়া শেখ ঠিক চিনেছিল সেই যৌনগন্ধ।

সেই মধুর গন্ধ অনুধাবন করে নাগিনীকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল খোঁড়া শেখ। তাতে অবশ্য খোঁড়ার মন বিষণ্নতায় ভরে গিয়েছিল। এই উদয়নাগিনীর লেজ নিজের হাতে জড়িয়ে আর স্ত্রী জোবেদার সঙ্গে নাগ-নাগিনীর শঙ্খমিথুনের আলোচনায় এবং নিজেদের দাম্পত্য-সোহাগ খোঁড়া শেখের মনের আদিমতার প্রকাশ ঘটিয়েছে পদে পদে।গল্পের শেষে খোঁড়া শেখের সন্ন্যাস গ্রহণ আসলে তারাশঙ্কর-চেতনায় ভিন্ন আবেগের দ্যোতক। গল্পকার দেখালেন শুধুমাত্র আসক্তি নয়, চূড়ান্ত নির্লিপ্তি বৈরাগ্যও বৈপরীত্যে রয়েছে খোঁড়া শেখের চরিত্রে।

ভূতো (পুতুলনাচের ইতিকথা :মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসের গাওদিয়া গ্রামের বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে ভূতো অত্যন্ত দুরন্ত বালক। জাম পাড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে তার হাত ও পা দুই-ই ভেঙে গেছে।শশী এই ভূতোর চিকিৎসার ভার নিয়েছিল। কারণ ভূতোর পরিবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে রাজী নয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। শশী ভূতোকে ইনজেকশন দেবার সময়ই ভূতোর মৃত্যু হয়। চরিত্রের আলোকে মানিক দেখিয়েছিলেন জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান কতটুকু! এক দুরন্ত প্রাণবন্ত বালক মৃত্যুর করালগ্রাসে কিভাবে হারিয়ে যায়।ভূতো মৃত্যুর আলোচনাকালেই যাদব পন্ডিতের নিস্পৃহতা, আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি অনীহা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন গূঢ় মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিতবাহী।

মোহন (পুতুলনাচের ইতিকথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসের মোহন শশীর বড় বোন বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী। বাড়ি বনগাঁ। পিতা শ্যামাচরণ নায়েব। মোহনের একটি পা খোঁড়া। গোপালের বড়জামাই মোহন।উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তার স্বল্প-উপস্থিতি। মোহনের শারীরিক বিকলতা

তাদের দাম্পত্যের সম্পর্কে বিকলন ঘটায়নি । উপন্যাসে গোপাল চরিত্রের ধুরন্ধরতা খোঁড়া মোহন এবং বিন্ধ্যবাসিনীর দাম্পত্যের পরিচায়ক।

মালা (পদ্মানদীর মাঝি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কেতুপুরের দশমাইল উত্তরবর্তী গ্রাম চরডাঙার বৈকুণ্ঠের দুই কন্যার বড় মালা। জেলেপাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে মালার মত সুন্দরী কন্যা খুব কমই হয়। আর তার সাথে রয়েছে তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। রূপের জোরে মালার খুব ভাল-বড় ঘরেই বিয়ে করে যাবার কথা। কিন্তু বিধি বাম। এত সুন্দরী মেয়েটার পায়ে একটা রয়ে গেছে একটা খুঁত। মালার একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে দুমড়ে মুচড়ে বেঁকে যাওয়ায় মালার ওঠা-হাঁটার ক্ষমতা নেই। কোনো রকমে সে নড়াচড়া করে মাত্র। সেই কারণেই ছোটোবেলা থেকেই মালা হাসি-ঠাট্টা-উপেক্ষার পাত্রী। আর দুর্বলের উপর ক্ষমতা প্রদর্শন করে নিজেকে উৎকৃষ্ট মনে করার ঘৃণ্য প্রবৃত্তি তো মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বিয়ের আগে বাপের বাড়ি থাকাকালীন মালার পাড়াতুতো ভাইরা তার উপর অবহেলা দেখিয়েছে আর বিবাহিত পরবর্তী জীবনে নিজের সন্তানদের কাছেও অনেকক্ষেত্রে অবজ্ঞার স্বীকার হয়েছে শুধুমাত্র এই শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে পেরোতে পারেনি বলে।

বিয়ের বাজারে মেয়েদের অন্যতম যোগ্যতা রূপ-সৌন্দর্য। কুৎসিত কন্যার বিয়ে দেবার জন্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কপালের ভাঁজ ক্রমে বেড়েই চলে। সেখানে মালা সুশ্রী - আবার গায়ের রং ও আছে। কিন্তু থাকলেও কি হবে। তার পায়ে খুঁত। এমন খুঁতো মেয়ে কি আর রাজরানী হবে? দরিদ্র নিরন্ন মাঝি কুবেরের ভাঙা ঘরই আধপেটা খেয়ে আবার কখনোও না খেয়ে আলো করে রাখল কুবেরের সহধর্মিনী মালা। কুবেরের চারটি সন্তানের জননীও হল মালা।

ঘরের মধ্যে এককোণে পড়ে থাকে মালা। বহির্জগতের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই তার। নিজের মধ্যে থেকে নিজের একান্ত ভালোবাসার মানুষগুলোকে জড়িয়ে গড়ে তোলে এক নিজস্ব জগৎ। এই জগৎ মালার রূপকথার জগৎ। মালা কথকতার দক্ষ শিল্পী। তার কথকতার আসরের শ্রোতা আবালবৃদ্ধবনিতা। শুধু নিজের ছেলেমেয়েরাই নয় মালার রূপকথার গল্প শোনার জন্য এসে জড়ো হয় কুবেরের পিসি থেকে শুরু করে প্রতিবেশিনী গণেশের স্ত্রী-সন্তানরা- উলুপি, মনাই,কুকী, সাথে আসে সিধুর হাবা তোতলা মেয়ে বগলীও। গল্প শুনতে শুনতে এরা ভুলেই যায় তার নিত্যনৈমিত্তিক দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের কথা। যতই থাকুক না মালার মাথায় উকুন, পরনের শতচ্ছিন্ন বসনটি যতই দুর্গন্ধ ছড়াক না কেন, মালার গল্পের জগৎ আবৃত করে দেয় ভিজে মাটি পচা শনের গন্ধ, ঢেকে দেয় চেরাবাঁশের অপর্যাপ্ত গৃহ-আবেষ্টন। কেরোসিনের ডিবরি জ্বলা অন্ধকার সন্ধ্যার মৃদু-মৃদু আলো-ছায়ায় গড়ে ওঠে এক আশ্চর্য রূপকথার জগৎ। চূড়ান্ত কঠোর বাস্তবের সাথে প্রতিনিয়ত

জীবনসংগ্রামে লিপ্ত কুবেরও সে জগতে মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। মানবচেতনের অবচেতনের প্রত্নপ্রতিমাটি আকার পায় মালার কথকতায়।

জেলে পাড়ার নারীপুরুষ প্রতি মুহূর্ত লড়াই করে চলেছে রুক্ষ বাস্তবের সঙ্গে। তাই জেলেপাড়ায় জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়না আবেগঋদ্ধ নয়। ধীবরপল্লীর নারী-পুরুষ নিষ্ঠুরতা ও ঔদাসীন্য দ্বারা আহত হয় না। ধীবরপল্লীর জননীরা সন্তানদের প্রতি খুব বেশি মমতাময়ী নয়। কেবলমাত্র কোলের সন্তান ছাড়া বাকিরা মাতৃস্নেহমমতার উর্দ্ধে অবস্থিত। এই ধীবরপল্লীর বধূ মালার কাছে সন্তানস্নেহ ভিন্নস্থানে অবস্থিত। মালা এখনও তার ছেলেদের সন্ধ্যাবেলায় গল্প বলে, ভাত মেখে খাইয়ে দেয়। যতই তার ছেলেরা ধীবরপল্লীর অন্যশিশুদের মত কিছুটা বাড়ন্ত হোক না কেন এখনও তারাও মায়ের আঁচলের তলায় পরম প্রশান্তি খুঁজে পায়। মধুর বাৎসল্য প্রীতির এই কোমলতার উদাহরণ জেলেপাড়ায় স্থাপন করার পেছনে মালার অবদান নেহাৎ কম নয়। শাস্ত্রে বলে-

কুপুত্র যদি বা হয়

কুমাতা কদাপি নয়।

ফ্রয়েড-মার্ক্স প্রভাবিত মানিকও এখানে মানবমনের জৈবিক প্রবৃত্তির তুলনায় মাতৃধর্ম-মায়ের মনকেই বড় করে দেখিয়েছেন। মায়ের ঈর্ষা বা দ্বেষ নয় মায়ের ভালোবাসাই মালার জয় ঘোষণা করেছে।

কুবের মাঝি রাত কে রাত বাড়ি থাকে না। পদ্মার বুকে জীবিকা উপার্জনের জন্য ঘুরে বেড়ায়। বাড়িতে একা থাকে মালা। সে চলচ্ছক্তিহীনা-দুর্বলা। গ্রামসমাজ তার এই অসহায়তার সুযোগটুকু নিতে ছাড়ে না। কুবেরের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে সারা গ্রাম জুড়ে মেজকর্তা অনন্ত তালুকদারের সঙ্গে কুৎসা রটনা শুরু হয়ে যায় মালার নামে। রোদে-জলে তেতে পুড়ে থাকা মানুষ, কুবেরের গায়ের রং ফর্সা নয় অথচ সদ্যোজাত পুত্রসন্তানটির হয়েছে বেশ পরিষ্কার গায়ের রং। অথচ কেউ এটা দেখে না মালার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হতদরিদ্র নিরন্ন সংসারেও সবার চোখ টানে। গ্রামজীবনের এই ঠাট্টা-তামাশা আসলে পরশ্রীকাতরতারই নামান্তর। যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে মালা আর কুবেরের সুখী দাম্পত্যের ছবি। কথায় বলে স্ত্রীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় স্বামীর দারিদ্র্যে আর স্বামীর প্রকৃত পরিচয় মেলে স্ত্রীর অসুস্থতায়। কুবেরের দারিদ্র্য সংসারের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যেই পীড়িত পিতৃগৃহ মালা শান্তির নীড় রচনা করেছিল। কুবেরও স্বীকার করেছিল কুবেরের এই হাঘরে সংসার রাজরানীর মত ভরিয়ে রেখেছে মালা। মালার ওই পায়ের খুঁতটুকুর জন্যই মালা যে কুবেরের ঘরণী হয়েছে মালার সেই দোষ বা গুণটুকুকে স্বীকৃতি দিয়েছে কুবের । মালার জন্মের

সময়ও মালার মায়ের ক্ষেত্রে বামুনঠাকুরকে নিয়েও একই দুর্নাম রটেছিল। সেই দুর্নাম আবার ফিরে এসেছিল মালার জীবনে।

স্নেহময়ী মমতার প্রতিমূর্তি মালার ভালোবাসার টান ছিল তার বাপের বাড়ির লোকজনদের প্রতি। বন্যার সময় স্বামী কুবেরকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিল মালা। মালার এই পিতৃগৃহ প্রীতিই মালার জীবনে এক নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। পঙ্গু স্ত্রী মালাকে নিয়ে কুবের সন্তুষ্ট ছিল ঠিকই কিন্তু মালার ছোট বোন কপিলার দুর্বার যৌবন মালা-কুবেরের দাম্পত্য জীবনে শৈথিল্যের জন্ম দেয়। শুরু হল কুবের-কপিলার নিষিদ্ধ প্রেমের দুর্বার জোয়ার, যাতে ভাঁটার টানে থিতিয়ে যেতে থাকল মালা-কুবেরের নিস্তরঙ্গ নিশ্চিত দাম্পত্য।

দারিদ্র্যের সংসারে বৃষ্টির জল আটকানোর জন্য মালা কুবেরকে নিজের আঁতুড়-শয্যার শন তুলে চালে লাগানোর কথা বলায় কুবেরের কাছে তা অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে মালা চরিত্রের এই উদারতা- নিজের কথা না ভেবে অন্যের ভালোর চিন্তা মালার স্বত:সিদ্ধ চরিত্রবৈশিষ্ট্য নয় বলে জানিয়েছেন মানিক। স্বার্থপরতার আত্মকেন্দ্রিকতার আরেক রূপ দেখালেন মানিক। মালার আত্মবৃত্ত জেলেপাড়ার অন্যরমণীদের মত নয়। তার নিজস্বতার পরিমন্ডলে তার স্বামী-সন্তানও রয়েছে। আঁতুড়ে থাকা সন্তানও যেমন মালার নাড়ী ছেঁড়া ধন, তেমনিই ঘরের মধ্যে থাকা গোপী-লখা-চন্ডী- তারাও মালার সন্তান। আর কুবের, কুবেরের পিসি তারাও তো মালার ভালোবাসার পরিমন্ডলেই থাকে। মালা উদগ্রীব সবার জন্য। পরের জন্য চিন্তাভাবনার আরেকটি স্থান মালার পিত্রালয়। তাদের জন্যও চিন্তা করে মালা। আর তার এই চরিত্রের দুর্বলতার ফাঁকটুকু দিয়েই তার সংসারে প্রবেশ করে তারই ছোট বোন কপিলা। জেলে সমাজ শুধু নিজের টুকুই বুঝে নেয়। অন্যের চিন্তা করে না। মালার এই নিজের সম্বলটুকু দিয়ে অন্যের মাথার উপর ছাদ গড়ার সদিচ্ছার মধ্যে আভাসিত হয়েছে নিজের একমাত্র সম্বল স্বামী কুবেরের সঙ্গে কপিলার অন্যত্র ঘর বাঁধার ভবিষ্যস্বপ্নটি।

মালাও চেয়েছিল সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে। গোপীর পায়ের আঘাত যে ডাক্তারের কাছে গিয়ে সারে, সেই ডাক্তার সেই হাসপাতালে নিজের পঙ্গুত্বকেও জয় করতে যায় মালা। কিন্তু মালার এই পঙ্গুত্ব রয়েই যায়। মালা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি থেকেও জীবনবিমুখ হয়নি। তার মধ্যে বাঁচার ইচ্ছা তীব্র। তার আছে রূপকথার জগৎ। রূপকথার জগতে সবাই রাজপুত্র। পেতে চায় কোনো এক রাজকন্যাকে যাকে কোনো এক দূর দেশে সোনারকাঠি-রূপোরকাঠির স্পর্শে বন্দি করে রাখা হয়েছে। অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সাতসমুদ্র তের নদীর পারে রাজপুত্র উদ্ধার করে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে। পথে যেমন রাক্ষস-খোক্কসদের মত অনেক বাধাবিপদ

আসে, তেমনি আবার সাহায্য করার জন্য থাকে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি, জাদুপ্রদীপ, মায়ামাদুর এরকম আরোও অনেককিছু। প্রত্যেক মানুষের architype এ থাকে এ প্রত্নপ্রতিমা। মালাও সেই বন্দিনী রাজকন্যা, তার প্রতিবন্ধকতা নিয়ে ঘরের কোণে বদ্ধ। তার রূপকথার জগৎই তার বিশ্বাস। কোনো একদিন কোনো এক কল্যাণ-মঙ্গল এসে মালার প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। মালা খুঁজে পাবে নিজের অস্তিত্বটুকু। প্রথমে বাপ-ভাই, পরে স্বামী এবং ভবিষ্যতে ছেলেদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার বদলে যে মালা পাবে এক নতুন জীবন।

হোসেন মিঞার নয়া উপনিবেশে অক্ষম পঙ্গুর কোনো স্থান নেই। তাই বিতাড়িত হতে হয় বসিরকে। স্থান হল না মালার। কুবেরের পাশে লক্ষ্মীর স্থলাভিষিক্ত হল কপিলা। আর মালা পড়ে রইল কেতুপুরেই। তার নাবালক সন্তানসহ। মালা ও তার নাবালক সন্তানরা- পরস্পর পরস্পরের কে কার অবলম্বনে, ভবিষ্যতের কথা তো ভবিষ্যৎই বলবে।বর্তমানে মালা single-parent এই গুরুদায়িত্বে ন্যস্ত। তাহলে আর মালা অক্ষম কোথায়? সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেছে মা-মালা। একাধিককে একসূত্রে গ্রথিত করে রাখার নামই মালা।

গজেন (তারপর ? : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিংশ শতাব্দীর চারেক দশকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘তারপর?’ ছোটগল্পের চরিত্র গজেন। জন্মাবধি সে প্রতিবন্ধী ছিল না। একদিন কাণকালি গাঁয়ের খালে স্নান করার সময় মা ও ছেলেকে কুমীর ধরলে মা গজেনকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। গজেনের মা মারা যান এবং তারপর থেকেই,-

> ‘‘খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে! টেরা বাঁকা আধ শুকনো বাঁ হাতটা একেবারেই
>
> অকেজো, আঙুলগুলি শক্তহয়ে গেছে, বাঁকে না। ডান হাতে বেশ জোর আছে,
>
> বিশেষ কর্মতৎপর নয় বটে,’’[৮৬]

এই শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে কিন্তু গজেন থেমে থাকেনি। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটেই এগিয়ে গিয়েছিল। ক্লাস সেভেন অবধি পড়াশুনো করেছিল। ফোর থেকে ফাইভে ওঠার সময় ক্লাসে প্রথমও হয়েছিল। তারপরই হঠাৎ করেই স্কুল ছুট হয়ে পড়ে, বদসঙ্গে পড়ে। বাড়িতে বাবা গজেনের মায়ের মৃত্যুর এগারো মাসের মাথায় আবার দ্বিতীয় বিবাহ করেছিল। বাবা গজেনকে বকাঝকা করত। বাড়িতে গজেন তাড়ানো ছেলের মতই থাকত, যদিও সৎমা তাকে মানুষ করায় কোনো ত্রুটি রাখেনি। তারপর একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। তারপর ছয়মাস পর যখন ফিরে আসে তখন তার বেশভূষা হাবভাবে অনেক পরিবর্তন আসে। জানা যায় নারীসংক্রান্ত ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছে গজেন।

এই গজেনের আঁকার হাত ছিল দুর্দান্ত। তার একটা হাত অকেজো হয়ে গেছিল বটে, কিন্তু ভাল থাকা হাতটা দিয়ে সে এত সুন্দর ছবি আঁকত যে

''ড্রয়িং মাস্টারের চেয়ে তার আঁকা পাখি ও গাছ জীবন্ত হত বেশি।''[৮৭]

প্রতিবন্ধকতার শিকার হলেও ভয়ঙ্কর মানসিক শক্তি ছিল গজেনের। শরীরটাকেও সে তৈরী করে নিয়েছে যথেষ্ট শক্তসমর্থ করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় প্রতিটি প্রতিবন্ধী চরিত্রই অসাধারণ সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তাদের নিজেদের ইচ্ছাশক্তির জোরে। জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও এসব চরিত্ররা যথেষ্ট ঝুঁকিও নিয়েছে।

বসন্তের স্বামী (হাঁসুলীবাঁকের উপকথা :তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে

'কাহারপাড়ার বিচিত্র মেয়ে বসন্ত'[৮৮]

যখন চৌধুরীদের বাড়ির ছেলেকে ভালোবেসে গর্ভবতী হল তখন সেই সন্তানের পিতৃত্বের দায়িত্ব দিয়ে বসন্তের সাথে বিবাহ দেওয়া হল কাহার পাড়ারই এক অথর্ব খোঁড়া কাহারের।-

'এক জরাজীর্ণ খোঁড়া কাহারের ছেলে'[৮৯]

কাহার সমাজে নারীরা ছিল স্বেচ্ছাবিহারী । পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনুশাসন বেঁধে রাখেনি কাহারপল্লীর মেয়েদের। পাখি হেঁপো রুগি নয়ানের ঘর করতে করতে চলে এসেছিল - পরে ঘর বেঁধেছিল করালীর সাথে। বনওয়ারীর সঙ্গে গোপন 'অঙে'র সম্পর্ক ছিল কালোশশীর। সুবাসী বনওয়ারীর বিবাহ হলেও সুবাসী পরবর্তীকালে বনওয়ারীকে ছেড়ে করালীর আকর্ষণে করালীর কাছে চলে আসে। আরও আছে, পাগল কাহারের মায়ের বৈষ্ণব রাখালরাজা দাসের সঙ্গে অঙের খেলায় মত্ত হওয়া এবং যার ফসল পাগল। এছাড়া পাগল-নসুর মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে মজামস্করা তো আছেই।

অর্থাৎ বোঝাই যায় যে হাঁসুলীবাঁকের সমাজব্যবস্থায় যৌনাকাঙ্খায় কোনো অবদমন বা বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু সমাজ সবসময় হয়ত এই যথেচ্ছ যৌনাচার অবাধে মেনে নেয়না। সেক্ষেত্রে একটা বাহ্যকরণ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঠিক এই কারণেই সুচাঁদ বসন্ত জমিদার-বাড়ির ছেলের সঙ্গে অঙের খেলায় গর্ভবতী হয়ে পড়লে রীতিমত ঘুষ দিয়ে খোঁড়া কাহারের সঙ্গে বসন্তর বিবাহ এবং অনাগত সন্তানের পিতৃত্বের দায়িত্ব দিয়ে পাখি এবং বসন্তকে রক্ষা করেছিল।

যুবতী পাখির গায়ের রং, মুখের রং, মুখের গড়ন, চোখ-নাক-চুল- সমস্ত কিছুর কাঠামোর সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির কর্তার ছেলের সাযুজ্য লক্ষ্যণীয়। এই নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তারাশঙ্কর কাহারসমাজ মানসিকতার কোনো হেরফের উল্লেখ করেননি, বরং তিনি যেন কোথাও একটা দেখাতে চেয়েছেন উচ্চবর্গের মানুষদের দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষদের যৌনশোষণ । এই Sexploitation -এর পাশাপাশি খোঁড়া কাহার চরিত্রের উপস্থিতি একই সঙ্গে তারাশঙ্করের পুরাণ চেতনার পরিচয়বহন করে । হাঁসুলীবাঁকে যে যুগবিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন ঘটনা তারই সাক্ষ্যবাহী। সমাজ যদি মাতৃতান্ত্রিকই হত, তাহলে পাখির কি পিতৃপরিচয়ের খুব দরকার পড়ত? প্রাচীন পুরাণ-মিথ-রূপকথায় সন্তানলাভে দেখি বিভিন্ন দেবতা-ব্রাহ্মণ-কুলগুরু-পুরোহিতদের অনুগ্রহ যার রূপকে থাকে বিশেষ কোনো স্মারক উপহার বা আশীর্বাদ। খোঁড়া কাহার চরিত্রটি অতি অল্প পরিসরে সমাজ বিবর্তনের সূত্রে বহুমাত্রিকতায় পিতৃত্ব নিরূপণের অনুষঙ্গের ইঙ্গিতবাহী।

নাটুক (নব আলপনা: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিশ শতকের চারেক দশকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্প ‘নব আলপনা’য় চুণোর ভাই নাটুক জন্মের পর থেকেই প্রতিবন্ধী।

> ‘‘আঁতুরে তাকে প্রথম কাঁদন কাঁদাতে গিয়ে চুণোর পিসি এক আছড়ে একটা পা তার ভেঙে দিয়েছিল।’’[৯০]

দারিদ্র্যের সংসারে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে এই গমন সংক্রান্ত অসহায়তার জন্য গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায় নাটুক। বস্তিতে জন্মালেও নাটুকের ফর্সা গায়ের রং তার পিতৃপরিচয় নিয়ে সমাজ-সংসারে সন্দেহাবকাশ সৃষ্টি করেছিল।

ফুলি (ভয়ংকর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘ভয়ংকর’ ছোটগল্পের পা খোঁড়া মেয়ে ফুলি দাদা-বৌদির সংসারে থাকে, প্রতিমুহূর্তে তাকে যে জীবনসংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়, তাতে তার শারীরিক সক্ষমতার থেকে বড় হয়ে উঠেছে তার মানসিক জোর। এই অসম্ভব মানসিক দৃঢ়তাতেই ফুলি বাড়ির কর্মচারী প্রসাদের মধ্যেও ইতিবাচকতার ভয়হীনতার সঞ্চার করে নতুন ভয়মুক্ত জীবন শুরু করার কথা ভাবতে পেরেছে।

খোঁড়া চখুরী (ঢোঁড়াই চরিত মানস : সতীনাথ ভাদুড়ী)

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসের এক অতি ছোট চরিত্র খোঁড়া চখুরী। তার বৌ তার সাথে থাকতে চায় না বলে মাহাতো নায়েবরা ইসরার সঙ্গে তার পুনর্বিবাহ দিয়েছে। রবিবার কাজ না করার প্রস্তাব যখন ঢোঁড়াই নাকচ করে, কারণ রবিবারই তাদের একমাত্র ভালো রোজগারের দিন এবং ঝোটাহাদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে আলাপ আলোচনার সময় নিদারুণ বাস্তব রূপ যে ঝোটাহাদের সঙ্গে মাহাতো আর ছড়িদারদের বিশেষ সম্পর্ক এবং টাকার লেনদেনের ইঙ্গিত স্পষ্ট করে খোঁড়া চখুরী। যদিও তার কথা জনকলোরবে চাপা পড়ে যায়। কারণ দুনিয়াটা কার বশ? দুনিয়া টাকার বশ।

রামিয়ার বাবা (ঢোঁড়াই চরিত মানস : সতীনাথ ভাদুড়ী)

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে রামিয়ার বাবাও পঙ্গু ছিল। এই সুযোগে রামিয়ার মায়ের সঙ্গে ঝাজির এক বিশেষ সম্পর্কের ইঙ্গিত রয়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যৌবন থাকলে মেয়েদের রোজগারের অভাব হয় না। কিন্তু মায়ের এই কলঙ্কের জন্য রামিয়াকে সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও পাত্রস্থ করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই দ্বিমুখী নীতির প্রসঙ্গ এখানে উল্লিখিত।

ফুলঝরিয়া (ঢোঁড়াই চরিত মানস : সতীনাথ ভাদুড়ী)

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে মাহাতোর মেয়ে ফুলঝরিয়া।

''তার পায়ের দিকটা খুব সরু। হাতে খড়ম পরে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সে চলাফেরা করে।''[৯১]

মাহাতোর সুপ্ত বাসনা ছিল ঢোঁড়াইকে তাদের জামাই করার। ফুলঝরিয়া তার পঙ্গুত্বের জন্য নিজে ভাবত,-

''কী পাপই না সে আগের জন্ম করেছিল। তারই উপর গোঁসাইয়ের যত আক্রোশ। কোন পাপ সে করেছিল জানে না। তবে কেন সে হাতে খড়ম প'রে থাকবে? কেন অন্য দশজনের মাতা সে চলতে ফিরতে পারে না? তাৎমাটুলির অন্য মেয়েরা বলে যে সে রূপের গরবে গত জন্মে 'শিউজী'কে (মহাদেব : শিবলিঙ্গ) লাথি মেরেছিল ; তার বাবা বলে যে সে মরদকে দিয়ে নিশ্চয়ই পা টিপিয়েছিল আগের জন্মে। ছি ছি ছি ছি ছি! কেন তার দুর্মতি হয়েছিল। মরদে টিপবে ঝোটাহার পা! শিউজীর মাথায় সে মারতে গিয়েছিল লাথি! শাস্তিই তার হয়েছে। রেবণগুণী কিন্তু বলে অন্য কথা। সে বলে যে ঠিক যেখানটায় সে জন্মায় সেই জায়গাটার মাটির নিচে নিশ্চয়ই কালো বিড়ালের হাড় আছে। জন্মানোর ছ'দিনের মধ্যে

কাঁকড়াবিছে ভাজা সরষের তেল, ঐ পায়ে মালিশ করতে পারলে, তবে ঐ বিড়ালের হাড়ের দোষ কাটাতে পারত। তা সে সময় তো আর মা বাবা রেবণগুণীকে দেখায়নি। দেখায় ছ'মাস পরে। তখন আর দেখিয়ে কী হবে। তার বাবাকে ভাগপরবাহার বৈদজী (হাতুড়ে ডাক্তার) যে এখনও যদি সদ্য মরা ভূঁড়ো শিয়ালের পেট চিরে, তার গরম গরম নাড়িভুঁড়ির মধ্যে পা ঢুকিয়ে বসতে পারা যায়, তাহলে অনেকটা উপকার পাওয়া যেতে পারে। তা ফুলঝরিয়ার বাবা আজ পর্যন্ত একটাও শিয়াল ধরার ব্যবস্থা করতে পারল না। এতদিন ফুলঝরিয়ার মনে আশা ছিল যে পঙ্গু হলেও তার বিয়ে হয়েই যাবে। কেননা কে না জানে যে তাৎমাদের বিয়েতে মেয়ের বাপ টাকা পায়, আর এই টাকার জন্য কত গরীব তাৎমা বিয়ে করতে পারে না, বহুদিন পর্যন্ত। তার বাবা টাকা যদি না চায়, তাহলেই দু'টো রাঁধা ভাত পাওয়ার লোভে, কত মরদ তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে। কিন্তু এ কি 'সরাধ'-এর কানুনের (সর্দা আইনের বিকৃত উচ্চারণ। 'সরাধ' কথাটির শব্দগত অর্থ শ্রাদ্ধ) কথা শোনা যাচ্ছে কিছুদিন থেকে।''[৯২]

যে সময়ে গান্ধীজির আগমনে, ভারত ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধেড প্রবল স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াই চালাচ্ছে, সেখানে গ্রামগঞ্জে তখনও রয়েছে কুসংস্কারের মত ব্যাধি, বিবাহে পণপ্রথা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের অবস্থান। ফুলঝরিয়া মনে মনে ঢোঁড়াইকে স্বামী হিসাবে স্বপ্ন দেখলেও বাস্তবে তারই সখী এবং বলা যায় তাদেরই জন্য আসা রামিয়ার সঙ্গে যখন ঢোঁড়াই-এর বিবাহ হয়, তখন আর পাঁচটা সাধারণ মেয়েদের মতই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ফুলঝরিয়া। এমনকি রামিয়ার সঙ্গেও স্বাভাবিক সম্পর্কে আর সহজ হতে পারেনি ফুলঝরিয়া।

বিন্তু (অভিনেত্রী : নরেন্দ্রনাথ মিত্র)

১৩৫৭ 'যুগান্তর' পত্রিকায় পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অভিনেত্রী' গল্পটির কথক অনিমেষ চৌধুরী, দীর্ঘদিনের সহকারী পরিচালকের অভিজ্ঞতা পুঁজি করে আজ নতুন পরিচালক। প্রযোজক বৈকুণ্ঠ পোদ্দার নতুন পরিচালককে অবশ্য খুব বেশি টাকা দিতে ভরসা করেননি। অনিমেষ তাতেই রাজী। দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রী মালতীকে দিয়েই তাই অনিমেষ চৌধুরী তার প্রথম কাজ শুরু করার কথা ভাবে। ঘটনাচক্রে অনিমেষ এসে পৌঁছায় পুরনো বন্ধু বিনয়দের বাড়িতে। এক রুগ্ন সন্তান আর অভাব-দারিদ্র্য চক্রবর্তী-দম্পতির সংসারে নিত্যসঙ্গী। সংসারে একটু আর্থিক সুরাহার আশায় অনিমেষ চৌধুরীর নতুন ছবিতে ছোট্ট একটা রোলে দু-তিনদিনের শুটিং-এ লাবণ্য ও তার পুত্র অভিনয় করতে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু লাবণ্য মোটেই পেশাদার অভিনেত্রী নয়। তাই অনেক শেখানো, অনেক রিহার্সালের পরও অনিমেষ ব্যর্থ হয় লাবণ্যকে দিয়ে ছবির অংশ দৃশ্যায়িত করাতে। পরবর্তীকালে যথাসময়ে ছবি যখন রিলিজ করল তখন অনিমেষ দুটো টিকিট

নিয়ে আসে বিনয়-লাবণ্যকে সিনেমার শো-এর। এসে অবাক হল অনিমেষ। যে লাবণ্যকে অনেকবার শেখানোর পরও অভিনয়টি যথাযথ করানো যায়নি, সেই লাবণ্য জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার লড়াই-বাড়িওয়ালার সাথে চমৎকার অভিনয়টা করল।

এ গল্পে লাবণ্য এবং বিনয় চক্রবর্তীর একমাত্র শিশুপুত্র বিন্তু। টাইফয়েডে ভুগে আজ তার একটা পা দুর্বল। ডাক্তার বলেছে এর একমাত্র ওষুধ পুষ্টিকর ভালো ভালো খাবার।তাহলেই বিন্তু সুস্থ হয়ে যাবে। বিন্তু ভালখাবার, টনিক কিনবে যে সে ক্ষমতা কোথায় বিনয়ের! সংসারের দৈনন্দিন চাহিদাটুকু পূরণ করতেই তার খামতি থেকে যায়।তার উপর আবার অসুস্থ সন্তানের পথ্য! এই নিয়ে নিত্য অশান্তি লেগেই থাকে চক্রবর্তী পরিবারে। বিন্তুর অসুস্থতা বিনয়-লাবণ্যের রাগের কারণ নয়।আসলে সন্তানকে যথাযথ প্রতিপালন করতে না পারার যন্ত্রণারই বহিপ্রকাশ তাদের কলহ।

গল্পটির রচনাকাল ১৯৫০-এর অগস্ট-সেপ্টেম্বর। বিংশশতাব্দীতে চার-এর দশকের শেষ লগ্ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ তো হল।যুদ্ধোত্তর সমাজ তখনও বিপর্যস্ত। নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষদের পক্ষে অন্নসংস্থান মাথার উপর ঠিকঠাক ছাদের ঠিকানা- এ সব কিছু নিয়ে সংগ্রাম তখনও চলছে। এই অরন্তুদ সময়ের সন্তান বিন্তু। তাই সে অসুস্থ, রুগ্ন, অপুষ্ট হতে বাধ্য। অস্থির সমাজের ছবিই বিন্তু। সমাজও যেমন টেনে টেনে চলছে বিন্তুও তারই প্রতীক।সদ্য বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা সামলে ওঠার পর সমাজকে স্থিত হবার জন্য আরেকটু যত্নের প্রয়োজন। বিন্তুই তার প্রতীক।

অনিমেষ চৌধুরী বন্ধু-দম্পতির আতিথেয়তায় প্রীত-আপ্লুত। বিনয়ের অভিনয়ের সুযোগ করে দিতে না পারলেও তার চলচ্চিত্রটিতে লাবণ্য ও তার শিশুপুত্রের পার্টের ব্যবস্থা করে ফেলল। ভূমিকাটি এ রকম; লাবণ্যর স্বামী পরিবারের ছোট ছেলে, সে বেকার, তাদের এক মুমূর্ষু সন্তান যে কিনা মৃত্যুপথযাত্রী। এই পরিবারের অসহায় ছোট বৌ এবং তার রুগ্ন সন্তানের ভূমিকায় অভিনয় করার বরাত পেল লাবণ্য। কার্যক্ষেত্রে অনিমেষ বার বার লাবণ্যকে শেখানোর পরও লাবণ্য সেই চরিত্রটি যথাযথ দৃশ্যায়িত করতে পারলনা। কিন্তু তাদের ছেলে বিন্তু সেই ভূমিকায় ঠিকঠাকই উতরে গেল। কিন্তু লাবণ্য পারল না।সেটের মধ্যেই লাবণ্যর হাত পা ঠোঁট থরথর করে কাঁপে অদ্ভুত একটা ভয়ে । অনিমেষের মোক্ষম শব্দ 'আপনার' 'নিজের ছেলে' 'মরে যাচ্ছে'- এই শব্দগুলিতে লাবণ্যর মনে আসা আবেগ তাকে অভিনেত্রী না, মাতৃত্বের শিখরে পৌঁছে দিল। লাবণ্যর সামনে রয়েছে বিন্তু। লাবণ্য এক সন্তানের জননী। যার সন্তান কিনা অসুস্থ। যে অসুখে বিন্তু ভুগছে তাতে হয়ত বিন্তুর প্রাণনাশের হুমকি নেই- কিন্তু এক সুস্থ সুন্দর শৈশব থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে। বিন্তুর শৈশব অসুখের ভারে আক্রান্ত আর ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল নয়। লাবণ্য অভিনেত্রী হতে পারল না,

কারণ তার মধ্যে জেগে উঠল মাতৃত্ব। আর তার সহ-অভিনেতা, চরিত্রের মুমূর্ষু সন্তানটিও যে বিন্তু- তার নিজের সন্তান, অভিনেত্রী না হয়ে ওঠার মধ্যেই লাবণ্যর মাতৃত্বের উত্তরণের অনুঘটক হয়েছে।

বিন্তু নিজে চরিত্রে ঠিকঠাকই অভিনয় করে উতরে গেল। অবশ্য বিন্তুর অভিনয় অংশ খুব বেশি ছিল না। লাবণ্যর জায়গায় এল যখন পেশাদার অভিনেত্রী মালতী মল্লিক তার অভিনয় সবারই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠল। উপস্থিত সমস্ত দর্শকের চোখেই জল এনে দিল। এখানেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,-

''সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে প্রকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না।''[৯৩]

আবার এই লাবণ্যই গল্পের শেষাংশে স্বামীর অসুখ নিয়ে কি অসাধারণ অভিনয়টাই না করল বাড়িওয়ালার কাছে। কারণ লাবণ্য এবং বিনয় সমাজ-সংসারের সংগ্রামের দুই যোদ্ধা। তারা চায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে এগিয়ে যেতে। আর বিন্তু সমস্ত মানুষের স্বপ্নের সন্তান। সেই কোনযুগে অন্নদামঙ্গলের কবি বলে গেছিলেন-

''আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।''[৯৪]

আধুনিক কবির কণ্ঠেও যার প্রতিধ্বনি শুনি-

''ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।''[৯৫]

বিন্তু সেই চিরন্তন বাৎসল্যরসের উৎসার ঘটিয়েছে।

বিন্তু তার ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করল যথাযথ। কিন্তু তার বাবা-মা তার বিনিময়ে প্রাপ্য পারিশ্রমিকটুকু নিতে পারল না। অথচ এই অল্প একটু টাকার আশাতেই বিনয়-লাবণ্য বিন্তুকে নিয়ে অভিনয় জগতে আসার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত মানসিকতা, চরম বাস্তব এবং হতাশাই তাদের গ্রাস করে।

''উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে।
তিনিই মধ্যম যিনি থাকেন তফাতে।''[৯৬]

বিন্তু 'অভিনেত্রী' গল্পের মুখ্য চরিত্র নয়। তার প্রতিবন্ধকতাও এমন কিছু মারাত্মক নয়। সে সামান্য একটু পা টেনে টেনে চলে মাত্র। যথাযথ পুষ্টিকর খাবার এবং টনিকের প্রয়োগে তার শরীরের সেইসব ঘাটতি মিটে যাবে এবং এক সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবে। বিন্তু আসলে গল্পকারের সময়ের চিত্র পরিস্ফূটনের ভূমিকা পালন করেছে। চরিত্র এবং সমাজ-সময়কে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছে বিন্তু।

চন্দ্রচৌধুরী (সৈনিক : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়)

সাহিত্যে মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রচুর। পোষ্য হাতির সঙ্গে অপত্য সম্পর্ক নিয়ে রচিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', বনফুলের 'গণেশ জননী', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুসলমান দরিদ্র প্রজা গফুর মিঞা ও ষাঁড়ের সম্পর্ক নিয়ে মর্মস্পর্শী গল্প 'মহেশ' । পশুর অপত্য স্নেহের করুণার্তি- বাড়ি ফেরার আকুতি বারবার বিভিন্ন নামে ঘুরে ফিরে এসেছে বিভিন্ন গল্পকারের লেখনীতে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের করুণরসাত্মক 'বুধীর বাড়ি ফেরা' বা রাজশেখর বসুর হাস্যরসাত্মক 'লম্বকর্ণ' এই শ্রেণীভুক্ত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়', 'নারী ও নাগিনী' সবই ভিন্নরসাত্মক পশুনির্ভর ছোটগল্প। আরোও অনেক আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক'ও সেই শ্রেণীভুক্ত।

বরেন্দ্রভূমিস্থ একটি গ্রাম কুমারদহ। দেবীকোট রাজবংশের কোনো এক রাজা একদা মুসলমান আক্রমণের ভয়ে এখানে পালিয়ে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। দীর্ঘদিন কেটে গেছে। গ্রামটি মজা দীঘি আর স্তূপীকৃত ইঁট-কাঁকরের মধ্যে এখনও শ্মশানভূমি। এখানকার বর্তমান রাজা চন্দ্রচৌধুরী। তার বশংবদ বাহন- আসামের প্রবল পরাক্রমশালী হাতি- রাজা চন্দ্রচৌধুরী যাকে আদর করে ডাকেন নীল বাহাদুর নামে। এই শ্বাপদ সংকুল বরেন্দ্রভূমিতে বসতি স্থাপন করার অনুমতি নিতে আসে সাঁওতালরা। চন্দ্র চৌধুরী তাদের সে অনুমতিও দেন। তারপর চন্দ্রচৌধুরীর মৃত্যু হলে তার পুত্র ইন্দ্রচৌধুরীর হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হলে সবকিছুতেই পরিবর্তন আসতে থাকে। ইন্দ্রচৌধুরী সাঁওতাল প্রজাদের এবং নীলবাহাদুরকে- দুজনকেই পছন্দ করত না। ইন্দ্রচৌধুরী আধুনিক যুগের মানুষ-বুদ্ধিমান। সে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলল। তার এক চালে মারা গেল নীলবাহাদুর এবং ছারখার হয়ে গেল সাঁওতাল গ্রামগুলি।

চন্দ্রচৌধুরী একসময়ে ছিলেন দোর্দন্ডপ্রতাপ জমিদার। নীল বাহাদুরের পিঠে সওয়ার হয়ে একসময়ে প্রবল পরাক্রমে বাঘ শিকারও করেছেন। আজ বয়স তাঁর পঞ্চাশোর্ধ্ব। আজ আর তার সেই পরাক্রম নেই। জরাগ্রস্ত জবুথবু বৃদ্ধ রাজা তিনি। তাঁর এই জড়তা কেবলমাত্র বয়সের ভারে। আজও তিনি যথার্থই রাজা। দীর্ঘ বারোবছর আগে যে সাঁওতালদের তিনি থাকতে দিয়েছিলেন তার বরেন্দ্রভূমিতে আজ বারো বছরের পরিশ্রমে সাঁওতালরা সেই ঊষর বনভূমির জঙ্গল কেটে সাফ করে বাসভূমি গড়ে তুলেছে। পালগ্রাম আজ সাঁওতালদের কলরবে মুখরিত। স্থবির রাজা চন্দ্র চৌধুরী এবং নীলবাহাদুরকে ঘিরে সাঁওতাল পল্লীর নৃত্যগীতি সেই রাজার প্রতি প্রজার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসারই প্রকাশক।

পাগলা ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে রাজা চন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসে পুত্র ইন্দ্র চৌধুরী। ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করা ইন্দ্র চৌধুরী যথার্থই আধুনিকমনস্ক সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতিনিধিত্ব করছেন। ইতিহাস তার পড়াশুনার বিষয় হলেও সে বিষয়ে তিনি কতটা আন্তরিক হতে পেরেছেন সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রশ্নের অবকাশ থাকে। তার সাঁওতাল বসতির উচ্ছেদ তার অপরিণামদর্শিতারই পরিচায়ক। ইন্দ্র চৌধুরীর দাম্ভিকতাই ইন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর কারণ।

বৃদ্ধ রাজা চন্দ্র চৌধুরী যৌবনবয়সে যথেষ্টই শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু সেই শক্তির প্রয়োগ ও প্রকাশ ঘটেছে গঠনমূলক কাজে। পুত্র ইন্দ্র চৌধুরী শক্তির আস্ফালন দেখাতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছে। রাজা মানেই শক্তির আগার। কিন্তু তার প্রায়োগিক ক্ষেত্রই নির্ধারণ করে ভবিষ্যতের। চন্দ্র চৌধুরীকে কাহিনি অংশে আমরা যখন দেখছি তখন তিনি স্থবির জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ রাজা। কিন্তু তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তার স্থবিরত্বকে ম্লান করতে পারেনি। রাজা চন্দ্র চৌধুরী ও হাতি নীলবাহাদুরকে ঘিরে বারো বছরে বসতি গড়ে তোলার পর সাঁওতাল সমাজের আনন্দানুষ্ঠান চন্দ্র চৌধুরীর জঙ্গমতার সাক্ষ্য বহন করছে। পাশাপাশি ইন্দ্র চৌধুরী সুস্থ সতেজ যুবক হলেও ক্ষমতার দাম্ভিকতায় এক লহমায় পদপিষ্ট হয়ে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

গল্পটির শিরোনাম 'সৈনিক'। গল্পটিতে মূলত: ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক সংস্কৃতির এক চিরকালীন দ্বন্দ্ব দেখানো হলেও কাহিনির প্রথমাংশে এক ইতিহাস কথা বলে। অকুতোভয় সাঁওতাল জনজাতির রুক্ষ ঊষর বনভূমি সাফ করে বসতিস্থাপনের কাহিনি আমরা পাই। আর শেষাংশে সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বজদের ছায়াপাত দেখি। সাঁওতাল পল্লীর বসতি স্থাপনের জন্য ভূমি পরিবেশ মোটেই অনুকূল ছিল না। প্রতিকূল পরিবেশকে নিজের বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য সাঁওতালদের শারীরিক সক্ষমতা তো ছিলই তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার সাথেও বড় যেটা সেটা হল জমিদার চন্দ্রচৌধুরীর মত ভাল মানুষের সহযোগিতা। রাজ চরিত্র কেমন হওয়া উচিত তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চন্দ্রচৌধুরী। তাই-জন্যই জীবনের শেষে নীলবাহাদুরই তার বাহন। তবুও শারীরিক জড়তা পেরিয়ে তিনি মানবিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন

অবলা (লেভেল ক্রসিং: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিশ শতাব্দীর পাঁচের দশকের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ 'ফেরিওলা' (১৯৫৩)-এর গল্প 'লেভেল ক্রসিং'। এই গল্পের একটি ছোট্ট স্বল্পপরিসরের চরিত্র অবলা বছর তিনেক হল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সারাদিন শুয়ে বসে কাটানো ছাড়া তার আর উপায় নেই। কাহিনিটিতে চরিত্রটির প্রত্যক্ষ ভূমিকা খুব বেশি না হলেও অবলার অক্ষমতার জন্যই তার সংসার সামলানোর জন্য তাদের বাড়িতে এসেছে অবলার কর্মনিপুণা বোন মায়া। কাহিনির নায়ক অবিবাহিত কেশব এই

বাড়িরই ছেলে। কেশবের বাড়ি গঞ্জ পরিবেশে আর লেভেল ক্রসিং পার করেই শহরাঞ্চলে সে ধনীব্যক্তির বাড়িতে ড্রাইভারি করে। মালিক-কন্যা ললনার হৃদয়-দৌর্বল্য রয়েছে কেশবের প্রতি। কেশব শহরে তার জন্য বরাদ্দ ধনীগৃহের ঘর-খাবার সব সুখে তৃপ্ত হতে না পেরে প্রতিদিন রাতে বাড়ি ফেরে গঞ্জে তার গরিবখানায়। কিন্তু ছুটি থাকা সত্বেও সকালে সে বাড়িতে থাকতে পারে না, তাকে টানে শহর। এ যেন 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শশী ডাক্তার আর কেশবের প্রতি মায়ার অনুরাগ মনে করায় কুসুমের কথা। আবার দিদির পক্ষাঘাতের জন্য বোনের দিদির সংসারে আসা মনে করায় 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পক্ষাঘাতগ্রস্ত মালা এবং তার বোন কপিলার কথা। মালার পরিণতি হল না অবলার, কারণ অবলার সংসারে আরেকটি অবিবাহিত পুরুষ কেশব। পূর্ববর্তী মালা শান্ত-কোমল স্বভাবা হলেও অবলা কিন্তু যথেষ্ট দাপুটে- তার শারীরিক অক্ষমতা তার চরিত্রের তেজকে কোনোভাবে ক্ষুন্ন করেনি।

বিভা (মীমাংসা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মানিকের গল্পগ্রন্থ 'লাজুকলতা' (১৯৫৪) -র 'মীমাংসা' গল্পে বিভা-পা খোঁড়া হলেও অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালিনী দৃঢ় চরিত্র। ধনী পিতার একমাত্র মেয়ে বিভা।

> ''বয়স হবে তেইশ-চব্বিশ, দুটি পায়ের পাতাই তার দুমড়ানো।মুখখানা লাবণ্যে কমনীয় মতে হতে পারত, কিন্তু অতিরিক্ত কালো রোমের জন্য সব লাবণ্য মাটি হয়ে গেছে।''[৯৭]

বাবা নগেনবাবু বিভার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন সুপাত্র রমেশ সরকারের সঙ্গে। কিন্তু বিভার এ বিয়েতে মত না থাকায় সে পঙ্কজের কাছে আসে অসহায় হয়ে। আসলে পঙ্কজের প্রতি বিভার শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা ছিল। পঙ্কজ তাকে শিখিয়েছে খঞ্জত্ব জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে পারে না। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে থাকা সুপ্ত শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে জীবনযুদ্ধে জয় লাভ করাই জীবনযাপন। শেষপর্যন্ত রমেশ সরকার বাবার অর্থের লোভে কুরূপা খঞ্জ কন্যা বিভাকে বিয়ে করছে এ দাবিতে যে বিভা রমেশের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব নাকচ করে, সেই বিভাই আবার যখন পঙ্কজ তাকে বলে তার বাবার অর্থানুকুল্যে তার কাগজ বেঁচে গেলে সে বিভাকে বিবাহ করতে রাজী আছে, তখন বিভার পঙ্কজের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। আসলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে বিভা চরিত্রে নারীমনস্তত্ত্বের সেই জটিল রূপটির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ 'নারী' কবিতায় যেমন বলেছিলেন,-

> ''আপন তপস্যা লয়ে যে পুরুষ নিশ্চল সদাই,
> যে উহারে কভু ফিরে চাহে নাই,
> জানি সেই উদাসীন

একদিন

জিনিয়াছে ওরে,

জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভ'রে!''[৯৮]

আমি (সামনে চামেলি : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৬৯)-এর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'সামনে চামেলি'।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত তেমন প্রত্যক্ষভাবে বাঙালিজীবন স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চাকরির বাজার পরিধি হারিয়েছে। অনিশ্চয়তার করাল ছায়া শুধু কলকারখানার শ্রমিকদের জীবনে নয়, পল্লীবাংলার শান্তজীবনেও ত্রস্ততার ছায়া এনেছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি একদিকে যেমন একশ্রেণীর মানুষের হাতে তুলেছিল প্রভূত অর্থ, আরেকদিকে তেমনই অর্থের অভাবে একদল মানুষের জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও প্রতুল হয়েছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় বোমা আক্রমণ বাঙালির জীবনে প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বযুদ্ধের আঁচ লাগিয়ে দিল। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা তো এল। কিন্তু যে প্রত্যাশা নিয়ে স্বাধীনতা এল, সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারল না স্বাধীনতা। একদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, তার উপর পুরাতন মূল্যবোধহীনতা-সামাজিক-নৈতিক সংকট-অবক্ষয়।

আশৈশব আত্মমগ্ন, নির্জনতাপ্রিয়, মিতবাক, আড়ম্বরবিমুখ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রখর ইন্দ্রিয়চেতনা রূপ-রস-গন্ধ স্পর্শময় প্রাকৃতিক জগতে নৈর্ব্যক্তিকতায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

'সামনে চামেলি'র কথক বাঁ পা হারিয়েছেন দুর্ঘটনায়। ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটার জন্য তার গতি অতি মন্থর। আর পাঁচটা সুস্থ মানুষের মত তাড়াতাড়ি চলতে পারেনা। যাদের দুটি পাই সুস্থ সবল রয়েছে তাদের মত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার করতে পারে না। চারিদিকের গাড়িঘোড়া দেখে শুনে সন্তর্পণে রাস্তাঘাট চলাচল ও পারাপার করতে হয়। ফুটপাথের ধার ঘেঁষে হাঁটলেও ভয়। গাড়িঘোড়া নয়, ভিড়। কথকের বক্তব্য অনুসারে দুই পায়ের ভারসাম্য ভিড়ের জোয়ার প্রতিরোধ করতে পারলেও; ক্র্যাচ একটা পায়ের বিকল্প হিসাবে সাময়িক support দিতে পারলেও, বড় ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা থাকে না বিকল্পসত্তার। বহি:শক্তির ক্ষমতা তো আর কখনোই আন্ত:শক্তি তথা অকৃত্রিমের সমতুল হতে পারে না। তাই জন্য ভিড় দেখলে কথক আগে ভিড়কে রাস্তা ছেড়ে দেন। তাইজন্য হাঁটতে থাকেন জনবিরল রাস্তা খুঁজে খুঁজে।

এই রাস্তার জনবিরলতা এবং গতিমন্থরতা সৃষ্টি করে এক নতুন কথার জগৎ। যে জগতে কথক বাইরের সমস্ত কিছু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অবলোকন করতে পারেন। বহি:প্রকৃতিতে এমন অনেক

কিছু আছে যা গতিশীলতার গতির স্রোতে ভেসে যায় প্রতিনিয়ত, তাই-ই , সেইসব তুচ্ছ-অতুচ্ছ সবার সাথেই নিবিড় সংযোগ স্থাপিত হয় মন্থর গতিশীলতার।

কথক নিজেকে খুবই লাজুক এবং আশাতীত রকমের ভীরু বলে মনে করেন। তিনি ভিড়হীন রাস্তায় একা চলাফেরায় তুলনামূলকভাবে অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কারণ জনমানস কেউ থাকলেই তাদের কারোর চোখাচোখি হয়ে গেলে যদি কথা বলতে হয়, তাতে কথক খুবই অস্বস্তিবোধ করবেন। হীনমন্যতায় আক্রান্ত কথক। তিনি নিজেও জানেন এই এতবড় শহরের বুকে তিনিই একমাত্র মানুষ নন, যিনি ক্র্যাচ নিয়ে ঘুরছেন। শুধু জানার কথাই নয়, কথক নিজেও বলেছেন তিনিও দেখছেন তার মত আরোও কত মানুষ রয়েছেন। কলকাতা শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে আলাদা করে চোখেই পড়ে না এই ক্র্যাচ নেওয়া মানুষদের। চোখে পড়ে না কথাটা না বলে বলা যায়, হাজার লক্ষ মানুষের মহানগরীর চূড়ান্ত ব্যস্ততায় চোখে পড়ার - আলাদা করে ভাবার সময় বা মানসিকতা নেই। কথকের মলিন বেশভূষা, দুর্বল রুগ্ন নিস্তেজ স্বাস্থ্য প্রকৃতপক্ষে মানসিক স্বাস্থ্যেরই জোর-অল্পতার প্রতীকমাত্র।

অত্যন্ত সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ কথক। থাকেন কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতা শহরের কোনো এক ঘিঞ্জিপাড়ার ধোঁয়া-কালিমা লিপ্ত গোলপাকানো নোংরা এক বস্তিতে যেখানে মেয়েরা লাইন দিয়ে রাস্তার কলকাতায় জল তোলে, বাচ্চারা উলঙ্গ হয়ে ফেরিওয়ালার পিছন পিছন ঘুরে বেড়ায়। পরনে পাঁচটাকা দামের একটা জ্যালজ্যালে সস্তাতম ছিটের শার্ট। তার কলারটা আবার ছিঁড়েও গেছে। ধুতির অবস্থাও তথৈবচ। বাবা ডাক্তার, কিন্তু হোমিওপ্যাথি। আর পসারও খুব একটা বেশি ভাল ছিল না। ডাক্তারখানার টেবিল চেয়ারের চিরকালই ধুলিমলিনতা ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতার মুখের ধূলিধূসরতার ব্যঞ্জনা দেয়। কথক ছিলেন বাড়ির বড় ছেলে। তাই স্বভাবতই পরিবারের সবারই তার প্রতি প্রত্যাশা ছিল অনেকটাই।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মতই যথাবয়সে স্কুলের গন্ডী টপকে কলেজে সদ্য ঢুকেছেন কথক। পড়াশোনাও চলছিল যথানিয়মে। কলেজে ভর্তির একমাসের মধ্যেই কথক ও পরিবারের স্বপ্নভঙ্গ হল। এক বন্ধুর মায়ের অসুখে বড় অ্যালোপাথি ডাক্তারকে ডাকতে গিয়ে এক দুর্ঘটনার কবলে আক্রান্ত হলেন কথক। প্রায় দেড়মাস হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। প্রাণে তো বাঁচা গেল। কিন্তু কাটা গেল একটা পা। একে কথকের দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য কোন্‌টা বলা যায়! বন্ধুর বাবার ক্ষমতার জোরে একটা চাকরি জুটে জায় কথকের। বন্ধুর বাবা একে ধনবান তার উপর আবার দুবার কর্পোরেশনের কাউন্সিলর হন। তাঁরই প্রচেষ্টায় বয়স যখন মাত্র কুড়ির কোটায় তখন প্রাইমারি

স্কুলের মাস্টারের চাকরি জুটে যায় কথকের। কথকের বন্ধুরা যখন দেশ-বিদেশে নিজেদের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করছে অনেক স্বপ্ন নিয়ে, ঠিক তখনই কথক ভবিষ্যতের কারিগর গড়ার কাজে লিপ্ত।

ছয়-সাত বছর চাকরি জীবনে কথকের বেতন একশ' কুড়ি। সাথে দুবেলা দুটো প্রাইভেট টিউশনির চল্লিশ টাকা। মোট আয় একশ' ষাট। আর বছর সাতাশের যুবক কথকের বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা মা ছাড়াও আছে আরও তিনটি ভাইবোন। একশ' ষাট টাকায় ছ'টি পেট প্রতিপালন করে কথকের পক্ষে আর নিজের প্রতি বিশেষ আহার ও যত্নের সংস্থান জোটে না। ফলে ডাক্তারের কথামত দুর্বল শরীরে যে আরও বেশি পরিমাণ সুখাদ্যের প্রয়োজন ছিল আর্থিক অনটনে সে ঘাটতি দিনে দিনে পূরণ হবার বদলে বাড়তেই থাকল। অপুষ্টিতে আরও বেশি ভুগতে থাকলেন কথক।

কথকের অপুষ্ট শরীরে যেমন সুখাদ্য-ভিটামিন জাতীয় মহামূল্য খাদ্যের প্রয়োজন ছিল, ঠিক তেমনই কথকের মনের পুষ্টিরও চাহিদা ছিল ব্যাপক পরিমাণে। মানুষটা আসলে ছিল রোম্যান্টিক, সুন্দরের পিয়াসী। তাই অতি অল্পবয়সেই একদিন একটামাত্র সুন্দর গোলাপের জন্য স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যেতে পেরেছিল। বদলে গোলাপ তো জোটেই নি, জুটেছে ভর্ৎসনা। আবার এই সুন্দরের পূজারী মনই একদিন আবার ছুটে গেছিল পেখম তোলা ময়ূরের টানে। ভুলে গেছিল মা, পরিবার, দায়িত্ব। ক্ষণিকের জন্য হলেও, সবই ভুলে গেছিল। শৌখিন কোনো বস্তু দেখলেও চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। কোনো খাদ্যের সুঘ্রাণ নাকে এলেও কুকুরের মত উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। রোম্যান্টিকতা এবং বাস্তবের দ্বন্দ্বে কথকমন সর্বদাই রোম্যান্টিকতা দ্বারা বাস্তবকে আগ্রাস করে ফেলত। যে পরিবার বাড়ির বড় ছেলেকে টানাটানির সংসারেও কলেজে পড়িয়ে স্বপ্ন দেখায় একটু সুদিনের, সেই ছেলেই ছোটবেলায় পড়াশুনা-বগলের বইখাতা-স্কুল-ক্লাস, মায়ের আনতে দেওয়া দরকারি জিনিস সবকিছু ভুলে গিয়েছে লাল গোলাপ আর ময়ূরের পেখম তোলার জন্য।

কথক পড়ান প্রাইমারী স্কুলে। কথকের কথামত এটা কথকের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। মাস্টারমশাই-এর এই ক্র্যাচময় জীবন দেখে সমব্যথী বাচ্চাগুলি। তারাও কষ্ট পায় স্যারের জীবনের এই কষ্টে। শারীরিক দৌর্বল্য, অপুষ্টি, খাদ্যের অভাব বাচ্চাদের মনকেও বেদনার্দ্র করে তোলে। মাস্টারমশাই অবশ্য এটাও বলেন, যদি তিনি বড় বাচ্চাদের পড়াতেন তাহলে এই নিষ্পাপ ভালোবাসা তো পেতেনই না, উল্টে যেকোনো বিষয়ে ছাত্রদের সাথে মনান্তর হলে কপালে জুটত টিটকারি।

হতদরিদ্র চেহারার মধ্যেও লুকিয়ে থাকা যে রোম্যান্টিক মন তা সুন্দরের সন্ধান করেই চলেছে। শৈশব কৈশোর পেরিয়ে কথক এখন পরিপূর্ণ যুবক, বয়স সাতাশ। অনেক কিছু না পাওয়ার মধ্যেও সেই মন এখনও খুঁজে চলে সৌন্দর্য। তাই ক্র্যাচে ভর দিয়ে সুদীর্ঘ পথ হাঁটতে হাঁটতেও

পেরিয়ে যায় অনেকটাই রাস্তা। রাধাচূড়ার পর মে-ফ্লাওয়ার, তারপর আবার রাধাচূড়ার পর মে-ফ্লাওয়ারের পরিবর্তে তাই এই সাহসী সন্ধানী মন খুঁজে পায় ইউক্যালিপটাস। এই সুন্দরের খোঁজেই এই মন একবার এক ঝলক রাস্তার লাইটপোস্টের ধারে যে একঝাঁক সুন্দরী তরুণীদের দেখেছিল তাদের আবার দেখার লোভে একমাস ধরে সেখানেই রোজ দাঁড়িয়ে থাকে। এর জন্য ম্লান হয়ে যায় শারীরিক ক্লেশ বা দারিদ্র্যের হাতছানিটুকুও। এই সৌন্দর্যের টানেই বিউগনভিলায় দেখা পায় এক সুন্দরীর। সেই সুন্দরী তাকে ভিক্ষুক ভেবে উপরের দোতলার বারান্দা থেকে পয়সা ছুঁড়ে দিলে সেই মন ভাবে, তার আশেপাশে হয়ত কোনো ভিক্ষার্থী প্রতীক্ষারত। গল্পের শেষে দারোয়ান তার চমক ভাঙিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করল যে বাড়ির দিদিমণির দেওয়া পয়সা সে নিল না কেন, তার কি জামাকাপড় কিছু চাই কিনা, তখন সে হেসে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। এই মন জুঁই, মাধবীলতা, হাস্নুহানা, চাঁপা, বকুল সব ফুল পেরিয়ে তখন চামেলির সন্ধানপ্রার্থী।

রূপের তৃষ্ণা , পরিচ্ছন্নতার মোহ , সুন্দরের পিপাসা । আর একদিকে একশ' ষাট টাকা মাসিক আয়, ক্র্যাচে ভর ছেঁড়া চটি পায়ে করে হাঁটা , জীর্ণ মলিন পোশাক , কোটরগত চক্ষু , সস্তা জ্যালজ্যালে ছিটের শার্ট , ময়লা ধুতির অবস্থাও তথৈবচ , ফ্যাকাশে শীর্ণ শরীরের জীর্ণতার ছাপ । একদিকে জনহীন রাস্তার অপার্থিব স্তব্ধতার প্রগাঢ়তা পাশাপাশি প্রেসারকুকারের বিদঘুটে আওয়াজ অথবা রেডিওতে সেতারের সুমিষ্ট আলাপচারিতার সুর । সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বুকে ঝুপ করে নেমে আসা অন্ধকার ; সাথে রাস্তায় নিওন ফ্লোরেসেন্ট আলোর দপদপ করে জ্বলে ওঠা । বৈশাখের এলোমেলো হাওয়ায় কোনো এক বাড়ির বারান্দায় ফুটে থাকা জুঁই এই সুগন্ধ ; এই সুগন্ধ নষ্ট করছে রাস্তার গাড়িগুলোর পেট্রোল-পোড়ার গন্ধ । ল্যাভেন্ডার ডিউ কি কিউটিকুরোর হাল্কা মেজাজী সৌরভের সাথেই রয়েছে ডেটল বা ফিনাইলের গন্ধও । কলকাতার সম্ভ্রান্ত পল্লীর নির্জনতা আর মেঘমন্দ্রের মত দামী অ্যালসেসিয়ানের হৃৎপিন্ডে ধাক্কা দেওয়া চিৎকার । তেরো-চোদ্দ বছর থেকে সাতাশ বছর। একদিকে কলকাতার বনেদী পাড়া, আর তার পাশাপাশি দারিদ্র্যক্লিষ্ট নোংরা ঘিঞ্জিময় বস্তি । বড় বাড়ি -লোক কম ; আর ছোট্ট বস্তির ঘর- গুঁতোগুঁতি করে তাতে থাকা মানুষজন ।

পৌগন্ডের লাল গোলাপের প্রতি আকর্ষণ মনে যে রোম্যান্টিকতার কলির সঞ্চার করেছিল অবস্থার বিপাকে সেই মন রাধাচূড়া, মেফ্লাওয়ার, জুঁই, মাধবীলতা, হাস্নুহানা, চাঁপা, বকুল পেরিয়ে চামেলির সন্ধানে এগিয়ে চলে। ময়ূরের পেখম মেলে ধরায় বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ স্মরণ করায় 'ময়ূর নাচত মাতিয়া'[৯৯] আর কাঙ্ক্ষিতা কামনার নারীসঙ্গ না মেলায় 'ফাটি যাওত ছাতিয়া'[১০০]। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পেও যে অতৃপ্ত কামনাবাসনার উল্লেখ রয়েছে, সেই নারীসৌন্দর্যের

বিচ্ছেদ বিধুরতা কথকমনকে মাসাধিক কাল ধরে বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে নিজের অক্ষমতা জানা সত্ত্বেও এনে দাঁড় করায় সম্ভ্রান্ত রাস্তায় বনেদী পাড়ায়। বাস্তবকে জানা এবং অবাধ্য মনের চাহিদাপূরণ দুটোর বিপ্রতীপতা সন্ধ্যার মুখে নিওন আলোয় পেভমেন্টের ওপর চিকরিকাটা আলপনায় নকসীকাঁথার জন্ম দেয়। সুন্দর সুন্দর বাড়ির ব্যালকনি-অথচ তাতে গ্রিল দেওয়া। কথকমনের রোম্যান্টিকতার প্রতি আকর্ষণ খোলা বারান্দা এবং নিজের দারিদ্র্যের গ্রিলের ঘেরাটোপ এক অসাধারণ দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে।

'সামনে চামেলি'র আমি যেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আত্মবিম্বন। বরাবর আত্মনিমগ্নতা, আবাল্য নি:সঙ্গতা ও অন্তর্মগ্নতা, প্রাকৃতিক আবরণে মানব-মানবীর সম্পর্কের চিরন্তনতার মূল্যায়ণ, মহানগরীর সুবিশাল ইমারতের মাঝখানে সবুজের প্রাণস্পন্দনতার সন্ধান রয়েছে কথক চরিত্রে। এই চরিত্রে রয়েছে সদ্য কৈশোর পেরোনো যুবকের নারী-নিমজ্জনের কামার্ত-স্বপ্নবিহ্বলতা অত্যন্ত সুচারুরূপে অঙ্কিত হয়েছে কথক চরিত্রটিতে। শারীরিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিসরের তথাকথিত মানদন্ডে একজন অক্ষম মানুষ কিভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জাগতিক সমস্ত আনন্দ উপলব্ধি করে স্বপ্নালুতার ঘোর ভেঙে এগিয়ে চলতে পারে সামনে নতুন চামেলির সন্ধানে তার নজির কথক চরিত্র। চরিত্রটিতে তাই বিষাদ থাকলেও বৈরাগ্য নেই। উৎসাহ স্থায়িভাবের উৎসারে চরিত্রটি বীর চরিত্র-হতভাগ্য প্রতিবন্ধী নয়- প্রতিবন্ধকতাকে জয়কারী তেজোদৃপ্ত বিনয়ী নায়ক।

শচীনবাবুর নাতনি (জননী : বিমল কর)

বিমল করের 'জননী' গল্পের কথকের বাবার ব্যবসার শরিক ছিলেন শচীনবাবু। বর্তমানে তাঁরা কাশীবাসী। বড়ই দারিদ্র্যের সংসার তাঁদের। শচীনবাবু নিজেও এতটাই অসুস্থ যে স্থবিরতা তাঁকে গ্রাস করেছে।তাঁর স্ত্রী শ্বাসকষ্টজনিত অসুখে ভুগে শয্যাশায়ী। এক ছেলে সেও বিপত্নীক,অতিকষ্টে হোটেলের গাইডগিরি করে দিনাতিপাত করে।তার দুটি মেয়ে। একটি লোকের বাড়িতে রান্নাবান্নার কাজ করে আর অন্যটি টাঙা থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে খোঁড়া হয়ে গেছে।

শচীনবাবুর এই নাতনী সম্পর্কে আর কিছুই বলেননি কথক। শুধু এটুকুই বলেছেন-

''একটি পা খোঁড়া হয়ে গেছে টাঙা থেকে পড়ে।''[১০১]

সম্পূর্ণ কাহিনিতে এই বাক্যাংশটুকু ছাড়া চরিত্রটির আর কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সামান্য ওইটুকুতেই পরিবারটির দৈন্যদশা স্পষ্ট। টাঙা থেকে পড়ে যাওয়াটা বড়কথা নয়, আসল কথা হল দারিদ্র্যের কারণে যথাযথ চিকিৎসা করাতে না পারা, বিনা চিকিৎসায় পঙ্গুত্ব।শচীনবাবুর আরেক নাতনি নিজের খরচ নিজেই জোগাড় করে নিচ্ছে। দারিদ্র্যের সংসারে সবাই সবার বোঝা। সুতরাং

এই পঙ্গু মেয়েটির ভবিষ্যৎ কী ? শচীনবাবুর এককালের সচ্ছল পরিবার আজ যে প্রবল দারিদ্র্যে কোনোরকমে হোঁচট খেতে খেতে চলছে তার প্রতীক মেয়েটির খঞ্জত্ব। শচীনবাবুর ব্যবসার উত্তরাধিকারহীনতার রূপক এই চরিত্রটি।

কথাশেষ

গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে কালবিচারে সবার প্রথম আলোচ্য চরিত্র শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অর্থমনর্থম' (১৯৩৩) গল্পের ফণিভূষণ। ব্যোমকেশের কেসগুলির প্রথমদিকের ঘটনা এটি। প্রতিবন্ধকতা মানুষকে মানসিকভাবে কতটা বিপর্যস্ত করে দিতে পারে, তারই জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ ফণিভূষণ। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, জীবনে প্রতিষ্ঠার পথে বাধা, ভালোবাসা না পাওয়া সবকিছু মানুষকে বাধ্য করে অন্ধকারজগতের পথে পা বাড়াতে। অপরাধীকে খুঁজে বার করে শাস্তি দেওয়া নয়, অপরাধীর অপরাধকে খুঁজে বার করা, এক জটিল মনস্তত্ত্বের উন্মোচন ব্যোমকেশের গল্পগুলির মূল বৈশিষ্ট্য। ফণিভূষণ তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে পেরিয়ে উঠতে পারেনি বলেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে অন্ধকারজগতে প্রবেশ করেছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ফণিভূষণের মনের অপরাধপ্রবণতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করলেন তার প্রতিবন্ধকতাজনিত সামাজিক উপেক্ষাকে। পরবর্তীকালের গোয়েন্দা চরিত্র স্রষ্টা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার গোয়েন্দা চরিত্র কাকাবাবুকেই গমনসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী হিসাবে দেখালেন এবং প্রতিষ্ঠা করলেন প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সফলতার কাহিনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক চরিত্রেরাই দেখেছি প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে ভিখু ডাকাতও খুন করেছিল, কিন্তু তাতে তার কোনো অনুশোচনা ছিল না। ভিখুর প্রতিবন্ধকতা তাকে ঠেলে দিয়েছিল জীবনযুদ্ধে সফলভাবে বাঁচার জন্য, পাঁচীকে লাভ করার জন্য বসিরকে খুন করতে। ভিখুর-পূর্ববর্তী ফণিভূষণ শারীরিক অক্ষমতায় বিপর্যস্ত হয়ে খুন করল, কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর প্রতিনিধি ফণিভূষণ তার আদিম প্রবৃত্তির জাগরণকে মেনে নিতে পারল না, আত্মহত্যায় পালিয়ে গেল। তার পরবর্তীকালে ভিখু, গজেনরা অন্ধকার পথে গেলেও জীবনসংগ্রামে হারিয়ে যায় না।

অভিসন্দর্ভে নির্বাচিত গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার পরবর্তী চরিত্র তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী' (১৯৩৪) গল্পের খোঁড়া শেখ। মানবমনের গহন গভীর তলের সুনিপুণ রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'নারী ও নাগিনী' গল্পে একদিকে মানুষ ও সরীসৃপ উভয় প্রাণীর স্বভাববৈশিষ্ট্যের মূল প্রভেদ, নারীমনস্তত্ত্বের ঈর্ষা, আদিম জান্তব জীবনদর্শন একীকৃত করে আঁকলেন খোঁড়া শেখের অবলম্বনে। খোঁড়া শেখ চরিত্রের মাধ্যমে তারাশঙ্কর দেখালেন মানুষের কামনা-বাসনা-

যৌনপ্রবৃত্তিগুলি আদিম প্রকৃতির প্রবৃত্তির ভয়ঙ্করতার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। খোঁড়া শেখ চরিত্র পরিকল্পনায় তারাশঙ্কর মূল সমাজজীবনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথক নিম্নবৃত্তীয় এক সমাজজীবন হিসাবে সাপুড়েদের জীবনচর্যা দেখালেন। ভিন্ন পটভূমিকার চরিত্র 'ডাইনী'র সোরধন বা 'বেদেনী'র রাধিকার মত খোঁড়া শেখও পারিপার্শ্বিকের চাপে হেরে যায়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) উপন্যাসে পায়ে খুঁত আছে এমন দুটি চরিত্র আলোচনা করেছি অভিসন্দর্ভটিতে। পার্শ্বচরিত্র- অতি ছোট চরিত্র- ভূতো এবং মোহন। উপন্যাসটিতে মৃত্যু এবং নিয়তি পাশাপাশি থেকে উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। শশীর ডাক্তার পাঠ শেষ করে গাওদিয়া গ্রামে প্রবেশের পরই বেশ কিছু অপমৃত্যু ঘটে, শশী তার অধীত চিকিৎসাবিদ্যা দ্বারা যাদের বাঁচাতে চেয়েছিল, কিন্তু অমোঘ নিয়তি মৃত্যুকেই জয়যুক্ত করেছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল বাচ্চা ছেলে ভূতো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্ক্সীয় যুগে মূলত: ভারতীয় নিয়তিবাদের সঙ্গে গ্রীক নিয়তিবাদ এবং ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আলোকে ভূতোর মত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের অপমৃত্যু দেখালেন। মানুষ যে কি পরিমাণে ভাগ্যের হাতের পুতুলমাত্র 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তা দেখালেন মানিক- তার মধ্যে ভূতো ছোট চরিত্র হলেও গুরুত্বহীন চরিত্র নয়।

'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র মোহন- সেও গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী। শশীর বড় বোন বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী মোহনের অবস্থানও কাহিনিতে খুব বেশি নয়। সমকালীন সমাজব্যবস্থার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি মোহন। মোহন চরিত্র উপস্থাপনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে শশীর পিতা গোপালের ধুরন্ধরতার পরিচয় দিয়েছেন।

সমকালে লিখিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে মালা পঙ্গু। মালার সন্তানের গায়ের রং ফর্সা হওয়াকে কেন্দ্র করে ধীবরসমাজে ঠাট্টা-তামাসার মাধ্যমে মানিক স্পষ্টতই সামন্ততান্ত্রিক সমাজজীবনে গোষ্ঠীচিন্তা ও একতার সুর অনুরণনের চিত্র ফুটিয়ে তুললেন। মালার মুখের রূপকথার গল্প এবং তা শোনার এক বিরাট শ্রোতাসমাজের মাধ্যমে লেখক ধীবর সমাজের প্রেক্ষিতে অনেকটাই ভিন্ন মানসিকতা ও সংস্কৃতিমনস্কতার পরিচয় যেমন দিলেন, তেমনি পাশাপাশি বোঝালেন পঙ্গুতা না থাকলে মালার জীবনেও এক স্বাভাবিক পরিণতি আসতে পারত। মালার সন্তানদের প্রতি স্নেহ আসলে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে করতে হারিয়ে যাওয়া সমস্ত ধীবর জননীর স্নেহ-বাৎসল্যের রূপ। ভিন্ন মাতৃস্নেহ-বশতই মালা রাসুর সঙ্গে গোপীর বিয়ে দিতে চাইলেও শেষপর্যন্ত তা কার্যকর হয়ে ওঠেনি, কারণ সেই সমাজ নারীর মতামতের কোনো মূল্য

তৎকালীন সময়ে ছিল না। স্থৈর্য, মমত্ব, উদারতার প্রতিমূর্তি হিসাবে মালা ধীবর সমাজের এক ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬) গল্পগ্রন্থের 'তারপর' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র গজেন জন্মের সময় সুস্থ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তার মা তাকে কুমীরের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ায় তার একটা হাত আর পা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। কিন্তু তবু জীবনযুদ্ধে সে হেরে যায়নি। 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর ভিখু যেমন সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে সাথে করেই জীবনসংগ্রামে এগিয়ে গেছিল গজেনও তাই। গজেনের প্রবলভাবে বেঁচে থাকা, তার অন্ধকারপথ বেছে নেওয়াকেও খাটো করে দেয় পাঠকের কাছে। মানিক দেখালেন একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী তার অনিচ্ছায় হওয়া শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য সমাজের করুণা নিয়ে চিরকাল বাঁচতে পারে না, বরং প্রবল সক্ষমভাবে বাঁচতে পারে- হতে পারে সেটা সমাজকথিত অসৎপথ- কিন্তু সমস্ত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে অত্যন্ত জীবন্ত চরিত্র হিসাবে গজেনকে স্থাপন করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গজেনের অন্ধকারপথে বৃত্তি-উপার্জনে আসলে মানিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের সমাজের অবমূল্যায়ণকেই নির্দেশ করলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে গজেন পূর্ববর্তী ভূতো ('পুতুলনাচের ইতিকথা'), মোহন ('পুতুলনাচের ইতিকথা'), মালা ('পদ্মানদীর মাঝি') তাদের পা-এর পঙ্গুত্বকে উত্তরণ করতে পারেনি- ভূতো তো মারাই গেল নিয়তির জন্য, মোহন ব্যবহৃত হল আর মালাও পারল না কুবের আর কপিলাকে ময়নাদ্বীপ যাওয়া থেকে আটকাতে। কিন্তু গজেন পারল নিজের জীবন নিজের ইচ্ছায় পরিচালনা করতে। পরবর্তীকালে মানিক নাটুককে ('নব আলপনা') বাঁচাতে না পারলেও ফুলি ('ভয়ঙ্কর'), অবলা (লেভেল ক্রসিং), বিভা (মীমাংসা) -দের গজেনেরই উত্তরসূরী হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসে বসন্তের স্বামীকে পেয়েছি খোঁড়া চরিত্র হিসাবে।চরিত্রটি উপন্যাসে মূল চরিত্রগুলির মধ্যে থাকা চরিত্র নয়। চরিত্রটি উপন্যাসের কথক, অন্যতম প্রধান চরিত্রই শুধু নয়, উপন্যাসের মূল সংস্কৃতির ধারক সুচাঁদের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার মূল স্তম্ভ। সুচাঁদ যে শুধু উপকথার কথক মাত্রই নন, উপকথার গঠনে সুচাঁদের সক্রিয় ভূমিকা প্রতিষ্ঠার জন্য খোঁড়া কাহার চরিত্রের অবতারণা করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোটোবড়ো' গল্পগ্রন্থের (১৯৪৮) গল্প 'নব আলপনা'র পার্শ্বচরিত্র নাটুক। জন্ম থেকেই ছেলেটা দুর্ভাগ্যের শিকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রটির উপস্থাপনায় স্বাধীনতা-উত্তর নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন-যন্ত্রণার ছবি দেখালেন। একদিকে আঁতুড়ঘরের সেই পুরাতন পন্থা, সেখানে মা এবং সন্তান উভয়েরই জীবনসংশয় হতে পারে, আর অন্যদিকে চূড়ান্ত অর্থাভাব।

স্বাধীনতার উপহার স্বরূপ উদ্বাস্তু সমস্যা- বস্তিজীবনের ছবি দেখালেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাটুকের উপস্থাপনায়। বস্তিজীবনের প্রিয়তম অবসরবিনোদন বা চরিত্রবৈশিষ্ট্য পরচর্চা, নাটুকের প্রতি তার দিদির স্নেহদৌর্বল্য অসাধারণ মুন্সিয়ানায় স্থাপন করেছেন মানিক। 'মহাকালের জটার জট' (১৯৩৯) গল্পে সুচিত্রারও ছোট ভাই ছিল, যার মৃত্যুতে ভাই-এর প্রতি সুচিত্রার ভালোবাসা ভিন্ন অভিমুখে গমন করেছিল- পাঁচুর সঙ্গে বিকৃতদাম্পত্য সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিল পাগল সুচিত্রা। নাটুকের দিদি চুণোরও ভাই-এর প্রতি যে ভালোবাসা ছিল, তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল এক অসূয়াবোধ যে তার ভাই তাদের মত রূপহীন নয়, বরং ফর্সা, দেখতে সুন্দর। ফ্রয়েডের ভক্ত মানিক দেখালেন নাটুকের অনাত্মীয়-প্রতিবেশিদের, নাটুকের মায়ের প্রতি কু-ইঙ্গিতের মধ্যে সত্যতার প্রশ্নের থেকেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে ঈর্ষা, আর সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে একই উদরজাত হওয়ায় একাত্মতা অনুভবে মনে মনে তৃপ্ত এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করার সুখ অনুভবে গৌরবান্বিত হয়েছে চুণো। এ এক বেশ জটিল মনস্তত্ত্ব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাটির মাশুল'(১৯৪৮) গল্পগ্রন্থের গল্প 'ভয়ঙ্কর'-এ ফুলি খোঁড়া। বিশ্বম্ভরের বেতনভূক কর্মচারী প্রসাদ শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে দুর্বল। ফলে তার উপর বিশ্বম্ভরবাবু যথেষ্ট হাঁকডাক করেন। এর সাথে রয়েছে বিশ্বম্ভরের স্ত্রী দিগম্বরীর প্রসাদের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। এসব বোঝা সত্ত্বেও প্রসাদ তার স্বভাব দুর্বলতার জন্য প্রতিবাদ করতে বা অন্যত্র চলে যেতে পারে না। এই চরম সংকটময় অবস্থায় বিশ্বম্ভরবাবু বোন ফুলি প্রসাদকে সাহস জুগিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালের মানুষের আর্থিক সংকট যে মানুষকে কতটা দুর্বল করে দিতে পারে তার নমুনা মানিক দেখালেন প্রসাদ চরিত্রে। এর পাশাপাশি ফুলি, যে কিনা নিজে একজন শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সক্ষম নয়, সে প্রসাদের মত শারীরিকভাবে সক্ষম মানুষকে প্রতিবাদের পথ দেখাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর নারীর আত্ম-স্বাতন্ত্র্যবোধের ঘোষণা করেছে ফুলি।

এক বিরাট রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মহাকাব্যের আধারে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' খোঁড়া চখুরী রামিয়ার বাবা এবং ফুলঝরিয়া সমাজ শাসন ব্যবস্থার দলিত সমাজের রীতিনীতি, কুসংস্কারাচ্ছন্নতার প্রতিনিধি। মহাকাব্যে যেমন ছোট বড় বহু চরিত্র-ঘটনা থাকে, তেমনি এই তিন পঙ্গু চরিত্র মহাকাব্যের প্রেক্ষাপট গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

এই অধ্যায়ে আরেকটি ছোট চরিত্রের আলোচনা রয়েছে-নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'অভিনেত্রী' (১৯৫০) গল্পের শিশুচরিত্র বিন্তু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী শহর কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবন বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে বিন্তু চরিত্র উপস্থাপনায়। বাস্তবতা এবং অভিনয়শিল্প এই দুই দ্বারা বাস্তব জীবনকে অনুভব করেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র- বিন্তু এবং তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তারই চরিত্র, অঙ্গস্বরূপ।

বিংশশতাব্দীর মধ্যলগ্নে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্পটি ভিন্নমাত্রার সংযোজক। চন্দ্র চৌধুরী বয়সজনিত কারণে পঙ্গু। বয়সজনিত কারণে পঙ্গুত্ব প্রতিবন্ধকতার অভিসন্দর্ভে এই কারণেই আলোচ্য, যে সমস্ত বয়স্ক মানুষদের সাহিত্য-অঙ্গনে পঙ্গু করে দেখানো হয়নি। চন্দ্র চৌধুরীকে পঙ্গু করে দেখানোর পিছনে আসলে লেখকের কোন মনস্তত্ত্ব কাজ করছে সেটাই আলোচ্য। 'সৈনিক' গল্পটি মূলত: মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর সম্পর্কের আখ্যান। বাংলাসাহিত্যে পশুকেন্দ্রিক সাহিত্যগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ', প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', রাজশেখর বসুর 'লম্বকর্ণ', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়', 'নারী ও নাগিনী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুধীর বাড়ি ফেরা', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'কুইন অ্যান', বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'গণেশ জননী', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লাল ঘোড়া', রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া', প্রফুল্ল রায়ের 'বাঘ', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঘিনী', প্রমথনাথ বিশীর 'নীলমণির স্বর্গলাভ', নারায়ণ সান্যালের 'গজমুক্তা' এবং আরোও অনেক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্পে চন্দ্র চৌধুরী এবং হাতি 'নীলবাহাদুর'-এর মধ্যে প্রভুভক্তির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। একদিকে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব এবং পাশাপাশি সনাতন ঐতিহ্যপ্রিয়তা ব্যঙ্গ করেছেন গল্পকার। বয়সজনিত কারণে প্রজন্মগত ব্যবধানে কারণে অনেকসময় বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে চন্দ্রচৌধুরীর, সেই দাপট হারিয়ে ফেলেছেন তিনি, কিন্তু তার নীলবাহাদুরের কাছে তার পুরানো আভিজাত্য তখনও বর্তমান তার।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ 'ফেরিওলা' (১৯৫৩)-এর গল্প 'লেভেল ক্রসিং'এ 'অবলা' পূর্ববর্তী 'ভয়ঙ্কর' গল্পের ফুলির উত্তরসূরী। খোঁড়া অবলার নাম অবলা হলেও সে কিন্তু মোটেই অবলা ছিল না। সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হিসাবে অবলা নিজের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিতই রেখেছে।

বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ 'লাজুকলতা' (১৯৫৪)-এর গল্প 'মীমাংসা'র নায়িকা বিভার মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তার সঙ্গে র‍্যোমান্টিকতার অপূর্ব মিশ্রণ রয়েছে। পঙ্কজ এবং বিভার মধ্যে ভালোবাসা ছিল প্রচ্ছন্ন। পঙ্কজের মনেও বিভার প্রতি এক ভালোবাসা ছিল, যা সে বলতে পারেনি যৌবনের কর্মব্যস্ততায়। বিভা-পঙ্কজের আখ্যানের উপর ছায়া ফেলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘ ও রৌদ্র', 'একরাত্রি'র মত গল্পগুলি, যেখানে কৈশোরে নায়ক-নায়িকার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যা প্রেম বা বিবাহে পরিণতি পায় না, কারণ নায়কের তখন দেশের কাজ ইত্যাদি করার জন্য বিবাহের প্রতি অনিচ্ছা। রবীন্দ্র-আখ্যানে নায়িকার অন্যত্র বিবাহ এবং পরবর্তীকালে নায়কের অনুশোচনায় কাহিনি সমাপ্ত হয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষেত্রে নায়কের না বলা কথা নায়িকাকে দিয়ে বলিয়ে নিলেন। বিভা আসলে সম্মান জানাল, পঙ্কজের কাগজের প্রতি

আত্মনিয়োগকে এবং পঙ্কজের সততাকে। বিভা পঙ্কজকে গ্রহণ করল পঙ্কজের দুর্বলতাকে নিয়েই, আর পঙ্কজও বিভাকে গ্রহণ করেছে তার দুর্বলতাকে নিয়ে। আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের কল্যাণী মূর্তি নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে হাজির বিভা। কল্লোলের সূচনা হয়েছিল রবীন্দ্র-বিরোধিতায় এবং সমাপ্তি ঘটল রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রোত্তরণে। বিভার লাঠিকে ভর করে হাঁটার মাধ্যমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে আগামীর পথে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন গড়ার কথা বললেন।

বিশ শতাব্দীর ষাটের দশক এক যন্ত্রণাময় সময়ের মধ্য দিয়ে চলছে। মানুষের নৈতিক অবমূল্যায়ণ ঘটেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশভাগ, মন্বন্তর, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন, রাজ্যে বারবার নির্বাচন এবং গদিবদল- এইসব ঘটনা সাধারণ মানুষের জীবনেও ভয়ঙ্করভাবে প্রভাব ফেলল। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সামনে চামেলি'তে (১৯৬২) এক স্কুল মাস্টারের জবানিতে দেখানো হয়েছে, দারিদ্র্যের কারণে তিনি অতিরিক্ত কিছু উপার্জনের জন্য টুইশনি করতে বাধ্য হয়েছেন, ছাত্ররা শিক্ষকের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে কথা বলছে, সেটা জেনেও মাস্টারমশাই কিছু বলতে পারছেন না, মাস্টারমশাই-এর চলার পথের রোম্যান্টিকতা অরন্তুদ সময়ে মনেই থেকে যায়। সম্পর্কহীনতা, নি:সঙ্গতা, একাকীত্ব সব মিলিয়ে মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গ এবং আত্মিক-সঙ্কট সাতাশ বছরের এই প্রতিবন্ধী ছেলেটার মধ্য দিয়ে প্রকটিত।

বিশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের উত্তাল সময় যখন নকশাল আন্দোলন তার কৃষক আন্দোলনের খোলস ছেড়ে মূর্তিভাঙার রাজনীতিতে পর্যবসিত হয়েছে, তখন বিমল করের 'জননী' গল্পের পার্শ্বচরিত্র শচীনবাবুর নাতনি খঞ্জত্বের মধ্যেই সেই উত্তাল সময়ের কথা বলছে, যখন বাড়ির মেয়েরাও বাধ্য হচ্ছে জীবিকা উপার্জনের জন্য অন্যের বাড়িতে কাজ করতে। চূড়ান্ত আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে শচীনবাবু তার পারিবারিক সম্ভ্রম বজায় রাখতে পারছেন না। মানুষের পারস্পরিক যে সুসম্পর্কের বন্ধন ছিল তাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মানুষ চাইছে অন্যকে বঞ্চিত করে নিজের ভান্ডারটা আরোও বেশি করে গড়ে তোলা। দীনেন্দ্রর পরিচালনায় তাদের মাতৃমূর্তি বিনির্মাণের একটি স্তর অবশ্যই শচীনবাবুদের পরিবার, যাদের দুরাবস্থার জ্বলজ্যান্ত প্রতীক শচীনবাবুর খঞ্জ নাতনী। শচীনবাবুদের একদা স্বচ্ছল পরিবার, যখন শচীনবাবু দীনেন্দ্রর বাবাকে টাকা ধার দেবার সক্ষমতা রাখছে, সেই শচীনবাবুদেরই বর্তমান ভগ্ন দশা সমকালীন সমাজপ্রেক্ষিতের চাপে- যার প্রতিমূর্তি শচীনবাবুর নাতনিও- এ যেন বুদ্ধকথিত সেই সুখ-দু:খের সহাবস্থানের কথাই বারবার বলছে।

হস্তসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

এই অধ্যায়ের আলোচ্য চরিত্ররা হস্তসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী। কারোর হাত বাঁকা, কারোর হাতের আঙ্গুল কাটা, আবার কারোর হাত নেই। কর্মেন্দ্রিয় হাত যাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে এমন কিছু চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছি- নির্বাচিত প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে।

মাণিকলাল (রাজসিংহ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে পরিচিত হলেও 'রাজসিংহ' উপন্যাসে মাণিকলাল কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয় - মাণিকলাল বঙ্কিমকল্পনার ফসল।'রাজসিংহ' উপন্যাসের তৃতীয় খন্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে মাণিকলালকে আমরা প্রথম পরিচয়ে পাই দস্যুরূপে।পরস্বপহরণ করেই সে জীবিকানির্বাহ করে থাকে।রাজসিংহ এই দস্যুকে দস্যুবৃত্তির শাস্তি দিতে গেলে নিজেই নিজের দন্ডবিধান করল মাণিকলাল। নিজের ডানহাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে ফেলল।প্রথমে ছুরি দিয়ে কাটার চেষ্টা করল।তাতে মাংস কাটা গেলেও হাড় কাটা যায়না।তখন মাণিকলাল পাথরের সাহায্যে সম্পূর্ণ আঙুলটিই ছেদন করেছিল। মূলকাহিনি বা উপকাহিনি কোনোটির নায়ক নয় মাণিকলাল।তবুও চরিত্রটি তার বহুমাত্রিকতায় খুবই দৃষ্টিগ্রাহী।

চঞ্চলকুমারীর গুরুদেব অনন্ত মিশ্রকে মাণিকলাল ও তার দলবল বণিকবেশে আক্রমণ করেছিল।রাজসিংহ পর্বতের উপরে থেকে সব দেখে অত্যন্ত চতুরতার সাথে ক্ষিপ্রভাবে সেই বণিকবেশী চারদস্যুর মোকাবিলা করে। তিনজন রাজসিংহের হাতে পরাজিত হলেও চতুর্থ মাণিকলাল উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছিল। মাণিকলাল ভীরু কাপুরুষ নয়। সে পালিয়ে যায়নি।এর পর সন্ধান করে উদ্ধার করে বনের মধ্যে রাজসিংহের লুকিয়ে রাখা বর্শাটি।আত্মরক্ষার উপায় ছিল না বলে পালিয়ে এসেছিল মাণিকলাল।তারপর ঠিকই সে প্রতি-আক্রমণ করেছে আক্রমণকারীকে। সুতরাং সে পলায়নবাদী নয়।

কিন্তু যাকে মাণিকলাল আক্রমণ করল সে তো মাণিকলালের থেকেও দক্ষ।তাই অচিরেই মাণিকলালের হাতের উদ্যত বর্শা লক্ষ্য রাজসিংহের খালি পিস্তলের টিপ আক্রমণে ভূপতিত হল। পরাস্ত মাণিকলালকে চুলের মুঠি ধরে এরপর রাজসিংহ মুন্ডচ্ছেদনে উদ্যত হলে দস্যু মাণিকলাল রাজসিংহের শরণাগত হয়।কারণ তার বাড়িতে আছে সাতবছরের মাতৃহীনকন্যা। মাণিকলাল শুধু

নিজের জীবনযাপন করে না মাত্র - একমাত্র সন্তানের সমস্ত দায়ভারও তার।এখানে মাণিকলালের চরিত্রে দস্যুবৃত্তিকে ছাপিয়েও বড় হয়ে উঠেছে চরিত্রের এক কোমল দিক - অপত্যস্নেহ।

এরপর দস্যু মাণিকলাল রাজসিংহের চরণ স্পর্শ করে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এ হল মাণিকলালের নতুন জীবনারম্ভ।দস্যু রত্নাকরকেও একদিন দেবতাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেখানে দস্যু রত্নাকর বুঝেছিল পরিবারকে প্রতিপালন করা মানুষের দায়িত্ব - কর্তব্য। সে কিভাবে প্রতিপালন করবে তার দায়ভার পরিবারের সদস্যদের নয়। কিন্তু কোনো মানুষ যদি কোনোভাবে পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম হন তাহলেও সেটা তারই দায়।এখানে দস্যু মাণিকলালও নিজসন্তান প্রতিপালনের জন্য দস্যুবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল কিন্তু তার দায়স্বরূপ মাতৃহীনা সন্তানকে পিতৃহীনা করে অনাথিনী করে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করেনি। এক সাতবছরের কন্যার পক্ষে একা নিজের জীবনধারণ করা সম্ভবপর নয়। তাই সেই বালিকার জন্যই দস্যু মাণিকলালের রূপান্তর ঘটল।

সুস্থ জীবনযাপনের শপথ নিল মাণিকলাল । রাজসিংহের শরণাগত সে । রাজসিংহকে সে গুরু মেনেছে তার সৎজীবনপথে । সে অঙ্গীকার করেছে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে রাজসিংহের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার । তার এই নতুন জীবনপথে সে একলব্যের মতই গুরুদক্ষিণা দিয়েছিল তার গুরুকে তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি। এ মাণিকলালের কাছে তার পূর্বকৃতপাপের দন্ডবিধান ।এরপর মাণিকলাল রাজসিংহের সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উদয়পুরে বসবাস করতে যায়। কিন্তু কন্যার প্রতি কর্তব্য সে ভুলে যায়নি।

উদয়পুরে যাত্রার পূর্বে মাণিকলাল তার এক সম্পর্কিত পিসির কাছে দু'মাসের জন্য মেয়েকে রেখে যায় এবং ব্যয়নির্বাহের জন্য একটি আসরফিও দিয়ে আসে। শুধু টাকা দিয়েই মেয়ের প্রতি পিতার দায়িত্ব পালন হয় না। কিন্তু নতুন স্থানে যুদ্ধক্ষেত্রে কন্যাকে কার ভরসায় রেখে যেত মাণিকলাল। যে অনিশ্চিত জীবনাবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে মাণিকলাল সেই স্থান মোটেই সুগম নয় সাত বছরের বালিকার জন্য। যদিও বঙ্কিমের কোনো কোনো লেখাতে সাতবছরের বালিকাও যথেষ্ট matured। কিন্তু এখানে মাণিকলালের পিতৃস্নেহধারার আভধারায় কন্যাটি আত্মীয়ার আশ্রয়েই রইল। কর্তব্যপরায়ণ মাণিকলাল চরিত্র আরও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হল।

রণকৌশল সম্পর্কেও যে মাণিকলাল একেবারেই অজ্ঞ নয় তার পরিচয়ও দিয়েছে রূপনগরে মাণিকলালের উপস্থিতি। মোগল অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে ছদ্মবেশে চঞ্চলকুমারীর শিবিকার সঙ্গে থেকে তার রক্ষা করেছে মাণিকলাল যথার্থ রাজপুতের মতই। যথার্থ পুরুষের মতই সে যেমন কন্যার প্রতি দায়িত্বশীল তেমনি যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করে নির্মলকুমারীকে যথাযথ সম্মানও দিয়েছে।

সর্পদংশনে মৃত মবারকের প্রতি চিকিৎসাব্যবস্থায় মাণিকলালের প্রাথমিক চিকিৎসা জ্ঞানের পরিচয় রয়েছে।

মাণিকলালের কর্তিত আঙ্গুল অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে পরবর্তীকালে কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়েছে । রাজসিংহ লিখিত পত্রটি ঔরঙ্গজীবের কাছে পৌঁছে দেবার দৌত্যক্রিয়ার ভার মাণিকলাল নিজেই চেয়ে নিয়েছে । পত্রটি ছিল তীব্রঘাতী । আর ঔরঙ্গজীবের কাছে দূতও অবধ্য ছিলনা । তাই মাণিকলালের প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা ছিল যথেষ্টই । এই বিপজ্জনক কাজটির ভার নেয় মাণিকলাল ।

মানুষের দুর্বলতা যখন মানুষের শক্তি হয়ে দাঁড়ায় তখন বিশ্বজয় থেকে তাকে আর আটকানো যায় না। তার প্রমাণ মাণিকলাল। মানুষের জীবনে অনেক বাধা আসে। তাকে জীবনীশক্তি দিয়ে পেরিয়ে যাবার নামই তো জীবন। মাণিকলাল এই জীবনের দৃষ্টান্ত । আধুনিককালে মানুষ অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যাচ্ছে নিজ বুদ্ধি বলে এবং সর্বোপরি জীবনী শক্তিতে । নকল আঙ্গুলের ধারণাটি সেই উৎসাহেরই একটি দিক বিশেষ।

তবে মাণিকলাল শুধুমাত্র যে নিজের জীবনের প্রতি সচেতন তাই নয় মাণিকলাল তার পারিপার্শ্বিক মানুষগুলোর প্রতিও যথেষ্ট সংবেদনশীল। মাণিকলাল রাজসিংহের কাছে পরাস্ত হয়ে জীবনভিক্ষা করে নিজেকে দন্ড দিয়ে নিজের জীবন নতুন করে শুরু করল। কিন্তু সেই পথে যেতে গিয়ে ভুলে গেল না তার এতদিনকার সহকর্মীদের যারা রাজসিংহের হাতে পরাস্ত হয়েছিল। মাণিকলাল জঙ্গল এবং গুহায় গিয়ে তাদের খোঁজখবর নেয় এবং যথাবিধি সৎকারের ব্যবস্থা করেছিল। হোক তারা দস্যু! তবু তো তারা মানুষ। তাই মৃতদেহকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছিল মাণিকলাল। আর যতই তা দস্যুবৃত্তি হোক না কেন এই মাধ্যমেই তো এতদিন মাণিকলাল তার নিজের এবং কন্যার জীবন প্রতিপালন করে এসেছে। সেই ঋণও ভোলেনি মাণিকলাল। ভুলে যায়নি অনন্ত মিশ্রের কথাও। তাকেও উদ্ধার করে মুক্ত করতে গিয়েছিল মাণিকলাল।

কাটা আঙ্গুল-এর জায়গায় হাতির দাঁতের নকল আঙ্গুল তৈরি- মাণিকলালের কুটনৈতিক জ্ঞানের পরিচায়কও বটে। তার এখন কুটনীতি সম্পর্কিত জ্ঞানের আরেক পরিচয় পাই জঠরাগ্নির সময় শত্রুসেনার সাথে সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাবে। তবে নকল আঙ্গুল তৈরির পদ্ধতিটি আধুনিকতম চিকিৎসা পদ্ধতির কথাও স্মরণ করায়।

ভিখু ডাকাত (প্রাগৈতিহাসিক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভিখু ডাকাত। ডাকাতি করাই তার পেশা ছিল। একবার বসন্তপুরে বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করার সময় তারা ধরা পড়ে যায়। তখন ভিখু ডাকাত পালিয়ে আসতে সক্ষম তো হয়েছিল, কিন্তু কাঁধে একটা আঘাত ছিল- বর্শার খোঁচার। পালিয়ে এসে সে আশ্রয় নিয়েছিল চিতলপুরে তার পরিচিত পেহ্লাদ বাগদীর বাড়িতে। কিন্তু পুলিশের ভয়ে পেহ্লাদ তাকে নিজের ঘরে আশ্রয় দেয়নি। তার বাড়ি থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী এক জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালে মাচা তৈরি করে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল পেহ্লাদ ভিখুকে। খাবারটা তো ঠিকঠাক দিয়েই আসত পেহ্লাদ ভিখুকে। কিন্তু ভিখুর কাঁধে থাকা সেই ক্ষত নিরাময়-চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা হল না। উল্টে ঘন বনমধ্যে পোকামাকড়, জোঁকের উৎপাত ঘা আরও বিষাক্ত হয়ে পড়ে। এবং যার ফলশ্রুতিতে ভিখুর এই হাতটা নষ্ট হয়ে যায়। ঘন বনে থাকাকালীন কয়েকদিন পেহ্লাদ না আসার পর শেষে একদিন দেখে ভিখু জঙ্গলে মাচার উপর অর্ধন্যুত অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। তখন পেহ্লাদ তার ভগ্নীপতি ভরতের সাহায্যে ভিখুকে নিজের বাড়ি নিয়ে এসে সেবা শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলে। কিন্তু এখানেই পেহ্লাদের অবর্তমানে তার স্ত্রীর প্রতি লোভের প্রকাশে ভিখু প্রচন্ড মার খেয়ে সেই আশ্রয় থেকে বিতাড়িত হল।

শুরু হল ভিখুর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। এবার আবার নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের কর্মবৃত্তে প্রবেশ করার পালা। এতদিন তো ভিখু ডাকাতি করত। কিন্তু এখন তো আর তার শরীরে সে শক্তি নেই। তার একটা হাতও নষ্ট হয়ে গেছে। তাই সে বাধ্য হল ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণে। এ এক নতুন জীবন। আগে লোকের কাছ থেকে বলপ্রয়োগ করে ছিনিয়ে নিত যে হাত আজ সেই হাত দুর্বল হয়ে পরের অনুগ্রহ দান প্রার্থনা করছে। যাই হোক, এবার ভিক্ষান্নে তার জীবনে মোটামুটি স্থিতিশীলতা এল। রোজগার পাতি মন্দ হয় না। স্বাস্থ্য ফিরল ভিখুর। নদীর পাশে থাকা বিন্নু মাঝির বাড়ির পার্শ্ববর্তী ভাঙা চালাঘরটা মাসিক আট টাকায় ভাড়া নেয় ভিখু। ঘর তো হল! কিন্তু এবার ঘরণী! নারীসঙ্গহীন জীবন বড়ই একঘেঁয়ে লাগতে থাকে ভিখুর কাছে। তার উপর পাশেই দেখছে বিন্নু মাঝির সচ্ছল দাম্পত্য জীবন। জীবনধারণের প্রাথমিক চাহিদা খাদ্য-বস্ত্র- বাসস্থান এর পূরণ-এর সাথে সাথে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে আদিম রিপু-কাম।

ভিখুর এই অস্থির জীবনচর্যাতেই এল পাঁচী। পাঁচীও ভিক্ষা করে। পাঁচীর পায়ে দগ্‌দগে ঘা। এই পাঁচীর সাহচর্য কামনা করে ভিখু। পাঁচীর পা এর ঘা সারিয়ে নেবার কথা বলে। কিন্তু কি আশ্চর্য! পাঁচী ঘা সারিয়ে সুস্থ হতে চায় না। কারণ পাঁচীর জীবিকানির্বাহের মূলধনই তার শারীরিক অসুস্থতা।

প্রাক্-ভিক্ষুক জীবনপর্বে পেহ্লাদের স্ত্রী, ভিক্ষুক জীবনবৃত্তান্তে বিন্নু মাঝি ও তার স্ত্রী-এর সুখী দাম্পত্য ভিখু ডাকাতের মনে আদিম প্রবৃত্তি তীব্রভাবে জাগিয়ে তোলে। এই প্রেক্ষিতে আসে পাঁচী। পাঁচীর পা-এর দগ্‌দগে ঘা। কিন্তু তবুও নারী-সংসর্গ। কিন্তু একসময় এই পাঁচীও ভিখুকে সঙ্গ না দিয়ে অপর আরেক ভিক্ষুক বসির মিঞার সঙ্গিনী হয়ে কাটায়। প্রবল যৌন-আর্তিতে ভিখু বসির মিঞার সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়ায় লিপ্ত হত। অবশেষে একদিন প্রবল রিরংসায় ভিখু বসিরকে মাথায় মুখে লোহার শিক বিদ্ধ করে হত্যা করল। আশ্চর্য বসির মিঞার পাশে শুয়ে থাকা পাঁচীর ঘুম ভেঙে যাবার পর পাঁচী আর ভিখু বসির মিঞার ভিক্ষালব্ধ সঞ্চিত টাকাপয়সা জিনিসপত্র যা কিছু ছিল সমস্ত পুঁটলি বেঁধে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল নতুন জীবন নতুন সংসার গড়ার বাসনায়। উল্লেখ্য পাঁচীর পায়ে ঘা থাকায় পাঁচীর চলতে কষ্ট হয় তাই ভিখু তাকে কাঁধে নিয়ে চলে।

আদিম প্রবৃত্তির তাড়না। সভ্যসমাজ বহির্ভূত রীতিনীতি। ভিখুর ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ার পর বর্শার খোঁচা খেয়ে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে জীবনযাপন করা থেকেই প্রাগৈতিহাসিকতার সূচনা। তারপর আশ্রয়দাতা জীবনদাতার ঋণ বিস্মৃত হয়ে তারই অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী-এর প্রতি কামদৃষ্টি সবই আদিম জান্তব-প্রবৃত্তির অনুসারী। এরপর এই ক্ষুধার নিবারণের বদলে আরও জাগিয়ে তুলল প্রতিবেশী মাঝি-দম্পতির সচ্ছল দাম্পত্য। সামনে রয়েছে পাঁচী। কিন্তু সেও বসির মিঞার সঙ্গ করল। আর আটকে রাখা গেল না ভিখুকে। প্রবল আদিমক্ষুধায় প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতায় বসিরকে হত্যা করে বলপ্রয়োগ করে নিজের কামনার ধন পাঁচীকে কাঁধে নিয়ে চলল ভিখু।

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে

''শেষ হইয়াও হইল না শেষ''

এক আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় ভিখু ডাকাত পাঁচীকে কাঁধে তুলে নিল। এক সময়ের দোর্দন্ডপ্রতাপ ডাকাত ভিখুর শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। দলের সবাই ধরা পড়লেও ভিখু পালিয়ে আসতে সফল হয়েছিল। সেই ভিখু পাঁচীকে কাঁধে নিয়ে চলেছে- তা তার কাছে মোটেই খুব একটা কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু ভিখুর কাঁধের চোট! সেই চোট কতটা সাথ দেবে ভিখুকে? মনে পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তারিণী মাঝির কথা। সেও জীবনরক্ষায় আরেক প্রবৃত্তির দাপট। তারিণীর জীবনের সমস্ত কিছু তার স্ত্রী সুখীকে পিঠে নিয়ে চলতে চলতে সর্বাঙ্গ সক্ষম সুঠাম প্রচন্ড শক্তিধর দক্ষ মাঝি তারিণীও একসময় জীবনরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল।

ভিখু চরিত্রের একমুখীনতা তাকে সভ্যসমাজ বহির্ভূত স্বভাববৈশিষ্ট্যে তাৎপর্যবাহী করে তুলেছে। এখানেই ভিখু স্বতন্ত্র। আধুনিক মানুষ হতে পারে অনেক সভ্য-মার্জিত- কিন্তু সবই আরোপিত। কৃত্রিমতার আড়ালে আধুনিক মানবসমাজের সারল্য হারিয়ে গেছে। ভিখুর মধ্যে রয়ে গেছে জীবনাবেগ। তার আচরণে মানবের সারল্য-অকৃত্রিমতা ফুটে উঠেছে। ভিখু আবেগ-চাহিদা-কামনাকে আড়াল করতে জানে না। তাই সে তার অধিকার ছিনিয়ে নিতে চায়। তাই ভিখুর যথার্থ জীবন সঙ্গিনী হয়েছে পাঁচী। তার জীবনে আচরণেও কোনো কপটতা নেই।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে আদিম জীবন-স্বভাব। আদিম জীবনাকর্ষণও মানুষের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত। কিন্তু মানুষ তাকে সততই গোপন করতে চায়। সেটা সহজ সরল সুন্দর -তার স্বাভাবিকতাকে অবরুদ্ধ অবদমিত করতে চাওয়াতেই এত জটিলতা।

প্রকৃত অর্থেই ভিখু ডাকাত ভিক্ষুক। জীবন ভিক্ষুক সে। জীবনের সমস্ত রূপ রস স্বাদ গন্ধ ডাকাতি করে, বলপ্রয়োগ করে, ছিনিয়ে নিয়ে আকণ্ঠ আত্মস্থ করতে চায় সে। সভ্য-অসভ্য জীবনের ঊর্দ্ধে সমস্ত মানব আত্মার মূর্ত প্রতীক-প্রাগৈতিহাসিক archetype ভিখু ডাকাত।জৈবিক প্রবৃত্তিতে জলজ্যান্ত জীবন্ত চরিত্র ভিখু। কখনোই তাকে মানসিকভাবে হেরে যেতে দেখা যায় না। পক্ষাঘাতের একমাসের মধ্যেই দুর্বল শরীরেও আশ্রয়দাতা পেল্লাদের স্ত্রীর প্রতি যৌনক্ষুধা মেটানোর প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আগুন ধরিয়ে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করে। কেউ ভিক্ষা না দিয়ে চলে গেলে তাকে টিটকারি দিয়ে মনের জ্বালা মেটায় ভিখু। অবশেষে পাঁচীকে বিয়ে করার জন্য পথের কাঁটা বসিরকে খুন করে মনে মনে নিজের সক্ষমতা নিয়ে ভারি গৌরবান্বিত থাকে ভিখু। মানুষের মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকা আদিম প্রবৃত্তিগুলির সবকটি এত সুন্দরভাবে একটি মাত্র চরিত্রে ফুটিয়ে তোলায় ভিখু চরিত্রটি স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে।

সুচারু (দেওয়াল : বিমল কর)

উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি দুই অবস্থাতেই সুচারু চরিত্রটি বিমল করের 'দেওয়াল' উপন্যাসের তিনটি খন্ড জুড়েই রয়েছে। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে টালমাটাল মানুষজনদের প্রতিনিধি সুধা বাবা মারা যাবার পর যে অফিসে চাকরি শুরু করে সেই অফিসেই সুধার সহকর্মী সুচারু। সুচারুর বাবা-মা দুজনেই মারা গেছেন। যুদ্ধের সময় সুচারু যুদ্ধে গেছে সুধাকে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সুচারুর অবর্তমানেও সুধার চিন্তায়-চিন্তাহীনতায় বিভিন্নভাবে সুচারু জীবন্ত জাগ্রতভাবে বর্তমান ছিল। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্ররাও বারবার ঘুরে ফিরে বলেছে সুচারুর কথা। উপন্যাসের শেষদিকে বিপন্ন সময়ে যখন মা-সন্তান, ভাই-বোনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি অমর্যাদা বিশ্বাসহীনতা প্রকট

হয়ে উঠেছে তখন সুচারু যুদ্ধেক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছে সুধার পাশে। একটু বদল হয়েছে কেবল সুচারুর চেহারায়। আরতি সুচারুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার পর,

''.....হঠাৎ আরতির চোখে পড়ল, সুচারুর ডানহাতের জামাটা কেমন বুকের তলা থেকে কোলের কাছে চুপসে পড়ে আছে। কোটের ফাঁক থেকে বুক এবং কোল দেখা যাচ্ছিল। ..... জামার তলায় হাত না থাকলে জামার হাতা যেমন দেখায় অবিকল সেইরকম দেখাচ্ছে।''[১০২]

আসলে,

''যুদ্ধে গিয়ে লোকটার ডান হাত কাটা গেছে। খুব জখম হয়েছিল, মরতে মরতে কপাল জোরে বেঁচে গেছে।''[১০৩]

কিন্তু তবুও প্রবলভাবে জীবনরসে রসিকতার চেষ্টায় সুচারু বলেছে,-

''সব জিনিস নিয়ে পথে ঘাটে বেরোতে নেই, একটা রেখে এসেছি।''[১০৪]

বেশ মজার মানুষ মনে হলেও সুচারুর মধ্যে কোথাও একটা প্রবলভাবে বিষন্নতার সুর ধ্বনিত হয়েছে সবসময়। পিতামাতার মৃত্যু এবং তার পিছুটানহীন জীবনই যেন তাকে যুদ্ধকে প্রত্যক্ষভাবে দেখায় অনুপ্রাণিত করেছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে ফিরে এসেছে, তার সুধার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সুধার পরিবারের একজনের মত হয়ে উঠেছে, কিন্তু তবুও, তার ডানহাতটা যুদ্ধে খোয়া যাবার হীনন্মন্যতায় সুধাকে বিয়ে করার কথা বলতে পারেনি। অদ্ভুত এক মানসিক দ্বন্দ্ব-দ্বিধা কাজ করেছে সুচারুর মধ্যে।

সুচারু যুদ্ধে গেছিল, কারণ তার মনে হয়েছিল,-

''যুদ্ধের বীভৎসতা, রিক্ততা আর নি:স্বতার মধ্যে কোথাও নিশ্চয় জীবনের সেই ছবি আছে।''[১০৫]

যুদ্ধ প্রসঙ্গ কথায় সুধার কাছে সুচারু বলেছিল,-

''আমায় একটা মিল খুঁজে বের করতে হবে, এই অমিলের মধ্যে।'একটু থেমে ভাবালু সুরে বিড়বিড়

করল :when much blood had clogged their chariot-wheels I would go up and wash them from sweet wells.....''[১০৬]

এই প্রসঙ্গে সুচারু কবিতার সেই সৈনিকের ছবিও তুলে ধরেছিল,-

''এক সৈনিক জঙ্গলের মধ্যে তার শত্রুকে নাগালে পেয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারল। মারার পর তার জামার পকেট হাতড়াচ্ছিল- যদি কিছু পকেটে পোরার মত পাওয়া যায় ভেবে। হাতড়ে

পাওয়া গেল, ক'টা আধ পোড়া সিগারেট, একটা ছুরি আর চেনে ঝুলানো লকেট করে বাঁধানো একটা ছবি। ছোট্ট ছেলের ছবি, হাসিখুশী মুখ। ছবিটা এর ছেলের- যে সরল। আর যে মারল সেই সোলজারটা অনেকক্ষণ বাচ্চার ছবিটা দেখে দেখে শেষে কি বললে জান? বললে- oh son! my son will share your fate and all our sons! ''[১০৭]

যে সুচারুর মধ্যে এই জীবনদর্শন রয়েছে, সে নিজের জীবনের যুদ্ধে এসে পরাজিত সৈনিক হয়ে পড়েছিল। চিরপরোপকারী সুচারু, সুধার পাশে চরম বিপদের সময়ও বন্ধুর মতই ছিল, কিন্তু জীবনসাথী হবার কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি। উপন্যাসের প্রথম খন্ডে সুচারুর উদার জীবনদর্শনের জন্য সুধার মত অন্তর্মুখী মেয়ে বহির্জগতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালাতে সাহস পেয়েছিল। উপন্যাসের একেবারে শেষে এসে যখন সুধাদের পারিবারিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে, সুধা নিজেই প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তখন সেই দুর্বল সুধাই সুচারুর জন্য নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পেরেছে। চিরদিন চুপ করে থাকা সুধা সুচারুকে বলতে পেরেছে,-

''আমাদের এই সময়টাই বোধ হয় এইরকম। সবাই ভাঙা, সকলেরই সমান অবস্থা, টুকরো-টাকরা হয়ে আমরা আছি, নিটোল পুতুল কেউ নই। হয়ত তাই দুই অন্ধ দুই খোঁড়া মিলে থাকতে হবে আমাদের।''[১০৮]

সুধার এই উত্তরণ সম্ভব হয়েছে সুচারুর জন্যই। লেখকের ভাষায়,-

''আজকের ক্ষয়িত, অক্ষম, আংশিক, এই অপূর্ণ মানুষের দিকে সুচারু যেন তাকিয়ে থাকল। সুধাকে সেখানে দেখা যায়। সুচারুকেও। ভাঙা মূর্তির মতন পাশাপাশি রাখা হয়েছে।''[১০৯]

মদনের মাসি (শিল্পী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' মদন তাঁতির প্রতিবাদী ও ঐতিহ্যবহনকারী শিল্পসত্তার সংগ্রামের রূপচিত্র। মদন তাঁতির দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসারে বয়স্কা মা, ন' মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এবং দু'বছরের পুত্র সন্তানের সঙ্গে থাকে নিজের চার বছরের কন্যাকে নিয়ে মদনের মাসি। মাসির শারীরিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। মাসির চেহারা রোগা প্যাকাটির মত। তার উপর এক হাত আবার নুলো।

ইংরাজী ১৯৪৬ সালের প্রেক্ষাপটে বৈপ্লবিক চেতনা, ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন, মানবজাতির সমষ্টিগত আভ্যুত্থানিক প্রতিবাদী মানসিকতা এবং সর্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মানবতাবাদের বাতাবরণে মার্ক্সবাদী কথাশিল্পী মানিক তৎকালীন ভারতবর্ষে শিল্পীসত্তার অবমূল্যায়ণ এবং কঠোর সংগ্রামী চিত্র দেখালেন। মদনের নিজের ঘরে খাবার নেই। অথচ খাদকের অভাব নেই। স্ত্রী সন্তান সঙ্গে বৃদ্ধা

মায়ের দায়িত্ব মদনের কাঁধে। অথচ ঘৃণ্য রাজনীতির শিকার হওয়ায় স্বার্থিক দলাদলিতে কর্মঠ-কুশলী শিল্পী মদন তাঁতি বেকার। এই পরিস্থিতিতেও রয়েছে কিছু আত্মীয়-পরিজনের দায়িত্বভার। আত্মীয়স্বজন নিয়ে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সনাতন বাঙালিয়ানার চিত্রবাহী মদনের মাসি।

কলকাটা (হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে রতন কাহারের বাবার কারখানায় কাজ করতে গিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বাদে বাকি চারটি আঙ্গুলই কেটে যায়। তাই রতনের বাবা 'কলকাটা' নামে পরিচিত ছিল কাহার সমাজে। ঘটনাটি দুঃখজনক তো বটেই রতনের বাবার পক্ষে এই অঙ্গুলীহীনতা শারীরিক কষ্টেরও কারণ বটে।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' কোপাই নদী তীরবর্তী বাঁশবাদী অঞ্চলের নিজস্ব কাহিনি। অঞ্চলটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত চরিত্র, কাহিনি, ঘটনা, ভাষা সমস্ত কিছুর সঙ্গে। আঞ্চলিকতা এ উপন্যাসের চালিকাশক্তি। সব অঞ্চলেরই রয়েছে এক নিজস্ব ভাষা-কথনশৈলী। অঞ্চল-সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা এ ভাষা বৈশিষ্ট্য অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন চরিত্রকে বিভিন্ন নামে নামাঙ্কিত করে। চরিত্রগুলি বিশেষ সংস্কার বা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বা তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিশেষ ঘটনা দ্বারা জনসমাজে চিহ্নিত হয়ে থাকেন। তারাশঙ্করের সেই folk-naming- এর অন্তর্ভুক্ত চরিত্রগুলির স্মারক কলকাটা।

একলব্যের গুরুদক্ষিণা দিতে গিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটিই বাদ পড়ে। আর এক্ষেত্রে রতন কাহারের বাবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি রয়ে যায়। এই চরিত্রটির ট্র্যাজেডির মধ্যেও রয়েছে আশেপাশের লোকজনদের রঙ্গরসিকতা। রতনের বাবার এই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি থাকায় রসিক তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছে-

'লবডঙ্কা দেখাতে বেঁচে'[১১০]

কলকাটা চরিত্রটি তারাশঙ্করের উপন্যাসের কায়াগঠনে ভাষা-শৈলী ও বিশিষ্ট আঞ্চলিকতার ঘনিষ্ঠ জ্ঞান এবং মানুষজনেদের দুঃখের মধ্যে জীবনের রসদ একটু হাসির খোরাক খুঁজে নেবার পরিচয় বহন করে, যেকোনো প্রতিবন্ধী চরিত্রই তার শারীরিক ক্লেশ-এর থেকেও যে বেশী সমাজ দ্বারা মানসিক আঘাত পায়, অঙ্গহীনতা সমাজের কাছে হাসির পাত্র করে তোলে চরিত্রগুলিকে এখানে তার প্রমাণ রয়েছে।

নিত্যচরণ (জটায়ু : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

পৌষ মাসের অমাবস্যায় কালীপূজাতে নিত্যচরণ মালসা নিয়ে নাচ করে। নিত্যচরণদের বংশেও নাচ ছিল। সারাবছর নিত্যচরণ এক অসম্ভব কষ্ট আর ভয় বুকে চেপে দিন কাটায়। স্ত্রী দুর্গার রোজগারেই তাদের জীবন যাপিত হয়। এপারে এসে স্টেশনে থাকাকালীন নিগৃহীতা দুর্গার সঙ্গে নিত্যচরণের বিয়ে হয়েছিল। বাবা-মাকে হারিয়ে দুর্গার স্মৃতিতে যখন পুরানো অতীতের দগ্‌দগে

দু:খ তখন তাকে সান্ত্বনা জানায় নিত্যচরণ। সুখে দু:খে দিন কাটছিল। হঠাৎই এক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে দুহাত হারায় নিত্যচরণ-

''পেটে, বুকে, পিঠে দু-তিনটি সুপুরির পঁটুলি বাঁধা ছিল! ঐ ব্রিজের কাছেই নাকি সিগনাল পেল মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে সার্চ হবে! সমস্ত মাল চালু গাড়ির কামরার তলায় বেঁধে বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছিল। থর থর করে খোয়াইগুলো কাঁপছিল। গাড়ির চাকা, নাট, বল্টু ঝনঝন ঝনঝন বাজছিল। আর হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ নাকি নিত্যচরণ পিছলে গেল। লাইনের ফাঁকে পড়েছিল, তাই মরল না। ভয়ে কিংবা জেদে দুহাতে গাড়িটা টেনে থামাতে চেয়েছিল। লোহার চাকা একটা কব্জি আর একটি ডানা কামড়ে ছিঁড়ে নিল।''[১১১]

যে হাত দুর্গার মাথায় হাত বুলিয়ে দিত, যে হাত আঁকড়ে ধরে দুর্গা ভয়ে ভরসা পেত, যে হাত দিয়ে দু:খের সময় নিত্যচরণ বুক চাপড়াতো সেই হাত যন্ত্রণার গহ্বরে বলি হল।

বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা-পরবর্তী ছয়-সাতের দশকের নিষ্ঠুর সময়ে সর্বদা কিছু না কিছু ভেঙেই চলেছে। খন্ডিতস্বাধীনতা, দেশভাগের কষ্ট, উদ্বাস্তুর যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে জীবনকে ঠেলে দিচ্ছে অনিশ্চয়তার পথে। নশ্বর জীবনের স্বল্প লালনের সুখস্বপ্ন ভেঙে চুরমার হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। ভেঙে যাচ্ছে পুরাতন মূল্যবোধ, সংস্কার, বিশ্বাস, ভালোবাসা সবকিছু। চোখের সামনে ভালোবাসার মানুষগুলি কেমন যেন দূরে সরে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে, চিরতরে হারিয়ে যাচ্ছে। ছদ্মবেশের আড়ালে মুখ ঢাকছে আশপাশ-পরিবার ও পরিস্থিতি। এই ধ্বস্ত সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছে নিত্যচরণ। তাই স্ত্রীর-রোজগারে বেঁচে থাকা নিত্যচরণ দুর্গার কাছে জানতে চায়,-

''বউ, এত রাইত্ অব্দি তুই কী করস্? বউ, তুই পান খাইয়া আস্ছস ক্যান্? বউ, তুই নয়া নয়া শাড়ি পাস্ ক্যামতে? বউ, আমি তরে ছাড়া কিছু জানি না।''[১১২]

নিত্যর চেনা বউ যেন প্রতিমুহূর্তে অচেনা হয়ে উঠতে লাগল জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য।

অস্তিত্ব অনস্তিত্বের সংকটে সংশয়গ্রস্ত নিত্যচরণ বিপন্নভাবে নিজেকে হাতড়েছে বারবার। কিন্তু এই অস্থির সময় তাড়া করে বেরিয়েছে প্রতিমুহূর্তে নিত্যচরণদের। পূজায় নাচার সুযোগ পেয়ে এই দুই-হাত-কাটা যাওয়া অসহায় নিত্যচরণ নিজেকে সবটুকু উজাড় করে দিচ্ছে।

''পরনে আঁটোসাঁটো জাঙ্গিয়া ছিল। উদোম শরীরটা পিছলে চকচক করছে। জলের ওপর তেলের মতোই এক টুকরো ময়লা কাপড় নেত্যর কোমর কামড়ে ভাসছে।

নেত্য আজ সেজেছে। সাবান ঘসে ঘসে মাথার চুল ফাঁপিয়াছে। কপালে সিঁদুর দিয়ে ফোঁটা কেটেছে। গলায়, বাহুতে টকটকে পাকা জামের তুল্য ডব্কা পুঁতির মালা। চিকন, চিরোল পাতার দেমাকে বুকখানি টালমাটাল। উরু আর পায়েও বেশ পুরুষালি লোম আছে। তাবৎ শরীর জুড়ে

পেশী, শিরা ফুলে পাকিয়ে সে এক কান্ড। নেত্যর চোখে ঘোর লেগেছে। গোঁয়ারের মতো মুখে সমসময় কেমন একটা উদাসীন, অন্যমনস্ক হাসি ফুটিয়ে রেখেছে।

তারপর দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। দাউ দাউ করে আগুল ছড়াল। আগুনের বেড়াজাল।

বেড়ার ভেতর নেত্য। নেত্যর দুটো হাত নেই। এক-দুই-তিনকরে বেড়াটা গুটোতে গুটোতে ছোট্ট হয়ে আসবে। মাথায় আর দাঁতে আগুনের মালসা নিয়ে নিত্যচরণ নাচছে। আস্তে সোহাগে পিছল কাদার ওপর পা ফেলছে।''[১১৩]

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ সংবেদনশীলতায় দেশ-কাল-পরিবেশ প্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানসের ব্যক্তিমানবের অন্বয়-অনন্বয়ের প্রকল্পে আত্মানুসন্ধানের প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করেছেন। একদিন যে নিত্যচরণ একজন প্রকৃত স্বামী, একজন প্রকৃত মানুষের মত বিপদের সময় দুর্গার পাশে থেকেছিল আজ সে তার হাতদুটো হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে। নিরুপায় হয়ে আজ আবার সুযোগ পেয়েছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার। নিত্যচরণের বউ হিসাবে সমাজের চোখে দুর্গার সম্মান- এতো একজন যথার্থ স্বামীর গৌরবের। দুর্গাকে এই সম্মানটুকু দিতে পেরেছে নিত্যচরণ।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ অনুষঙ্গ এই সময়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য ব্যবহার করেছেন অসাধারণ মুন্সিয়ানায়। পৌষমাস লক্ষ্মীর মাস। কথিত আছে পৌষমাসের অমাবস্যার ব্রত পালনে পিতৃদোষ স্খালন হয়, পরিবারে স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি আসে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশেষ তিথিতে ব্রতপালনের মাধ্যমে কোথাও যেন বাংলার স্থিতিশীলতা কামনা করেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের ক্ষতগুলো ষাটের দশকের মানুষ বয়ে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেন তার থেকেও মুক্তি পেতে চাইলেন।

''মায়ের চোখের সামনে ঠাঁই হয়েছে। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে আট-দশ হাত জমি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে, জল ঢেলে ঢেলে পেছল করা হয়েছে। হাঁটতে চলতেই কষ্ট। এর ওপর নেত্যচরণ শরীর মুচড়ে, পায়ের ভর ঠিক রেখে আশ্চর্য ছাঁদে নাচবে। আগুনের ভেতর নাচবে। আগুন বয়ে নাচবে। নেত্যচরণ আগুন হয়ে যাবে।''[১১৪]

নিত্যচরণের সঙ্গে এই আগুন শব্দটার যোগ বেশ গভীর। আগুনজ্বলা সময়ে, দুর্গার আগুনে পোড়া জীবনে, নিত্যচরণের আগুনের মত বিশুদ্ধ অস্তিত্ব। নিত্যচরণ চেয়েছে দুর্গাকে বাঁচাতে, দুর্গাকে নিয়ে নিজে বাঁচতে। গল্পটিতে দুর্গার বিভিন্ন জবানিতে যখন দেখি পদ্মা শুকিয়ে মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে বা এ পারের কথা তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে দ্বিখন্ডিত বাংলার ছবি। এই আগুন আরেকভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। গল্পটিতে সরাসরি ভাবে না হলেও রামায়ণের মিথ এনেছেন গল্পকার। নিত্যচরণের দু'হাত কাটা, নিত্যচরণ নাচের সময় যেন পাখির মত ওড়ে, নিত্যচরণের

ডানা যেন কেউ কামড়ে নিয়েছে, নিত্যচরণ হাত দিয়ে বউ দুর্গাকে সান্ত্বনা দেয়, আর গল্পটির নাম জটায়ু। পৌষ অমাবস্যায় দেবীমূর্তি গড়লেন দাশরথি। দাশরথি রামের আরেকনাম। অকালবোধনের সময় সন্ধিক্ষণে দেবীর পূজায় রামচন্দ্র একটি নীলপদ্ম কম হওয়ায় নিজের এক চক্ষুদান করে আরাধনা করেছিলেন দেবীকে। এখানেও কালীমূর্তির রঙ ঘোর নীল। সন্ধিপূজায় বলির আয়োজনও হয়েছে। সেই শুভক্ষণে নাচবে নিত্যচরণ। নিত্যচরণের স্ত্রীর নাম দুর্গা। দুর্গার বিড়ম্বিত জীবনে আগুন দু:স্বপ্ন বহন করে এনেছে বারবার। আর আজ এই আগুনের সামনেই নিত্যচরণের নাচ। আগুন নিয়ে নাচ। আগুন হয়ে নাচ। রামায়ণে দেখি রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। সীতার জীবনে আগুনের মধ্যে গমন একবার নয়, এসেছিল একধিকবার। নিত্যচরণের নাচের আগুনবলয়ও তিনটি। সীতা অপহরণের সময় জটায়ু পাখি রাবণের হাত থেকে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বয়সোজনিত কারণে রাবণের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফিরে এসেছিল। নিত্যচরণও বাঁচাতে চেষ্টা করে দুর্গাকে। বাঁচা এবং বাঁচানোর চেষ্টাতেই যাপিত হয় নিত্যচরণ-দুর্গার জীবন। জটায়ু পাখি অগ্রজ সম্পাতির সঙ্গে যুবাকালে সবচেয়ে উঁচুতে উড়াল দেবার প্রতিযোগিতা করতেন। কোনো এক সময়ে জটায়ু উচ্চতর উড়াল দিলে সূর্যতেজে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। তখন সম্পাতি তার পক্ষ প্রসারিত করে সূর্যের তেজ আটকে জটায়ুকে প্রাণে রক্ষা করে। এই ঘটনার পর সম্পাতি এতটাই জখম হন যে নিজের ডানাদুটি হারান এবং বাকি জীবন সম্পাতি পক্ষহীন পক্ষীর জীবন যাপন করতে থাকে। জটায়ুও তার পক্ষ দিয়ে সীতাকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। সেই সীতা যাকে বারবার অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে সতীত্বের প্রমাণ দিতে। নিত্যচরণ হাত থাকা অবস্থাতেও দুর্গাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, হাতদুটো চলে যাবার পরও দুর্গাকে নিয়ে বাঁচা আর বাঁচানোর সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

বিশ্বযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার ফলস্বরূপ দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা মাথায় নিয়ে থাকা মানুষ-মানুষীর আখ্যান পুনরুক্ত প্যাটার্নে মিথ-ব্যঞ্জনায় অসাধারণভাবে বাঙ-ময় করে তুলেছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যক্তিজীবনে বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী দীপেন্দ্রনাথ কলকাতার উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে পুনর্বাসনের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকায় খুব কাছ থেকে জেনেছিলনে এই মানুষগুলির দু:খকষ্টের জীবনকাহিনি। বামপন্থা আদর্শ কখনোই ধর্মের নামে হওয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিভেদ দেখানো পছন্দ করে না। কারণ সেক্ষেত্রে ধর্মকে স্বীকৃতি দিতে হয়। তাই বামপন্থায় বিশ্বাসী দীপেন্দ্রনাথ দেশভাগ-দাঙ্গা-উদ্বাস্তু সমস্যা-নারীর উপর অত্যাচার সমস্ত কিছুর শেষেও আশাবাদে মানবিকতার জয় সূচিত করেছেন নিত্যচরণের দুর্গার সঙ্গে সংগ্রাম করে বাঁচার মধ্যে। দুর্গা দেশভাগ দাঙ্গার স্বীকার হয়ে আত্মীয় পরিজন-সম্ভ্রম হারিয়ে আশ্রয় পেয়েছিল রেল ব্রোকার নিত্যচরণের কাছে। কিন্তু সমাজের করাল গ্রাসে দুর্ঘটনায় নিত্যচরণের ডানা থেকে দুইহাত কাটা পড়ে। ফলে জীবনচর্যার আগিদে দুর্গাকে আবার ঘরের বাইরে বেরতে হল। দুর্গা তার শরীরকে পণ্য করে হোটেলে কাজ

করে প্রাণধারণ করে। আর্থিক-সামাজিক এই দুরাবস্থায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে দুর্গা এক নি:সঙ্গ জীবনযাপন করে। অপরিচিত মানুষ দেখলে ভয় পায়। কাউকে দেখলে চোখ তুলে কথা বলতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে নিত্যচরণের ধুনুচি নাচ যেন এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। দুর্গা-নিত্যচরণ এত সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যেও সংগ্রাম চালিয়ে বেঁচে আছে। এই ইতিবাচকতা প্রতিষ্ঠাই দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে স্বাতন্ত্র্য।

কথাশেষ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজসিংহ' (১৮৮২) উপন্যাসের মাণিকলাল আলোচ্য প্রথম চরিত্র। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'তে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রাজসিংহ' উপন্যাসে মাণিকলালের চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন,-

> ''বিপুল ইতিহাস ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনকে প্রায় গ্রাস করিয়া লইয়াছে। আরংজেব, রাজসিংহ ইহারা তো ঐতিহাসিক ব্যক্তিই;কল্পনাপ্রসূত চরিত্রগুলিও-চঞ্চল, নির্মল, মাণিকলাল, প্রভৃতি- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া ঐতিহাসিক কোলাহলের মধ্যে নিজ নিজ কণ্ঠস্বর হারাইয়া ফেলিয়াছে,ও বৃহৎ ইতিহাস-যন্ত্রের অঙ্গপ্রতঙ্গমাত্রে পরিণত হইয়াছে।''[১১৫]

ইতিহাসের স্রোতে মিশে গিয়েও অসাধারণ মুন্সিয়ানায় বঙ্কিমচন্দ্র মাণিকলালকে বহুমাত্রিকতা দিয়েছে। চূড়ান্ত মানবিক চরিত্র মাণিকলাল দস্যুবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে তার কন্যাপ্রতিপালনের জন্য যা মনে করায় দস্যু রত্নাকরের কথা। কিন্তু মাণিকলালের পাপ-পুণ্য ন্যায়-নীতিবোধের জ্ঞান প্রখর দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'রাজসিংহ' প্রথম খন্ড প্রকাশিত হবার পর বঙ্কিম বলেছিলেন যে, লোকজন আর দস্যু মাণিকলালের কাহিনি শুনতে চাইছে না, দেশের ছেলেমেয়েদের মাথা বিগড়ে যাবার আশঙ্কায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এরপর মাণিকলালের যে চিত্র আঁকলেন সে মাণিকলাল প্রভুভক্তি এবং সততার মূর্তি এবং তার থেকেও বড় কথা অসাধারণ বুদ্ধির প্রাখর্য, রণকৌশল যেকোনো পাঠককে আকর্ষণ তো করবেই, সাথে অন্যদের কাছে শিক্ষণীয় চরিত্রও হবে মাণিকলাল- বঙ্কিমলেখনী তার প্রতিষ্ঠা করলেন। মাণিকলাল চরিত্র প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, মাণিকলালের যে প্রতিবন্ধকতা, অর্থাৎ আঙ্গুলটা কাটা, সেটা মাণিকলাল নিজে হাতে করেছিল- এই অসাধারণ মানসিক জোর অবশ্যই প্রশংসনীয়।

চরিত্রাত্মক গল্প 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিককার রচনা। ডাকাতি করতে গিয়ে গল্পটির নায়ক চরিত্র ভিখুর একটা হাত নষ্ট হয়ে যায়। ভিখুকে কেন্দ্র করে

মানিক narrative style-এ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকা আদিম জৈবিক প্রবৃত্তির প্রবহমানতার চিত্র দেখিয়েছেন। গল্পে দেখি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভিখুর জবানিতে বলিয়েছেন,-

''নদীর ধারে খ্যাপার মতো ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মনে হয় পৃথিবীর যত খাদ্য ও যত নারী আছে একা সব দখল করিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হইবে না।''[১১৬]

এই যে ভিখুর মধ্যে থাকা পৃথিবীর সমস্ত জীবের, শুধু মানুষের মাত্রই নয়, সমগ্র জীবকূলের আদিম জৈবিক প্রবৃত্তি কাম, যৌনতা, ক্রোধ, হিংসা, লোভ-লালসা, জিঘাংসা, রিরংসা তা প্রাগৈতিহাসিক বিষয়ই বটে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে ভিখুর পাশাপাশি আরোও দুটি চরিত্র উপস্থাপন করেছেন, যারা প্রতিবন্ধকতার শিকার। একজন পাঁচী, যার পায়ের ক্ষত নিরাময়যোগ্য হলেও সমাজে আর্থিক আনুকুল্য লাভের পন্থা হিসাবে পাঁচী সেই ক্ষতকে সারতে দেয়নি। এবং বাস্তবে দেখা যায় পাঁচীর আয় ভিখুর আয় থেকে বেশি হয়। আরেকটি চরিত্র বসির, তারও পায়ের নীচের দিকটা ঘায়ে ভরা এবং সেই কারণেই সেও ভিখুর থেকে বেশি রোজগার করে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমাজে টিকে থাকার লড়াই-এর ছবি আরোও আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাসের মেলা' গল্পের নাম না জানা অন্ধ খঞ্জ ভিখারিদের জীবনবৃত্তান্তে। ভিখুর মাধ্যমে মানিক দেখালেন প্রতিবন্ধকতাকে হাতিয়ার করে জীবন-জীবিকা উপার্জনের পন্থা।

ভিখুর পাঁচীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া আসলে বাঁচতে চাওয়ার নামান্তর। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে প্যাভলভের কথা। প্যাভলভ মনে করতেন মানুষ প্রতিনিয়ত হিংস্র পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিতে জান্তব হয়ে পড়েছে। ভিখুও বর্শার আঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়ে তারপর বেঁচে থাকার তাগিদে, নিজের জীবনরক্ষার জন্য হিংস্র আচরণগুলি করেছিল। প্যাভলভ কথিত জীবনরক্ষার তাগিদে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চাপে মানুষের হিংস্র প্রবৃত্তিগ্রহণ অথবা ফ্রয়েড কথিত মানুষের মনের আদিম জৈবিক প্রবৃত্তি হিংস্রতা- যেভাবেই ভিখুর আচরণ ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, আসল উদ্দেশ্য জীবনসংগ্রামে টিকে থাকা। মানিকের প্রথমদিককার গল্পে ফ্রয়েডীয় চেতনার প্রভাব বেশি থাকলেও শেষের দিকের গল্পগুলিতে দেখব ঘুরে ফিরে আসে কৃষক বিদ্রোহের কথা। এই কৃষকদের বিদ্রোহও তো আসলে বেঁচে থাকার লড়াই-ই। ভিখু এই বেঁচে থাকার লড়াই-এ ডাকাতি ছেড়ে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছে, মানিকের গল্পে জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন পেশাগ্রহণ এবং অক্ষমতাকে হারিয়ে সক্ষমতাকে নিয়ে বেঁচে থাকা বারবার দেখা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা বিমল করের 'দেওয়াল' (১৯৩৯-৪৫) উপন্যাসে সুচারু যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগদান করে একটা হাত খুইয়ে ফিরে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসমকালীন ভয়ঙ্কর আর্থিক-সামাজিক পরিবেশের সাথে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশের ভয়াবহতার ছাপ বহন করছে সুচারু। যুদ্ধের প্রভাব মানুষের মনের অন্তকরণে কত গভীর প্রভাব বিস্তার করছে তার জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ

সুচারু। যে সুচারু সুধাকে জীবনসংগ্রামে লড়াই করার সাহস জুগিয়েছে, সেই সুচারু হাত-হারানোর পর সুধার পাশে থাকলেও জীবনসঙ্গী হবার কথা সাহস করে ভাবতে পারে না। এক মারাত্মক ভয় গ্রাস করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মানুষকে- যেখানে মানুষ একাকিত্বের সংকটে নিজের প্রতিই আর বিশ্বাস রাখতে পারছিল না- সেই দু:সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে সুচারু। সুচারু প্রথমদিকে নিজের হাত চলে যাওয়া নিয়ে মশকরা করলেও, তাতে এতটাই বলিষ্ঠতার অভাব ছিল যে, তার আশেপাশের লোকজন দু:খের আবেশ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সুচারুর মধ্যে বিমল কর বুদ্ধধর্মে কথিত জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু-জনিত দু:খের কথা বলেছেন। গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন, জীবনে সুখ বা দু:খ কোনোটাই স্থায়ী নয়। বিমল কর সুচারুর জীবনেও পিতা-মাতার মৃত্যু, তারপর স্বাধীন আনন্দময় জীবন, সুধার সঙ্গে সম্পর্ক, যুদ্ধে গমন, যুদ্ধে একটা হাত কাটা যাওয়া, ফিরে এসে সুধার সঙ্গে নতুন করে জীবনপথে চলা- এই যে সুখ এবং দু:খর ক্ষণস্থায়ীত্ব এবং 'চক্রবৎপরিবর্তন্তে' 'দু:খানি চ সুখানি চ'-এর পরিক্রমা উপস্থাপিত করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানুষের পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে লিখিত 'পরিস্থিতি' গল্পগ্রন্থের (১৯৪৬) 'শিল্পী' গল্পে মদন তাঁতির মাসি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ক্ষয়িষ্ণু একান্নবর্তী পরিবারের ছবি পরিস্ফুট হয়েছে চরিত্রটিতে।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ 'আজ কাল পরশুর গল্প' (১৯৪৬) এর 'তারপর?' গল্পে গজেন হস্ত এবং পদ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী। তার একটা হাত অকেজো, আর একটা পাও অকেজো হবার জন্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। গজেনের একটা হাত সক্রিয়তাই লেখক বড় করে দেখালেন। গজেনও কিন্তু ভিখুর মতই জীবনসংগ্রামে লড়াই করে জেতার গল্প শোনায় পাঠকদের। গজেনের সুন্দর আঁকার হাত তার শিল্পী মনের পরিচয়। এই শিল্পী মানসিকতার গজেনের নারীব্যবসায়ী হয়ে ওঠার অন্তরালে যে গল্প চলছে তা আসলে জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কাহিনি। পারিবারিক সম্পর্কগুলোর অন্ত:সারশূন্যতার মধ্যে অর্থকরী ব্যাপারটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গজেন আগে বাড়িতে থাকত তাড়ানো ছেলের মত। তার অন্ধকারপথে যাবার কারণ হিসাবে তার বদবন্ধুসঙ্গের কথা উল্লেখ করলেও পারিবারিক অনীহাও একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে। গজেনের খাবার-সময় অনাত্মীয় প্রতিবন্ধী কন্যা হাবার বিশেষ যত্নআত্তি পরিবারের লোকজনদের চোখ টাটায়, কিন্তু গজেনের প্রকৃত শুভাকাঙ্খী পরম আত্মীয় কাউকে দেখা যায় না। সম্পর্কহীনতার দু:সময়ে অন্ধকারপথের হাতছানি, চোরাপথে মানুষের জীবিকা উপার্জন, মূল্যবোধহীনতা, অপসংস্কৃতি- এই সব কিছু নেতিবাচকতার স্বাক্ষর হলেও তার মধ্যেই গজেনের জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার সাধনায় চরিত্রটি স্বতন্ত্রতার দাবী রাখে। পূর্ববর্তী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ব্যোমকেশের গল্পের ('অর্থমনর্থম্') ফণিভূষণ তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় হীনন্মন্যতায় অপরাধ সংঘটিত করে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যায় পালিয়ে যায়। গজেন ফণিভূষণের মত দুর্বল-চিত্তের মানুষ না হয়ে, হয়েছে ভিখুর ('প্রাগৈতিহাসিক' : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) মত মানসিকভাবে দৃঢ় মানুষ। তাই গজেন খল চরিত্র হলেও মার্লোর 'ড: ফস্টাস', গ্যেটের 'ম্যাফিস্টোফোলিস', শেক্সপীয়রের 'ইয়াগো'র মতই সুন্দর- পাঠকমনে ঘৃণা জাগায় না গজেন, বরং গভীর অনুধ্যানে মাতৃহারা, পরিবার-স্নেহ-বুভুক্ষু মানুষটি হাবোর মতো পাঠক-মনেও জায়গা করে নেয়।

১৯৪৭-স্বাধীনতালাভের সময়কালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' আসলে 'সভ্যতার পিলসুজ' মানুষগুলির আখ্যান। এই উপন্যাসের এক ছোট চরিত্র কলকাটা এইরকম খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি, যারা তাদের জীবনের ছোটখাটো প্রতিবন্ধকতাগুলিকে অসাধারণ মনের জোরে অনায়াসেই হারিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলতে পারে। নিজেকে নিয়ে রসিকতা খুব কম মানুষই করতে পারেন, আবার এমন বিষয় নিয়ে রসিকতা যা তাকে সমাজের চোখে প্রতিবন্ধী রূপে পরিচয় দেয়। কলকাটা এমনই এক দৃঢ়চেতা মানুষ, যে নিজের কাটা আঙ্গুল নিয়ে লজ্জিত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিমল করের উপন্যাস 'দেওয়াল' (১৯৩৯-১৯৪৫)-এ দেখেছি সুচারু তার একটি হাত কাটা যাওয়া নিয়ে রসিকতা করেছে, যদিও ওই রসিকতাটুকুই সার, সুচারু তার শারীরিক অক্ষমতাকে মানসিক শক্তির দ্বারা জয় করতে পারেনি। তুলনায়, কলকাটা চরিত্রটি কাহার সংস্কৃতির অনুগ প্রাণবন্ত ইতিবাচকতায় ভরপুর। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় কলকাটার মাধ্যমে কোপাই নদী কেন্দ্রিক জনসংস্কৃতির সজীবতার একটা রূপ দেখালেন।

অভিসন্দর্ভে এই ধারায় আলোচিত শেষ নির্বাচিত চরিত্র দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশ্বমেধের ঘোড়া' (১৯৬০) গল্পগ্রন্থের 'জটায়ু' গল্পের নিত্যচরণ। এক দুর্ঘটনায় নিত্যচরণের দুটি হাতই কাটা যায়। দেশবিভাগ, দাঙ্গা, অর্থনৈতিক সংকট, নারীর সম্ভ্রমহীনতা, বিশ্বাসভঙ্গ এবং সন্দেহ- এই চূড়ান্ত অস্থিরতার সময় লেখকের কলমে নিত্যচরণ শুধু স্ব-ইতিবাচকতার প্রতীক হয়ে জীবনযুদ্ধে একা বেঁচে থাকার কথা বলেনি- নিত্যচরণ দু'হাত হারিয়েও পরিবারকে রক্ষা করার কথা বলেছে। গজেন জীবনসংগ্রামে একা লড়াই করছে, নিত্যচরণ দুর্গাকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। নিত্যচরণ আর দুর্গা মিলে গড়ে উঠবে পরিবার আর পরিবার গড়বে সমাজ।

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত

কুষ্ঠরোগে অঙ্গহানি শুধু না,মানুষের মৃত্যুও হত।এ রোগ ছোঁয়াচে ছিল বলে রোগীকে একঘরে করত সমাজ।পরবর্তীকালে ওষুধে সম্পূর্ণ নিরাময় হলেও মানুষের মন থেকে সেই ভয় দূর হয়নি।

যতীন (কুষ্ঠরোগীর বউ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুষ্ঠরোগীর বউ' নামকরণেই প্রতীত হয় নায়িকা মহাশ্বেতার জীবনেতিহাস। Protagonist মহাশ্বেতার স্বামী যতীন। বয়স আঠাশের কোটায়। যতীন পিতার প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। স্বচ্ছল জীবন এবং দাম্পত্যের মাঝে হঠাৎই ছেদ টানল যতীনের আঙ্গুলে কুষ্ঠরোগের অতর্কিত আক্রমণ। যতীনের ব্যাধিটি যে দুরারোগ্য কুষ্ঠ তা স্থির নির্ধারিত হবার পর থেকেই যতীন এবং মহাশ্বেতার মাঝে দূরত্ব তৈরী হতে থাকে। মহাশ্বেতা যদিও স্বামী যতীনকে আন্তরিকভাবেই সেবা- শুশ্রূষা করতে থাকে কিন্তু যতীন ক্রমশই নিজেকে নির্বাসিত করে ফেলে। একসময়ে দূরত্ব বাড়তে বাড়তে মহাশ্বেতা এবং যতীন দুজনের চরিত্রেরই বদল ঘটল। নাস্তিক যতীন ক্রমে হয়ে পড়ল ঈশ্বরবিশ্বাসী। আর মহাশ্বেতা, যে স্বামীকে ভালোবাসত আর রাস্তার কুষ্ঠরোগীদের ঘৃণা করত সেই মহাশ্বেতা গল্পের শেষে স্বামীকে সে ঘৃণা করল আর ভালোবাসল পথের কুষ্ঠব্যাধি আক্রান্ত মানুষগুলিকে।

মহাশ্বেতার মত বলিষ্ঠ নারী চরিত্র বাংলা সাহিত্যে সত্যিই অতি দুর্লভ। এক রোম্যান্টিক একনিষ্ঠ পতিপ্রেমপরায়ণা স্ত্রী মহাশ্বেতার জীবনের প্রখর লড়াই এর কারণ স্বামী যতীন। যতীনের ক্রমাগত স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে তুলেছে। আর এই দূরত্ব বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত ফাটল ধরেছে সম্পর্কে।

যতীন আর মহাশ্বেতার দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল ঈর্ষণীয়। পারস্পরিক ভালোবাসা বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তারা সন্তানের স্বপ্ন দেখেছিল। মহাশ্বেতার গর্ভস্থ সন্তান যখন ছয়মাসের তখনই যতীনের কুষ্ঠব্যাধি দেখা দিল। এই কুষ্ঠব্যাধি শুধুমাত্র যতীনের শরীরেই থাবা বসাল না, যতীনের মনকেও কুড়ে কুড়ে খেতে লাগল ভয়াবহ কুষ্ঠ। যার ফলাফল তাদের সন্তানের মৃত্যু।

যতীন-মহাশ্বেতার সন্তানের মৃত্যুর পর যতীনের মহাশ্বেতার প্রতি সন্দেহ যেন আরও তীব্র হতে থাকে। এই সন্দেহ আসলে যতীনের মানসিক অস্থিরতা এবং অসহায়তারই প্রতিবিম্ব। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কুষ্ঠরোগ ছিল ভয়াবহ। রোগাক্রান্ত মানুষের শারীরিক ক্লেশের থেকেও বেশি ভয়াবহ ছিল সামাজিক এবং মানসিক যন্ত্রণা। যন্ত্রণাক্লিষ্ট একাকিত্বময় জীবনে যতীনের একমাত্র চাহিদা স্ত্রী

মহাশ্বেতার অন্তরঙ্গ সেবা ও সাহচর্য। কারণ যতীনের জীবনে এখন স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। যতীন জানে না তার এই কুষ্ঠরোগ নিরাময় হবে কিনা। তাদের প্রেমময় দাম্পত্য মধ্যযৌবনেই হারিয়ে যেতে বসেছে। শুধুমাত্র এই কুষ্ঠরোগের কারণে। স্ত্রী মহাশ্বেতার মনেও কি এর কোনো প্রভাব পড়বে না! এই এক অজানা আশঙ্কা প্রতি মুহূর্তে কুড়ে কুড়ে শেষ করে দিতে লাগল যতীনকে। যার ভয়াবহ পরিণতিতে যতীনের অবচেতনে মহাশ্বেতার প্রতি সন্দেহের বীজ বাসা বাঁধে। যতীনের জীবনের একমাত্র অবলম্বন স্ত্রীকে হারিয়ে ফেলা, স্ত্রীর ভালোবাসায় ঘৃণার উপস্থিতি আশঙ্কায় যতীনের মনে ক্ষয়ব্যাধি গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে।

ইতিমধ্যে তাদের রোগগ্রস্ত সন্তানের মৃত্যু ঘটে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গ্রন্থিসূত্রটিও হারিয়ে যায়। যতীন জানে মহাশ্বেতা স্ত্রী হিসাবে স্বামীর একনিষ্ঠ সেবা করছে, কিন্তু স্ত্রী মহাশ্বেতার চাহিদা কি স্বামী হিসাবে আর যতীনের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব? মহাশ্বেতাও একজন রক্তমাংসের মানুষ, দেবী নয়। তাহলে মহাশ্বেতার জীবনে কি অন্য পুরুষের প্রতীক্ষা আসবে? এই সব চিন্তাভাবনা যতীনকে করে তোলে আরও অসহায়। যতীন এবার শেষ ভরসা করল almighty God-এর শরণাপন্ন হল। দৈবপ্রত্যাদেশ প্রার্থনায় কামাখ্যাদর্শনে যায় যতীন। দেবতার চরণে সমস্ত কিছু অর্পণ করে দেবতার শক্তিতে অকৃত্রিম বিশ্বাসে যতীনের অশান্ত মন শান্ত হয়। আবার ফিরে এসে যতীন নিজের ঘরেই বসবাস শুরু করে।

যতীনের কুষ্ঠব্যাধি মহাশ্বেতা চরিত্রের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটায়। যতীনের ভয়াবহ রোগে মুখ বুজে সেবা করতে থাকে মহাশ্বেতা সম্পূর্ণরূপে নির্বিকারচিত্তে। সেইসময়কার আতঙ্কসৃষ্টিকারী কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে বসবাস, তার সেবাযত্ন করা এবং যখন সেই কুষ্ঠব্যাধি আক্রান্ত মানুষটি হয় নিজের স্বামী! তার মধ্যে নিজেকে যথাসম্ভব দৃঢ়চিত্তে সংবদ্ধ রেখেও যখন স্বামী যতীনের সন্দেহের চোখে বিদ্ধ হতে হয় তখন উচ্ছল প্রাণবন্ত মহাশ্বেতা হয়ে ওঠে আরও শান্ত। মৃত্যুর শীতলতা স্পর্শ করে যায় মহাশ্বেতা চরিত্র। যে মহাশ্বেতার কাছে আগে জীবনের অপর নাম ছিল যতীন সেই মহাশ্বেতা যতীনকে কামাখ্যায় একা পাঠিয়ে দিয়ে নিজের জীবনের শান্তি অর্থ খুঁজে নেয় কালীঘাটের সর্বস্বান্ত ভিক্ষুক আর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষদের দানধ্যান করে। এই দীনার্ত মানুষগুলিকে সেবার বিনিময়ে মহাশ্বেতার দিকে থাকে না কোনো সন্দেহের চোখ রাঙানি। নিঃস্বার্থতার দুইপ্রান্তসীমার মেলবন্ধনে শ্বেতা হয়ে ওঠে মহাশ্বেতা। চারিত্রিক এই বিবর্তনে সবচেয়ে বড় অবদান যতীনের।

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য একদা মহাশ্বেতা বলেছিল যতীনের এ রোগ মহাশ্বেতার কপাল দোষে। কিন্তু যতীন স্ত্রী মহাশ্বেতার মানসিক যুদ্ধে পাশে দাঁড়ায়নি। মহাশ্বেতাকে যতীনের কুৎসিত ক্রুদ্ধতা জানিয়েছে মহাশ্বেতার পাপেই যতীন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। শুধু তাই-ই নয়,

মহাশ্বেতাকে 'ছেলে-খেকো রাক্ষসী' বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি একটুও যতীন। একে স্বামীর এ হেন কুষ্ঠরোগ তার উপর একমাত্র সন্তানের মৃত্যু - মহাশ্বেতার এ হেন মানসিক বিপর্যয়ে স্বামী যতীন পরম বন্ধু হিসাবে মহাশ্বেতার পাশে দাঁড়াতে পারেনি। যতীনের আত্মরতি এবং প্রবল মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব মহাশ্বেতার প্রতি বিষোদগারের লাভাস্রোতরূপে উদ্গীরিত হয়েছে।

সেই সনাতন কাল থেকে শুনে আসছি 'মরে পুত্র জনকের পাপে'[১১৭] (মেঘনাদবধ)। যতীনের এ হেন রোগের পিছনে তার বাবার প্রভূত সম্পত্তির পিছনের ইতিহাসের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন মানিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষ তাদের বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি দুর্ভোগ নিয়ে হাজির হয়েছে মার্কসবাদী মানিকের কলমে। 'কুষ্ঠরোগীর বউ' প্রাক্-মার্কসবাদী মানিকের সৃষ্টি। এখানে তাই যতীন অন্যায়ভাবে অপরিমিত অর্থসঞ্চয়কারী মানুষদের উপর আসা বঞ্চিত নিপীড়িত শোষিত মানুষদের চোখের জল- অভিশাপের ফসল। কালের এই অসুখ মনে করায় শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা'।'ধূসর শূন্যের আজান গান'[১১৮] শুনিয়ে যেখানে কবি প্রশ্ন তুলেছেন, -

'কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?'[১১৯]

কারণ কবি জানেন পিতার শরীরের পাপের বীজানুই বর্তেছে পুত্রের শরীরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'বাবরনামা'-য় উল্লিখিত বাবর-সংক্রান্ত মিথটি। ১৫২৯-এ গোধরা যুদ্ধ জয় করে এসে পিতা বাবর দেখেন জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন দুরারোগ্য ব্যাধিতে মরণাপন্ন। তখন বাবর আল্লার কাছে নিজের প্রাণের বিনিময়ে পুত্রের আয়ু ভিক্ষা করেন। জানা যায়, এরপর ধীরে ধীরে হুমায়ুন সুস্থ হয়ে ওঠে এবং হুমায়ুনের সম্পূর্ণ সুস্থতার মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই কালব্যাধিতে বাবরের জীবনপ্রদীপ নিভে যায় মাত্র সাতচল্লিশ- আটচল্লিশ বছর বয়সেই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যতীন যে কিনা কালব্যাধি কাটিয়ে উঠতে পারেনি, যতীনরাও রোগাক্রান্ত হয়েছে আর তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বর্তেছে তার পরিবারের উপরও। আর তাই যতীনের পরবর্তী প্রজন্ম বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শেষ প্রান্তে এসে পিতারাই নিজের দোষ স্বীকার করে। ভগবানের কাছে শুধু সন্তান নয় সমগ্র 'সন্ততি'র সুস্থ স্বপ্নের জীবন প্রার্থনা জানায়।

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'[১২০]

অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনাই অনুরণিত হতে থাকে। তাই 'কুষ্ঠরাগীর বউ'-তে যতীনের সন্তান মৃত্যুর করালগ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। তাদের মধ্যেই তাদের পিতার পাপের বীজ ধ্বংস হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখার সাহস জাগিয়েছে।

হাবু বোষ্টম (সুন্দরম্ : সুবোধ ঘোষ)

সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্' গল্পের অপ্রধান চরিত্র ভিখারী পরিবার এরা। হাবু বোষ্টম তাঁতিদের সন্তান। কুষ্ঠরোগে হাতদুটো নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আজ সে জীবিকা উপার্জনের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কুষ্ঠরোগে হাতদুটো তার পট্টিবাঁধা। শরীর রোগাক্রান্ত হলেও জীবন তার থেমে নেই। সংসার আছে হাবুর। বৌ হামিদা। দুই সন্তান।

পথবাসী (উল্কা : নীহাররঞ্জন গুপ্ত)

নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' উপন্যাসটিতে লেখক এক বিকৃতদেহী মানুষের শৈশব থেকে যৌবনের প্রথম প্রেমস্ফূরণের আখ্যান বলেছেন। সেইখানে এক অতি ছোট্ট চরিত্র হিসাবে এনেছেন এক কুষ্ঠরোগীকে। স্বামীজির মৃত্যুর পর অরুণাংশু যখন নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন এক রাতে অবসন্ন দেহে ব্রীজের নীচে বসতে গিয়ে অরুণাংশু এই মানুষটার তীব্র প্রতিবাদ শুনেছিল। ব্রীজের নীচে থাকা মানুষটাকে পরদিন সকালে অরুণাংশু দেখে জানতে পারে যে সে একজন কুষ্ঠরোগী।

> ''.... বীভৎস ভয়াবহ তার চেহারা। ডুমো ডুমো ফুলো ফুলো বিকৃত মুখখানা যেন একটা সিংহের মুখের মতই মনে হয়। লোকটার হাতে পায়ে সর্বত্র দগ্‌দগে্ ঘা, মাছি ভনভন করছে সর্বাঙ্গে; একটা তেলচিটচিটে মলিন চিরকুট পরিধানে। একটা চামসে গন্ধ আশেপাশের বাতাস যেন বিষাক্ত। নাকটা জ্বালা করে।''[১২১]

অরুণাংশু তো শুধু দেখতে কুরূপ। আর এই কুষ্ঠরোগীর শরীর দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে চারিদিকে। কিন্তু তবুও তার পরিবার আছে। ব্রীজের তলায় সে সংসার পেতেছে। এই জায়গায় সে বাইরের অপরিচিত কেউ এলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। জীবনসংগ্রামে প্রবল যুদ্ধ করে চূড়ান্তভাবে বেঁচে আছে এই কুষ্ঠরোগী। তার কুরূপ তার জীবনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। কিন্তু অরুণাংশু হেরে গেল জীবনযুদ্ধে। যতই সে শেষপর্যন্ত তার বাবা-মার স্বীকৃতি লাভ করুক, রামায়ণের বীর জটায়ুর মত দুষ্টলোকের কবল থেকে মিলিকে উদ্ধার করুক শেষপর্যন্ত ট্র্যাজেডির নায়কই হয়ে থাকল অরুণাংশু, সেখানে বৈপরীত্য অতি স্বল্প পরিসরে প্রতিমুহূর্তে জীবনকে উপভোগ করছে কুষ্ঠরোগীটি।

রুহিতন কুরমি (মহাকালের রথের ঘোড়া : সমরেশ বসু)

সত্তরের দশকের উত্তাল ঘটনা নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত সমরেশ বসুর উপন্যাস 'মহাকালের রথের ঘোড়া'র নায়ক রুহিতন কুরমি ছিল ব্যর্থ আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী।

উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের আন্দোলনের নেতা রুহিতন কুরমি নতুন কিছু গড়ার আশা নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল কৃষক আন্দোলনের। আন্দোলনের জন্য তাকে বহুবার বিভিন্ন জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। শেষে রুহিতন কুরমি ছাড়া পেয়ে ফিরে আসে, তখন সে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে সেরে গেছে, তার শরীরে কেবল রোগের থাবা রয়েছে।

রুহিতন কুরমির সঙ্গে অনেক বড় বড় মানুষের আলাপ ছিল জেলে যাবার আগে। রুহিতনকে দলে এনেছিল শিলিগুড়ির বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি, যিনি মোহন ছেত্রীর থেকেও বড় জোতদার সেই দীনু বাগচির ছেলে দিবা বাগচি। কিন্তু যখন রুহিতন কারাবাস কাটিয়ে ফিরে আসে তখন তাকে নিতে আর কেউ আসে না। তার স্ত্রী-সন্তানরা তাকে নিতে এলেও রুহিতন খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে, দীর্ঘ আটবছরে সম্পর্কের উষ্ণতা শেষ হয়ে গেছে। রুহিতনের ভয়ানক কুষ্ঠাব্যাধি এ দূরত্ব বজায় রাখার আসল কারণ নয়, প্রকৃত কারণ হচ্ছে বিশ্বাসভঙ্গতা। দলমতের মধ্যে এবং যার প্রতিফলন উপন্যাসে পড়েছে পারিবারিক সম্পর্কেও।

রুহিতন জেলে থাকাকালীন সহযোদ্ধা কর্মীর থেকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়েছিল, সে কথা মানতে নারাজ তার স্ত্রী। এই সংস্কার শুধুমাত্র নারীমনস্তত্ত্বের সংকীর্ণতার প্রকাশক নয়। কারণ এখানে সমরেশ বসুর উদ্দিষ্টপূরণে কুষ্ঠব্যাধি সমাজমনের দুষ্টক্ষতস্বরূপ। কুষ্ঠ শুধুমাত্র রুহিতনকে অঙ্গহীন করেছে তা নয়, বিশ্বাসভঙ্গতার ক্ষতে সমাজমনস্কতা ক্ষয়ে যাচ্ছে।

উপন্যাসের শেষে দেখি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত রুহিতন সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে মাটির নিচে তার লুকিয়ে রাখা পুরনো রিভালবার বার করে কুষ্ঠতে ক্ষয়ে যাওয়া তার তর্জনী চেপে ধরেছে ট্রিগারে। শক্তিহীন দেহে তার সান্ত্বনা বিশ্বাসহীনতার জগৎ পেরিয়ে অভিশপ্ততা কাটিয়ে রুহিতন শান্তির নিশ্চিত আশ্রয়ে মাথা রাখতে চলেছে।

রুহিতনের অন্তিম পরিণতি অনেক সমালোচকের কাছেই বিরূপতার সৃষ্টি করেছিল,

> ‘‘পার্টি ও পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন তার ব্যক্তিরূপের মধ্যে কেউ ‘মর্ডানিস্টে’র প্রবণতা, কেউ ‘সমাজের মুক্তির প্রশ্ন’-কে লঘুভাবে দেখা, ‘বিচ্ছিন্ন’ একা লড়াইয়ের চেষ্টা, এমনকি নকশাল আন্দোলনকে এই সঙ্গে ‘বাল্যখিল্য ব্যাপার’ বলে উপেক্ষার কথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।’’[১২২]

রুহিতনের এই নি:সঙ্গ জীবনযাপন-এর মধ্যে রয়েছে এককালে তাকে ঘিরে আবর্তিত হওয়া বহু মানুষজনদের যাপিত জীবন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটি-

> ‘‘ব্যক্তি বনাম পার্টি, ব্যক্তি বনাম সমাজ, ব্যক্তি বনাম পরিবার, ব্যক্তি বনাম ধর্ম- তিনি সর্বত্র দেখেছেন ব্যক্তির নিগূঢ় প্রশ্ন, তার অস্তিত্বের ‘ডেসিডারেটা’, তার স্বাধীনতা। তার নির্বাচনের

স্বাধিকার।''[১২৩]

একেবারেই আক্ষরিকভাবে যথার্থ হয়েছে রুহিতন কুরমির জীবনে।

শাম্ব (শাম্ব : সমরেশ বসু)

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সমরেশ বসুর 'শাম্ব' উপন্যাসে পৌরাণিক চরিত্রের আধারে কুষ্ঠরোগীদের সমাজ বিচ্ছিন্ন অবস্থান সূচিত হল। বিংশ শতাব্দীর উত্তাল সত্তরের দশকের শেষ পর্যায়ে পৌরাণিক চরিত্রের আধারে কুষ্ঠরোগমুক্তির চিত্র নি:সন্দেহে স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে।

কালকূট ছদ্মনামে সমরেশ বসু মহাভারতের অপ্রধান চরিত্র শাম্বকে অবলম্বন করে লিখলেন 'শাম্ব' উপন্যাস (১৯৭৮)। কাহিনির সূচনায় দেখি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর সমস্ত যাদবকুল নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করছিল। এমন সময়ে নারদমুনি আসেন কৃষ্ণের আলয়ে। সেখানে তার চোখে পড়ে জাম্ববতীর গর্ভজাত কৃষ্ণের পুত্র শাম্বকে। কৃষ্ণের পুত্রদের মধ্যে শাম্ব ছিল অসাধারণ রূপবান। তার সোনার মত গায়ের রঙে পার্শ্ববর্তী লতাপাতা, কুঞ্জকানন, জলাশয়, আকাশ পর্বত সবই প্রতিফলিত হয়, এমনকি নারীও। শাম্বর দৃষ্টিতে কামানল নেই। বরং শাম্বের শান্ত-মুগ্ধ দৃষ্টিতে রমণীকুল শাম্বর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আকুল হয়ে পড়ে। নারদমুনি যখন কৃষ্ণের আলয়ে আসেন তখন রমণীকুলের সঙ্গে প্রণয়োল্লাসে ব্যস্ত শাম্ব মুনির প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেননি বলে নারদ ক্রুদ্ধ হন এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে অনুযোগ জানান পিতার ষোলোশত গোপিনীদের শাম্বের প্রতি আকর্ষণ বিষয়ে। এখানে কৃষ্ণের দেবত্বের মোড়ক ভেদ করে রক্তমাংসের মানুষ প্রকটিত হল। পিতার ঈর্ষায় পুত্রের উপর অভিশাপ বর্ষিত হল। কৃষ্ণের অভিশাপে শাম্ব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে তার সুরূপতা হারায়।

মহাভারতে চরিত্রটি অন্তরালবর্তীই ছিল। কিন্তু সমরেশ বসুর লেখায় শাম্ব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে ভেঙে পড়ল না। চন্দ্রভাগা নদী তীরবর্তী মিত্রবনে সূর্যের কাষ্ঠনির্মিত প্রতিরূপ তৈরী করে কঠোর সাধনায় সূর্যদেবকে তুষ্ট করে শাম্ব কুষ্ঠমুক্ত হলেন। ভাগ্যকে মেনে হেরে না গিয়ে নিজের চেষ্টায় ভাগ্যকে জয় করার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন শাম্ব।

ব্যক্তিজীবনে সমরেশ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত সেন্টুর সাথে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। জীবনের শেষ কটা দিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাটিয়ে সুন্দর ছেলে সেন্টু কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যায়। লেখনীতে সমরেশ কিশোর সেন্টুকে রূপ এবং রোগমুক্তি ঘটালেন শাম্ব চরিত্রে।

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষরা (অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

১৯৮৩ সালের উপন্যাস 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখে' সুভাষ মুখোপাধ্যায় শুধুমাত্র একজন নয় একদল কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষদের চিত্রাঙ্কন করলেন। উপন্যাসের চরিত্র বড়বাবু বিমানযাত্রার সময় উপলব্ধি করেন যে তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। এরপর ডাক্তার দেখিয়ে রোগবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে প্রথমেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন। ঠাকুর-দেবতাকে ভরসা করতে শুরু করলেন রোগ নিরাময়ের জন্য। শেষে অত্যাধুনিক চিকিৎসায় উপশম হল তার। বড়বাবু, নিজেই স্বীকার করেছেন, যে যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা না করালে তার অঙ্গহানিও ঘটতে পারত।

বড়বাবুর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভেঙে পড়া জীবনে বলভরসা জোগায় আরোও অন্যান্য কুষ্ঠরোগীরা। তাদের অঙ্গহানিও ঘটেছে। কিন্তু তবুও তারা প্রবলভাবে জীবনটাকে বাঁচছে। যে বড়বাবু নিজের কুষ্ঠরোগের চিন্তায় পার্শ্ববর্তী সুস্থ মানুষজনদের সহ্য করতে পারছিল না, সেই বড়বাবুই দেখল যে কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ আক্রান্ত হবার ভয়ে সমাজচ্যুত করে, তারাই খোলা মাঠে-ঘাটে পড়ে থাকতে থাকতে সেখানেই ঘর বেঁধে বসতি গড়ে তুলছে। নাম তালবেতালিয়া। এদের মধ্যে বড়বাবু বেঁচে থাকার সম্বল খুঁজে পেল। ব্যাংমুড়ি, পৈলু, হাঁড়িচাচা, পল্টন, সোনিয়া, ভৈবি- এরা সবাই একটাই পরিচয়ে পরিচিত- সবাই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত বিকৃতদেহী মানুষজন। এদের সাথে একাত্মবোধ করল ধনীর সন্তান বড়বাবু চরিত্রও।

বড়বাবু এবং সহায়সম্বলহীন ফুটপাতবাসীদের একই ছাদের তলায় সহাবস্থান আসলে দুটি ইঙ্গিত করে। প্রথমত: সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, জাত-ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য সমস্ত কিছু অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে মৃত্যুর কাছে। দ্বিতীয়ত:, একমাত্র মানবিকতা দ্বারাই সমাজের সমস্ত ভেদ পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। উচ্চবিত্তীয় বড়বাবুর এই বোধোদয় আসলে মানবজাতির তথা মনুষ্যত্বের বোধোদয়।

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষদের সমাজ পরিত্যাগ করে। ফলে তারা একাকীত্বে ভোগে-স্বজন হারিয়ে। কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা চলাকালীন আত্মীয়-পরিজনের খোঁজ নেওয়া কমতে কমতে রোগীর সুস্থ হবার পর দেখা যায়, ততদিনে তারা পরিত্যক্ত হয়েছে সমাজ এবং পরিবার দ্বারা। সুস্থ হবার পরও সমাজ ও পরিবারের চোখে তারা কোনোদিনই সুস্থ হতে পারে না। সুভাষ দেখালেন তাহলে এরা কি করে আত্মীয় হতে পারে। আত্মার সম্পর্কে যুক্ত মানুষরা আত্মীয় হয়। তাই সুভাষ অসাধারণ মুন্সিয়ানা সম-অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোকে নিয়ে একটা গোষ্ঠী গঠন করলেন। কুষ্ঠরোগাক্রান্তরা একাকীত্বে ভুলে নতুন উদ্যমে বাঁচতে শিখল এবং শেখাল।

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষদের জীবন নির্বাহের প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জন যেখানে কপালে ভাঁজ ফেলে দেয়, তখন এই তালবেতালের মানুষজনরা সদর্পে ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবনধারণ করছে। শিক্ষিত শহুরে অর্থবান মানুষদের অমানবিকতার উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের দুর্বলতাকে ব্যাধির সংক্রামকতাকে কাজে লাগিয়ে হৈ হৈ করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে এরা। এক অপার প্রশান্তিতে ভরে যায় এই মানুষগুলোর জীবন।

তালবেতালিয়া থেকে নবজীবনগড়ে উন্নীত হবার একটি সোপান সমস্ত বিকলাঙ্গ মানুষদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নগর প্রতিস্থাপন। শেষে দেখি এরা বিবাহ বন্ধনেও যুক্ত হয়- পৈলু ও সোনিয়া, চ্যাংমুড়ি ও কুলসুম বিবি। স্বামীজির কক্ষিবান ঋষিকন্যা ঘোষার জীবনকাহিনি বর্ণনার মধ্যে সমস্ত মানুষরা সেবাধর্মে ব্রতী হয়। এই নতুন গড়ে সভ্য মানুষের সভা-সমিতি, মিছিল-মিটিং, পোস্টারে স্বাভাবিক জীবনের আলোক স্পর্শে ফিরে আসার কথা ব্যঞ্জিত হয়েছে।

এই বিকলাঙ্গ মানুষগুলির প্রত্যয় জন্মায় অসম্পূর্ণতা আসলে তাদের মধ্যে নয়, রয়েছে শহুরে শিক্ষিত সুস্থ স্বাভাবিক মানুষদের মধ্যে, যারা হিংসা-হানাহানিতে দ্বিধাদীর্ণ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই একগুচ্ছ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষগুলির মধ্যে মানবিকতায় উত্তরণের এবং নবজীবনবোধের জাগরণ সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

কথাশেষ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৌ' গল্পগ্রন্থের (১৯৪০) একটি গল্প 'কুষ্ঠরোগীর বউ'- এর যতীন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে হস্ত সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত। যতীন চরিত্রের মাধ্যমে মানিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন পরিস্থিতিতে একদিকে চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকট এবং পাশাপাশি মানসিক বিকার- এই দ'ুয়ের টানাপোড়েনে সংকটময় দাম্পত্যজীবনের ছবি এঁকেছেন। মনোবিজ্ঞানের অস্তিত্ববাদে মানুষের মৃত্যুচেতনা প্রবলভাবে থাকে। যতীনকেও তার ডাক্তার সেরে যাবার কথা বললেও যতীন চূড়ান্ত ভয়ংকরতম পরিণতির কথা ভেবে নিয়ে হয়ে উঠেছে মনোবিকারগ্রস্ত। তাই একসময়ে মহাশ্বেতা যতীনের মনোবল ফেরানোর চেষ্টায় যতীনের রোগাক্রান্ত আঙ্গুলগুলোয় চুমো খেয়েছিল, কিন্তু যতীনের মানসিকতার তাতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু শেষেরদিকে যতীনই ভয়ংকর রিরংসায় মহাশ্বেতার সারা শরীরে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পচে যাওয়া হাত বুলিয়ে দিয়েছে। যে যৌনতা আগে ছিল ভালোবাসা, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে যতীন যখন সমাজের কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে, তখন সেই দাম্পত্য-যৌনতা হয়ে উঠছে যতীনের আক্রোশের নির্গমপথ।

যতীনের দাম্পত্য-নিপীড়নে মহাশ্বেতা শেষপর্যন্ত নিজেকে পৃথক করে নিয়ে এক দৃঢ় ব্যক্তিত্বে উন্নীত হল। যতীনের মত বিকলাঙ্গ মনোবিকারগ্রস্ত মানুষ সমাজের ভবিষ্যৎ হতে পারে না, তাই মানিকের লেখনীতে তাদের সন্তান জন্ম নিল না। মানিকের রচনাতে অন্যান্য প্রতিবন্ধী চরিত্ররা মানসিকভাবে অনেক দৃঢ় হলেও যতীনের মানসিক দুর্বলতাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্' গল্পটি 'ফসিল' (১৯৪০) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। অবরবর্গীয় মানুষদের গূঢ় মনস্তত্ব দেখানোর প্রেক্ষিতে সুবোধ ঘোষ সুকুমারের বিকৃত যৌনাচার দেখানোর ঘটনায় আনলেন দরিদ্র ভিখারী কন্যা তুলসীকে। তুলসীর বাবা হাবু বোষ্টম। তার হাত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে অক্ষম। এই সমস্ত মানুষগুলিরই অক্ষমতার সুযোগ কিভাবে নেয় সুকুমারদের মত মানুষরা তা দেখিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। হাবুর নিজের রোজগার না থাকায় সে সবকিছু জেনেও বাধ্য হয়েছে যুবতী মেয়েকে ভিক্ষা বৃত্তি করতে যেতে মত দিতে।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' উপন্যাসে বিকৃতরূপী অরুণাংশুর লড়াই প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ফুটপাথবাসীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন। ঔপন্যাসিক দেখালেন, প্রতিদিন একটু একটু করে জীবনসংগ্রাম করতে করতে এই সাধারণ দরিদ্র মানুষটিও নিজের অধিকারটুকু বুঝে নিতে পারছে, সংসার করছে, অক্ষমতাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে যোগ্যতমের উদ্বর্তনে। অরুণাংশু চরিত্র পরিস্ফুটনে contrast সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক সচেতনভাবেই চরিত্রটি সৃজন করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমরেশ বসু মানুষের মনে নতুন করে আশ্বাস স্থাপন করলেন।'মহাকালের রথের ঘোড়া'র এক ব্যর্থ নায়কের একাকীত্ব , সমাজ-মানসের সংকীর্ণতা দেখানোর পরই 'শাম্ব'তে দেখালেন রোগ-ব্যাধির মধ্যে হারিয়ে না গিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাস আর অধ্যবসায়ে সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব।এর পরবর্তীতে 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখে' সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেখালেন কুষ্ঠরোগীরা সদর্পে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে সমাজে নতুন জীবন স্থাপনা করেছে।

বামন

অভিসন্দর্ভটিতে দুটি বামন চরিত্র আলোচনা করা হল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'খাখ্' ছোটগল্পের ভোম্‌রা এবং বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে রচিত বিমল করের 'দেওয়াল' (১৯৩৯-১৯৪৫) উপন্যাসের উমা।

ভোম্‌রা (খাখ্ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্প 'খাখ্' এর চরিত্র ভোম্‌রা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলার নিম্নবৃত্তীয় সমাজের জীবনসংগ্রামের গল্প 'খাখ্'।

ভোম্‌রা বামন,

''সাত বছরে যা, সতেরো বছরেও তাই- যেমন কে তেমন; বাড়ে না একটুও।.....

গোঁফের রেখা দেখা দিল, বুকের ছাতিটাও ফুলল,উরু দু'টোও চওড়া হ'ল-

কিন্তু লম্বায় সেই আড়াই হাত-ই।.....

সবাই ক্ষেপায়। কেউ বলে - লাটুর আল; কেউ বলে- পাঁঠার শিং; কেউ বা বলে

হোঁদল কুৎকুতে। নামটা সংক্ষিপ্ত ক'রে অনাবশ্যক জোর দিয়ে বলে- ভোম্।''[১২৪]

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সংগ্রামে ভোম্‌রা বিভিন্নরকম জীবিকা গ্রহণ করেছিল। একেবারে ছোটোবেলায় সে কোনোরকমে মাছ ধরে উপার্জন করার চেষ্টা করত। মা মারা যাবার পর অন্যের সংসারে প্রতিপালিত হবার সময় মাছ ধরার পাশাপাশি আরোও অনেকরকম কাজ সে করেছে। রাস্তা তৈরীর কাজে হাত লাগিয়েছে, মাটি কুপিয়েছে, শুকনো পাতা লক্‌ড়ির কাঁটা টুকরো কুড়িয়েছে, তারপর কাঁচের চুড়ি ফিরি করার মধ্য দিয়ে তার নতুন দোকানদারি জীবনের সূচনা। গায়ে অসম্ভব শক্তি থাকার জন্য ভোম্‌রা শারীরিক পরিশ্রমে কোনোদিন ক্ষান্ত হয়নি। শেষপর্যন্ত প্রচন্ড পরিশ্রম করে ঘুরে ঘুরে ফিরি করতে করতে নিজের একটা দোকানঘর করতে পেরেছে। ভোম্‌রার দোকানে বহু বিচিত্র জিনিস পাওয়া যায়। ভোম্‌রা দোকানে দুজন কর্মচারীও রাখতে পেরেছে।

ভোম্‌রা পয়সা উপার্জন করলেও কোনোদিন তাকে বিলাসব্যসনে উড়িয়ে দিতে দেখা যায়নি। ভোম্‌রা যখন মাটি কাটতে যায় বন্ধুদের সঙ্গে তখন তার প্রবল হিসাবী মানসিকতা ফুটে উঠেছে। সে জানে সারাদিন মাছ বিক্রির থেকে বেশি টাকা উপার্জন করতে পারবে সে মাটি কোপালে। তাই ভোম্‌রা মাটি কোপাতে যায়। আর এই মাটি কোপানোর টাকা নিয়ে বন্ধুরা বিলাসিতা শখ পূরণের স্বপ্ন দেখলেও ভোম্‌রা সেই টাকা দিয়ে অসুস্থ মায়ের চিকিৎসা করানোর কথা ভাবে। ছোট থেকেই

অনেক পরিণত মনস্ক ভোম্‌রা। তাই দেখি বহু প্রতিকূল পরিস্থিতি পেরিয়ে সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

ভোম্‌রা বামন। তাকে এ নিয়ে প্রায় সবাই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে। সেও চেষ্টা করেছিল প্রবলভাবে যাতে লম্বা হতে পারে।

''কদমগাছটার তলায় এসে উপুর হয়ে ডন দেয়, ওঠ-বোস করে। নোয়ানো ডালটায় একটা দড়ি ঝুলিয়ে দু'ধারে দু'টো হাত এঁটে বেঁধে শূন্যে ঝোলে- হাত দুটো ছিঁড়ে পড়তে চায়- কিন্তু তবুও একটুও ঢ্যাঙা হয় না- এক ইঞ্চিও না।''[১২৫]

শত্রুর মোকাবিলা করতেও বেশ কষ্ট করতে হয় ভোম্‌রাকে।

''শত্রুকে আক্রমণ করতে হ'লে একেবারে বুকের কাছটিতে এসে দাঁড়াতে হয়- দূর থেকে ঘুষি নাগাল পায় না। তার আগেই ওরা ওদের লম্বা ঠ্যাং দিয়ে ল্যাং মেরে ওকে মাটিতে ফেলে দেয়।''[১২৬]

কিন্তু তবুও হার মেনে নেয় না ভোম্‌রা। বারবার বহু প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সে সমানে লড়াই চালিয়ে গেছে।

যৌবনের ধর্ম মেনে ভোম্‌রার মনেও প্রেম এসেছে। ছোটবেলায় পাশাপাশি থাকার সুবাদে পরস্পরের বিপদে-আপদে পাশে থেকেছে ভোম্‌রার মা আর কুসি। ভোম্‌রার মা ছিল জেলেনি আর কুসি গয়লানী। বিপদের সময় একটা বোয়াল মাছ রান্নার সময়ও ভোম্‌রা কুসির মেয়ে বেঁকির জন্য ভাগ রাখার কথা বলেছে। যাদের নিজেদেরই খাবারের অপ্রতুলতা, সেই পরিবারে দাঁড়িয়েও ভোম্‌রা শুধু নিজে নয়, একটা বোয়াল মাছ থেকেই মা, কুসিমাসি, বেঁকি সবার খাবারের কথা বলেছে। ছোটবেলার এই সম্পর্কেই যৌবনে ভালোবাসার রঙ লাগে। তবে এ রং ছিল একতরফা।

''গয়লানির মেয়ে জেলেনির ছেলের প্রেম প্রত্যাখ্যান করলে।''[১২৭]

বেঁকি বিয়ে করল ছিদামকে।

''সমস্ত সংসারে একটি লোককেই ও চায় বেঁকি ভাবে। ভোম্‌রা ভাবে- সমস্ত সংসারে একটি লোককেই ও চায়না।'' [১২৮]

ভোম্‌রার মা ছিল। বাবার কোনো উল্লেখ নেই ভোম্‌রার জীবনে। ছোট থেকেই সে অনেকরকম অকথা-কুকথা তার নিজের চেহারা নিয়ে শুনলেও দমে যায়নি কখনো। ভোম্‌রা একা বাঁচার স্বপ্ন দেখেনি। একটা পরিবারের সাধ ছিল তার মধ্যে। বেঁকি তাকে প্রত্যাখ্যান করলে সে আর

অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকায়নি। বরং বেঁকির এই প্রত্যাখ্যানই ভোম্‌রা জীবনটাকে অন্যখাতে বইয়ে দিল। অল্পবয়সে নারীর প্রত্যাখ্যান অন্য আর পাঁচজন সাধারণের মত বিষ বা মদ না খেয়ে, কবিতা না লিখে ভোম্‌রা সাড়ে এগারো আনার কাঁচের চুড়ি কিনে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেছিল। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ফিরি করতে করতে প্রচন্ড খিদেয় পেট যখন জ্বলছিল তখন ভোম্‌রার মনে হয়েছিল যে পয়সা কটা দিয়ে সে হাতে বেঁকির প্রতিরূপে উল্কি করিয়েছিল তা হাতে থাকলে সে কিছু কিনে খেতে পারত। কারণ বেঁকি ভোম্‌রার ভালোবাসাকে কোনোদিনই সম্মান করেনি। কিন্তু ভোম্‌রার এই ভাবনাটুকুই সার। চিরজীবন সে মনে মনে বেঁকিকেই ভালোবেসেছে।

এই প্রেমে উদগ্র কামনার স্ফূরণ ঘটিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার। যৌবনের ধর্মে ভোম্‌রা জড়িয়ে ধরেছিল বেঁকিকে, সেই একই আশ্লেষ বেঁকির বিয়ের দিন ভোম্‌রা যখন কাঁচা চিঁড়ে খাচ্ছিল তখনও ফুটে উঠেছিল। বেঁকির বিয়ে হয়ে যাবার পরও ভোম্‌রার মন একইভাবে বেঁকির প্রতিই আসক্ত ছিল। ছিদামের সাথে বেঁকির বনিবনা না হওয়া, ছিদামের মৃত্যু এবং শেষে বেঁকির দেহব্যবসা, সবকিছুকে নিয়েই বেঁকিকে ভালোবেসেছিল ভোম্‌রা। আর বেঁকি নিজের সর্বস্ব খোয়ালেও গ্রহণ করেনি ভোম্‌রাকে, তার বামন চেহারার জন্য। একদিন নিজের হাতে ভোম্‌রা বেঁকির চেহারার আদলে উল্কি করেছিল, সেটা প্রথমে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। আর শেষে নিজের মনে থাকা বেঁকির অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য নিজের দোকানকে সাথে নিয়ে জ্বলে খাখ্ হয়ে গেল ভোম্‌রা।

ভোম্‌রার আজন্ম দারিদ্র্য কেটে গেলেও ভালোবাসার অপমৃত্যু ঘটেছে বারবার বেঁকির প্রেমের স্বার্থপরতায়। ভোম্‌রার আচরণে ফুটে উঠেছে জীবনের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ-উদগার আর দেহজ-প্রেমের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণবোধ। কল্লোলের যুগলক্ষণ হিসাবে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ‘খাখ্’ গল্পে প্রবল বিরুদ্ধচারিতা এবং অবদমিত ভাববিলাস প্রকটিত।

উমা (দেওয়াল : বিমল কর)

তিন খন্ড ‘দেওয়াল’ উপন্যাসের দ্বিতীয় খন্ডে বিমল কর পাঠকের সামনে আনলেন উমাকে। প্রথম খন্ডে সুধাদের বাড়িকে আবর্তিত হওয়া বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে সূচিত হওয়া কাহিনিতে সুধারা যে বাড়ির দো’তলায় ভাড়া থাকে তারই নিচের তলায় এক বর্ষণমুখর দিনে আসে উমাদের পরিবার। গিরিজাপতি বাবু তার ভাইপো নিখিল এবং ভাইঝি উমাকে নিয়ে সুধাদের বাড়ির একতলায় ভাড়া এসেছিল। প্রথম বিমল কর পাঠকদের সাথে উমাকে পরিচয় করালেন এভাবে,-

> ‘‘উমার চেহারাটা দেখলে চমকেই উঠতে হয়। বিস্ময়ে এবং ভয়ে। মাথায় এতটুকুন- দশ বারো বছরের মেয়ের মতন, কিন্তু গায়ে যেন উনিশ-বিশ বছরের বড়। পা দেখা যাচ্ছিল না, হাত আর

মুখ আর মাথা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। বয়স্ক মেয়ের সবটুকু পরিপুষ্টতা সেখানে। মোটা মোটা গোল হাত, গলাটা ছোট কিন্তু মোটা, মুখ চৌকো ধরণের। সে-মুখ লালিত্যহীন। গালের হাড় বড় প্রখর, ভাঙা চিবুক, চোখ দুটো ছোট, ভোঁতা নাক। উমার নীচের ঠোঁটটা এত পুরু যে ঝুলে পড়েছে, সামনের ক'টা দাঁত সবসময় বেরিয়ে থাকে। সমস্ত মুখখানার চেহারাই এতে যেন আরও কুৎসিত হয়েছে। কেমন যেন নির্বোধ, পশু পশু দেখায়। গায়ের রঙটা কিন্তু ফরসা উমার, বড় বেশি ফরসা, কট্‌কট্‌ করছে। চোখে লাগে।

পাতা-পাড় ঘোর নীল শাড়ি পরে অতটুকুন চেহারার মেয়েটা যখন চৌকাট ছাড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, সুধা আর আরতি তখন চমকে না উঠে পারে নি। জীবনে এ-রকম অদ্ভুত চেহারার মেয়ে তার আর দেখেনি। এ-পাড়াতেই একটা মুচি ছিল, মাথায় হাত তিনেক, গাট্টা-গাট্টা চেহারা, লোকে বলত বামন। উমাও তাই।''[১২৯]

উমার বাবা ছিলেন একজন বিখ্যাত বিপ্লবী। পাঁচবছরের বিবাহিত জীবনে খুব কম সময়ই তিনি স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে কাটাতে পেরেছিলেন। রাজনীতির বলি হয়ে উমার বাবাকে হত্যা করেন গিরিজাপতি দলের নির্দেশ পালনের জন্য। কিন্তু কাজটি করার পর উমার মায়ের উদ্দেশ্যে লেখা উমার বাবার শেষ চিঠিটি পড়ে পাল্টে যায় গিরিজাপতি। তখন থেকেই নিজকৃতকর্মের জন্য গিরিজাপতি উমাদের কাকা হয়ে উঠেছিল। গিরিজাপতি কোনোদিনই আসল সত্যটা উমাদের সামনে প্রকাশ করেননি। আর উমাও কাকাকে যথাসম্ভব সেবাযত্নের ত্রুটি রাখত না। কলকাতায় এসে গিরিজাপতির উপার্জিত অর্থে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উমা সংসার চালাত। কখনো উপর তলায় থাকা সুধাদের যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টাও করত। একা হাতে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করা হোক, প্রতিবেশী আরতির জন্য উল বোনা সবের মধ্যেই উমার সহৃদয়তার ছাপ সুস্পষ্ট।

উমার শারীরিক কদর্যতা দু'বার দু'ভাবে আঘাত দিয়েছে উমাকে। প্রথমবার সে আঘাত পেয়েছে বাসুর থেকে এবং দ্বিতীয়বার অবনীর চিঠিতে। বাসুর সাথে উমার সম্পর্কে অনুক্ত অনুরাগের ছোঁয়া ছিল। কিন্তু সম্পর্কটি পরিস্ফূটিত হবার আগেই শেষ হয়ে যায়। বাসুর উপর কেমন এক আশ্চর্য অধিকারবোধ জন্মেছিল উমার, হয়ত সেটা আরতি এবং রত্নময়ী দু'জনের সঙ্গে সুসম্পর্কের জন্য। কিন্তু বাসুর রাগের মাথায় একটি কথা,-

''....ছেলের বউ নাকি তুমি? .....তাও যদি একটু ভদ্দরলোকের মতন চেহারা হত।''[১৩০]

আর দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা উমার আরও ভয়ঙ্কর। গিরিজাপতিবাবু প্রকৃত পিতৃব্যের কর্তব্য অনুসারেই উমার বিবাহের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। পাত্র নির্বাচন করেছিলেন পরিচিত অবনীকে। কিন্তু অবনী তাতে অসম্মতি জানায়। নিজের অপারগতার কারণই মূলত: নিখিলকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছিল অবনী। কিন্তু চিঠির শেষ অংশটিতে অবনীর লেখাগুলি বড়ই মর্মান্তিক এবং বাস্তব।-

> ''পুনশ্চ: আরও একটা কথা লিখছি। এটা অবশ্য আমার নিজের গায়ে পড়ে বলা। আপনার কাকা আপনার বোনের বিয়ে দিতে ইচ্ছে করেন, কিন্তু এমন বিয়ে শুনেছি ভাল না। মা বলছিলেন, তাঁর এক আত্মীয়ের এই ভাবে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাচ্চা হবার সময় পেট কাটতে হয়। দুজনেই মারা যায়। কয়েকদিন আগেকার কাগজে এই রকম একটা খবর বেরিয়েছে, চোখে পড়ে থাকলে দেখেছেন নিশ্চয়, সেখানেও দুজনে মারা গেছে।''[১৩১]

এই চিঠিটা পড়ার পরই উমা প্রচন্ডভাবে মানসিক আঘাতে ভেঙে পড়ে এবং গায়ে কেরাসিন তেল ঢেলে আত্মহত্যা করতে যায়। কিন্তু শেষ অবধি দেশলাই আর জ্বালাতে পারে না উমা- গিরিজাপতির কথা ভেবে। অসম্ভব দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে উমা। অবনীর চিঠির অংশে স্পষ্ট অবনী শুধু যে নিজেই উমাকে বিবাহ করা থেকে সরে আসছে তা নয়। ভবিষ্যতে উমার মত মেয়েদের বিবাহ দেওয়া একেবারেই অনুচিত সেটাও স্পষ্ট করেছে। উমার বিয়ের পর তার সন্তান-সন্ততির মধ্যেও অস্বাভাবিকতা আসার সম্ভাবনার প্রসঙ্গে গিরিজাপতি আগেই ডাক্তারের সাথে আলোচনা করেছিল। উমা সে বিষয়ে জানত না। এই পরিস্থিতিতে একেই নিজের চেহারা সম্পর্কে বাসুর থেকে প্রথম আঘাত এবং দ্বিতীয়ত: অবনীর প্রত্যাখ্যানে উমার সমস্ত রাগ বা আক্রোশ বা ক্ষোভ গিয়ে পড়ার কথা ছিল গিরিজাপতির প্রতি। কিন্তু এক্ষেত্রে উমা অবনী বা বাসুর মানসিক ক্ষুদ্রতার জন্য গিরিজাপতিকে শাস্তি দিল না। গিরিজাপতিকে উমা সন্তানহারা করল না। উমা বুঝেছিল অবনী বা বাসুর কেউ নয় উমা। তাই তাদের কোনো এক্তিয়ার নেই উমার জীবন নষ্ট করার। আর উমা মারা গেলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে গিরিজাপতির যে কিনা উমার ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করছে। তাই ঔপন্যাসিক শেষপর্যন্ত উমাকে জানাননি যে গিরিজাপতি আসলে উমার পিতৃহন্তা। বরং উমার চোখে গিরিজাপতির অনুতপ্ত প্রকৃত মানব পরিচয়ই প্রতিষ্ঠা পেল পাঠকসমাজেও। তাই শেষপর্যন্ত উমা আর গিরিজাপতি আবার কলকাতার ভাড়াবাড়ি ছেড়ে স্থানান্তরে গমন করে। ভবিষ্যতে উমাই হয়ত হয়ে উঠবে গিরিজাপতির অভিভাবিকা।

কথাশেষ

প্রায় দুই দশক ব্যবধান দুটি চরিত্রের মধ্যে। দুটি চরিত্রের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে,-

i. দুটি চরিত্রই পিতৃমাতৃহীন। দুজনের ক্ষেত্রে আগে বাবা এবং পরে মা মারা যায়।

ii. দুটি চরিত্রই তাদের জন্মস্থান ত্যাগ করে ভাগ্যের অন্বেষণে স্থানান্তরে গমন করতে বাধ্য হয়েছিল এবং পরে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে।

iii. দুটি চরিত্রের জীবনেই প্রেম আসে, যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম মেনে, কিন্তু প্রত্যেকেই ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় তাদের শারীরিক বিকৃতির জন্য।

iv. দুটি চরিত্রই সমাজের চোখে শয়তান নামে একবার না একবার অভিহিত হয়েছেই।

ভোমরা তার খর্বত্ব-জনিত সমাজের ব্যঙ্গ মেনে নিতে না পারলেও উমা সমস্ত কিছুর বাধা পেরিয়ে জীবনকে বেছে নিয়েছে।

অ্যাসিড আক্রান্ত

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর আবমাননার আরেক উদাহরণ নারীর ওপর অ্যাসিড আক্রমণ।এতে শারীরিক দিক দিয়ে নারী যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়,অনেকসময় দেখা যায় মানসিকদিক থেকে আঘাত হয় আরো বেশি গভীর।অধুনা এদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য আইনী অধিকার সুনিশ্চিতকরণ করা হয়েছে।এদের স্থান সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে দেখানোর জন্য দুটি গল্প নির্বাচন করা হল।

অমৃতা (অমৃতা : বাণী বসু)

বাণী বসুর উপন্যাস 'অমৃতা'র নামচরিত্র অমৃতা এক নারীর পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই করে আত্মপ্রতিষ্ঠার নামান্তর। তার শৈশবের সূচনা অসুস্থ মায়ের সেবা-শুশ্রূষায়। মাত্র তিনবছরের দাম্পত্য জীবনেও সে সেবাময়ী। তার মধ্যে থাকা অমৃতত্বের উৎসাহ ঘটে তার সন্তান-সম্ভাবনায়। যদিও অমৃতার জবানি অনুযায়ী তার গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি টান তার তৈরি হয়নি, তার কারণ সেই সন্তান তার স্বামীর আত্মজ, যে স্বামীকে অমৃতা ভালোবাসার স্থান থেকে চ্যুত করতে বাধ্য হয়েছিল যখন স্বামী এবং স্বামীর বাবা-মা তাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে তার গর্ভস্থভ্রূণ অ্যাবর্সান করার চেষ্টা করেছিল। একমাত্র অমৃতার প্রবল মানসিক শক্তিতেই সে তার গর্ভস্থ সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে পেরেছিল সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে।

অমৃতার মধ্যে আসলে মাতৃরূপিণী নারীসত্তা সর্বদা বিরাজ করেছে। যার উপলব্ধি অমৃতা করেছে টুটুলকে জন্মের পর প্রথমবার কোলে নেবার মধ্যে। অমৃতার তার ছেলেকে দেখে তার মায়ের মুখ মনে পড়েছে। যে মায়ের কাছে অমৃতার বাৎসল্য প্রতিবাৎসল্য সম্পর্ক তার প্রথম যথাযথ সম্পূর্ণ মাতৃত্ব নাম পেল টুটুলের জন্মের সাথে। শম্পা অমৃতার সমবয়সী হয়েও বারবার ছুটে আসে অমৃতার কাছে পরামর্শের জন্য। এখানেও অমৃতার ভূমিকা অনেকটাই শম্পার মায়ের মতই। বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের দোলার সাথে সম্পর্কের মধ্যেও দেখেছি অমৃতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপুটে রাশভারী প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী জয়িতা বাগচীও স্নেহময়ী হয়ে ওঠেন অমৃতার সংস্পর্শে। নারীত্বের কল্যাণময়ী মাতৃসত্তার উৎসার সদাসর্বদা প্রবহমান অমৃতার মধ্যে।

বিয়ের তিনবছর অমৃতাকে শ্বশুরবাড়িতে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। মন তাতে সায় না দিলেও মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। শেষে গর্ভস্থ সন্তানের জন্য সে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। যদিও অমৃতার মাতৃত্বের এই রূপ তখনই বোঝেনি অমৃতা। অমৃতার যদি সত্যিই গর্ভস্থ ভ্রূণের সম্পর্কে শুধু তার স্বামীর স্মৃতি থাকত, তাহলে সে সন্তানকে বাঁচানোর জন্য

নিজের প্রাণের ঝুঁকি পর্যন্ত নিতে পিছপা হত হয়ত। স্বামী এবং স্বামীর পরিবার এই সন্তানের জন্য অমৃতাকে যেকোনো বড় বিপদে ফেলতে পারে, এটা জেনেও সে অজ্ঞাতবাসে থেকে নিজের পরীক্ষার পড়া তৈরী করেছে, আসলে সন্তানকে আগলে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত সন্তানের জন্ম, আইনীযুদ্ধ, পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হলেও অ্যাসিড বাল্ব দ্বারা আক্রান্ত হয় অমৃতা। তিনদিন, তিনরাত অসহ্য দহন জ্বালার সঙ্গে লড়াই করে জ্ঞান ফেরার পরই অমৃতা তাই প্রথম উচ্চারণ করেছিল 'টুটুল'- তার সন্তান।

অমৃতার স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা, চাকরির লক্ষ্য সবই তার সন্তানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। রঞ্জন কার্লেকরের দৃষ্টিভঙ্গীতে,

> ''অনেক যন্ত্রণা দেখেছেন রঞ্জন। তাঁর পেশাটা তো যন্ত্রণা দেখারই। কতরকম ভঙ্গি দেখেছেন যন্ত্রণা সইবার। কিন্তু এত সাহস, এমন শান্ত সাহস একটি এই বয়সী মেয়ের- এ তিনি কখনও দেখেননি যেন।ও তো বলছে না একবারও- কেন এমন হল? কেন আমার কপালেই বারে বারে হয়। আমাকে মেরে ওদের কী লাভ? যতদিন ওদের কাছে ছিলাম, ওদের উপকারই করেছিলাম। তাহলে কেন? কিন্তু ও কিছু বলছে না। ফরিয়াদ বুঝি ফুরিয়ে গেছে ওর। ও ধরে নিয়েছে এটাই, এরকমটাই ওর হবে। ও শুধু লড়ে যাচ্ছে। অবশ্যই ডাক্তাররা আছেন, নার্সরা আছেন, শিবানী মাসি আছেন! কিন্তু, শেষ পর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপে ভয়ঙ্কর লড়াইটা তো ওর একারই! অথচ জীবনের কোনও পর্বেই ও নিজের হাতে নির্বাচন তুলে নেয়নি। না বিবাহ, না সন্তানধারণ। এমনকি আইনি-লড়াই ও বিবাহ-বিচ্ছেদও ঘটেছে যেন কারণ ও ফলাফলের স্বাভাবিক যুক্তিতে। যে অত্যাচার, যে যন্ত্রণা ও ভোগ করল, করে চলছে, তার কোনও দায়ভাগ ওর নেই। ও যদি আজ বিমূর্ত নৈর্ব্যক্তিক এই সমাজকে প্রশ্ন করে- কেন? তো করতেই পারে। যদি ছিঁড়ে খুঁড়ে দিতে চায় সব, ধ্বংস চায় তো চাইতেই পারে। তখন কারও কাছে কোনও উত্তর থাকবে না। সমাধান থাকবে না।''[১৩২]

'অমৃতা' উপন্যাসের অনেকগুলি নারীচরিত্র। প্রত্যেকেই যখন আস্থাহীনতায় বিভ্রান্ত-উদ্‌ভ্রান্ত, তখন তাদের মধ্যে অমৃতার দ্যুতিময় অবস্থান। একদিকে শম্পা-সৌমিত্র, একদিকে অমিতাভ-র উপর দোলার অনাস্থা এবং যার ভয়ঙ্করতম প্রতিচ্ছবি রম্ভার ডাক্তারি ছেড়ে দেওয়া এবং শেষে নিজে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞা হয়েও মারণরোগকে পুনরায় ঋতুমতী হয়ে আবার মাতৃত্বের সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে ওঠা। এরই মধ্যে সমস্ত সমস্যার সমাধান অমৃতা। শম্পা বিধবা মায়ের একমাত্র অবলম্বন হওয়ায় বিবাহের পর স্বামী সৌমিত্র এবং শম্পার মায়ের মধ্যে চলা দ্বন্দ্বে শম্পার নিষ্পেষিত অবস্থার সমাধান স্বরূপ উভয়পক্ষের প্রতি অনরক্তি প্রদর্শনের পন্থা দেখাল অমৃতা। অমৃতা নিজে চির অসুস্থ

মা এবং বাবার একমাত্র অবলম্বন। অমৃতার অন্যতম অবলম্বন বিধবা শিবানী দত্ত-এর একমাত্র সুপুত্র সম্পদ প্রবাসী। শিবানী মাসির স্বাবলম্বিতা এবং নিজের মায়ের অসহায়তায় অমৃতা শিখেছে ভাল থাকার মূলমন্ত্র। সংসার হল এমনই জায়গা, যেখানে যে যত অভিনয় করতে পারবে সে তত ভাল থাকবে। অমৃতা নিজে কোনোদিন কারোর মন জুগিয়ে না চললেও এ বোধ যে তার মধ্যে রয়েছে শম্পাকে দেওয়া উপদেশে প্রমাণিত।

অ্যাসিড আক্রান্ত হয়ে বাঁদিকটা বুকের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরো জ্বলে যাবার পর কেবল বাঁ হাতটা বাইরে অংশটা প্লাস্টিক সার্জারি করে ঠিক হয় অমৃতার। অ্যাসিড-বাল্ব দ্বারা আক্রান্ত হবার পর অমৃতার জীবনে ড: রঞ্জন কার্লেকরের উপস্থিতি সবিশেষ হয়ে ওঠে, যদিও যোগসূত্র স্থাপক টুটুল। এক স্নেহবুভুক্ষু পিতৃহৃদয় এবং স্নেহবুভুক্ষু মাতৃহৃদয় টুটুলের মাধ্যমে পরিপূর্ণতার ইঙ্গিতে অমৃতার জীবনবৃত্তে পূর্ণতার আশা করতে পারে পাঠক। অমৃতার উপর সবাই নির্ভর করতে পারে।

ড: রঞ্জন কার্লেকর তাঁর স্ত্রী রম্ভাকে অমৃতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, অন্যান্য কেউ ঘটনার অভিঘাতে শকেই যেখানে হেরে যেত, সেখানে অমৃতা জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে অত্যন্ত স্বাভাবিকতায়। রবীন্দ্রনাথের মতই অমৃতাও যেন নিজের মনের সাথে বোঝাপড়াটুকু করে নিয়েছে,-

''ভালো মন্দ যাহাই আসুক।

সত্যেরে লও সহজে।''[১৩৩]

পুরাণে দেখি সমুদ্র-মন্থনের সময় আগে বিষভান্ড উঠেছিল, তারপর উঠেছিল অমৃত সুধা। বাণী বসুর নায়িকা অমৃতাও জীবনসমুদ্রোত্থিত গরল পান করে দৃপ্ত বলিষ্ঠ মানসিক দার্ঢ্যতায় জয়ী হয়েছে।

ফাতিমা (জ্বলবা: ফণীশ্বরনাথ রেণু)

ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'জ্বলবা' আবৃত হয়েছে ফাতিমাকে কেন্দ্র করে, গল্পকথকের জবানীতে ফাতিমাদি। ফাতিমা সোনাপুরনিবাসী এক মৌলবীর কন্যা হলেও কোনোওরকম ধর্মীয় সংস্কার-গোঁড়ামি দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল না। এমনকি ধর্ম নিয়ে মিঠে রসিকতাও করত সে। শৈশবাবধিই ফাতিমা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করত। প্রকাশ্য জনসভায় পুরুষবেশে সংগ্রামীকর্মীরূপে সাবলীল ছিল ফাতিমা। এ হেন ফাতিমাদি সাথে কথক অজিতের অনেকদিন পর যখন আবার দেখা হল তখন ফাতিমাদির রূপ বোরখা পরিহিতা।

পুরুষবেশে প্রকাশ্যে বক্তৃতাকারী ফাতিমা আর বোরখাবৃত ফাতিমার মাঝে রয়েছে এক ইতিহাস। টাউন হলে ন্যাশন্যালিস্ট মুসলিম কনভেনসনকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া দাঙ্গার হিংস্র উল্লাস ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলেছিল ফাতিমাকে। আহত ফাতিমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখা যায় জান্তব ক্রিয়াকান্ডে ফাতিমার হাতের হাড় ভেঙেছে। আর বদমাশ পশুর দল নারকীয় উন্মাদনায় অ্যাসিডের শিশি পুরো উপুড় করে দিয়েছে ফাতিমার উপর। ফলত ফাতিমার মুখ ঝলসে কালো হয়ে গেছে আর একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে।

বোরখা বা সাম্প্রদায়িক পীড়ন কোনোটাই ফাতিমার 'জলওয়া' তথা ঔজ্জ্বল্য বিবর্ণ করতে পারেনি, অজিতকে এখনও সে সেই 'আজিজ' নামেই সম্বোধন করে। শুধু সম্বোধনমাত্রই নয়, অজিত সত্যিই এখনও ফাতিমার কাছে 'প্রিয়' মানুষ- ভাই, সহকর্মী, সহযোদ্ধা, সহমর্মী, সমব্যথী।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ ফাতিমার একেবারে অল্পবয়সেই। ১৯৩০-এ ঠাকুরবাড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে কুর্তা-পাজামায় ফাতিমা যখন লেকচার দিয়েছিল তখন তার বয়স মাত্র দশ। সেই শুরু, তারপর একের পর এক। ১৯৩৪-এ দেশ যখন ভূমিকম্পপীড়িত তখন গান্ধীজীর পাশে পাশে ছিল এই চোদ্দ বছরের মেয়েটি। তারপর ১৯৩৭-এ জাতীয় সেবাদলে জেলার জি. ও. সি. হিসাবে রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করেছিল। সেখানে স্কুলের মাঠে একদল বিভেদকামী মুসলিম জননেতা গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করলে এই মাত্র সতেরো বছরের কিশোরী মেয়েটি মঞ্চে উঠে প্রকাশ্য জনসভায় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৩-এ 'স্বাধীন সেনা'র হয়ে উত্তর-ভারতের প্রতিটি অলিতে গলিতে জনজাগরণের জন্য প্রচারের কাজ চালিয়েছিল যুবতী ফাতিমা। এরপর ঐতিহাসিক ১৯৪৭। তখনও ফাতিমা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলিষ্ঠভাবে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় লড়াই করেছিল। আর শেষাবধি অন্য আর পাঁচজনের মত পাকিস্তানে চলে যায়নি পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার করে।

স্বাধীন ভারতে বেশ কিছুকাল পরে সুদীর্ঘ ৩৫-৩৬ বছরের ব্যবধানে কথক অজিতের সাথে হঠাৎই পাটনার এক দোকানে সাক্ষাৎ হয় ফাতিমার। কিন্তু এ ফাতিমা কুর্তা পাজামা ও পুরুষের পোশাক পরিহিতা সংস্কারহীন ফাতিমা নয়, পরিবর্তে চোখের সামনে রয়েছেন বোরখাবৃত সনাতন মুসলিম নারী। তাই অজিতের প্রথমে চিনতে অসুবিধা হয়েছিল। সন্দেহ নিরসনের জন্য অজিত দানিশ মঞ্জিলের পুরোনো বাড়িতে যায়। কিন্তু সেখানেও আবার হতাশ হতে হল অজিতকে। যে ফাতিমাদি সোচ্চারে মুক্তকণ্ঠে সবার সামনে মঞ্চে উঠে প্রতিবাদ করত, সেই ফাতিমাদিই আজ অজিতের সাথে কথা বলছেন দরজার আড়াল থেকে! ফাতিমার এই অবগুণ্ঠন আসলে লজ্জার। এ লজ্জা স্বাধীনতা উত্তর সমগ্র ভারতবাসীর লজ্জা। দেশ স্বাধীন হবার পর দেখা যায় যারা এতকাল

নেহেরু, পাটিল, গান্ধীকে গালিগালাজ করত সরাসরি গান্ধীবাদের বিরোধিতা করত, এখন স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পদ অধিকারের জন্য ভোল পাল্টাতে লাগল। যাদের সর্বস্ব ত্যাগের বিনিময়ে দেশমাতৃকা পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হল, স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব মানুষগুলিকেই অস্বীকার করে সুবিধাবাদী মুষ্টিমেয় এই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিজেদের আখের গোছানোর প্রচেষ্টায় উদ্যত হল। এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিফল হয়েছেন ফাতিমা। তার এই লড়াইয়ে কাউকে পাশে তো পায়ইনি উল্টে আবার লোকজনের টীকাটীপ্পনীর স্বীকারও হয়েছে ফাতিমা। লোকে তাকে বলেছে বিয়ে করে সংসারী হতে। কেউ কেউ আবার তাকে মাথার চিকিৎসা করানোর পরামর্শও দিয়েছে। এই লজ্জা থেকে ফাতিমা সরে এসে নিজেকে আড়াল করেছে বোরখার আড়ালে।

বোরখার রং খয়েরি। ফাতিমা নিজেকে আড়াল করে রেখেছে খয়েরি রং-এ। রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেলে তার রং হয় খয়েরি। রক্ত একেবারে শুকিয়ে কালো হয়ে যাবার আগের রং খয়েরি। এই শুকনো রক্তে আবার যদি একটু জল দেওয়া যায় তাহলেই সে হয়ে উঠবে প্রাণতাজা-টকটকে লাল, যেন পানের খয়ের। যা চুনের সংস্পর্শে এসে মুহূর্তে ঠোঁট রাঙিয়ে তোলে। আবার এই খয়েরই অতিরিক্ত কর্কশতায় ক্ষতিকারক হতে পারে। ফাতিমার ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

ফাতিমা এতকাল নিজেকে বোরখার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। যা অজিতের কাছে অস্বাভাবিক লেগেছে। কিন্তু এই ফাতিমার বোরখার আবরণ ছিন্ন করছে তার আদরের প্রিয়তম কুকুর নওমি। আর ফাতিমাও তার আদরের সহপ্রাণ সহযোদ্ধা অজিতকে সেই পুরোনো অধিকারের নাম ‘আজিজ’ নামে ডেকে সমস্ত সন্দেহের নিরসন ঘটিয়েছে।

এই বোরখার আবরণে প্রথমে অজিতকে ‘আজিজ’ সম্বোধন এবং নওমির বোরখার টেনে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলা- ফাতিমার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হবার পর ঘটল টাউন হলের সেই বীভৎস নারকীয় ঘটনা। বোরখাহীন ফাতিমাকে চিনতে অসুবিধা হয়নি দুর্বৃত্তদের। ফাতিমার মধ্যে পুঞ্জীভূত ছাই চাপা আগুন আবার দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে উঠল অনেকদিন বাদে। ফাতিমার এই প্রতিবাদের আগুনে পতঙ্গবৎ ছুটে এল নরপশুরা। কিন্তু কোনো কিছুতেই তারা ফাতিমার ভিতরকার আগুন নেভাতে পারেনি। তাই হাসপাতালের বেডে শুয়ে ফাতিমাদি আজিজকে তার শারীরিক ক্লেশের কথা বলেনি, বলেছে নিজের ভিতরকার ঔজ্জ্বল্যের কথাই।

ফাতিমা আসলে একনিষ্ঠ প্রতিবাদী চরিত্র। রাজনৈতিক বিপ্লব কখনোই সার্থক হতে পারে না সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ব্যতিরেকে। তাই ফাতিমা প্রথাবদ্ধ সামাজিক রীতিনীতি এবং সুবিধাবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে বিপ্লব জানিয়েছিল। একটি মেয়ে বিশেষত সে যখন আবার উঠে আসছে এক

রক্ষণশীল ধর্মসম্প্রদায় থেকে তার সংগ্রামী চেতনা। সে হোক না কেন যতই দেশহিতকর, আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ দেশকে তাদের একচ্ছত্র অধিকার মনে করে গন্ডীর বাইরে বেরিয়ে আসা মেয়েটিকে স্পর্ধাভরে অবজ্ঞা করেছিল। মেনে নিতে পারেনি কোনো মেয়েকে মানুষ হিসাবে- মেয়ে তাদের কাছে অবলাজাতি। যে 'মহামায়ার ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ি কাঁদে' সেই নারীশক্তিকে সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী জনগোষ্ঠী বীরদর্পে পদদলিত করার চেষ্টা করেছে। হীনরাই উচ্চদের ছোট করে নিজেকে বড় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে বড়র পদস্খলন ঘটে না। হীন তার হীনতারই স্মারক আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে মাত্র। ফাতিমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে ফাতিমার অন্তরের আগুন ঔজ্জ্বল্যই প্রদীপ্ততর হয়েছে।

ধর্মসংস্কারহীন মুক্তমনা ফাতিমা তার অজ্ঞাতবাসপর্বে সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছে এক কুকুরছানাকে। কুকুর তো হিন্দুধর্মানুযায়ী ধর্মরাজের বাহন। আর ধর্ম হল তাই যা মানুষকে ধারণ করে থাকে। মানবতা হল সেই ধর্ম। আর ফাতিমা হল প্রকৃত মানবতার প্রতিবিম্ব।

তবে শুধুমাত্র প্রতিবাদের আগুনই নয়, পরিপূর্ণ রসবোধও আছে ফাতিমার মধ্যে। রসিকতার মাধ্যমেই ফাতিমা অপরিচিত মানুষজনেদের মধ্যে খুব সহজেই মিশে যেতে পারে। অজিতের স্ত্রীর সঙ্গে ফাতিমার আলাপ-পরিচয়- সহজ-সাবলীলতা-ঘনিষ্ঠতা ফাতিমার এই বিরল গুণেরই পরিচয়। বোরখার আড়ালে ফাতিমার উচ্চকণ্ঠের হাসির শব্দ ফাতিমার প্রাণবন্ততার পরিচয়। আর এই প্রাণবন্ততাই ফাতিমার সাহসিকতার উৎস। সৎ, চিৎ, আনন্দে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ আগুনের প্রতীক ফাতিমা।

গল্পের সীমিত পরিসরে দীর্ঘ ৩৬ বছরের উত্থান-পতনের বহু রঞ্জিত কাহিনি ফাতিমা। ফাতিমা আসলে সমগ্র ভারতবর্ষের অগ্নিগর্ভ ইতিহাসের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। প্রতিবেশী সাহিত্য থেকে বাংলার সমকালীন সময় পরিসর বোঝাতে চরিত্রটি নির্বাচন করেছি।

কথাশেষ

বাণী বসুর 'অমৃতা' উপন্যাসের নামচরিত্র অমৃতা অ্যাসিড-আক্রান্ত হবার পরও সমান দৃপ্ততায় ভাস্বর। অ্যাসিড-আক্রমণ তো অমৃতার শরীরের উপর হওয়া অত্যাচারের ছবি, অ্যাসিড আক্রমণে অমৃতার শরীরের অর্ধ অংশে রয়েছে দহন-জ্বালা, কিন্তু তার আগে হওয়া অমৃতার উপর মানসিক অত্যাচার, যার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, সেই সমস্ত আঘাত অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে অমৃতা। অমৃতার লড়াই করার মধ্যে এমন এক স্বতস্ফূর্ত সহজ স্বাভাবিকতা রয়েছে, যা শুধু

পাঠককে জাগরিত করে, তাই-ই নয়, অমৃতাকে আদর্শস্থানীয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। স্বাধীনতাপরবর্তী কালের প্রতিবেশী হিন্দি সাহিত্য থেকে নির্বাচিত ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'জলবা' (বাংলা অনুবাদ নাম 'দাহ') গল্পের ফাতিমা সমাজের রক্ষণশীলতা রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়ে অ্যাসিড আক্রান্ত হয়ে সেই রূপবিকৃতির শিকার।

রূপবিকৃতি

গবেষণা অভিসন্দর্ভে প্রতিবন্ধী চরিত্র আলোচনা সাপেক্ষে কয়েকটি এমন চরিত্র নির্বাচন করেছি, যারা দুর্ঘটনায় বা অসুখে রূপবিকৃতির শিকার হয়েছে। অভিসন্দর্ভের নির্বাচিত চরিত্রগুলি হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহামায়া' গল্পের নাম চরিত্র মহামায়া, বনফুলের 'তাজমহল' গল্পের আগ্রা শহরের এক দরিদ্র ভিখারীর মৃত্যুপথযাত্রী বেগম, বিমল করের 'আঙুরলতা' গল্পের প্রভুলাল ও 'জননী' গল্পের এক অতি ক্ষুদ্র পার্শ্ব চরিত্র অনুপমার ছেলে, ড. নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' উপন্যাসের মূল চরিত্র অরুণাংশু। ইন্দ্রিয়জ প্রতিবন্ধকতাজনিত জীবনধারণের সমস্যার সম্মুখীন এরা হয় না। এরা সমাজের চোখে স্বাভাবিক সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষ নন। বামন চরিত্র প্রসঙ্গেও যে কথা বলা যায়। বামনদের উচ্চতা কেবলমাত্র গড়-স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ কম হয়। এরাও সমাজের চোখে ঠিক স্বাভাবিক সাধারণ মানুষ নয়। বামনদের যেমন সমাজ অপাঙ্গদৃষ্টিতে দেখে এই রূপবিকৃত মানুষের প্রতিও সমাজের সেই দৃষ্টিই রয়েছে।

মহামায়া (মহামায়া : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহামায়া' গল্পটি ১৯২১ ডিসেম্বর 'The Modern Review' পত্রিকায় যদুনাথ সরকার কর্তৃক ইংরাজী অনুদিত হয়ে প্রকাশ পায় 'Adament' নামে।এই 'Adament' অর্থাৎ অনমনীয় বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নামটির মধ্যেই সমাজে কৌলিন্য ও সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নায়িকার তেজোদৃপ্ত বলিষ্ঠ চরিত্রটি ফুটে ওঠে। মহামায়া চট্টোপাধ্যায় সম্ভ্রান্ত কুলীন সন্তান। অগ্রজ ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়। বয়স চব্বিশ হয়ে গেলেও এই কুলীন কন্যাটি কুমারী। কিন্তু সৌন্দর্যের কোনো ঘাটতি নেই। অপরূপা সুন্দরী। সাধ্যাতীত ব্যয় ব্যতীত বামনহাটি নিবাসী অনুরূপ কুলশীলমানসম্পন্ন পাত্র জোটেনি মহামায়ার। প্রজাপতি ব্রহ্মার নজর না থাকলেও কন্দর্পদেবের সুনজর থেকে বঞ্চিত হয়নি মহামায়া। তার জীবনেও প্রেম এসেছিল, রাজীব, মহামায়াদের প্রতিবেশী বিদেশী এক যুবক। রাজীবের বাবার মৃত্যুর পর রেশম কুঠির বড়সাহেব তাঁর কর্মচারীর সন্তান রাজীবকে নিজের ছেলের মতই স্নেহ করতেন। এতাবদ রাজীবেরও বিয়ে না হওয়ায় সাহেব ভেবেছিলেন রাজীবও হয়ত সাহেবের মতই চিরকৌমার্যে ব্রতী হবে। কিন্তু মদনরাজার বাণ! খন্ডাবে কিভাবে?

রাজীবকে তার মনের কথা মহামায়াকে জানানোর জন্য অনেক প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল। কারণ মহামায়ার অমিত চারিত্রিক দার্ঢ্য। মহামায়ার দাদার কথাও যেমন ছিল আদেশের সামিল, তেমনি অনুজা মহামায়ার কথাও ছিল অলঙ্ঘনীয়। কথা কমই বলত মহামায়া। ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যই ছিল প্রখর দ্যুতিমান মহামায়ার মধ্যে।

মহামায়া রাজীবের প্রণয় প্রস্তাব শোনা মাত্রই নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিল। রাজীবের কাছে উত্তরটা খুব একটা অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ রাজীব জানতই তার মতন অকুলীন দ্বিজ পাত্র মহামায়ার মতো প্রবল কুলাভিমানসম্পন্ন পাত্রীর পক্ষে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রণয় প্রস্তাব পেশ এবং তা প্রত্যাখ্যাত হওয়া প্রস্তাবকারীর কাছে যতটা না চাঞ্চল্যকর ছিল, তার থেকেও বেশি মানসিক চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল প্রস্তাবপ্রাপক মহামায়ার মানসজগতে। আসলে মহামায়া নিজের চারপাশে এক অদৃশ্য বেড়াজাল তৈরি করে রেখেছিল। তাই রাজীবের প্রণয়প্রস্তাব মহামায়ার কাছে ছিল এক স্পর্ধাস্বরূপ। মহামায়ার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াই ছিল রাজীবের এই স্পর্ধার কারণ মহামায়ারই হয়ত কোনো ব্যবহার। মহামায়ার গাম্ভীর্য, তার চারিত্রিক আবরণ মহামায়ার স্বরচিত।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে সহোদর-সহোদরার সমমানসিকতার পরিচয় আছে। মহামায়া ও তার দাদা ভবানীচরণ- সবাই বলে ভাই বোন এক প্রকৃতির। এরা দুজনেই মুখে কোনো কথা না বললেও চারিত্রিক তেজোদৃপ্ত মানুষ। দাদা এতদিন বিবাহ করেননি। কি তার কারণ জানা যায় না। ভবানীচরণের কথা কেউই কোনোদিন অগ্রাহ্য করতে পারেনি। মহামায়াও তাই। চিরদিন মহামায়াও অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। দাদার মতই চারিত্রিক দার্ঢ্যাবরণ রয়েছে মহামায়ার মধ্যেও।

প্রণয় প্রস্তাবের সময় মহামায়া-রাজীবের আলোচনা সম্পূর্ণ হবার আগেই মন্দিরে মহামায়ার খোঁজে পৌঁছে যান ভবানীচরণ। রাজীব-মহামায়া দুজনকে একসঙ্গে দেখে কোনো কথা বলেননি ভবানীচরণ। কিন্তু তার নীরব দৃষ্টিই যা বলা বলে দিয়েছে। ভবানীচরণের উপস্থিতিই মহামায়া চরিত্রের মোড় বদল ঘটাল। এতক্ষণ যে মহামায়া রাজীবের প্রণয় প্রস্তাবকে নীরবে ভর্ৎসনা করেছে সেই মহামায়াই দাদা ভবানীচরণের সঙ্গে নিঃশব্দে মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় সোচ্চারে রাজীবকে জানিয়ে গেল যে মহামায়ার জন্য যেন অপেক্ষা করে রাজীব, মহামায়া রাজীবের ঘরেই আসবে।

মহামায়ার মনেও প্রেম এসেছিল। কিন্তু এক কঠিন কৌলিন্যের সংযমে তাকে বিকশিত রূপ দিতে পারেনি মহামায়া। সেই অতি কাঠিন্যের কশাঘাতেই সেই আবরণ ভেঙ্গে পড়ল। মহামায়ার একদিকে দাদা ভবানীচরণ, আর একদিকে রাজীব। ভবানীচরণ চিরকাল শাসন করেছে মহামায়াকে। আর রাজীব নিজেই মহামায়ার শাসন মেনে নিতে এসেছে। মহামায়া মেনে নিল রাজীবকে।

সেইদিন রাত্রেই ভবানীচরণ লাল চেলি পরিয়ে মহামায়ার সাথে বিয়ে দিল গঙ্গাঘাটে মৃত্যুপথযাত্রী এক মুমূর্ষু বৃদ্ধের সঙ্গে। মহামায়া কোনো বাধাই দিল না এ বিবাহে। প্রত্যাশা মতই বিবাহের ঠিক পরের দিনই বিধবা হল মহামায়া। বিবাহটা ছিল মহামায়ার কাছে এক দুর্ঘটনামাত্র।

তাই বৈধব্য সংবাদ মহামায়ার কাছে কোনো দুঃখের বার্তা নিয়ে এল না। স্বামীর চিতায় মহামায়ার সহমরণের উৎসবের ধুমধাম অনুষ্ঠান শুরু হল।

মহামায়ার হাত-পা বেঁধে চিতায় সমর্পণ করে যথাবিধ অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল। চিতার আগুনও বেশ প্রজ্জ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা মহামায়ার শরীর লেহন করতে শুরুও করেছিল। এখনও মহামায়া নিশ্চুপ। কোনো প্রতিবাদে সোচ্চার হতে শেখেনি মহামায়া। চিরকালই নীরব মহামায়া। মহামায়ার মনের মধ্যেকার প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি রূপ পেল প্রকৃতির খেলায়। দাউ দাউ করে চিতা যখন জ্বলছে হঠাৎই প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। শ্মশানযাত্রীরা সবাই গঙ্গাযাত্রীর ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। প্রচন্ড ঝড়জলের দাপট থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঘরের দরজাও বন্ধ করে দিল। বলাই বাহুল্য, চিতানলও আস্তে আস্তে নিভে যেতে শুরু করেছে। আর মহামায়া! স্বভাবসিদ্ধতায় তখনও সে স্থবির। চিতানল মহামায়াকে জাগতিক বন্ধন থেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে না পারলেও যে রজ্জুবন্ধনে বদ্ধ করে মহামায়াকে সহমরণের চিতায় নিক্ষিপ্ত করা হয়েছিল সেই বন্ধনরজ্জু ইতিমধ্যে চিতানল ভস্মীভূত করতে পেরেছে। অসহ্য দাহযন্ত্রণায় বৃষ্টিস্নাত মহামায়া উঠে বসে মুক্তহস্তে পায়ের বন্ধন মুক্ত করল। তারপর স্থানে স্থানে দগ্ধ বস্ত্রখন্ডই জড়িয়ে উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা ত্যাগ করে নিজের ঘরে এল।

প্রসঙ্গত মনে পড়বে 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কাদম্বিনীর কথা। কাদম্বিনীও শ্মশান থেকে ফিরে এসেছিল। কাদম্বিনীর চিতায় অগ্নি সংযোগ হবার আগেই প্রচন্ড ঝড়জলের মধ্যেই শ্মশানভূমি ত্যাগ করেছিল কাদম্বিনী। তবে কাদম্বিনী নিজের ঘরে ফিরে আসেনি। কারণ কাদম্বিনী ভাবতে পারেনি যে সে বেঁচে আছে। আর মহামায়া দগ্ধক্ষত প্রতিমুহূর্তে তাঁর বেঁচে থাকার প্রমাণ দিচ্ছে।

মহামায়া জ্বলন্ত চিতা থেকে উঠে নিজের ঘরে এসে প্রদীপের আলোয় নিজেকে আয়নায় দেখল। প্রথম দর্শনের আঘাত নিতে পারল না মহামায়া। হাত থেকে দর্পণ মাটিতে পতিত হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। মহামায়ার খন্ড-বিখন্ড মানসিক অবস্থাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে দর্পণে। চিতা থেকে উঠে আসা মানবীর বিকৃত মুখশ্রী নয় ক্ষতবিক্ষত মানুষীর রূপ রূপকায়িত হয়েছে ভূপতিত দর্পণে। মহামায়া এরপর তার মুখের উপর এক দীর্ঘ ঘোমটা টেনে দিয়ে অদূরবর্তী রাজীবের ঘরে এল।

মহামায়া রাজীবকে বলেছিল তার জন্য অপেক্ষা করতে। রাজীবও সেই জন্য অপেক্ষা করেছিল তার ঘরে। মহামায়া তার কথা রেখেছে। এসেছে রাজীবের ঘরে। অঙ্গীকার পালন করতে এসে অঙ্গীকার পূরণ করার পথে রয়ে গেল আরও একটি শর্ত। মহামায়া রাজীবকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাল যে রাজীবের সাথে মহামায়া থাকতে পারে যদি রাজীব মহামায়ার অবগুণ্ঠন কোনোদিন মোচন

না করে। রাজীবের কাছে মহামায়ার জীবনই ছিল প্রধান। তাই মহামায়ার সমস্ত শর্তই চিরকালের মতই রাজীব আজও শর্তহীনভাবেই মেনে নিল। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রইল গঙ্গা-শান্তনুর কাহিনিটি।

একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষের দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কেটে যখন চাঁদ দেখা দিল তখন স্বপ্নচালিতের মতই রাজীব হঠাৎই মহামায়ার শয়নমন্দিরে উপস্থিত হয়ে অবগুণ্ঠনহীন মহামায়ার মুখখানি দেখতে পেল। মহামায়ার অগ্নিদগ্ধ মুখখানি দেখে হয়ত অজান্তেই রাজীবের অব্যক্ত ধ্বনি স্ফুরিত হয়েছিল। আর তাতেই মহামায়ারও নিদ্রাভঙ্গ হল। রাজীব তার প্রতিজ্ঞা না রাখতে পারার জন্যই ক্ষমা চাইল মহামায়ার কাছে। কিন্তু মহামায়া চিরদিনের মতই নিঃশব্দে ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাজীবকে ত্যাগ করে চলে গেল। ঠিক যেমন শান্তনুকে ত্যাগ করেছিল গঙ্গা।

আগুনের লেলিহান শিখা মহামায়ার বাঁদিকের গাল থেকে কিছু অংশ মাংসপিন্ড গ্রাস করেছিল। এই বিকৃত রূপ মহামায়া নিজেই মেনে নিতে পারেনি। তাই জন্যই রাজীবের জীবনে আসার সময়ই সে রাজীবকে বলেছিল এই মহামায়া আর আগের মহামায়া নেই। মহামায়ার সৌন্দর্য হৃত হয়েছে। কিন্তু সর্বগ্রাসী আগুন মহামায়ার মনকে ছুঁতে পারেনি। অগ্নিদগ্ধ হবার আগের যে মহামায়া রাজীবের ঘরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই মন নিয়েই মহামায়া আজ রাজীবের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজীব আর মহামায়ার মিলনের পথে আগে বাধা ছিল কৌলিন্য। মহামায়া চিতানলে সে কৌলিন্যকে আহুতি দিয়ে এসেছে। কিন্তু এখনও তাদের মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে রইল এক অবগুণ্ঠন। 'রাজা' নাটকে রাজা এবং রানির মিলনের পথে অন্তরায় হয়েছিল রাজার কুদর্শন। কিন্তু শেষাবধি সেই অন্তরায় অন্ধকার গৃহকোণ উত্তীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এখানে মহামায়া সেই বাধা উত্তীর্ণ হতে পারল না। ছোটগল্প পাঠের অতৃপ্তি নিয়েই মহামায়ার গৃহত্যাগে কাহিনির সমাপ্তি।

'মহামায়া' আসলে স্ত্রীস্বাধীনতার পরিপন্থী কৌলিন্য প্রথার নির্মম প্রতিচ্ছবি। মহামায়ার দাদা ভবানীচরণ শুধুমাত্র বংশগৌরব এবং কৌলিন্যপ্রথাকে বাঁচানোর জন্য নিজের সুযোগ্যা বোনের পাত্র নির্বাচন করেছিল অকুলীন ব্রাহ্মণের পরিবর্তে মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষু বৃদ্ধকে। বিবাহের সময় বিবাহস্থলে অদূরে বাসরঘরের বদলে সাজানো ছিল দুটি চিতা, নবদম্পতির জন্য। অর্থাৎ শুধুমাত্র কৌলিন্যই নয়, সতীদাহ প্রথা-সহমরণ কি নিষ্ঠুরভাবে মানুষের মর্মচেতনাকে গ্রাস করেছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। সমাজ অনুশাসনের নিগড়ে অসহায় মহামায়া কৌলিন্যপ্রথা এবং সহমরণ মেনে নিলেও উনিশ শতকীয় নবজাগ্রত মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত রবীন্দ্র-নায়িকা তার প্রবল ব্যক্তিত্বে পোড়া চিতা থেকে উঠে এসে দগ্ধরূপ নিয়েই বাস করেছে তার ভালোবাসার সঙ্গে। তবে রবীন্দ্রনাথ মহামায়াকে করুণার পাত্রী করেননি। শর্তসাপেক্ষে মহামায়া প্রেমিকের সঙ্গে ততদিনই বাস করেছে যতদিন প্রেমিক মহামায়ার আপোষ শর্ত মেনে চলেছে। শর্তভঙ্গের সাথে সাথে গঙ্গা যেমন শান্তনুকে ত্যাগ

করে চলে গেছিলেন মহামায়াকেও তার অন্যথা করাননি রবীন্দ্রনাথ। ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত দগ্ধ প্রেমের প্রতীক মহামায়া। নারীজীবনের স্বাভাবিক ফসল হিসাবে মহামায়ার জীবনেও প্রেম এসেছিল। কিন্তু তাকেও সে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার প্রবল ব্যক্তিত্ব দ্বারা। হৃদয়-দৌর্বল্য দ্বারা প্রেমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি মহামায়া।

ফকির শা-জাহানের বেগম (তাজমহল: বনফুল)

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'অদৃশ্যলোক' গ্রন্থের (প্রকাশকাল ১৯৪৬) অন্তর্ভুক্ত অনুগল্প 'তাজমহল' গল্পের নামকরণে মোঘল ইতিহাস থাকলেও প্রকৃতপক্ষে গল্পটিতে এক বৃদ্ধ দম্পতির পারস্পরিক ভালোবাসার সৌধ নির্মাণ চিত্রিত হয়েছে।

আগ্রা শহরে বসবাসকারী এক হতদরিদ্র বৃদ্ধ দম্পতি ফকির শা-জাহান ও তার স্ত্রী। বেগম সাহেবা গুরুতর অসুস্থ। প্রায় বিকলাঙ্গ। মুখের একটা দিক পুরো পচে গেছে। ডানদিকের গালটা গলে গেছে। ফলত দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে আসে। আর পচা শরীরের দুর্গন্ধে কাছে ঘেঁষা যায় না। অসুস্থ স্ত্রীকে বৃদ্ধ স্বামী পিঠে ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। বেগম সাহেবার পচাগলা শরীর প্রচন্ড দুর্গন্ধ ছড়ানোয় হাসপাতালের বাইরে এক গাছতলায় তার স্থান হয়। কথক ডাক্তারবাবুর বর্ণনায় জানতে পারি কি অম্লান প্রেম-নির্ভরতা-ভালোবাসা এই দুটি মানুষের হৃদয়ে।

বেগম সাহেবার চিকিৎসা চলতে থাকে গাছতলাতেই। ইনজেকশন চলছে নিয়মিত। পাশে রয়েছেন স্বামী। এক মুষলধারে বৃষ্টিতে স্ত্রীকে আচ্ছাদন দেবার জন্য স্বামী একটা চাদরের দুটি খুঁট গাছের দুটো ডালে বেঁধে বাকি দুটো ডাল নিজে দু'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ভিজছেন। আর স্ত্রীর বিকৃত আধখানা মুখেও রয়েছে এক অমলিন হাসি। এ হাসি জীবনের প্রতিটি রূপ-রস-গন্ধ শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ করার হাসি। এ হাসি জীবন জয়ের হাসি। স্বামীর কাতর প্রশ্ন স্ত্রীকে আর সুস্থ করে বাঁচাবার কোনো উপায় আছে কিনা। কিন্তু ডাক্তাররা এ রোগীকে জবাব দিয়ে গেছেন। তবুও স্বামী শেষ প্রাণবিন্দু পর্যন্ত স্ত্রীকে সেবা করার যত্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন।

ডাক্তারের কাছে জবাব পেয়ে যাবার পর এই বৃদ্ধ দম্পতিকে আর গাছতলায় পরদিন থেকে দেখতে পাননি কথক ডাক্তারবাবু। আবার ডাক্তারবাবুর সাথে দেখা হয় ফকির শা-জাহানের এক দুপুর রৌদ্রে। প্রচন্ড তাপপ্রবাহেও বৃদ্ধ কিছু ভাঙা ইট আর কাদা দিয়ে স্ত্রীর কবর তৈরী করছেন। ডাক্তারবাবুর কাছে যখন বৃদ্ধ জানতে পারলেন স্ত্রীর আর সুস্থ হবার সম্ভাবনা নেই তখন স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে নিজেদের আস্তানায় সম্ভবত জীবনের শেষদিনগুলি কাটালেন। অসুস্থ মুমূর্ষু যে রোগীর কাছে

দুর্গন্ধে মানুষ আর কাছে ঘেঁষতে পারছে না সেই বেগমের মুখের বীভৎস হাসিই এখনও ফকির শা-জাহানের জীবনীশক্তি।

মুসলমানী রীতিতে মৃত্যুর পর গোর দেওয়া হয়। আগ্রার প্রেক্ষাপটে গল্পটি রচিত। এই বিকৃতদর্শন বেগম সাহেবার কবরের পশ্চাতে রয়েছে পৃথিবীবিখ্যাত তাজমহল। সম্রাট শা-জাহানের সুন্দরী বেগম সাহেবা যার মধ্যে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত। এই তাজমহল একই সঙ্গে সম্রাট শা-জাহানেরও বৈভব-প্রতিপত্তির স্মারকও বটে। দুই কবরস্থানের মধ্যে বনফুল এক অসাধারণ বৈপরীত্যের চমক ঘটিয়েছেন।

* একদিকে পূর্ণিমার রাতের তাজমহলের নেশাধরানো সৌন্দর্য, অপরদিকে দুপুরের গনগনে রোদে ফকির শা-জাহানের তাজমহল নির্মাণ।
* একদিকে অজস্র পাথরের ইমারত তাজমহল পাশাপাশি ভাঙা ইঁটের টুকরো আর কাদা দিয়ে গড়া ফকির শা-জাহানের বেগমের কবর।
* মমতাজ বেগমের অপরূপ সৌন্দর্য, বৈপরীত্যে বীভৎস দর্শন ফকির বেগম সাহেবা।
* সম্রাট শা-জাহান; ফকির শা-জাহান।
* একদিকে তাজমহলের বিরাট ইমারতের ভিত্তিতে অগণিত কারিগরদের রুধিরাশ্রুবিন্দু; অপরদিকে দরিদ্র বেগম সাহেবার কবরের ভিত্তিতে দরিদ্র অসহায় স্বামীর ভালোবাসার অশ্রুবিন্দু।
* বেগম সম্রাজ্ঞীর স্মৃতিসৌধে ঈশা খাঁর কর্তিত-অঙ্গুষ্ঠ; আর ভিখিরি বেগমের স্মৃতিসৌধে স্বামীর 'স্বেদমকরন্দ'।

সম্রাট শা-জাহান নিজের মৃত্যুর পর প্রিয়তমা মমতাজ বেগমের কবরের পাশেই অন্তিম শয্যার বাসনা জানিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর তার সেই মনস্কামনা অপূর্ণ থাকেনি। সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগম মৃত্যুর পরও তার স্বামী সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। আর গল্পের বেগম সাহেবা! তাঁর বা তাঁর স্বামীর সেরূপ কোনো ইচ্ছা প্রকাশ্যে আসেনি। কারণ কি তাদের সে স্বপ্নপূরণ করার অভাব? নাকি বেগম সাহেবার তার স্বামীর প্রতি অটল বিশ্বাস ও প্রেম? স্বামী ও স্ত্রী তাঁরা জীবৎকালেই একে অপরের পরিপূরকরূপে থেকেছে। জীবনের পরপারে কি আছে তা কি বলা যায়? জীবনের অপর রূপ হয়ে উঠেছেন ফকির শা-জাহানের বেগম সাহেবা।

লক্ষ্যণীয়, প্রচন্ড বৃষ্টির দিনের সেই চিত্র। যখন বেগম সাহেবা মৃত্যুপথযাত্রী, ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেছেন, তাও স্বামী খোলা মাঠের মধ্যে স্ত্রীকে বৃষ্টির তোড় থেকে রক্ষা করার জন্য চাদরের খুঁট

ধরে হাপুস ভিজছে। তখনও কিন্তু বেগম সাহেবার মুখে রয়েছে হাসি। গল্পকারের ভাষায় 'বীভৎস' হাসি। হাসির এই বীভৎসতা দুটি ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ। এক শারীরিক বিকটতা যা সাধারণ মানুষের মনে জুগুপ্সার জন্ম দেয়। আর অপরদিকে, যতই হোক তা ভয়াল, প্রাণের মানুষটির হাসিমুখ প্রাণের দোসরের জীবনীশক্তি। নতুবা বেগমসাহেবার স্বামীটিরও তো বয়স হয়েছে যথেষ্ট। বৃদ্ধ নিজেই বয়সের ভারে ন্যুব্জ। কিন্তু তবুও স্ত্রী আপাত শারীরিক বিকটতা তাদের ভালোবাসার কাছে ফিকে হয়ে গেছে। দরিদ্র বৃদ্ধটি প্রকৃতই শা-জাহান হয়েছেন তাঁর বেগমসাহেবার জন্য। আর জীবনসঙ্গী বেগমসাহেবাকে হারিয়ে এই শা-জাহান আজ প্রকৃতই ফকির শা-জাহান! একদিকে মহাঐশ্বর্যশালিনী সম্রাজ্ঞী মুমতাজ- তার সৌন্দর্য, আরেকদিকে ভিখারী বৃদ্ধের মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রী- অসুখে বিকৃতরূপী ; মানবিকতা হৃদয়বত্তায় ইতিহাসের সম্রাটকে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসন নিয়েছে বাস্তবের বৃদ্ধ শাহজাহান- তার বিকৃতরূপী বেগমের জন্য।

প্রভুলাল (আঙুরলতা : বিমল কর)

বিমল করের বিভিন্ন গল্পে মৃত্যু বারবার ঘুরে ফিরে আসে। 'আঙুরলতা' (শারদীয় দেশ, অক্টোবর ১৯৫৬)গল্পটিরও সূচনায় রয়েছে মৃত্যু। মারা গেছেন নন্দ চক্রবর্তী। স্বাভাবিক মৃত্যু। তার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে আঙুরলতার ঘরে। নন্দ চক্রবর্তীর দেহ সৎকার করতে হবে।সৎকার না করলেও হয় অবশ্য। কারণ বেশ্যাপল্লীতে এরকম ঘটনা আকছারই ঘটে। কিন্তু আঙুরলতা চায় দেহটি যথাযথ সৎকার করতে। হাজার হোক ব্রাহ্মণের মরা বলে কথা। তাকে কি আর মেথর মুদ্দফরাস দিয়ে বাইরে টেনে ফেলে দিয়ে আসা যায়।

আঙুরলতা বেশ্যাপল্লীর এক অতি সাধারণ বেশ্যারমণী। তার কাহিনিবৃত্ত আবর্তিত হয়েছে একেবারেই চেনা পরিচিত ছকে। আঙুরলতার জীবনের প্রথম খদ্দের ছিল নন্দ চক্রবর্তী। জীবনে প্রথম পুরুষ হওয়ায় দু'জনের মধ্যে প্রথমদিকে বেশ একটা ভালোবাসার রং লেগেছিল। বছর খানেক দুজনে স্বামী-স্ত্রীর খেলাও খেলেছে। তারপর সময় গড়িয়েছে। আঙুরলতার জীবনে অনেক খদ্দের এসেছে। আজ আঙুরলতা মধ্যবয়স্কা। শরীরে বাসা বেঁধেছে অসুখ। তাই আর বেশি খদ্দের নিতে পারে না আঙুরলতা। পয়সারও তাই বেশ টানাটানি।

নন্দর সৎকারের জন্য আঙুরলতা তাই প্রথমে নিজের জমানো পয়সার জোগাড় করল। কিন্তু তা বড়ই অল্প। এরপর বেশ্যাপল্লীর লোকজনের সাহায্যের সন্ধানে যায়। আতার কাছে নিজের পুরানো শাড়ি বিক্রি করে কিছু পায়। হিমুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করে। সব মিলিয়ে জোগাড় হল ছয় টাকা। কিন্তু বিশু জানায় এই সব মিলিয়েও মরা পোড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় টাকা ভাঁড়ারে কম পড়বে। তখন আঙুরলতা হাত পাতে ভোটের সময় প্রার্থীর হয়ে ভোট চাইতে আসা মুন্সীর

কাছে। কিন্তু সেখানে সে বিফলকাম হয়ে ফিরে আসে। অগত্যা এবার তো তার নিজের গতরই ভরসা। অসুস্থ হলেও ঘরে খাটের নিচে মরা পড়ে থাকলেও সেই দেহ সৎকারের জন্যই খাটের উপরে আঙুর দেহদান করতে বাধ্য হল প্রভুলালকে- সৎকারের প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড়ের উদ্দেশ্যে।

প্রভুলাল রাস্তার ধারে সাজানো গোছানো আতরের দোকানে বসে। লোকটা কামুক। আঙুর জানে,-

''ওকে দেখলে প্রভুলালের শরীরটা কেমন কিলবিল করে ওঠে। যেন জ্বর লেগে যায়।দাঁত, মুখ, চোখ,গা-সব যেন কসকস করে,কাঁপে ভেতর ভেতর; টসটসিয়ে ওঠে। তখন লোকটার একটা চোখ চকচক করে, ভীষণ চক-চক,''[১৩৪]

মানসিক বিকৃতির প্রকাশ প্রভুলালের শরীরেও প্রকটিত,-

''অন্য চোখটা- যেটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে,ঝুলে পড়েছে, মাছের পিত্তির মতন গলাগলা, সবুজ-সেটা যেন আরও কুচ্ছিত হয়ে ওঠে। প্রভুলালের কালো কুচকুচে ফোলা ফোলা মুখ থেকে দাঁতগুলো তখন যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। জিভ দিয়ে লাল পড়ে।''[১৩৫]

''লোকটাকে কী ঘেন্নাই করত ও; প্রভুলালের কালো কুচকুচে, থলথলে মোটা, ভোঁদরের মতো শরীর- আর ওই কুচ্ছিত মুখ, মাছের পিত্তির মতন গলাগলা একটা চোখ, যেটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে- দেখলেই আঙুরের গায়ে কাঁটা দিত, ঘিন ঘিন করত সারা গা, ভয় ভয় লাগত। বেশিক্ষণ তাকাতে পারত না লোকটার দিকে''[১৩৬]

ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে লোকটাকে কোনোদিন কাছেই ঘেঁষতে দেয়নি আঙুর। যার সম্পর্কে আঙুরের অভিব্যক্তি ছিল,-

''মাগো, ওই লোকটার সঙ্গে কি শোয়া যায় নাকি? আঙুর তাহলে মরেই যাবে।''[১৩৭]

আর নন্দর দেহ সৎকারের পয়সা জোগাড় করার জন্য সেই প্রভুলালই তার শেষ ভরসা। উল্টে এই পরিস্থিতিতে আঙুর ভাবছিল-

''প্রভুলালও যদি মাথা নাড়ে। না বলে।''[১৩৮]

প্রভুলাল অত্যন্ত ধূর্ত মানুষ। পরিবেশ পরিস্থিতির যথাযোগ্য সুযোগ নিতে সে মোটেই ভুল করে না। প্রথমে টাকাটা নেবার জন্য আঙুরলতা বেশ কিছু মিষ্টি কথা ছলাকলায় ভোলাতে চেয়েছিল

প্রভুলালকে। কিন্তু সে হিসাবী। নিজেরটা বুঝে নিতে ভালই জানে। তার উপর প্রভুলালের অনেকদিনেরই নজর ছিল আঙুরের প্রতি-

''শালা কী চোচ্ যে আছে তুমার বাস্তে।''[১৩৯]

আঙুরের ছলাকলায় তাই ভুলল না প্রভুলাল। বরং আঙুরের শারীরিক বিভঙ্গে-

''প্রভুলালের চোখ চকচক করছে,''[১৪০]

আর তারপর -

''ঠেলে বেরিয়ে আসা মাছের পিত্তির মতন প্রভুলালের চোখটা যেন গলে গলে পড়ছিল।''[১৪১]

শেষ পর্যন্ত প্রভুলাল বুঝতে পারে আজ আঙুরলতা তার কাছে এসেছে নিতান্তই ফাঁপরে পড়ে। নতুবা আঙুর তো চিরকালই এড়িয়ে যেত প্রভুলালকে। তাই সে তার বহুদিনের জমে থাকা কামবাসনা চরিতার্থ করার সুযোগের সদ্ব্যবহার করল।

''কিরপা থোড়ি কুছ হো যাক আঙুগুরী।''[১৪২]

দোকান বন্ধ করে যখন প্রভুলাল এল আঙুরলতার ঘরে-

''প্রভুলালের চোখ লালচে, চকচকে। মাছের পিত্তির মতন চোখটা যেন গলেই গেল। ওর নাকের নিশ্বাসে হিসহিস শব্দ। লাল দাঁতগুলো তৈরি, খাবারটা পেলেই যেন চিবিয়ে চুষে সাবাড় করে দেয়।''[১৪৩]

আঙুরলতা দেহজীবী। দেহই তার জীবিকা নির্বাহের উপায়। বহু পুরুষের শরীরের জান্তব ক্ষুধা নিবৃত্তিই তার কাজ। কিন্তু তবুও তাদের জীবনেও আছে নন্দ, আসে প্রভুলাল। নন্দ চক্রবর্তীর মত মানুষের সাথে বাঁধা মেয়েমানুষ হওয়া সত্ত্বেও কদিনের জন্যও মনগড়া স্বামী-স্ত্রী খেলায় ব্যাপ্ত হতে পারে আঙুরলতারা। কিন্তু প্রভুলাল সে তো শুধুমাত্রই ভোগ করতে এসেছিল আঙুরলতাকে। চিরদিনই আঙুরের প্রতি তার একটা নজর ছিল। কিন্তু তাতে কোনোদিনই ভালোবাসার কোনো ছিটেফোঁটাও ছিল না। এতদিন পর আঙুরকে পেয়ে প্রভুলাল-

''একটা ভাগাড়ের খ্যাপা কুকুর দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে,''[১৪৪]

খাওয়ার মত ভোগ করল তাকে। আর শেষে-

''প্রভুলাল খুশী। আঙুর হাত পাতলো। চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খেয়ে যেমন হোটেলের দাম মেটায় মানুষ-তেমনি; ঠিক তেমনি আরও দু'খিল্লি পান জর্দা মুখে দিয়ে, রুপোর দাঁত-খোঁটা কাঠিটা দিয়ে

দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আটটা টাকা দিল প্রভুলাল হেসে হেসে। আঙুরের গালটা আর একবার টিপে দিয়ে চলে গেল।'' [১৪৫]

প্রভুলাল আঙুরকে প্রথমে তার দোকানে আসতেই জানতে চেয়েছে যে এখন আর তাকে বেশি দেখা যায় না কেন, কিন্তু একবারও খোঁজ নেয়নি আঙুরের শারীরিক সুস্থতা-অসুস্থতা নিয়ে। অসুস্থতার কারণে ডাক্তারের কড়া নির্দেশে আঙুর যে আজকাল আর নিজের দু'বেলা দুমুঠো ডাল-ভাতের জোগাড়টুকু ছাড়া আর বাকি অতিরিক্ত কিছু কাজ করত না। সে খবর নজর থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন জানতে চায়নি প্রভুলাল। তার চোখ তার এই কদর্য মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। প্রভুলাল যখন যেতে চাইল আঙুরের ঘরে তখন আঙুর চমকে উঠে অন্যঘর খোঁজার কথা বলে। হিসাবী প্রভুলাল সাথে সাথে আঙুরকে বলে যে টাকা নেবে আঙুর আর ঘর খুঁজবে প্রভুলাল। এখানে প্রভুলালের কামাতুর মানসিকতার থেকেও বড় হয়ে উঠেছে সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তি। একবারও প্রভুলাল জানতে চায়নি আঙুরের ঘরে কোনো অসুবিধা আছে কিনা। আঙুরের ঘরে প্রবেশ করে দেখে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। সেখানেও প্রভুলাল জানতে পারল না ঘরে অন্ধকারের কারণ কী। তেল হীনতা, নাকি আঙুরলতার শতচ্ছিন্ন দারিদ্র্যের পরিচয়বাহী পোশাক, নাকি তাদের রমণশয্যার নিচে থাকা নন্দ চক্রবর্তীর মৃতদেহ। আর সঙ্গমকালে শয্যাসঙ্গীর মন প্রভুলালকে কামনা করছে না বরং আঙুরলতার মন নন্দ চক্রবর্তীর মৃতদেহের যথাযথ সৎকারের পরিকল্পনা করছে।

প্রভুলাল বিকৃতদেহী শুধু নয়, তার বিকৃতমন বিকৃতদেহরূপেই প্রতিফলিত। বিমল করের লেখনীতে প্রভুলালের চোখ বিভিন্নসময়ে তার মনেরই পরিচয় দিয়েছে। প্রভুলাল চরিত্র সৃষ্টি আসলে আঙুরলতার চরিত্র চিত্রণের একটা মোক্ষম অবলম্বন বিমল করের কাছে। গল্পটির চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণ থেকেই বোঝা যায় লেখকের আসল উদ্দেশ্য আঙুরলতার চরিত্রের বহুমাত্রিকতা স্থাপন করা। একজন বেশ্যা আঙুরলতার নন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে দাম্পত্য-খেলা এবং নন্দ চক্রবর্তীর মৃত্যুতে আঙুরলতার ব্রাহ্মণের মৃতদেহ যথাবিধ রীতি অনুসারে সৎকার করতে চাওয়ার মধ্যে যে মানবিকতার উৎসার ঘটেছে, তার যথাযথ স্ফুরণ ঘটেছে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য টাকা জোগাড় করার জন্য প্রভুলালের কাছে আঙুরলতার দেহদান। আঙুরলতার সঙ্গে প্রভুলালের শয্যাগ্রহণ এবং সেই খাটের নিচেই পড়ে থাকা নন্দর মৃতদেহ, প্রভুলালকে দেহদানের সময় নন্দর কথা মনে পড়তে থাকে আঙুরের, জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানে থাকা আঙুরলতা শেষ অবধি জীবনকেই বেছে নিয়েছিল। প্রভুলালের দেওয়া টাকায় নন্দ চক্রবর্তীর সৎকারের সময়ে আঙুরলতা উপলব্ধি করে, সে আর মরবে না, কাঁদবে না সে আর। বৌদ্ধদর্শনের কথাই বিমল কর বললেন-জীবনে সুখ এবং দু:খ দুই-ই থাকবে, তার মধ্যে থেকেই আমাদের জীবনের পথ, সুখের পথ খুঁজে প্রশান্তি খুঁজে নিতে হবে।

প্রভুলাল চরিত্রের অবতারণায় যে দেহোপজীবী আঙুরলতার চরিত্র অঙ্কন করলেন বিমল কর, প্রভুলাল এবং নন্দ- সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠিত আঙুরলতা সেখানে একজন সাধারণ বারবণিতা থেকে সনাতনী নারীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বিমল কর দেখালেন নন্দ চক্রবর্তীর মৃতদেহ রীতি অনুযায়ী সৎকার করার প্রবল ইচ্ছা নন্দ চক্রবর্তীর রক্ষিতা আঙুরলতার সাপেক্ষে সমাজের অন্যান্য বিভিন্ন স্তরীয় মানুষদের মানবিকতা-অমানবিকতার রূপ। প্রভুলালের বিকৃত দেহমন অনেকাংশে বিকৃত সমাজ মনস্কতার পরিচয় বহন করছে। সেই সমাজ পরিবেশে বারাঙ্গনা-নারীদের মধ্যে নারীত্বের মহিমা স্থাপন করেছেন বিমল কর 'আঙুরলতা'য়।

অরুণাংশু (উল্কা : নীহাররঞ্জন গুপ্ত)

স্বাধীনতা পরবর্তী দশকে নীহাররঞ্জন গুপ্ত 'উল্কা' উপন্যাসে এক বিকৃত বিকট চেহারার মানুষের মনস্তত্ব ফুটিয়ে তুললেন অসাধারণ মুন্সিয়ানায়। নাম অরুণাংশু।

> ''উঁচু প্রশস্ত কপাল, ভ্রূ একেবারে নেই বললেই চলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার দুটি চক্ষুতারকা তাও আবার ঈষৎ ট্যারা, তাও আবার একটা উঁচুতে একটা একটু নীচে।ছড়ানো চৌকো চোয়াল।উপরের ওষ্ঠটা ছোট হওয়ায় উপরের মাড়ি বড় বড় দাঁতগুলো নিয়ে ভেংচি কাটছে বলে যেন মনে হয়। নীচের ওষ্ঠটা অস্বাভাবিক পুরু ও ভারী হওয়ায় যেন নীচের দিকে খানিকটা ঝুলে আছে।বাঁ দিককার কপালে একটা বিশ্রী আব-মাংসপিন্ড যেন একটা মারবেলের আকারে ঝুলে আছে।গলাটা খাটো - গায়ে হাতে পায়ে মুখে অত্যাধিক লোম।কিন্তু দেহের গঠন দেখলেই মনে হয় প্রচন্ড শক্তি ধরে ও দেহে। পা দুটো একটু বাঁকা হওয়ায় চলায় সময় অংশু পা দুটো একটু টেনে টেনে দুলে দুলে থপ থপ করে যেন হাঁটে।দূর থেকে দেখলে মনে হবে একটা দীর্ঘাকৃতি বীভৎস দানব হেঁটে চলেছে বুঝি।''[১৪৬]

রাজীবচন্দ্র ঘোষের গায়ের রং কালো ছিল এবং চলায় ফেরায় চেহারার বিকৃতিই ফুটে উঠত। বংশপরম্পরায় প্রজনন বীজের ক্রোমোজমের প্রভাবেই[১৪৭] রাজীব সুশ্রী দেহের অধিকারী হতে পারেনি। রাজীবের পিতা বৃন্দাবনও খুব একটা সুন্দর দেখতে ছিলেন না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বংশপরম্পরায় তাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বরাবরই প্রবল ছিল। বৃন্দাবন ঘোষ তার রূপহীনতাকে অতিক্রম করে বুদ্ধিমত্তায় জোর দিয়েছিলেন। তাই নিজের না-পাওয়া, না করতে পারা পুত্র রাজীবের মধ্যে করতে চেয়েছিলেন। আর রাজীব বুদ্ধিমান পুরুষ হয়েও নিজের কুরূপতাকে মেনে নিতে পারল না। রাজীব বিবাহ করেছিল সুন্দরী কমলাকে, সুন্দর সন্তান লাভের লিপ্সায়। যথাসময়ে রাজীব এবং

কমলার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে রাজীব প্রচন্ড ভেঙে পড়ে। নিজের ব্যর্থতা নিজের অপারগতা সন্তানের মাধ্যমেও উত্তরণ করতে না পারার যন্ত্রণায় নিজের থেকেও আরও বীভৎস-দর্শন পুত্রকে ত্যাগ করে রাজীব। বন্ধু ডাক্তার সুহৃৎ সরকার সেই সদ্যোজাত পুত্রটিকে ব্যারাকপুরে স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের স্বর্গাশ্রমে রেখে আসেন। স্বামীজি তার নামকরণ করেছিল অরুণাংশু। 'নবোদিত সূর্যকিরণ'[১৪৮] ।

অরুণাংশু ঘোষ জন্মমুহূর্তে পিতা-মাতার উষ্ণ অভ্যর্থনার বদলে পেল অনাথ আশ্রমের ঠিকানা। স্বামীজি যে লছ্মীর উপর ছোট্ট অরুণাংশুর লালন-পালনের দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন সেই লছ্মী-মা-ও অরুণাংশুকে প্রথম দেখে শিউরে উঠেছিল। আর বড় হবার সাথে সাথে আশ্রমের অন্যান্য বাচ্চা বা কর্মচারীদের সবার কাছেই ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠতে থাকে অরুণাংশু। একমাত্র ভালোবাসা স্নেহ অরুণাংশু পেয়েছিল স্বামীজি এবং লছ্মী মার থেকে। এরপর লছ্মী মার মৃত্যুর পর স্বামীজিই অরুণাংশুর একমাত্র স্নেহের আশ্রয় হয়।

পঁচিশ বছর সবার চোখে ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকতে থাকতে অরুণাংশু মানসিক দিক থেকেও প্রচন্ড একা এক মানুষ ছিল। স্বামীজি তাকে বীণা বাজাতে শিখিয়েছিলেন। অরুণাংশুর দু:খের ক্ষরণ হত বীণাধ্বনিতে। বীণাধ্বনিতে শান্ত হত অরুণাংশুর অশান্ত মন। স্বামীজির মৃত্যুর সময় অরুণাংশুর জীবনে নতুন করে ঝড় নেমে এল। একদিকে এতদিনকার একমাত্র স্নেহ-আশ্রয় স্বামীজি মহারাজের মৃত্যুতে আশ্রয়চ্যুত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা আর অপরদিকে, এতদিন পর অরুণাংশু জানতে পারে সে অনাথ নয়, তারও বাবা-মা আছেন। নিশ্চিত এবং অনিশ্চিতের এই দোলাচলতায় অরুণাংশুর একমাত্র সাথী স্বামীজির শিখিয়ে দেওয়া বীণাটি।

অরুণাংশুকে স্বামীজি অংশু বলে ডাকতেন। স্বামীজির মৃত্যুর পর নানান ঘটনার অভিঘাতে অরুণাংশুকে সবাই ডাকল অরুণ নামে। অংশু এতদিন সবার ঘৃণার পাত্র হয়েই ছিল। নতুন জীবনে প্রবেশ করে বহু ঘটনার অভিঘাতে ডাক্তার সুহৃৎ সরকার এবং জন্মদাতা পিতা রাজীবচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অরুণের। সময় এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে রাজীব-কমলার কোল আলো করে এক ছেলে সুবীর এবং এক মেয়ে গোপা এসেছে। ভাগ্যের পরিহাসে পঁচিশ বছর পর যখন অরুণাংশু পিতার স্বীকৃতি পেল তখন অরুণাংশুর সেটা গ্রহণ করার মত পরিস্থিতি থাকল না।

স্বামীজির মৃত্যুর পর অরুণাংশু ডা: সুহৃৎ সরকারের স্নেহের ছায়াতেই আশ্রয় পেয়েছিল। এখানে অরুণাংশুর মনে প্রথম প্রেমের জাগরণ ঘটে। ডা: সরকারের মেয়ে মিতালীর অপূর্ব ফুলের মত কোমল রূপে মুগ্ধ হয়েছিল অরুণাংশু। কিন্তু অরুণাংশু তার নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিল। জ্ঞান হওয়া থেকেই সে জেনে এসেছে ভারী ভয়ঙ্কর দেখতে সে, ভূতের মত। তাকে

দেখলে লোকজন ভয় পায় আর ঘৃণা করে। সুতরাং কোনো মেয়েকে ভালোবাসার কথা ভাবতেই পারে না অরুণাংশু। কিন্তু তবুও মিলি অরুণাংশুর হৃদয়ে প্রথম প্রেমের স্ফুরণ ঘটালো। অরুণাংশু জানে তার বিকৃত চেহারা, মিলি তার আশ্রয়দাতার কন্যা এবং নিজের সহোদর ভ্রাতা সুবীরের বাগ্‌দত্তা মিলি। তাই মিলিকে দূর থেকে দেখলেও নিজেকে মিলির সামনে কোনোদিন প্রত্যক্ষ করায়নি অরুণাংশু। নিজের চোখের অসুখের জন্য আলো নিভিয়ে রাখার অজুহাতে বড় অসহায় দেখায় অরুণাংশুকে। রবীন্দ্র পরবর্তীকালে নীহাররঞ্জন গুপ্তের এই রচনায় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে রবীন্দ্রসংগীত। শুধু তাই-ই নয়, অন্ধকারে অরুণাংশুর মিলির সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বীণার অনুষঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের কথা মনে করায়।

পিতা রাজীব তাদের বংশানুক্রমিক কুরূপতার ক্রম অবলুপ্ত করার জন্য সুন্দরী কমলাকে বিবাহ করেছিল। তাদের পুত্র সুবীর পিতার রূপ পায়নি। সুবীরের বাগ্‌দত্তা মিলিকে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন পরমাসুন্দরী হিসাবেই। সুতরাং আশাই করা যায় রাজীব যে উদ্দেশ্যে তাদের প্রথম সন্তানকে ত্যাগ করেছিল তা সফল হয়েছিল। অরুণাংশু যে কিনা তাদের বংশানুক্রম বজায় রেখে বিকট থেকে বিকটতর এবং বিকটতম হয়েছে তার মৃত্যুর মধ্যে নীহাররঞ্জন গুপ্ত সেই অসুন্দরের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত কাহিনির শেষদৃশ্যে এক অসাধারণ পৌরাণিক ঘটনার কথা মনে করালেন। সুবীরের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য মিলিকে অপহরণ করা হয়েছিল। সেই অপহৃতা মিলিকে উদ্ধার করেছিল অরুণাংশু অসীম সাহসিকতার সঙ্গে। মিলির শাড়ির টুকরো দেখে মিলিকে কোন পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রামায়ণে সীতা অপহরণ কাহিনি স্মরণ করায়। সীতা তার যাত্রাপথ দেখানোর জন্য গয়নাগুলো খুলে খুলে রেখেছিল। সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য জটায়ু পাখি মারাত্মকবভাবে আহত হয়েছিল এবং প্রভু রামের কাছে সীতার সংবাদটুকু পৌঁছে দিয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল। রামায়ণের জটায়ু সীতাকে বাঁচাতে পারেনি। কিন্তু অরুণাংশু পেরেছিল মিলিকে রক্ষা করতে।

এক নাম না জানা পথের কুষ্ঠরোগী যেখানে প্রতি মুহূর্তে জীবনকে গ্রহণ করছে সমস্ত খারাপ দিকগুলোকে নিয়েই, সেখানে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি অরুণাংশুর জীবনে এ দু:খের কালো ছায়া নেমে এল কেন? ঔপন্যাসিক নিজেই বোধ হয় এর কারণ হিসাবে বলেছেন,-

> ''..... শোন রাজীব, আজ শুনতে তোমার ভালো না লাগলেও তোমাকে সত্যি কথাই বলবো, ওর ওই চেহারার জন্য যদি কেউ সত্যকারের দায়ী হয় তো ও নয়, তুমি। .....তোমার বিকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তোমার অস্বাভাবিক যত উদ্ভট কল্পনা, তোমার নির্জ্ঞান মনের বিকৃত অনুভূতি ও কামনাই হয়তো

তোমার ঔরসজাত, ঐ নিরপরাধ সন্তানের চেহারায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। দোষ ওর নয়, দোষ তোমার। ওর মায়ের দাবী ও সত্তাকে তুমি তোমার উদ্ভট কল্পনা ও বিকৃত ব্যক্তিত্ব দিয়ে কুক্ষিগত করেছিলে, এ তারই ফল, তারই প্রতিক্রিয়া।''[১৪৯]

ডাক্তার নীহাররঞ্জন গুপ্ত শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য শুধু যে মা নয়, পিতারও দায়িত্ব থাকে সেই কথাটি প্রতিষ্ঠা করলেন। তার সাথে তিনি এও দেখালেন উচ্চবিত্তীয় সমাজব্যবস্থার আপাত সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানব মনের কলুষিত রূপটি।

বড়দি অনুপমার ছেলে (জননী : বিমল কর)

বিমল করের 'জননী' গল্পে বড়দি অনুপমার ছেলে চরিত্রটি খুবই ছোট। পৃথিবীতে কাটানোর সময়ই তার খুব কম। কিন্তু অতি অল্প পরিসরের চরিত্রটি অনেক কিছু বলে গেল। কাহিনির ক্রম- অগ্রসরতার সঙ্গে আমরা দেখব অনুপমা ভালোবাসত অন্য একটি ছেলেকে। কিন্তু তার মায়ের প্রবল মর্যাদাবোধ ভালোবাসাকে গুরুত্ব দিতে পারল না। বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য অনুপমার মা অনুপমাকে আবার ওই স্বামীর কাছেই ফিরে যেতে বলে। কিন্তু মেয়ের মন মা বুঝল না। দ্বিতীয়বার মনের মানুষের সঙ্গে ঘর করতে উৎসাহিত করল না। ছোট্ট ছেলেটি যে হয়েই মারা গেল, সে একই সঙ্গে তার জন্মদাতা বাবার শরীরের খারাপ অসুখ এবং মায়ের শারীরিক- মানসিক যন্ত্রণার ছবি তুলে ধরল। অনুদির স্বামীর যৌবনের কুকর্মের ফসল তার সন্তানহীনতা- উত্তরাধিকারহীনতা।

''আমাদের সংসারে প্রথম শোক এল বড়দির বিয়ের পর। তার স্বামী খারাপ রোগে ভুগছিল। বড়দির প্রথম ছেলেটা হল নাক-ভাঙা, বিকলাঙ্গ। মরে গেল। পরে আরও একটা পেটে এসেই নষ্ট হয়ে গেল। স্বামীর রক্তে কোন্ রোগের পোকা বংশবৃদ্ধি করেছে, ততদিনে বুঝতে পেরে গিয়েছে বড়দি। নিজেও ভুগছিল। একদিন স্বামীকে ঘরের মধ্যে পুরে বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়ে বড়দি চলে এলো, আর স্বামীগৃহে যায়নি।''[১৫০]

'জননী' মা শব্দটির -মা প্রতিমূর্তির ভাঙা-গড়া-নির্মাণ-বিনির্মাণের এক অসাধারণ ছোটগল্প। কালের নিয়মে যথাবয়সে পাঁচ-পুত্রকন্যার জননী গত হয়েছেন। মৃত্যুকালে মায়ের পাশে তাঁর পাঁচসন্তানই উপস্থিত। বারোয়ারী শ্মশানে মাকে সৎকার না করে পাঁচসন্তানই তাদের বাড়ির বাগানে মাকে দাহ করে, সেখানে একটি বেদী নির্মাণ করে। এক মাস পরে পাঁচ ভাই বোন মিলে মায়ের স্মৃতিচারণ করে। সেখানে মাতৃমূর্তির নবনির্মাণের নবরূপায়ণ দেখি। কাহিনিটি ছোটগল্প হলেও এতে চরিত্র সমাবেশ প্রচুর। ছোট-ছোট কোলাজ মিলিয়ে যেমন একটি গোটা ছবি ফুটে ওঠে 'জননী'

গল্পেরও বহু ছোট ছোট চরিত্র মিলে মিশে একটি গোটা কাহিনি নির্মাণ করেছে। 'জননী' ছোটগল্পে বেশ কয়েকটি প্রতিস্পর্ধী চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে।

আলোচ্য অতি ক্ষুদ্র পরিসরের চরিত্রটির বর্ণনায় বিমল কর ধ্বস্ত মানবিকতার রূপ দেখালেন- উত্তাল সময়ের ফসল বিকৃত ভবিষ্যতের রূপ কেমন হতে পারে, তা দেখানোর চেষ্টা করলেন বিমল কর। ছেলের মৃত্যুতে মায়ের ভেঙে পড়ে শেষ হয়ে যাওয়া দেখালেন না বিমল কর, বরং সন্তান শোক থেকে বেরিয়ে আসার কথায় বিমল কর বৌদ্ধজীবনদর্শনের ইঙ্গিত দিলেন।। মৃত্যুশোক কাটিয়ে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথাই বললেন বিমল কর। মায়ের মৃত্যুর পর মাতৃমূর্তিবিনির্মাণের পটক্ষেত্রে অনুপমার মাতৃত্বও বিশেষ এক অংশ।

কথাশেষ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ১৮৯৩, ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহামায়া' ছোটগল্পে মহামায়া সামাজিক ব্যাধির শিকার। সতীদাহের সময় জ্বলন্ত চিতা থেকে উঠে এসেছিল মহামায়া। তারই জ্বলন্ত চিহ্ন রয়ে গেছে তার শরীরে। সময়ান্তরে নারীমনস্তত্ত্বের দার্ঢ্যতার ক্রম উত্তরণ এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয়। প্রসঙ্গত উঠে আসছে আরেক নারীর কথা- বনফুলের 'তাজমহল' গল্পের ফকির শা-জাহানের অসুস্থ বেগমের কথা। এই ভদ্রমহিলার রোগে রূপবিকৃতি ঘটেছে। ভয়ঙ্কর রূপ দেখে মানুষ দূরে সরে যায়। সেই পরিস্থিতিতে তার স্বামীর অসাধারণ সেবা এক মানবিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে উঠেছে।

বাংলার সমাজ প্রেক্ষিতে বিবাহ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'মহামায়া'র রূপবিকৃতি সমাজস্বীকৃতি বিবাহের পর। মহামায়া তার ভালোবাসার মানুষের সাথে থাকছে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি তথা বিবাহের কথা ভাবতেও পারছে না, এমনকি বিকৃতরূপ অনাবৃতও করতে পারছে না রাজীবের কাছে। এটি হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের ছবি। বাংলার বাইরে আগ্রা শহরে মুসলমান দম্পতির যে মানবিকতার রূপ, সেখানে বেগমের রূপবিকৃতি মৃত্যুকালে, শেষবয়সে। মানুষের বয়সকালে রূপজমোহ দূরীভূত হয়ে যেখানে আত্মার সম্পর্ক স্থাপিত হয় সেই সময়কালের এক বিকটদর্শনা বৃদ্ধা বেগম। রক্ষণশীল পরিবারের আরেক নারী ফাতিমা, সেও বিবাহ-সম্পর্কে আবদ্ধ নয়।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিমল করের 'আঙুরলতা' গল্পটিতে supporting character প্রভুলাল বিকটদর্শন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের ভোগ বাসনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে রূপবিকৃতি

কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। যদিও আঙুরলতা তথা সমাজের চোখে যে প্রভুলাল রূপবিকৃতির জন্য স্বাভাবিক category-র অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রতিষ্ঠিত। সমাজ যে বিকৃতরূপী মানুষদের ভিন্নদৃষ্টিতে দেখে তার আরেক নিদর্শন বিমল করের 'জননী' ছোটগল্পের এক অতি ক্ষুদ্র পরিসরের চরিত্র অনুপমার ছেলে।

গিরিজাপতি উমার ('দেওয়াল' : বিমল কর) বিয়ের কথা ভাবলেও তাদের সন্তানও সেই বামন হয়ে জন্মাবে কিনা এরকম একটা প্রশ্নে বিবাহপ্রসঙ্গ চাপা পড়েছে। নীহাররঞ্জন গুপ্ত নিজে একজন ডাক্তার হওয়ায় 'উল্কা'য় দেখালেন রাজীব তার কুরূপতা পেয়েছে তার পিতার থেকে। তারপর সুন্দরী রমণীকে বিয়ের পর তাদের প্রথম সন্তান অরুণাংশু বিকৃতরূপী হলেও পরবর্তী দুই ছেলে-মেয়ে রূপবিকৃত হয়নি। সামাজিক গ্লানি সহ্য করতে না পেরে ভোম্‌রা এবং অরুণাংশু মৃত্যুর মধ্যে শান্তি খুঁজেছিল। এদিক থেকে উমা অদ্ভুত মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। উমা সমাজে যারা তাকে উপেক্ষা করছে তাদের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন না দিয়ে, গিরিজাপতির মত মানুষ, যারা উমাকে প্রকৃতই ভালোবাসে তাদের জন্য আগুনকে দূরে সরিয়ে রেখে জীবনের পথ বেছে নিয়েছে।

সমাজ দৃষ্টিকোণ বামন এবং বিকৃতরূপী মানুষদের যে শুধু ভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখে তাই-ই নয়, অনেকসময় শয়তানের প্রতিভূ বলে মনে করে। যার উল্লেখ আছে জার্মান পুরাণের 'চ্যাঞ্জেলিং' চরিত্রটিতে। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়জ বা অঙ্গজ অসম্পূর্ণতা যে সমাজের চোখে মানুষকে প্রতিবন্ধী হিসাবে স্থাপন করে, তাই-ই নয়, মানুষের উচ্চতা-হ্রস্বতা এবং দুর্ঘটনাজনিত রূপবিকৃতি, পোড়াদাগ ও সমাজের মানুষের চোখে প্রতিবন্ধী।

শ্বেতী

ইউরোপ আমেরিকার মানুষজন শ্বেতীকে কোনো রোগের পর্যায়েই ফেলেন না।কিন্তু আমাদের দেশে এ রোগ সম্পর্কে মানুষের মনে সংস্কার রয়েছে।

অরুণ (প্রজাপতির আকাশ : প্রদীপ রায়গুপ্ত)

২০০১ এ প্রদীপ রায়গুপ্তর 'ঘরে ফেরার সময়' গ্রন্থে সংকলিত 'প্রজাপতির আকাশ' গল্পের কথক অরুণের আচরণ কেমন যেন অস্বাভাবিক।ছোট্ট ভাইপো বুচকুনের ভাষায়,

''জেঠু কেমন পাগলের মতো ''[১৫১]

আর অরুণের মায়ের ভাষায় অরুণ

''থেকেও নেই''[১৫২]

তার এ অসংলগ্ন আচরণের কারণ শ্বেতী আক্রান্ত হওয়ায় ইনফিরিয়োরিটি কমপ্লেক্স।স্কুলে চাকরি পাবার পর বাবার বন্ধুর মেয়ে তিতলির সাথে বিয়ে ঠিক হয় অরুণের।কিন্তু বিয়ের ঠিক মুখে শ্বেতী আক্রান্ত হওয়ায় সে বিয়ে ভেঙ্গে যায়।অরুণের পিঠোপিঠি সহোদর বরুণের সাথে তিতলির বিয়ে হয়।যার সাথে ঘর গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল অরুণ,সেই মেয়েটিকে চোখের সামনে সবসময় দেখলেও সে অরুণের কেউ না।এ আঘাত নিদারুণ মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল অরুণের জীবনে।মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্পের নায়কের কথা।বাল্য সহচরী সুরবালাকে যথাসময়ে বিয়ে না করে নায়ক দেশের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।তারপর উকিলবাবুর ঘরণীরূপে সুরবালাকে দেখে তার মনে হয়েছিল,

'সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়,কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত।.....আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ,আমার সব চেয়ে নিকটবর্তী,আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত-সে আজ এত দূর,এত পর,আজ তাহাকে দেখা নিষেধ,তাহার সঙ্গে সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ।''[১৫৩]

এই একাকীত্ব ভয়ংকরভাবে গ্রাস করে অরুণকে। মদ্যপ বরুণ এক স্কুটার দুর্ঘটনায় মাথায় হেলমেট না থাকায় মারা যায়।ঘটনাক্রমে সেটি তখন চালাচ্ছিল অরুণ।সবাই জানত বরুণ চালাচ্ছিল।কিন্তু নিজের কাছে তিতলির বৈধব্যের জন্য নিজের অপরাধবোধ প্রতিমুহূর্তে আরো মর্মবেদনার সৃষ্টি করেছিল অরুণের মধ্যে।যার ফলে আরো নিজের মধ্যে গুটিয়ে পড়েছিল অরুণ।এক পুত্রের জননী তিতলির আবার দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করে তার পরিবারের লোকজন,বিপত্নীক ধনীর

সঙ্গে।দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রেও পাত্র হিসাবে অরুণ বিবেচিত হল না।এক্ষেত্রে বলা যায়,প্রদীপ রায়গুপ্তের ২০০৯ এ 'ছায়াবাগানের জুঁই' এর অন্তর্গত 'খঞ্জন' গল্পে খঞ্জ অঞ্জনের বিয়ের জন্য শ্বেতী রোগাক্রান্ত মেয়ের সম্বন্ধ আসে।শ্বেতী মানুষের মনে বিশেষ করে বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এখনও।

স্প্যাস্টিক

রাপ্তি (সমান্তর : প্রদীপ রায়গুপ্ত)

প্রদীপ রায়গুপ্তর 'ছায়াবাগানের জুঁই' গ্রন্থের (২০০৯) 'সমান্তর' গল্পে নায়িকা সুতপার একমাত্র কন্যা রাপ্তি স্প্যাস্টিক।গল্পকার অত্যন্ত মানবিকভাবে দেখালেন বাবা-মার মধ্য কলহ একজন সাধারণ বাচ্চার মত স্প্যাস্টিক শিশুর মনেও প্রভাব ফেলে।এই বাচ্চাদের অন্যান্য শারীরিক বিকাশ যথাযথ হয় যে তা দেখালেন যথাসময়ে রাপ্তির ঋতুমতী হওয়ায়।রাপ্তির ভূমিকা গল্পে মূল হয়েছে শিক্ষিত ভদ্রবেশী অভ্রর সন্তানের বিকলাঙ্গতাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে না নিয়ে স্ত্রীর ওপর সমস্ত দায় বর্তানো এবং সেই প্রেক্ষিতে সুতপার আত্মসম্মানবোধে স্বনির্ভরশীলতা। সুতপার মত ডাক্তার নিজের সন্তানের প্রতিবন্ধকতার লজ্জিত।সেখানে লালতিরা সত্যকে কত সহজে মেনে নেয়।শহুরে মানুষের আত্মিক সংকট প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে রাপ্তির উপস্থিতিতে।

রেডিওঅ্যাকটিভিটি জনিত বিকলাঙ্গতা

গঞ্জাটারের ভূমিপুত্ররা (সমান্তর : প্রদীপ রায়গুপ্ত)

হিবাকুশা একটি জাপানি শব্দ। যার অর্থ পারমাণবিক বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত বিকৃতদেহী মানুষজন। ১৯৪৫ এ হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের বহু বছর পরও এখনও সেখানকার মানুষজন বিভিন্ন শারীরিক বিকলাঙ্গতার শিকার। প্রদীপ রায়গুপ্ত 'ছায়াবাগানের জুঁই' গ্রন্থের (২০০৯) 'সমান্তর' গল্পে ভারতের পটভূমিকায় মানুষের শরীরে রেডিওঅ্যাকটিভিটির মারাত্মক প্রভাব দেখালেন।এখানে যে জায়গায় রাসায়নিক বর্জ্য ফেলা হয় তা সেখানকার দু' কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে থাকা গ্রামের মাটিতে মিশে গিয়ে বাচ্চাদের পঙ্গু করে দেয়,গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়,বিকলাঙ্গ শিশু জন্মায়,মানুষজন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন।লালতির প্রথম সন্তানের কাঠির মত হাত পা,মাথাটা ফুটবলের মত বড় গোল আর দ্বিতীয় সন্তানের নাকি চোখ নাক ছিলনা।লালতির মাসির মেয়ে ধনিয়ার আট বছরের ছেলেটি বসতে দাঁড়াতে কথা বলতে পারে না। কলোনিয়াল লেগাসির নির্মম চিত্র ফুটে উঠেছে চরিত্রগুলির মাধ্যমে। এখানকার মানুষজন এ বিষাক্ত প্রভাব মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে কারণ এছাড়া আর উপায় নেই।পুরুষরা সুস্থ সন্তানের জন্য ভিন গাঁয়ের মেয়ে বিয়ে করে আনছে। লালতিরা সুন্দর প্রজন্মের মুখ চেয়ে সতীন দ্বন্দ্ব ভুলে ছুটকিকে আপন করে নিচ্ছে।

মানসিক প্রতিবন্ধী

এই অধ্যায়ে আলোচিত চরিত্ররা হলেন মানসিক প্রতিবন্ধী। চরিত্রগুলির কেউ মানসিক স্থিরতা হারিয়েছে, কেউ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, কেউ সম্পূর্ণ উন্মাদ। চলতি ভাষায় এরা পাগল বা পাগলী নামে সমাজে বহুল পরিচিত। 'পাগল' শব্দটি বর্তমানে বহুল ব্যবহারে তার আভিধানিক অর্থ থেকে অনেকটা কোমলরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। আবার এক অর্থে, এমনটাও বলা চলে, কমবেশি সবাই-ই একটু-আধটু পাগল- পাগল এখানে আবেগপ্রবণ অর্থে দ্যোতিত। অভিসন্দর্ভে প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে মানসিক দিক থেকে যারা বিপর্যস্ত, সেইসব উন্মাদ-উন্মাদিনীদের কয়েকজনকে নির্বাচন করে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিনিধিস্বরূপ আলোচিত হল।

মেহের আলি (ক্ষুধিত পাষাণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' (শ্রাবণ, ১৩০২, সাধনা) গল্পে মেহের আলির debut-প্রথম আবির্ভাব-

''আমাদের পাগলা মেহের আলি''[১৫৪]

শাহীবাগের তুলার মাশুল আদায়কারী কালেক্টর বাবুটির কাছে বিজন প্রাসাদ ক্রমশই জীবন্ত হয়ে উঠছিল। খন্ড আমি এবং অখন্ড আমির মধ্যে বারবার যাতায়াতের মধ্যে গড়ে ওঠা illusion-super natural suggestion-reality-এই সবের মধ্যে একটি character মেহের আলি। অতীত এবং বর্তমান মিলে মিশে এক অখন্ড জগৎসত্তা গড়ে ওঠার অপর নাম মেহের আলি।

প্রতিদিন সকাল বেলা মেহের আলি রাস্তা দিয়ে চিৎকার করতে করতে হেঁকে চলে।-

''আমাদের পাগলা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে প্রত্যুষের জনশূন্য পথে ''তফাত যাও'' ''তফাত যাও'' করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।''[১৫৫]

মেহের আলির এই স্বল্প উপস্থিতি তার প্রাত্যহিকতার স্মারক রেখে যায়। সে প্রতিদিনই এ রাস্তা দিয়ে একই সময়ে একই কথা আওড়াতে থাকে। এই স্বল্প কথা নিয়ে চরিত্রটির দ্বিতীয় আবির্ভাব ঘটে কাহিনির শেষভাগে। এ পাষাণপুরী নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে 'সঙ্গিনীহীন' মাশুল-কালেক্টর বাবুটি যখন ক্রমেই আরও নিমজ্জমান হয়ে পড়ছিল তখনই সহসা দ্বিতীয় আবির্ভাব ঘটল মেহের আলির। তার সেই সনাতন চীৎকার,-

''তফাত যাও, তফাত যাও''[১৫৬]

সাথে যোগ হল নতুন কথা-

''সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।''[১৫৭]

দ্বিতীয়বার মাশুল-কালেক্টর স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে এল।

এই পাষাণপুরীর করাল গ্রাস থেকে বাঁচার জন্য মাশুল কালেক্টর গুলবাগকে পরিত্যাগ করে জিনিসপত্রসহ আফিসঘরে গিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বিকাল হতেই সেই পাষাণপুরীর অমোঘ আকর্ষণ এড়াতে না পেরে নিজেরই অজান্তে গোধূলি মুহূর্তে ধাবিত হয়ে এসে পড়েছিলেন সেই ক্ষুধিত পাষাণেই।সমগ্র রাত্রিব্যাপী তিনি ওই পাষাণপুরীতেই এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়তায় যাপন করলেন। পাষাণপুরীর কাছে সবাই ধরা দেয়, আজ সেই পাষাণপ্রতিমা মাশুল-কালেক্টরের কাছে ধরা দিয়ে কাতর আবেদন জানিয়েছে মুক্তি বাসনায়। কিন্তু তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গেছেন। দ্বিতীয়বার ফিরে এলেন বটে পতঙ্গের মত বহ্নির আকর্ষণে কিন্তু সে বহ্নি তখন জলধারায় রূপান্তরিত হয়ে ঝরে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত সেই রাতের অবসান ঘটল-

''পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, ''তফাত যাও, তফাত যাও!সবঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়''।
দেখিলাম ভোর হইয়াছে এবং মেহের আলি এর ঘোর দুর্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ
প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয়তো ঐ
মেহের আলিও আমার মতো এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল এখন পাগল হইয়া বাহির
হইয়াও এই পাষাণ-রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।
আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলের নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,
''মেহের আলি, ক্যা ঝুট হ্যায় রে?''
সে আমার কথায় কোনো উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের
চতুর্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল,
কেবল প্রাণপণে নিজেকে সর্তক করিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিল,''তফাত যাও, তফাত যাও,
সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়।''[১৫৮]

এখানে একীকৃত হয়ে গেলেন মেহের আলি এবং মাশুল-কালেক্টর। প্রচ্ছন্নময়তায় মাশুল কালেক্টরের বিকল্প-সত্তা রূপে মেহের আলির রূপকল্প নির্মাণ। কারণ মাশুল-কালেক্টর প্রথমার্ধেই মেহের আলিকে বলেছেন 'পাগল' আর শেষে নিজের অবস্থা বর্ণনায় নিজেকে 'পাগল' বলেছেন-

''আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মতো আপিসে গিয়া করিমখাঁকে ডাকিয়া বলিলাম.....''[১৫৯]

দুজনের মধ্যে এই alter-ego এর ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না একটি তত্ত্বের ভিত্তিতে যে শিল্পীসত্তায় পাগলামো থাকতে পারে- শিল্পসাধনার প্রচন্ড শৃঙ্খলাবোধে আসতে পারে উন্মাদনা- কিন্তু একজন উন্মাদ কখনোই শিল্পী হতে পারে না। কারণ উন্মাদ নিজের প্রতি নিজের জীবনের প্রতিই ছন্দ শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলেছে সে করে নতুন সৃষ্টি করতে পারে না ।

শেষে কালেক্টর আপিসের করিম খাঁ সাহেবের কাছ থেকে জানা গেল মেহের আলির পূর্বপরিচয়। এলাকার লোকজনের কাছে সুপরিচিত মেহের আলি,-

''যাহারা ত্রিরাত্রি ওই প্রাসাদে বাস করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেবল আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।''[১৬০]

তথ্যটিতে উল্লেখ্য কালেক্টর সাহেব পাগলের পরিচয় দিলেন 'আলি' বলে আর কালেক্টর বাবুর মত আগন্তুকদের কাছে সে মেহের। মেহের নামটি লক্ষ্যণীয়। ইসলাম রীতিতে মেহের নামটি পুংলিঙ্গবাচকও বটে আবার স্ত্রীলিঙ্গ বাচকও বটে। নামটির অর্থ সহৃদয়বান মানুষ। সিংহ রাশি এবং মঘা ও অশ্লেষা নক্ষত্রের সঙ্গে নামটি সংযুক্ত।

প্রথম আবির্ভাবে মেহের আলির চিৎকার এবং কাফ্রি খোজার তলোয়ার মেহের আলির পূর্বজীবনের ইতিহাস বলে। মেহের আলিও হয়ত প্রাসাদকন্যার 'মোহিনী-সর্পিনী' আকর্ষণে আবিষ্ট হয়ে পড়ে কাফ্রি খোজার উদ্ধত শাস্তির কোপে পড়েছিল। তাই মেহের আলির কথা বলার আগে এল-

''ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খন্ড চাঁদ জাগরণক্লিষ্ট রোগীর মত পান্ডুবর্ণ''[১৬১]

উপমার সার্থক প্রয়োগ?দু'পায়ের ফাঁকে খোলা তলোয়ারের সশব্দে পতন কি neuteralization-এর ইঙ্গিত দিচ্ছে কোনোভাবে? তাই হয়ত আলি আজ মেহের নামে সম্বোধিত। প্রাসাদের 'ক্ষুধার্ত', 'তৃষ্ণার্ত' নারীসত্তা 'সজীব মানুষ' অর্থাৎ পুরুষ মানুষ পেলেই গিলে ফেলতে চায়। মেহের আলি এই পাষাণীর কবল থেকে বেরিয়ে এসেছে ভয়ঙ্কর খেসারত দিয়ে। তাই আজও সে তার চারপাশেই ঘুরে ঘুরে রক্ষা করে বেড়ায় যাকে পরিবৃত হয়ে থাকা সত্ত্বেও যাকে ভোগ করতে সে পারেনা। আর সর্বদাই সবার প্রতি সর্তকবাণী শোনাতে থাকে-

''তফাত যাও, তফাত যাও''[১৬২]

মেহের আলির সর্তকবাণী তার নিজের প্রতি, যে আর জড়িয়ে পড়ো না, মাশুল-কালেক্টরের প্রতি,যিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলাচলতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং সতর্কীকরণ প্রাসাদের প্রতি, যে প্রাসাদ একদিন ভালোবাসার মোহে ছিল 'মোহিনী-সর্পিনী' কিংবা আজ প্রতিহিংসাপরায়ণার ক্রূরতায় হয়ে

উঠেছে 'অজগর'। বাদশাহী হারেমের অতুল ঐশ্বর্যময়তার অন্তরালে কারাগারে বধ্য যে জীবনাকাঙ্খা সেই মেহের আলির জবানীতে সাবধান করছে এই মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথাটিকে ।

বিন্দুর শাশুড়ী (স্ত্রীর পত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছের 'স্ত্রীরপত্র'(শ্রাবণ, ১৩২১)-র বিন্দুর পাগল শাশুড়ী সম্পর্কে ছোট্ট একটা কথা যথেষ্ট-

''সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরো ভয়ানক।''[১৬৩]

বিন্দুর শাশুড়ীর পাগলামির প্রধান কারণ তার প্রচন্ড রাগ। তার এই প্রচন্ড রাগের কারণেই স্বামী ও তাকে বেশ ভয় করেন। পাগল ছেলের বিয়ে দিয়ে অন্য একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করার সিদ্ধান্তে বিন্দুর শ্বশুরের তাই প্রবল আপত্তি ছিল। কিন্তু তার স্ত্রীর সাথে পেরে উঠবেন না জেনে তিনি তার অসহযোগিতা প্রকাশে কাশী চলে যান।

মেয়েরাই মেয়েদের সবথেকে বড় শত্রু। সমাজ প্রচলিত এই কথাটির দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বিন্দুর শাশুড়ী। তিনি নিজে একজন মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়ের সর্বনাশ কি করে করতে পারলেন? বিন্দু পালিয়ে আসার পর আবার যখন ওই বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হল তখন তার শাশুড়ী তাকে প্রবল বকাঝকা করে বলেছিল, তার ছেলে তো আর বৌকে খেয়ে ফেলছে না। নেহাতই শরীরটা বিগড়ালে মাথাটা একটু বিগড়ে যায়। তখনই আচরণে অসঙ্গতি, আর কদাচিৎ violence. কিন্তু আর যাই হোক তার ছেলের তো অন্য কোনো বদগুণ নেই। যেখানে সংসারে মন্দ স্বামীর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সে তুলনায় তো তার পাগল ছেলে সোনার চাঁদ।

ছেলেরা তো সোনার আংটি। সোনার আংটি আবার বাঁকা হয় না। আর বাঁকা হলেই বা কি! সোনার তো বটে। সমাজের এই পুরুষতান্ত্রিকতার পিছনে দায়িত্ব কিন্তু নারীদেরও সমানভাবে বর্তায়। যে পুরুষপ্রধান সংসার সমাজে মৃণাল রয়েছে, যেখানে নিজের সংসারে নারীর কথা বলার কোনো স্বাধীনতা নেই বলে মৃণালরা গৃহত্যাগী হতে বাধ্য হচ্ছে, আর যারা মৃণালের মত পঙ্কশয্যা থেকে উঠে প্রস্ফুটিত কমল হতে পারে না সেইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অস্তিত্বহীন বিন্দুদের অবলুপ্ত হতে হয়, যে সমাজে পুরুষের পাগলামি, যৌনব্যভিচার কোনো অন্যায় অপরাধ নয়, সেই সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিন্দুর শাশুড়ীর মত দাপুটে মহিলার অবস্থান, যার দোর্দন্ডপ্রতাপে স্বামীদেবতাটি গৃহত্যাগী হয়ে কাশী যাত্রা করেন তার ভূমিকা কাহিনিতে সংক্ষিপ্ত হলেও মোটেও তুচ্ছ নয়।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিনারীতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীর দুটি রূপ। একজন সে কল্যাণী আর একজন উর্বশী। বিন্দু মাতৃহীনা। দিদি থাকা সত্ত্বেও সে বিন্দুর মায়ের স্থান নিতে পারেনি

স্বামীর সংসারের ভয়ে। কিন্তু বিন্দুর এই দিদির মেজজা মৃণালের মাতৃত্বের স্নেহটুকু অধিকার করেছিল বিন্দু। মৃণালই হয়ে উঠল বিন্দুর মাতৃকল্পা। বিবাহের পর বিন্দুর জীবনে এলেন নতুন মা- বিন্দুর শাশুড়ী-মা- ইংরাজীতে যাকে খুব সুন্দরভাবে বলা যায় mother-in-law- আইনবলে মা। তিনি নিজের পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে মাতৃহীনা মেয়েটির মায়ের স্থান পূরণ করতে পারলেন না। তাই গল্পটিতে কোথাও তাকে মা বা শাশুড়ীমা বলে সম্বোধন বা পরিচয় দেওয়া হয়নি। তিনি শুধুমাত্রই বিন্দুর 'শাশুড়ী'।

মানুষের ষড়রিপুর দ্বিতীয় রিপু ক্রোধ দ্বারাই আক্রান্ত বিন্দুর শাশুড়ী। এই রাগের জন্ম অসহায়তা-অপারগতা থেকে। মানুষ নিজের সক্ষমতায় যখন আর পেরে ওঠে না, তখন সেই না পারা থেকেই জন্ম নেয় ক্রোধ-রাগ। তাহলে বিন্দুর শাশুড়ীর এই রাগের কারণ কি তার ছোট ছেলের মানসিক ভারসাম্যহীনতা? মানুষের ভালোবাসার আকর তার সন্তান। সন্তানের কোনো ত্রুটি তার মায়ের কাছে সবচেয়ে বড় অক্ষমতা। সেই আক্রোশই বিন্দুর শাশুড়ীর প্রচন্ড ক্ষোভ। ছেলের পাগলামি জানা সত্ত্বেও তিনি বিন্দুকে ঘরের বৌ করে নিয়ে আসেন। বিবাহের পরের দিন ছেলে ভয়ংকর হয়ে ওঠার পরদিন রাতে আবার বিন্দুকে ছেলের ঘরে শুতেও পাঠান। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ছেলেটি কিন্তু সবসময় ভারসাম্যহীনতায় ভোগে না। তাহলে হয়ত বিন্দুর শাশুড়ী চেয়েছিল বিবাহের মাধ্যমে যদি স্ত্রীর সাহচর্যে ছেলের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসে।

হয়ত মা হিসাবে তিনি ঠিক। শুধু তার approach- এ একটু গন্ডগোল ছিল।মা হিসাবে ঠিক মানুষ হিসাবে ঠিকের থেকে আলাদা হতে পারেনা।সবার ওপর মানুষ সত্য। তিনি বিন্দুকে রূপের বিচার না করেই ঘরের বউ করে এনেছিলেন। যদি বিন্দুর উপর রাগ দেখিয়ে জোর না খাটিয়ে বিন্দুর পাশে থাকতেন তাহলে হয়ত মা এবং স্ত্রীর ভালোবাসায় আদরযত্নে ছেলেটি সুস্থ হয়ে যেতেই পারত। বিন্দুর শাশুড়ী আসলে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন মাত্র। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকীয় নারীদের সামাজিক অবস্থান এবং সেই অবস্থান থেকে নারীকে নিজের ভাগ্য জয় করবার অধিকার দেবার কথা বলবেন 'স্ত্রীর পত্র' ছোটগল্পে, তাই বিন্দুর শাশুড়ীও রাগে পাগল রূপে চিত্রিত হল।

বিন্দুর স্বামী (স্ত্রীরপত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

'স্ত্রীরপত্র'(শ্রাবণ, ১৩২১) রবীন্দ্র গল্পগুচ্ছে নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী। ৬ নম্বর মাখন বড়াল লেনের মেজ বউ মৃণাল এর মুখপাত্র। মৃণালের বড়জার বোন বিন্দু। বড় জাদের বংশের মেয়েরা দেখতে সুন্দরী নয়। তাই স্বামীগৃহে বড়জার আদরযত্ন খুব একটা বেশি নয়। তার উপর বড়জার বাবা মার অবর্তমানে বিন্দু দিদির বাড়ি আশ্রয় নিলে বিন্দুকে গলগ্রহ মনে করে এক

পাগল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বিদায় দেওয়া হল বিন্দুকে। বিবাহের তিনদিনের মাথায় পালিয়ে এসে বিন্দু মৃণালকে জানাল-

''তিনি পাগল।''[১৬৪]

এই পাগলামি সবসময়ের জন্য থাকে না। তাই একনজরে দেখেই তাকে পাগল বলে মনে হয় না। কিন্তু রেগে গেলে তখন তার হিতাহিতজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। তখন তাকে তালাবন্ধ করে ঘরে আটকে রাখতে হয়। বিবাহসভায় স্বামী দেবতাটি ঠিকঠাকই ছিলেন। কিন্তু বিয়ের প্রচুর নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ, পালন করার জন্য তার শরীরের উপর দিয়ে প্রচুর ধকল গেছে, তার উপর ছিল রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি। তারই ফলে বিয়ের পরদিন দুপুরবেলা থেকেই তার মাথা বিগড়ে যেতে শুরু করে। মস্তিষ্ক বিকৃতিতে বিন্দুকে তার অসংলগ্ন আচরণের বলি হতে হল।

শারীরিক ক্লিষ্টতায় মস্তিষ্ক-বিভ্রমে বিন্দুকে তার স্বামীর মনে হয়েছে রানি রাসমণি। বিন্দু দুপুরবেলায় পিতলের থালায় ভাত খেতে বসেছিল। তাতে তার স্বামীদেবতাটির মনে হয়েছে তার সামনে অন্নগ্রহণে উপবিষ্ট দেবীটি স্বয়ং রানি রাসমণি। আর সে কিনা পিতলের থালায় অন্নগ্রহণ করছে। রানি তো সোনার থালায় খাবেন। সুতরাং কোথায় গেল সেই সোনার থালা। নিশ্চয় বেহারা চুরি করেছে। তাই সেই বেহারার প্রতি রাগ এবং রানির সরলতা তাকে প্রচন্ড ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। স্বামীদেবতাটির দৃঢ় বিশ্বাস বেহারা রানির সোনার থালা চুরি করে নিজের পিতলের থালায় রানিকে খেতে দিয়েছে। তাই রাগে স্বামীদেবতাটি ভাতসুদ্ধ থালা বিন্দুর সামনে থেকে টেনে উঠোনে ফেলে দেয়। রাত্রে আবার স্বামী ঠান্ডা মানুষ।

এ হেন বরের সঙ্গে ঘর করতে না পেরে পালিয়ে আসে বিন্দু মৃণালের কাছে। ছেলের বাবা ছেলের হঠাৎ পাগলামির কথা জানত। তাই বিবাহে তার মত ছিল না। কিন্তু স্ত্রীর প্রচন্ড দাপটে তার কোনো কথাই খাটবে না। তাই তিনি এ বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছিলেন। কিন্তু এ হেন বরের হাত থেকে বাঁচতে পারল না বিন্দু পালিয়ে এসে। বিন্দুর ভাসুর এসে তাকে নিয়ে গেল। খুব বেশি ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়নি বিন্দুর ভাসুরকে। কারণ বিন্দুকে পাত্রস্থ করার জন্য তো তার দিদির বাড়ির লোকেদের উদ্যোগ কিছু কম ছিল না।

বিন্দু আবার ফিরে যেতে বাধ্য হল পাগল স্বামীর কাছে। এবং শেষপর্যন্ত কাপড়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে মুক্তি পেয়েছে। কারণ সমাজ ব্যবস্থা। সমাজ ব্যবস্থা বিন্দুর দিদির মুখ দিয়ে বলিয়েছে পাগলই হোক আর ছাগলই হোক স্বামী তো স্বামীই হয়। পতিই পরম গুরু। পতিই অবলার গতি। এহেন কথায় আশৈশব লালিত হওয়া বিন্দুরা আত্মহনন ছাড়া আর কি পথ বেছে নেবে?

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে বিন্দুর স্বামীর পাশাপাশি আরও কয়েকটি স্বামী চরিত্র রয়েছে। মৃণালের স্বামী, ভাসুর, বিন্দুর শ্বশুর। এদের মধ্যে বিন্দুর স্বামী পাগল বলে তার অত্যাচারের নমুনা প্রত্যক্ষগোচর হল। কিন্তু বাকিরা? তারাও কি খুব মানসিক সুস্থতার পরিচয় দিতে পেরেছে? বিন্দুর স্বামী কখন বিন্দুকে রানির চোখে দেখবে আর কখন সাধারণ রমণীর চোখে দেখবে আবার কখন কিরূপে দেখবে তার উপর নির্ভর করবে স্ত্রীর প্রতি তার আচরণ। আসলে বিন্দুর স্বামী এই নিদারুণ সমাজব্যবস্থারই প্রতীক, যাদের হাতের পুতুলস্বরূপ বাংলার বধূ সম্প্রদায়। আর বিবাহের পর সেই স্বামীত্ব বরণ করা আত্মহননেরই নামান্তর। বিন্দুর পাগল স্বামী সেই সমাজদর্পণ।

যামিনী কবিরাজ (পুতুলনাচের ইতিকথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে গাওদিয়া গ্রামের অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ এবং মান্যিগণ্যি মানুষ যামিনী কবিরাজ। তাঁর কবিরাজির খ্যাতি অনেক দূর-দূরান্তের গ্রামেও রয়েছে। যামিনী কবিরাজের একটি বিখ্যাত ওষুধ আছে- মকরধ্বজ। এর প্রয়োগে রোগী দীর্ঘজীবী হয় আবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকেও ফিরে আসে। যামিনী কবিরাজের মকরধ্বজ সেবনে রোগী বেঁচে তো ওঠে এবার সেই নবজীবন ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন মহাকপিলাদি বটিকা। এ বটিকার আবিষ্কর্তা যামিনী স্বয়ং। কিন্তু সমস্যা হল এই মহাকপিলাদি বটিকা তৈরী করে রাখা যায় না। মহাতেজস্কর এই ঔষধের গুণ প্রখর সূর্যরশ্মি আকর্ষণ করে নেয়। আর এই বটিকা তৈরী করতে তিনরাত্রি সময় লাগে। তাই অনেকসময়ই রোগী কপালদোষে মকরধ্বজ সেবনে প্রাণ ফিরে গেলেও মহাকপিলাদির যথাসময়ে প্রয়োগের অভাবে মারা যান। এতে অবশ্য যামিনীর কবিরাজির খ্যাতি কোনো অংশ কম হবার নয়। লোকের অগাধ বিশ্বাস যামিনী কবিরাজের মৃতসঞ্জীবনীর শক্তির প্রতি।

গ্রাম-গ্রামান্তরে যামিনী কবিরাজের খ্যাতি থাকলেও যামিনীর বৌ সেনদিদি তার ওষুধ খেত না। বসন্ত আক্রান্ত হলে সেনদিদির চিকিৎসা করার জন্য শশীর ডাক পড়ে, কিন্তু যামিনী স্ত্রীর এই চিকিৎসায় মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। তার একটা কারণ তো অবশ্যই পেশাগত। কবিরাজী পদ্ধতিতে বিশ্বাসী যামিনীর অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর কোনো বিশ্বাস নেই। তবে দ্বিতীয় আরেকটি কারণ আছে, যেটি ভয়ঙ্কর রকমের মারাত্মক।

যামিনী কবিরাজ বৃদ্ধ হলেও তার স্ত্রী সেনদিদি অপরূপা সুন্দরী এবং অত্যন্ত অল্প বয়স্কা। সাধারণত: বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যারা স্বামীর অত্যন্ত আদরের হয়ে থাকে। কিন্তু মনস্তত্ত্বের এক অদ্ভুত জটিলতায় যামিনী কবিরাজ এবং সেনদিদির দাম্পত্যে প্রেমময়তার অভাব প্রকটিত। যামিনী চাইত না অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসা হোক, অভিজ্ঞ শশীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয় বলেই সেনদিদির

চিকিৎসায় আগত শশীকে দেখে শশীর প্রতি যেমন যামিনী অবজ্ঞা দেখিয়েছে তেমনই শশী সেনদিদির অসুস্থতা সম্পর্কে জানতে চাইলে উদাসীনভাবে তাকে সামান্য জ্বর বলে উড়িয়ে দিয়েছে, যদিও তখন শশী রোগীকে জ্বরে অচেতন এবং শরীরে মায়ের দয়ার চিহ্নশুদ্ধ আবিষ্কার করেছে।

এ এক অদ্ভুত মানসিক বিকৃতি। যে গোপালের দ্বারা বৃদ্ধ যামিনীর সেনদিদির মত সুন্দরী তরুণী স্ত্রী লাভ সম্ভব হয়েছে, যে গোপালকে ঘিরে সেনদিদির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে গ্রামসমাজে কানাঘুষো চলে সেই গোপালের নয়, বরং যামিনীর ঈর্ষা-আক্রোশের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় সেই গোপালের একমাত্র ছেলে শশী-শশী ডাক্তার। আর শশীকে কিনা নি:সন্তান সেনদিদি নিজের পেটের সন্তানের থেকেও বেশি ভালোবাসে। এ মানসিক বিকৃতি পেশাগত ঈর্ষা থেকে শুধু নয়, এর কারণ স্ত্রীর মনোযোগ-বিশ্বাস যামিনীর বদলে রয়েছে শশীর প্রতি।

এই মানসিক বিকৃতির জন্যই শশী যখন আপ্রাণ সেবা করে সেনদিদিকে বাঁচিয়ে তুলল বসন্তব্যাধি থেকে তখন যামিনী কবিরাজ তার জন্য শশীর প্রতি কৃতজ্ঞ না থেকে বসন্তের প্রবল দাপটে সেনদিদির নষ্ট হয়ে যাওয়া একটা চোখের জন্য দায়ী করতে থাকেন শশীকে-শশীর ডাক্তারিকে।

যামিনী কবিরাজের চরিত্রের মানসিক বিকৃতির চূড়ান্তরূপ প্রকাশ পায় যখন যামিনী কবিরাজ নিজের স্ত্রীকে শশীর দেওয়া গুটিবসন্তের ওষুধ গুটি পাকার সময় ছলনা করে খাইয়ে দেন। কারণ যামিনী এবং গোপাল ষড়যন্ত্র করে শশীকে যামিনীর বাড়ি আসা ঠেকাতে না পারার প্রতিহিংসাপরায়ণতা। শেক্সপীরীয় নায়ক ওথেলোর ক্ষেত্রেও তার ঈর্ষাকাতরতাই সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। মার্ক্সবাদ এবং ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে বিশ্বাসী মানিকের লেখনীতে যামিনী কবিরাজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত মাৎস্যন্যায় ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তের বিশ্বাসহীনতা, চারিত্রিক সংকট, আত্মিক গ্লানির মূর্ত প্রতীক হয়েছে মাত্র।

যাদব পন্ডিত ও পাগলাদিদি (পুতুলনাচের ইতিকথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে যাদব পন্ডিতের বৌ তার পাগলাটে স্বভাবের জন্য সমাজে ছেলে-বুড়ো সবার কাছে পাগলাদিদি নামে পরিচিত। এই পাগলাদিদি ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই যাদব পন্ডিতের। শশী ডাক্তারের সঙ্গে এই পাগলাদিদির সম্পর্ক খুবই ভাল। এই বৃদ্ধার ঘর শশীর বহির্জীবনের সমস্ত সন্তাপ জুড়িয়ে দেয়। পাগলাদিদির স্বভাব পাগলাটে হলেও পাতিব্রত্যে সে মোটেই মানসিক শৈথিল্য প্রদর্শন করেনি। স্বামী যাদব পন্ডিত সূর্যবিজ্ঞানের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য ঝোঁকের মাথায় রথের দিন নিজের মৃত্যুর দিনক্ষণ ঘোষণা করে বসেন। শশীর সংস্কারমুক্ত মন বাস্তবটা বুঝতে পেরে যাদবদের বলে রথের দিন পুরী বা অন্য কোনো তীর্থ

ভ্রমণে যেতে। কিন্তু যাদবের ego তাতে দপ্ করে জ্বলে ওঠে। পলায়ন মনোবৃত্তি নেই যাদবের। ভাঙবে সে, তবু মচকাবে না। পাগলাদিদি কিন্তু বাস্তবটা বুঝেছিল। সব বুঝেও সে স্বামীর ঊর্দ্ধে যেতে পারেনি। তাইজন্যই যাদব শশীকে তিরস্কার করার পর শশী তাদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিলে পাগলাদিদি তাকে ডেকে বলেছিল মৃত্যু ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই তাদের। শেষে রথের দিনে আফিমের তীব্র মাত্রা প্রয়োগে এই পদ্ধতি অজস্র মানুষের মনের সংস্কার-বিশ্বাসকে রূপ দিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ভুবনের পিতা (সরীসৃপ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' কাহিনি আকারে বেশ বড়। নায়ক বনমালী এবং তার দুই পাশে থাকা দুই রমণী চারু ও পরী- যারা সম্পর্কে দুই বোনও বটে-এই তিনজনের সম্পর্কের আবর্তন-টানাপোড়েনে গড়ে উঠেছে কাহিনিকায়া। এখন চারু প্রৌঢ়ের সীমায় উপনীত। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তার বিবাহ হয়। বর পাগল। চারুর শ্বশুরমশাই রামতারণবাবু প্রায়শই প্রতিবেশী বনমালীর বাবার সঙ্গে ব্যারাকপুরের বাগানবাড়িতে ফূর্তি করতে যেতেন- রাত কাটিয়ে আসতেন। তাই পাগল পুত্রের বধূ চারুকে পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন বনমালীকে। বনমালীর বয়স তখন ছিল পনের। বুদ্ধিমতী চারু বনমালীকে তাদের পাশের ঘরে শুইয়ে রেখে স্বামীর সামনেই শোবার ঘরের মাঝের দরজাটা খুলে রাখত। এখানে মানিক জানিয়েছেন চারুর পাগল স্বামী বাবার ভয়ে সব জেনেও কিছুতে বাধা দিত না।

পনের বছরের বনমালী এবং সতেরো বছরের চারুর মধ্যে সন্তর্পণে গড়ে উঠত এক সম্পর্ক। চারুর স্বামী পাগল ছিল। কিন্তু সে সব বুঝত। রামতারণবাবুর প্রবল প্রতাপে তার চরিত্রের দার্ঢ্যতা ব্যাহত হয়েছিল। স্বভাব চরিত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়েছিল বাবার প্রতি তার প্রচন্ড ভয়। সেই ভয় থেকেই সে রয়ে গেল জড়বুদ্ধিসম্পন্ন।

ভুবন (সরীসৃপ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপে' পরবর্তীকালে চারুর একমাত্র সন্তান ভুবন-সেও তার বাবার মতই হল, জড়বদ্ধিসম্পন্ন। মনে পড়ে মহাভারতের কথা। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব, পান্ডুর পান্ডুরতার পশ্চাতে তাদের জন্মবৃত্তান্তের ছাপ পড়েছে। ভুবনের পিতার তার বাবার প্রতি থাকা প্রচন্ড ভয় জিনবাহিত হয়ে এসেছিল ভুবনের মধ্যেও। ফলত: ভুবনেরও স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটল না। ভুবনের প্রতিবন্ধকতাকে মানিক গল্পে দেখিয়েছেন এইভাবে-

''ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য মোটা। তাহার গলায় দুটি খাঁজ আছে, মনে হয় গালেও খাঁজ পড়িবে।''[১৬৫]

'সরীসৃপ'-এর কাহিনিবৃত্তটি আবর্তিত হয়েছে মধ্যবয়সী পাটের কারবারী বনমালীকে কেন্দ্র করে দুইবোন চারু ও পরীর মানসিক টানাপোড়েন ও যৌনঈর্ষাকে নিয়ে। চারুর সঙ্গে কাঁচাবয়সেই বনমালীর একটা মানসিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেও অবিবাহিত বনমালীর সঙ্গে সেই সম্পর্ক কখনোই কোনো অন্যমাত্রা পায়নি। চারুর স্বামী মারা যাবার পর চারু এই ভুবনকে নিয়ে বসবাস করতে থাকে বনমালীর ভরসাতেই। বনমালীও ভুবনের প্রতি যথেষ্ট ইতিবাচক আচরণ করত। যদিও ভুবনের মত অস্বাভাবিক স্থূলকায়া জড়বুদ্ধিসম্পন্ন সন্তানের প্রতি মা চারুর স্নেহ বনমালীর মনে যথেষ্ট বিস্ময়বোধের উদ্রেক করে। রসশাস্ত্র মতে বিস্ময় থেকেই হয় নতুন সৃষ্টি।

বনমালীর যৌবনের প্রেমিকা চারু আজ বার্ধক্যে উপনীত। পাগল স্বামী মারা গেছে চারুর। একমাত্র পুত্র ভুবন সেও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। এরকম পরিস্থিতিতে তাদের জীবনে এসে হাজির হয় চারুর ছোট বোন পরী। পরীর জীবনেও নেমে এসেছে বার্ধক্য। এখন পরীরও একমাত্র অবলম্বন তার একমাত্র পুত্র। দুই বিধবা রমণীর জীবন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে বনমালী। দুই বোনের মানসিক দ্বেষ-ঈর্ষা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। যার ঘৃণিত রূপের বহিপ্রকাশ ঘটে যখন চারু তারকেশ্বর থেকে আনা কলেরার জীবাণু মেশানো পাত্রে পরীকে প্রসাদ খাওয়াতে চায় পৃথিবী থেকে চিরতরে পরীকে সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু গল্পের মোড় ঘুরে গেল- কিছুদিন পর চারু নিজেই কলেরায় মারা যায়।

পিতৃহারা ভুবন অনাথ হয়ে পড়ল মায়েরও মৃত্যুতে। যে বনমালী চারুকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেনি সেই বনমালীই চারুর ছেলেকে নিজের সন্তানের মত আগলে রাখল। ভুবনের বয়স এখন আঠারো। মানিক চমৎকার মুন্সীয়ানায় এই বয়সসংখ্যাটিকে ব্যবহার করেছেন। আঠারো বছর বয়স হওয়া মানে সে আর শিশু নয়, সে এখন adult বয়:প্রাপ্ত। ভুবনের মধ্যেও এক পরিবর্তন এল। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বালক মায়ের মৃত্যুশোকের জাগরণ ঘটে। ভুবনের এই মানসিক-স্থিতির উন্নতি অনেকাংশে অনুপ্রাণিত করে বনমালীকে। বনমালী আর ভুবনের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটতে থাকে, পারস্পরিক আনুগত্য ভালোবাসার বিস্তার ঘটতে থাকে। অপরপক্ষে ভুবনের প্রতি বনমালীর ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা-স্নেহপ্রীতি পরীর মনে নতুন করে insecurity- বোধ বাড়াতে থাকে। এরপর বনমালী যখন পরীর সামনে ভুবনের নামে একটি বাড়ি লিখে দেবার কথা বলে আর সামলাতে পারে না পরী ফলস্বরূপ বনমালীর মা হেমলতার অসুস্থতার ব্যস্ততার সুযোগে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ভুবনকে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে পরী ভুবনকে হাওড়া স্টেশন থেকে বোম্বের গাড়িতে তুলে দেয়, যা ভুবনের কাছে মৃত্যুমুখে পতিত হবার নামান্তর। এরপর পরীর ষড়যন্ত্র বনমালীর কাছে

ধরা পড়লে বনমালী নিচের তলায় বাড়ির পরিচালিকাদের সাথেই একটা স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দেয় পরীর।

ভুবন নিজে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন স্থবির হলেও কাহিনির অনুঘটক হিসাবে ভুবন চরিত্রের জঙ্গমতা অত্যন্ত কৌশলী। চারুর নিষ্কন্টক বনমালীকে প্রাপ্তির জন্য পরীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা এবং ভাগ্যের পরিহাসে নিজেই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া ভুবনের সামনে এক অন্য বাস্তব তুলে ধরে। অনাথ ভুবন বনমালীর অভিভাবকত্বে নতুন জীবনযুদ্ধে পা দিল। যা আবার পরীর কাছে ভিন্ন বার্তা বহন করে আনল। পরীর বনমালীকে পাবার পথ মসৃণ হবার বদলে আরও ভুবনময় হয়ে পড়ল। ফলত পরী ভুবনকে সরিয়ে দিল। পরীর মনের মাতৃসত্তা গ্রাস করল বিকৃত যৌনতৃষ্ণা। না মা না মাসি সব সত্তাই বিষাক্ত হল পরীর। আর রইল পড়ে বনমালী! বনমালীর প্রকৃত মনুষ্যত্বও উন্মোচিত হল ভুবনের সংস্পর্শে এসেই।

ভুবন নিরুদ্দেশ হবার পরই বনমালী পরীর আস্তানার পরিবর্তন ঘটায়। পরী বনমালীর আশ্রিতা এবং শুধু তাই-ই নয়, পরী হল চারুর বোন, যে চারু বুদ্ধিমতী, প্রতিভাময়ী এবং বনমালীর প্রথম বয়সের নেশা। পরী দেহসর্বস্বতা দিয়ে বনমালীকে মুগ্ধ করতে পারেনি। স্বভাবসিদ্ধতায় নিরাসক্ত, সংযমী বনমালীর পক্ষে তাই চারুর অবর্তমানে ভুবনময় জীবনে ভুবনহীনতা পরীর প্রতি নির্মমতায় অকপট থেকেছে। চারু বয়সে দুবছরের ছোট বনমালীর প্রেম নিয়ে যথেচ্ছ খেলা করেছে। সেই ফাঁক দিয়েই বনমালীর জীবনে প্রবেশ করেছে পরী। কিন্তু পরীতে চারুর অভাব পূরিত হয় না। চারুর অবর্তমানে তার পুত্র ভুবন চারুর প্রতিনিধিত্ব করেছে।

শেষপর্বে বনমালীর মা হেমলতা নিরুদ্দিষ্ট ভুবন সম্পর্কে খোঁজ নিতে এলে বনমালী বলেছিল আপদ বিদায়ে শান্তির কথা। বনমালী যে যথার্থ নিস্পৃহ জীবন সম্পর্কে নিরাসক্ত সেই চরিত্ররূপের যথার্থ পরিচয় ভুবনের অন্তর্ধানে। বনমালীর চারুর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার স্মারক চারু অবর্তমানে তার অবোধ বড় সন্তান ভুবনের প্রতি বনমালীর দায়িত্বশীলতা। আর পরীর বনমালীর প্রতি প্রেমাকাঙ্খার শ্বাপদ প্রবৃত্তির প্রকাশ ভুবনের প্রতি পরীর কপটাচরণ। সুতরাং বলা যায় ভুবন জড়বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বিকার চরিত্র হলেও তার মাধ্যমেই মানবমনের গূঢ় জটিলতা সরীসৃপের রূপে বিস্তারিত হয়েছে।

সুচিত্রা (মহাকালের জটার জট : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রাক্ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাকালের জটার জট' গল্পে সুচিত্রা মানসিক বিকারগ্রস্ত। তবে সুচিত্রা যে শুধু পাগল, তাই-ই নয়, লেখকের ভাষায়,-

''সুচিত্রা আধবোবা, আধকালা, আধপাগল।''[১৬৬]

তার এই প্রতিবন্ধকতার জন্য তার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অতিকষ্টে পাত্র জোগাড়ের চেষ্টায় এক পাত্রপক্ষ সুচিত্রাকে দেখতে এলে সে এক ভয়ঙ্কর কান্ড করে বসে,-

''অর্ধনগ্ন অবস্থায় উঠানে গড়াগড়ি দিয়ে সুচিত্রা চিৎকার করিয়া কাঁদে। মরিয়া গেলেও সে দুবার বিবাহ কিছুতেই করিবে না, এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টায় পাগল মেয়েটার যেন প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।''[১৬৭]

সুচিত্রা পাশের বাড়ির ছোট ছেলে পঞ্চু, যে কিনা স্কুলে পড়ে, তার সাথে অলীক দাম্পত্যের জগৎ রচনা করেছে।

''সুচিত্রার বিকৃত মনে এই ভাইটির জন্য কেমন করিয়া একটা আশ্চর্য প্রখর মমতা জন্মাইয়াছিল, খুব সম্ভব সেই ভালোবাসাই এখন পাশের বাড়ির গম্ভীর প্রকৃতি ছেলেটির উপর পড়িয়াছে ; পাগল মেয়ের অন্ধ উগ্র ভালোবাসা। প্রকাশটি বিচিত্র। পাঁচুর স্কুল বন্ধ থাকার দিনটির প্রতীক্ষায় সুচিত্রা ছটফট করে, অন্যদিন তার কাছে পাঁচুর বেশিক্ষণ থাকা নিষেধ, তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখিয়া পাঁচু মানুষ হোক সুচিত্রার এই আগ্রহ একেবারে নিষ্ঠুর।''[১৬৮]

তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে তার কারণ, তবেই পাঁচু সুচিত্রাকে ছেলে কিনে এনে দিতে পারবে।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অনুসারী মানিক সুচিত্রা চরিত্রে দেখালেন মানুষ যখন বাস্তবে তার আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে না, তখন বহির্জগতে কল্পনায় তার ইচ্ছাগুলি পূরণ করে নেয়। সুচিত্রার মাথার গন্ডগোল থাকলেও বয়সোজনিত কারণে তার মধ্যে কামচাহিদা এসেছে এবং তা সে চরিতার্থ করছে পাঁচুকে কেন্দ্র করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই পাঁচু আর সুচিত্রার মধ্যে একটি সম্পর্ক সূত্র বলেছেন, পাঁচুর বয়স সুচিত্রার শৈশবেই মারা যাওয়া ছোট ভাইটিরই সমপ্রায়। ছোটভাই-এর প্রতি অতৃপ্ত ভালোবাসা সুচিত্রার ধাবিত হয়েছিল পঞ্চুর প্রতি, এর সাথে বাস্তবের না পাওয়া, বয়সোচিত কাম সবকিছু মিলিয়ে পঞ্চু হয়েছিল সুচিত্রার স্বামী। অবদমিত কাম মস্তিষ্কবিকৃতির পথে ভিন্ন ধারায় নিজের যৌনচাহিদা পূরণ করেছে। মানিক দেখালেন, ফ্রয়েড কথিত যৌনতা-নরনারীর

প্রতি আকর্ষণ- ইডিপাস কমপ্লেস- কিভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন সম্পর্কের বেড়াজালে কাজ করে।

বিবাহিতা সুচিত্রা দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায় না। বাড়ির লোক এ বিয়ে মানে না, কারণ তার স্বামী রোজগার করতে পারেনা। আমরা যদি না জানি যে, মেয়েটি পাগল, তাহেল কিন্তু দেখব তার কথাগুলি মোটেই অবাস্তব নয়। একটি অল্পবয়স্ক মেয়ে রোজগারহীন ছেলেকে বিয়ে করায়, তার পরিবারের লোকজন সে বিয়ে না মেনে মেয়েটির আবার জোর করে দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ করছে, এবং বাড়ির লোক বলছে এ বিয়ের ব্যাপার সত্য নয়, অর্থাৎ বাড়ির লোক চাপা দিতে চাইছে ঘটনাটি। এবার জানা গেল, সুচিত্রার স্বামী রোজগার করে না, কারণ সে পড়াশুনা করছে। এ পর্যন্ত ঠিকই আছে। এরপর যখনই জানা গেল সে ছেলেটি স্কুলে পড়া বাচ্চা, তখন প্রথম খটকা লাগে। আর তারপর গল্পকার যখন বললেন পাশের বাড়ির ছেলেটির বয়সীই সুচিত্রার এক ভাই ছিল, যে মারা গেছে। মানসিক বিকারে সুচিত্রার বয়সও থেমে রয়েছে সেই বাল্যেই। বাড়িসুদ্ধ লোক সুচিত্রাকে এড়িয়ে চলে- তারা সবাই পূর্ণবয়স্ক মানুষ। তাই সুচিত্রা একমাত্র মনের কথা বলে পাশের বাড়ির বাচ্চা ছেলে- পাঁচুর সাথে। সুচিত্রার বুদ্ধির বিকাশ না হলেও শারীরিক গঠন ছিল পরিপূর্ণ। ফলে জৈবিক চাহিদাগুলিও তৈরী ছিল তার মধ্যে। এরপর যুক্ত হল সমাজের নিয়ম অনুসারে পাগল মেয়েরও বিয়ে দেবার চেষ্টা। বাড়িতে বৌদি সুলতার সাথে সুচিত্রার সম্পর্ক ভালো- সেই সুলতা এখন সাত মাসের অন্ত:সত্ত্বা। ফলে সবমিলিয়ে সুচিত্রার মনের অবদমিত কামের পাঁচুর সঙ্গে অসম বিকৃত দাম্পত্যে নির্গমন হতে থাকল। এত ছোটো ছেলের সঙ্গে সুচিত্রার দাম্পত্য সমাজের দৃষ্টিতে বিকৃত, কারণ সুচিত্রা পাগল- সেটা বিশ শতকের তিন-এর দশকের কথা। বর্তমানকালে সুচিত্রা যদি পাগল না হত, এবং পাঁচু আর সুচিত্রা দুজনেই যদি স্বাধীন পূর্ণবয়স্ক মানুষ- adult হত, তাহলে তাদের সম্পর্ককে বিকৃত আখ্যা দেওয়া যেত না হয়তো।

পূর্ণিমা (তিরোলের বালা : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিরোলের বালা' গল্পে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের মতই অপরূপ রূপবতী যুবতী পূর্ণিমা, জাতিতে ব্রাহ্মণ বয়স এই সতেরো-আঠারো। বাড়ি সুদূর ধানবাদের কাছে সয়লাডি কলিয়ারি। বাড়িতে বাবা আছেন। মা নেই। বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সে স্মৃতি কখনো পূর্ণিমার থাকে ,কখনোও আবার সে নিজেকে অবিবাহিত মনে করে বলে বাবা হয়ত এ বছরই তাকে পাত্রস্থ করবেন। পূর্ণিমা পাগল, উন্মাদ। দাদার সঙ্গে অনেকটা পথ ট্রেন-নৌকা গোরুর গাড়ি ইত্যাদি অনেক কিছু পেরিয়ে সে চলেছে তিরোলে। কথিত আছে সেখানকার পাগলাকালীর বালা ধারণে সুফল মেলে উন্মাদরোগগ্রস্তদের। এ যেন চাঁদের কলঙ্ক। গায়ের রং তার ধপ্‌ধপে ফর্সা, বড় বড় চোখ। আর

ঠোঁটের উপরটা কেমন যেন ঈষৎ বেঁকানো হয়ে মুখশ্রীর সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। আর কণ্ঠস্বরও সুমিষ্ট সেতার ঝঙ্কারের মতই অনুরণিত। পোশাক-আশাকও তার পাগলামির চিহ্ন বহন করে না। তবে তার ছাপা সিল্কের শাড়ি এবং পায়ে মাদ্রাজী চটির সঙ্গে একটু বেমানান তার মাথার চুলের অবিন্যস্ত বন্ধন। মার্টিন কোম্পানির রেলগাড়িতে দাদার সঙ্গে পূর্ণিমা চলেছে। পথে কথকের সাথে দেখা সহযাত্রী হিসাবে।

পূর্ণিমা এবং তার দাদা এক ট্রেনে পাশাপাশি চলেছে। সহযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে টুকটাক কথাবার্তা চালালেও এই দুই সহযাত্রী অস্বাভাবিক রকমের চুপ। লোকজনের চোখে তা অনেকটাই সন্দেহজনক। কারণ পূর্ণিমার নৈঃশব্দ্য। অনেকেই ভাবছে এটা হয়ত ইলোপ কেস হতে পারে। কারণ পূর্ণিমা বেশ সুন্দরী, বয়সটাও কম। পাশের ছেলেটি দাদা-বোন হতে পারে আবার মামা-ভাগ্নীও হতে পারে। কিংবা প্রেমঘটিত কোনো সম্পর্ক। পূর্ণিমার আচরণে না আছে আপাত কোনো উগ্নতা, আবার নেই কোনো সহৃদ্যতা-আন্তরিকতা।

এরপর অবশ্য পূর্ণিমার দাদা যখন সহযাত্রী কথকের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপচারিতায় রত হল, তখন পূর্ণিমার ব্যবহারেও এল আন্তরিকতার ছোঁয়া। সহযাত্রীর প্রতি আতিথ্য-সৎকার ক্রিয়াতে মোটেও আন্তরিকতার অভাব নেই পূর্ণিমার আচরণে। দাদা ও বোন তিরোলের পথে যাবার সময় নিজেদের সঙ্গে কিছু খাবার এনেছিল। লুচি, পটলভাজা, আলুচচ্চড়ি। পথে আবার বর্ধমান থেকে কিছু পরিমাণ মিহিদানাও কিনে নেয়। অতিথিকে পথে হলেও যথাযথভাবেই আদর-আপ্যায়ণ করে পূর্ণিমা। এ পর্যন্ত তার আচরণে কোনো পাগলামির লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। এমনকি মিহিদানা খেতে দেবার সময় সে অত্যন্ত বিনীতভাবেই জানতে চেয়েছে যে খাবারটা মিষ্টিটা কোনোভাবে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার দরুণ নষ্ট হয়ে গেছে কি না । অতি সুন্দরী তরুণী, তদুচিত সুমধুর ব্যবহার।

পূর্ণিমার দাদার কথা থেকে জানা যায় দীর্ঘ দুইমাসব্যাপী সে চুপ করে আছে। তাই ভয় কখন আবার ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় পূর্ণিমাকে সামলানো খুবই কষ্টকর। পূর্ণিমার এই উন্মাদ দশা ঘটে অপরিচিত মানুষদের সান্নিধ্যে। অথচ আশ্চর্যের কথা কথকও তো পূর্ণিমার কাছে অপরিচিত-বাইরের লোক। কিন্তু প্রথম আলাপে কোনোরকম আচরণের উগ্রতা তার মধ্যে দেখা দেয়নি। পূর্ণিমার দাদা বোনের এই পাগলামির উৎস জানতেন। কিন্তু বিধাতার লেখা কি আর খন্ডানো যায়। সুদূর তিরোল যাবার পথে একা পাগলি বোনকে নিয়ে যাবার রিস্ক নিতে পারল না পূর্ণিমার দাদা। সাথে কথককে নিলেন সহযাত্রী সহকারী সহযোগী হিসাবে।

ট্রেনের যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় সমাজ-দেশ সর্ম্পকিত আলোচনায় যখন পথশ্রমলাঘবে ব্যস্ত তখন পূর্ণিমা একধারে দাদার সাথে বেঞ্চিতে এককোণে বসেছিল। তাকিয়ে ছিল

বাইরের দিকে। জানলা দিয়ে সে একদৃষ্টে সবকিছু দেখেছিল। ট্রেন যতই এগিয়ে চলতে থাকল ততই ভিড় কমতে লাগল। ডেলি প্যাসেঞ্জারর যে যার নিজের স্টেশন আসাতেই নেমে গেল। গাড়ি ফাঁকা। পূর্ণিমা, তার দাদা এবং কথক। এই তিনজনমাত্র রয়েছে কামরাটিতে। জাঙ্গিপাড়ায় বাকি সব যাত্রীরাই নেমে গেছেন। পরবর্তী স্টেশন আঁটপুর। এখানে ভাল করে পূর্ণিমার পরিচয় পাওয়া গেল। তার সাজসজ্জায় বিবাহের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। তবে সহযাত্রীর সাথে এতটা রাস্তা একটাও কথা না বলায় কথকের মনে হয়েছে তরুণ-তরুণীটির আসার পথে কোথাও বোধ হয় ঝগড়া হয়েছে। তাদের দুজনের সম্পর্ক ঠিক কি ভাই-বোন, মামা-ভাগ্নী না কি প্রেমিক-প্রেমিকা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ঘটে পূর্ণিমার ব্যবহারের উদাসীনতায়।

নামার আগের স্টেশন পিয়াসাড়ায় শেষ স্টেশন চাঁপাডাঙায়। পূর্ণিমার দাদাই প্রথম কথা বলল কথকের সাথে। পূর্ণিমার দাদা জানতে চেয়েছিল চাঁপাডাঙা স্টেশন থেকে নদী কতদূর। পূর্ণিমার আচরণ যে কৌতুহল সৃষ্টি করেছিল জনমানসে তা আরও বেড়ে যায়। পূর্ণিমারা কোথায় যাবে এই অজপাড়া গাঁয়ে - প্রত্যন্ত রাঢ়দেশে। কারণ তাদের পোশাক-আশাক যথেষ্ট ভদ্রজনোচিত শৌখিনতার সাক্ষ্য বহন করছিল। অবশেষে যুবকটিই সমস্ত কৌতূহলের অবসান ঘটিয়ে জানায় স্টেশন থেকে নদী পার হয়ে তারা আরও কোনো গাড়ি করে সুদূর তিরোল যেতে চায়। কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত। সঙ্গে থাকা পূর্ণিমা তার বোন। এই বোনের জন্যই পাগলাকালীর বালা আনার উদ্দেশ্যে তাদের এই এতদূর আসা। এই এতদূর পথ, বিদেশ-বিভুঁই, অন্ধকার, সাথে পাগলি বোন - যুবতী সুন্দরী পূর্ণিমা - তাকে নিয়ে একা ভরসা না পেয়ে যুবক কথকের সাহায্য চায়।

পূর্ণিমার আর্কষণে কিংবা সহানুভূতি অথবা যুবকের অবস্থার কারুণ্য বুঝতে পেরে কথক মানবিকতার পরিচয় দিয়ে নিজের মেসোমশাই-এর অসুস্থতায় মাসির বাড়ি যাবার বদলে আগে তাদের সাথে যাবারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাত হয়ে যাওয়ায় চাপাডাঙা স্টেশনেই কারো বাড়ি আশ্রয় নেবার কথা বললে পূর্ণিমার মানসিক অবস্থার জন্য সেই সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায়। কারণ পূর্ণিমার এ পর্যন্ত আচরণ অতি শান্ত। একটাও কথা বলেনি সে। তার দাদার কথা থেকে জানা যায় প্রায় দুমাস সে একদম চুপ করে আছে। কখন যে সে আবার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে সেটাই আশঙ্কার কারণ। বিশেষতঃ পূর্ণিমার দাদার কথা অনুযায়ী অপরিচিত লোকের মাঝেই তার মানসিক ভারসাম্য লঙ্ঘিত হয়। সে এক প্রচন্ড রুদ্র মূর্তি সে ধারণ করে। দাদার হাতে ছাড়া কারো হাতে সে খায় না অবদি।

অথচ বিস্ময়ের কথা হল এই অপরিচিত সহযাত্রীর সঙ্গে পূর্ণিমার দাদা যখন কথা বলছে তখন পূর্ণিমার কোনো অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্যিত হয় না। গোরুর গাড়ির ছই-তে বসে পূর্ণিমার প্রথম কথা শোনা গেল। একেবারেই স্বাভাবিক সে কণ্ঠস্বর এবং কথোপকথন। নদীর কাছাকাছি ঠান্ডার

অনুভূতির কথা সে জানায় তার দাদাকে। যদিও কথকের কথানুসারে সেটাতে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু বৈশাখী সন্ধ্যায় চাদর গায়ে দেবার মত শীতানুভব বিশেষ অন্য তিনটি মানুষের সেরূপ অনুভব না হওয়া একটু অস্বাভাবিকতা বটে। যদি সত্যিই এতটাই ঠান্ডা লাগত। তাহলে সাথে সাথে গায়ে কিছু দেবার ব্যবস্থা করত নিশ্চয় পূর্ণিমা। বিশেষত সাথে যখন রয়েছে চাদর এবং তার দাদা সেকথা তাকে স্মরণও করায়। কিন্তু এতটাই মানসিক চাঞ্চল্য পূর্ণিমার যে তৎক্ষণাৎ সে নদী দেখে দামোদর-এর কথা বলতে থাকে। ছোটবেলায় মামারবাড়ির স্মৃতি ভেসে ওঠে পূর্ণিমার। বর্ধমান জেলার দামোদরের ধারে বল্লভপুর গ্রামে শৈশবে দুবার মামারবাড়ি গেছিল পূর্ণিমা। কিন্তু তারপর আর কি হয়েছিল সে ব্যাপারে একটা ধাঁধার সৃষ্টি করে পূর্ণিমার দাদার ''তারপরে --'' শব্দবন্ধ এবং যতিচিহ্নের ব্যবহার। এই নদী, নদীর সাঁকোর উপর দিয়ে গোরুর গাড়ি যাত্রা- যাত্রাপথের দোদুল্যমানতা মৃত্যুভয় সৃষ্টি করেছিল পূর্ণিমার মধ্যে।

এ পর্যন্ত পূর্ণিমার আচরণে খুব একটা বেশি অস্বাভাবিকতা অবশ্য বলা যাবে না। কারণ অল্পতেই ভয়ভীত হওয়া নারীচরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম। আর নদীযাত্রাপথে সমপ্রায় যাত্রাপথের পূর্বস্মৃতি স্মরণে আসাও কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। মানবমনস্তত্ত্ব বলে মানবমন মাকড়সার জালের মতই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্যে যথেচ্ছ জাল বোনে। সাহিত্যতত্ত্বের ভাষায় stream of consciousness কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

ট্রেনযাত্রা, এরপর গোরুর গাড়িতে তারপর নৌকায় নদীপথ পেরোনো, এরপর আরও একপ্রস্থ গাড়ির প্রয়োজন। সেটার জন্য সহৃদয় গাড়োয়ান তিন সওয়ারীকে গাড়িতেই বসতে বলে পরবর্তী গাড়ির উদযোগে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সময় পূর্ণিমার উদ্যোগেই কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা হয়। এত দূর পথ অতিক্রম করার জন্য পূর্ণিমাদের সাথে লুচি, পটল ভাজা, আলুচচ্চড়ি এবং বর্ধমান থেকে কেনা মিহিদানার ব্যবস্থা ছিল। পূর্ণিমা ক্ষুধা অনুভব করায় দাদা এবং বোন শুধু নয়, কথককেও যেভাবে খাবারের জন্য বলেছিল তাতে কোনোরকম অস্বাভাবিকতা তো ছিলই না, বরং এক মমতাময়ীর আন্তরিকতাই পরিস্ফুট। 'পোষ্টমাস্টার' গল্পে সুদূর উলাপুর গ্রামে অসুস্থ অবস্থায় যেমন পোষ্টমাস্টার বালিকা রতনের সেবাস্পর্শে বাড়ির মা-দিদির স্নেহসান্নিধ্য অনুভব করেছিল, কথকও তেমনি পূর্ণিমার আচরণে অপরিচিতের সংকোচ বা মানসিক বৈকল্যের কোনো লক্ষণ তো পানইনি, উল্টে গৃহপরিবেশ আর মা-বোনের সান্নিধ্যে চির-পরিচিত পরিবেশের স্বাভাবিকতা সৃষ্টি করেছিল।

পূর্ণিমার আচরণে কোনোরকম অস্বাভাবিকতা ছিল না। অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ কোনো সংকোচ বা নারীসুলভ লজ্জাও ছিল না। বরং বর্ধমান থেকে আসার পথে কেনা মিহিদানাটার গুণগতমান নিয়েও যথেষ্ট স্বাভাবিক কথোপকথনই হয়। বরং কথককেই পূর্ণিমা বলেছে খেয়ে দেখতে

রাস্তায় কেনা মিহিদানাটা ভাল আছে কিনা। এতে রাস্তায় পথচলতি দোকানের খাদ্যের গুণগতমান সম্পর্কে ক্রেতার সাধারণ concern এবং তার সাথে অতিথির সঙ্গে একেবারেই ঘরের লোকের মত অকুণ্ঠ ব্যবহার প্রকাশ পেয়েছে। পূর্ণিমা কিন্তু একবারও বাকি খাবারগুলি মানে লুচি, পটলভাজা বা আলুচচ্চড়ি বিষয়ে জানতে চায়নি। কারণ সে জানে এই খাবারগুলো ঠিকই থাকবে।

আহার পর্ব শেষ হতে হতেই মাঝি ভাই পরবর্তী স্তরের জন্য গোরুর গাড়ি জোগাড় করে নিয়ে আসেন। তাকে তার প্রাপ্য ভাড়া এবং বকশিস দিয়ে পূর্ণিমারা তিনজন গাড়িতে উঠে রওনা দেয়। কিন্তু গারোয়ান তামাকের টিনটা আনতে ভুলে যাওয়ায় গ্রামপথ শামকুড় দিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। এই গ্রামপথ গ্রাম্য পরিবেশে পূর্ণিমা কথকের সঙ্গে স্বাভাবিক কথোপকথন শুরু করেছিল। কথকের মাসিমার বাড়ি বর্তমান অবস্থা থেকে কতদূর জানতে চায় পূর্ণিমা। কথক জানিয়েছিল দূরত্ব বেশ খানিকটা। কারণ তিরোল আর মাসিমার বাড়ি এক রাস্তায় নয়। সম্পূর্ণ বিপরীত পথ। এর পরবর্তী কথোপকথনও অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অভিপ্রেত। সম্পূর্ণ অপরিচিত দুই যুবক-যুবতীর সাহায্যের জন্য এই এতটা রাস্তা আসা কথকের পক্ষে ক্লেশদায়ক - কিনা তা পূর্ণিমা বলতে কথক অত্যন্ত বিনীতভাবেই জানায়, তাতে ক্লেশের কষ্টের কিছু নেই। এই কথা শুনে পূর্ণিমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হঠাৎ ছেলেমানুষী হাসিতে ফেটে পড়ে। এক সুন্দরী যুবতীর এহেন হাসি, বিদেশ বিভুঁই-এর বৈশাখী সন্ধ্যায় গ্রাম্য পরিবেশে প্রথমে সহৃদ্য আতিথ্যের পর মুগ্ধতাবোধের সঞ্চার করলেও, প্রাথমিক আবেশ কেটে গেলেই যুবকের কানে অপ্রকৃতিস্থতার শব্দ ধ্বনিত করে।

পূর্ণিমার দাদা আন্দাজ করতে পারছিল পূর্ণিমার দীর্ঘ দুইমাস নিঃশব্দের পর কথা বলা এবং হাসি হয়ত কোনো বড় ঝড়ের সংকেত হতে পারে। হলও তাই। গাড়ী আরেকটু কিছুদুর এগোতেই পূর্ণিমা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দাদার প্রাথমিক প্রতিরোধ দাঁতের কামড়ে প্রতিহত করে গোরুর গাড়ির সামনে এসে গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে যায়। গাড়োয়ান তরুণ। আর জানাই থাকে তিরোল যাত্রীদের মধ্যে কেউ না কেউ উন্মাদ হয়ই, কিন্তু সে যে এই পরমাসুন্দরী যুবতীটি তা বোঝা যায় পূর্ণিমার আচরণে। পূর্ণিমা পালিয়ে যায়। তারপর অবশ্য গাড়োয়ানের উপস্থিত বুদ্ধি এবং তৎপরতায় পূর্ণিমার সন্ধান পাওয়া যায়।

গ্রামের এক গৃহস্থ রসিকলাল ধাড়া, জাতিতে কৈবর্ত। তারই গোয়ালঘরে গিয়ে উঠেছিল পূর্ণিমা। এখানে একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হল পূর্ণিমা কিন্তু কোনো জলভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। গাড়োয়ান বা পূর্ণিমার দাদা পূর্ণিমা গাড়ি থেকে নেমে পরায় খাল বা জলার অংশগুলি প্রথমে ভাল করে সন্ধান চালায়। কিন্তু পূর্ণিমা আশ্রয় নিয়েছিল গৃহস্থের গোয়ালঘরে গোরুদের সান্নিধ্যে। এরপর পূর্ণিমার আচরণ আবার শান্ত ও স্বাভাবিক। গৃহস্বামীর অনুরোধে পূর্ণিমারা সেই রাতটুকু সেই

বাড়িতেই থাকার উদ্যোগ করে। কৈবর্ত্তের রাঁধা ভাত যেহেতু ব্রাহ্মণদের গ্রহণীয় নয়, তাইজন্য রান্নার সমস্ত জোগাড় রসিকলাল দিয়ে গেলেও রান্নার ব্যবস্থা পূর্ণিমারাই করে। আবার পূর্ণিমার শান্তরূপ ফিরে আসায় এবারও রান্নায় বসে পূর্ণিমা নিজে।

রন্ধনরতা পূর্ণিমা নারীর পরিপূর্ণ রূপের আরেকবার পরিচয় দেয়। এখানেও পূর্ণিমার আচরণে কোনোরকম অসংলগ্নতা লক্ষিত হয় না। বরং রান্নার সময় সে তাকে দেখতে আসা মেয়ে-বৌদের সঙ্গে টুক্‌টাক কথাবার্তা ও রঙ্গরসিকতাও করেছে। বরং আবার দর্শনার্থীদের পূর্ণিমা এটাও বলেছে যে সেও তো আর পাঁচটা মেয়ের মতই সাধারণ দুই হাত- দুই পা বিশিষ্টা ; সুতরাং তাকে এত ঘটা করে সবার দেখতে আসার কিছু নেই। শুধু তাই-ই নয়, পূর্ণিমার বাড়ি-ঘর-বাবার নাম বয়স সবই সে যথাযথ জানিয়েছে। পূর্ণিমা নিজে থেকেই দাদাকে বেশ সহজ সুরেই জানিয়েছে পাড়ার লোক তার বৈবাহিক স্থিতি সম্পর্কে কৌতুহল প্রকাশ করায় সে জানিয়েছে তার বাবা এ বছরই তার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন।

এখানে বলা যায়, পূর্ণিমার পোশাকে বিবাহের কোনো চিহ্ন ছিল না। ফলতঃ একজন সুন্দরী যুবতী অবিবাহিতা হলে সমাজের লোকের প্রশ্নবাণ সৃষ্টি হবেই। পূর্ণিমার দাদা যদিও ট্রেনেই জানিয়েছিল যে, পূর্ণিমা অপরিচিত লোকেদের মাঝখানে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে- ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, রসিকলাল ধাড়ার বাড়িতে কিন্তু তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি। বরং, সবার সঙ্গেই পূর্ণিমা বেশ সহজভাবেই মিশেছে। তার আচরণে একটিই মাত্র অসঙ্গতি দেখা গেছিল তা হল একেবারেই প্রথমে যখন সে রসিকলালের বাড়ি পালিয়ে আসে। রসিকলাল যে বুঝতে পেরেছিল পূর্ণিমা পাগল, তার কারণ ভরসন্ধ্যাবেলায় কোনো যুবতী পালিয়ে অপরিচিত মানুষের বাড়ি আসবে না। যদিও বা পথে কোনো বিশেষ বিপদে পড়ে কোনো গৃহস্থের বাড়ি আশ্রয় নিতেও হয়, তাহলে গৃহস্থের সদর দরজা দিয়েই শরণ নেবে, কখনই গোয়ালঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে না।

পূর্ণিমার দাদা কিন্তু পূর্ণিমার আচরণ খুব ভাল ভাবে জানত। অন্ততঃ জানা তো উচিত। সুদীর্ঘ পথশ্রম। ট্রেনে আসার সময় অনেক অনেক অপরিচিত মানুষ, তারপর বাকি অন্য যানবাহনেও বেশ কিছু অপরিচিত লোকের সঙ্গে যাত্রা। সব থেকে বড় কথা দাদা ও বোনের মাঝে একজন তৃতীয় ব্যক্তির সর্বদা উপস্থিতি। যেখানে দাদার বক্তব্য অনুসারে পূর্ণিমার অসুবিধা অপরিচিত লোকেদের সান্নিধ্যেই। রসিকবাবুর বাড়িতে এসেই পাড়াসুদ্ধ মেয়েদের এসে পূর্ণিমার সঙ্গে আলাপ। এত কিছু চাপ পূর্ণিমার পক্ষে যে হানিকর হতে পারে সে সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে দাদার আরোও বেশি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

রান্নাবান্নার পর রাত্রি এগারোটার সময় পূর্ণিমা দাদা এবং কথককে খাবার পরিবেশন করে। সামান্য ডাল-ভাতের আয়োজন। গৃহস্বামীর মেয়ে এরপর অতিথিদের জন্য দুধ নিয়ে এলে সুগৃহিণীর মতই পূর্ণিমা তাকে অন্য আরেকটি হাতা নিয়ে আসার কথাও বলে। ডালের হাতা এবং দুধের হাতা দুটিকে আলাদা রাখা উন্নত রুচিশীলতারই পরিচয় বহন করে।

খাবার খাওয়ার সময় কথকের সঙ্গে স্বল্প আলাপচারিতায় পূর্ণিমার আন্তরিকতাই বেশি প্রকটিত। এইসময় সে কথককে সরাসরি দাদা সম্বোধন করে আত্মীয়তার জোরে তাদের বাড়ি আসার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। বিশেষতঃ পুজোর সময় বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন দুটি পুজোপ্যান্ডেল, সখের থিয়েটার দেখার আমন্ত্রণ জানায় পূর্ণিমা। পূর্ণিমা তাকে দেখতে আসা মানুষজনদের যে তার বৈবাহিক স্থিতি সম্পর্কে যা জানিয়েছে সেটা দাদার সামনে বলার সময় কথককে দেখে নারীসুলভ আচরণের পরিচয় দিয়ে চোখ টেপে। পূর্ণিমার এহেন আচরণে আবার স্বাভাবিক শান্ত স্নিগ্ধ কল্যানী রূপ ফিরে এসেছে।

খাবার খাওয়ার আধঘন্টার মধ্যে সবাই দীর্ঘ পথশ্রমে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে। রসিকলালের অতিথিবাসের দুটিঘরের বড়টিতে কথক একা এবং ছোটটিতে পূর্ণিমা এবং তার দাদার শোবার ব্যবস্থা হয়। সকালবেলা দীর্ঘক্ষণ দরজা না খোলায় নটার সময় জানলা দিয়ে উঁকি মেরে জানা যায় পূর্ণিমা চরম সর্বনাশের কান্ডটি ঘটিয়ে ফেলেছে। রাত্রে ঘুমের মধ্যেই গৃহস্থ সবজি কাটার জন্য যে বঁটি দিয়েছিল তা দিয়েই দাদাকে সে খুন করেছে। দাদার হাতে, কাঁধে, গলায় সাংঘাতিক সব কোপের দাগ। ঘরে পাতা চৌকির উপর অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে পূর্ণিমার দাদার মৃতদেহ। রক্ত গড়িয়ে পড়েছে বিছানা থেকে মেঝের উপর। সেই রক্তের মাঝে দেওয়ালের গা ঘেঁষে পরম প্রশান্তির নিদ্রায় মগ্ন পূর্ণিমা। পাশে পড়ে রয়েছে একটি রক্তাক্ত পাশবালিশ। পূর্ণিমার জামাকাপড়ে খুব বেশি নয়, অল্পস্বল্প রক্তের দাগ। এরপর দরজাভাঙার শব্দ বা দাদার মৃতদেহ তুলে নিয়ে যাওয়াতেও কোনোওভাবে নিদ্রাভঙ্গ হয়নি পূর্ণিমার।

পুলিশ এসে জোর করে ঘুম ভাঙায় পূর্ণিমার। বাড়িতে টেলিগ্রাম করে জানানো হলে বাবা আসেন। পূর্ণিমা পাগল হলেও আইনের হাত থেকে রেহাই পায় না। শ্রীরামপুর কোর্টে তাকে তোলা হয়েছিল দাদাকে হত্যার অপরাধে। কিন্তু এই পর্যায়ে কোনো জ্ঞান কাজ করেনি পূর্ণিমার। বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি তার কাছে কোনো রেখাপাত করেনি। পূর্ণিমা তার নিজস্ব জগতেই মজে ছিল। প্রভাবশালী বাবার প্রতিপত্তিতে ঘটনাটি যথাসম্ভব কম আলোড়ন সৃষ্টি করে ধামাচাপা পড়ে যায়। তবে বাবা আর তার পুত্রহন্তারককে ঘরে নিয়ে যেতে রাজী হননি। ফলে শ্রীরামপুর থেকে হাওড়া, তারপর সোজা রাঁচী। পাগলাগারদেই জীবনের শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে পূর্ণিমা।

এক করুণ মর্মান্তিক পরিণতি। পূর্ণিমা পাগল। তার প্রতি তার বাড়ির লোকের ব্যবহারে যথেষ্ট আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্যণীয়। পূর্ণিমা যে দাদাকে হত্যা করল, সেখানে সবটা দায় শুধু পূর্ণিমার উপরই বর্তায় না ।তার দাদার ভূমিকা ছিল ।দাদার তো আরও একটু সচেতন হওয়া উচিত ছিল। বিশেষত কুটনো কোটার বঁটিটি একবার যখন পূর্ণিমার হাতে পড়েছিল, তখন দাদার বা কথকের অথবা গৃহস্থের কারোর সেটা পূর্ণিমার নাগালের বাইরে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল । আরেকটু সাবধান হলেই হয়ত এতবড় বিপদটা এড়ানো যেত।

আরেকটা বিষয় উল্লেখ করা যায়, পূর্ণিমার দাদা বলেছে পূর্ণিমার অসুবিধা অপরিচিত লোকের মধ্যে। পূর্ণিমার বাবা তো বেশ অবস্থাপন্ন। এত অপরিচিত লোকের মধ্যে দিয়ে সুদূর তিরোলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থার বদলে অন্য ব্যবস্থা করা যেত ।একটা পাগল মেয়ের সাথে পাঠানো হল একটিমাত্র ছেলেকে! প্রত্যেকবার পূর্ণিমার আচরণে অস্বাভাবিকতা ফুটে উঠেছে অন্ধকারে। অন্ধকার কোনোরকম ভয়ার্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করত পূর্ণিমার জীবনে। হাওড়া থেকে রাঁচীর ট্রেনে যখন ওঠানো হল পূর্ণিমাকে তখনও কিন্তু সে জানে না তার গন্তব্য কোথায় ।পথে পাতানো দাদা কথককে তখনও নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে সে ভোলে না। আর বাবার কাছ খোঁজ নেয় দাদার। কারণ দাদার কাছে সে তার কানের দুল দুটো খুলে রেখেছে। পরম বিশ্বাসভাজন দাদার প্রতি পূর্ণিমার এই ভয়ঙ্করীরূপের কারণ কি হতে পারে, যেখানে উগ্রমূর্তির পূর্ণিমা একমাত্র দাদার হাতেই খেত।

জ্যোতিষশাস্ত্র তথা নক্ষত্ররাশিবিজ্ঞান বলে থাকে চন্দ্র মানুষের জীবনের একটি বেশ প্রভাবশালী গ্রহ। মানুষের মানসিক স্থিতি-সুস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে চন্দ্র। চন্দ্রের প্রকোপেই মানসিক চাঞ্চল্য সূচিত হয়। নায়িকার জীবনের সাথেও চন্দ্রের যোগ এক গূঢ় দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে। মেয়েটির নাম পূর্ণিমা। পূর্ণ চন্দ্র- চাঁদের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোক। সৌন্দর্যের পূর্ণমূর্তি। পূর্ণিমার চাঁদের আকর্ষণে যেমন জোয়ার-ভাঁটা হয়, পূর্ণিমার আচরণেও স্বাভাবিকতা এবং অসংলগ্নতার আকর্ষণ-বিকর্ষণ-প্রত্যাকর্ষণের খেলা চলে। যে মেয়ে অপরিচিত জনসমাজে ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে, সেই আবার অপরিচিত এক যুবককে অতি সহজেই দাদা বলে সম্বোধন করে সম্বন্ধ পাতাতে পারে। রসিকলাল ধাড়ার বাড়িতে পাড়ার মহিলারা পূর্ণিমার খবর পেয়ে দল বেঁধে দেখতে এলে পূর্ণিমা তাদের সাথে সৌজন্যসূচক ব্যবহার করেছে। শুধু তাই নয়, তাদের কথাবার্তায় কৌতুক-আমোদও উপভোগ করেছে। তাহলে পূর্ণিমার মনের জটটা কোথায়? ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আগের কোনোও পূর্বাভাস তো লক্ষ্যণীয় হয়নি তার মধ্যে। পূর্ণিমার দাদার কথা মতো দীর্ঘ নৈঃশব্দ্যের পর হাসিটাই ভয়ঙ্করীর

তান্ডবলীলার পূর্বলক্ষণ। কথকের কানেও অবশ্য কখনো কখনো এ হাসি নারীসুলভ মধুর ঝংকারের পর অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার তো সব ঠিকঠাক।

তিরোলের পাগলাকালীর বালা ধারণ করতে হয় অমাবস্যায়। তামস যামিনী। পূর্ণিমার চূড়ান্ত পাগলামি অর্থাৎ নিজের হাতে দাদাকে খুন করার আগে যে পূর্বাভাস দেখা গেছিল অর্থাৎ গোরুর গাড়ি থেকে দাদার প্রতিরোধ উপেক্ষা করে নেমে পড়া- দুটি ঘটনাই কিন্তু ঘটেছিল অন্ধকারে। পূর্ণিমার পাগলামির সঙ্গে অন্ধকারের কোনো সম্পর্ক রয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আলোয় পূর্ণিমার আচরণ স্বাভাবিক-স্বচ্ছ। আর তার পাগলামির ঘটনাদুটিই ঘটেছে আলোহীনতায়।

প্রথমবার পূর্ণিমা যখন গাড়ি থেকে নেমে পালাতে উদ্যত হয়েছিল, তখন লক্ষ্যণীয় তার দাদা প্রথমে কথকের কাছে সাহায্য চেয়েছিল বোনকে ধরে থামাতে, কিন্তু পরমুহূর্তেই বলেছিল গায়ে গায়ে হাত দেবেন না। ওর চুল ধরে আটকানোর কথা বলেছিল পূর্ণিমার দাদা। বিশেষ লক্ষ্যণীয় দাদা পূর্ণিমার গায়ে হাত দিতে নিষেধ করেছিল। কারণ পূর্ণিমা তখন কামড়াতে শুরু করেছে। অর্থাৎ পূর্ণিমার এই আক্রমণ আত্মরক্ষাজনিত কারণে। পূর্ণিমার মধ্যে সবসময় একটা আতঙ্ক ভয় কাজ করেছে।

দ্বিতীয় উল্লেখ ঘটনা বলা যেতে পারে রসিকলাল ধাড়ার বাড়িতে রাত্রে খাবারের পর শোয়ার ঘটনাটি। কথকের ঘুমের ব্যবস্থা করা হয়েছিল একটি ঘরে - একা। আর পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটিতে দাদা ও বোনের শোবার আয়োজন হয়েছিলদ কিন্তু মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে হঠাৎই কথক অনুভব করেছিলেন বুকের ওপর কিরকম যেন একটা ভারি-ভারি ব্যাপার - নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট। এটা ক্ষুধিত পাষাণের মতই কথকের শ্রান্ত অবচেতন মনের কামনার উদগ্র প্রতিস্ফূরণ বা সত্যই দামিনীর ন্যায় আত্মসমর্পণকারিণীর আত্মউৎসর্গের নিবেদন ছিল ।

পূর্ণিমার আচরণের অসংলগ্নতা - পাগলামির মূলে রয়েছে কোনো এক না পাওয়া। পূর্ণিমার মা নেই। উন্মাদিনী পূর্ণিমাকে বাবা ঘরে নিল না। একমাত্র সম্বল-সহায়-নির্ভরতা ছিল তার দাদা। পূর্ণিমার এই উন্মাদগ্রস্ততার বীজ শৈশবেই প্রোথিত । বিয়ের পর স্বামী ত্যাগ করেছে - পূর্ণিমার পাগলামির জন্য। তাহলে নিশ্চয় পূর্ণিমার রোগ লুকিয়েই তাকে পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পূর্ণিমাকে আসলে তার পরিবার বোঝা বলেই মনে করত। তাই-ই তো পাগল মেয়েকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিতে চেয়েছিল। তার বাবার পরিবার সম্ভ্রান্ত পরিবার। পূর্ণিমার ভ্রাতৃহত্যার ঘটনাটি তাই বাবা যথাসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে চাপা দিতে পেরেছিলেন। সেইরকমই কি আরও কোনোও ঘটনা আছে, মাতৃহীনা পূর্ণিমার শৈশবে, যা তার বাবা এবং পরিবার প্রভাব বিস্তার করে চাপা তো দিয়েছে, কিন্তু যার চাপ সহ্য করতে না পেরে পূর্ণিমার চাঁদ অমানিশায় ঢেকেছে।

পূর্ণিমার রহস্যাবৃত শৈশব, পূর্ণিমার হাতে দাদা খুন হবার মারাত্মক ঘটনাটি টেলিগ্রাম করে তাদের বাড়িতে জানানোর পর কোনো আত্মীয়-পরজন-কুটুম্ব নয় বরং মাত্র তিনজন বন্ধু নিয়ে বাবার এসে ঘটনাটি যথাসম্ভব প্রভাববিস্তার করে মিটিয়ে ফেলার মধ্যেই পূর্ণিমার একাকীত্ব-ভয়ভীত পরিবেশের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। প্রভাবশালী ধনশালী পিতার কন্যা হয়েও পূর্ণিমাকে মানসিক ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানোর বদলে তিরোলের বালা ধারণের ঘটনার মধ্যে কোথাও একটা যেন বিষাদের সুর লেগে রয়েছে। এই দুস্তর যাত্রাপথে উন্মাদিনীর পাশে রয়েছে তার একমাত্র দাদা। এই সবছবিগুলি মিলিয়ে এক দুর্ভাগিনীর কোলাজচিত্র অঙ্কিত হয়।

দামোদর-মামারবাড়ি-মা ; নদীপথযাত্রা ; অন্ধকার রাত; প্রচুর লোকসমাগম; বিয়ের কথাবার্তা; পরিচিত-অপরিচিত সান্নিধ্য; রান্নাবান্না-ঘরকন্যা; নিশিযাপন; আর সব শেষে কানের দুল দুটির খোয়া যাওয়া - সব ঘটনাতেই বারবার ঘুরে ফিরে আসা দুটি চরিত্র পূর্ণিমা এবং তার দাদা - ভাই-এর রক্তে হাত-রাঙানো পূর্ণিমা অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত-তিনকালের স্বচ্ছন্দ পদসঞ্চারিণী পূর্ণিমার কখনোও কল্যাণী, কখনো বিধ্বংসী রূপের নারীর ট্র্যাজেডির বাণীরূপ ঝংকৃত হয়েছে।

পূর্ণিমার মধ্যে সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকেছে ফ্রয়েডীয় জীবন-মৃত্যু দ্বিপক্ষবাদ- life and death polarity। পূর্ণিমার মধ্যে একদিকে কাজ করেছে জীবনমুখী শক্তি -যার প্রতিফলন ঘটেছে তার বিবাহ চিন্তা অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি প্রবৃত্তি (reproduction); আবার পাশাপাশি ক্রিয়াশীল থেকে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি (self-preservation) যার প্রভাবে সে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেছে কামড়ে। এই কামড়ানোর মাধ্যমে আত্মরক্ষাতেই ক্ষান্ত হয়নি সে, ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর। শেষে দাদাকে হত্যা করার মাধ্যমে তার মধ্যে সুপ্ত পরঘাতী মৃত্যুমুখী প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটেছে। Eros এবং Thanotos- এর দ্বন্দ্বের ক্রিয়াশীলতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পূর্ণিমার আচরণ।

হাবো (তারপর ? : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারপর?' ছোটগল্পের এক চরিত্র হাবো শারীরিক প্রতিবন্ধী।

''চোখ ট্যারা, হারগিলের মতো রোগা শরীর ও মুখ দিয়ে লালা''[১৬৯]

ঝরে পড়তে থাকে তার। হাবো এবং গজেনের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার এক সম্পর্ক ছিল, যা গড়ে উঠেছিল উভয়ের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য। হাবো গজেনকে বিশেষ যত্ন-আত্তি করত। কিশোরী মেয়েটি হাবা-গোবা হলেও গজেনকে অন্য মেয়ের সাথে দেখে গজেনের দেওয়া কেরাসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেছিল। মানব মনস্তত্ত্বের অবচেতন মনের ছবি তুলে দেখালেন মানিক

বিংশ শতাব্দীর চারেক দশকে লেখা 'তারপর?' গল্পে- হাবোর মনেও যে নারীত্বের বিকাশ তা অসাধারণ মুন্সিয়ানায় ফুটিয়ে তোলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাগল (হাঁসুলীবাঁকের উপকথা :তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় কাটোয়া থেকে আগত রাজমিস্ত্রি বোষ্টম রাখালরাজা দাসের সঙ্গে অঙের খেলায় মেতেছিল কাহারপল্লীর এক কন্যা। আর তাদেরই অঙের ফসল পাগল। কাহার সংস্কৃতিতে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব থাকায় পাগল বৈষ্ণবরক্তশরীরে ধারণ করেও মাতৃসূত্রে কাহার সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। পিতৃসূত্রে বৈষ্ণব মাতৃসূত্রে কাহার ছাড়াও আরোও একটি সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত পাগল।চন্দনপুরনিবাসী ব্রাহ্মণবধূ লাল ঠাকরুণের সঙ্গে দিদি ও ভাই-এর সম্পর্ক স্থাপন করেছিল পাগল।পাগল এত সম্পর্কযুক্ত হলেও তার ঘর নিঃসঙ্গ ঘর-সংসার-স্ত্রী-সন্তান কিছুই নেই পাগলের। একমাত্র কন্যার বিয়ে দিয়েছে সে অন্যগ্রামে।সেই মেয়ের পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যাই এখন পাগলের জীবনের অবলম্বন।পাগল পাগল তার স্বভাব। কারো ভালোতেও থাকে না, আবার কারো মন্দতেও থাকে না পাগল।

পাগল নিজের মত থাকে।তার মধ্যে একই সঙ্গে অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী চরিত্রবৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। তার নিজস্ব ঘর নেই। অথচ বহির্সংস্কৃতি-বহির্দেশীয় বামুন-বউ-এর সঙ্গে সম্পর্ক পাতায় সে। নসুর নাচের সাথে গান করে সে। এতটা extrovert character হলেও পাগল কিন্তু সবসময় নিজের মত থাকে।নিজের খেয়াল-খুশী মতন খায়-দায়, যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, কাজও করে খুশী মতন।

পাগলের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল সে বিভিন্নরকম কাজ করতে পারে। সে যেমন সুন্দর ঘর ছাইতে পারে,তেমনি আবার অসাধারণ দক্ষতায় মাটির দেওয়ালেরও কাজ করে। ঘর লেপনের কাজেও সে নিপুণ শিল্পী। বাবা রাখালরাজা কতটা নিপুণ কারিগর ছিল তা জানা যায় না কিন্তু পাগলের ছিল ওস্তাদের হাত। শুধু তাই নয় অতিসামান্য বাঁশ দিয়েও কি অসাধারণ নৈপুণ্যে পাকা ডোমকারিগরের মত ঝুড়ি, খাঁচা সব তৈরী করে দিত।

পাগল কাজ করত খুব ভাল। সারাদিন এখান সেখান টুকটাক কাজকর্ম করতেই থাকে। তার কাজ করতে কোনো অনীহা নেই। কর্মবিমুখ সে নয়। তবে সে কাজ পাগল নয়। পাগল গানপাগল। চমৎকার গান বাঁধে সে। গানই পাগলের প্রাণ। যখন নগদের প্রয়োজন পড়ে তখন পাগল দিনমজুরীতে খেটে পয়সার জোগাড় করে নেয়। আবার বেরিয়ে পড়ে প্রাণের সন্ধানে। পাগল গান করে নিজে আনন্দ পায়, আর অপরকেও আনন্দ দেয়। কাহারদের ঘেঁটুগান বরাবর পাগলই বাঁধে। চন্নপুরে প্রথম যখন রেললাইন বসল তখন পাগলের ঘেঁটুতে এল-

''সায়েব আস্তা বাঁধালে!

হায় কলিকালে

কালে কালে সায়েব এসে আস্তা বাঁধালে।''[১৭০]

গাজন উৎসবেও সঙ নন্দী সেজে গান করে লোকরঞ্জন করে পাগল।

শুধু আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতই নয় কর্মসঙ্গীতেও পাগলের দক্ষতা অসাধারণ। পালকী বহনের পথশ্রম লাঘব হয় পাগলের সঙ্গীতের সুর-তাল-লয়-এর মূর্ছনায়।

''বরেরো পাল্কী

পড়িল পিছনে

আগে চলে লক্ষ্মী

পিছে এল নারায়ণ....''[১৭১]

ঘর ছাওয়ার সময়ও পাগল গেয়ে ওঠে নিজের ছন্দে-

''লাল মুখো সাহেব এল কটা কটা চোখ-

দ্যাশ-বিদ্যাশ থেকে এল দলে দলে লোক''[১৭২]

অসাধারণ ambiguity গানের কথায়। একদিকে পাগল স্বদেশের ঘর ছাইছে আর অন্যদিকে গানে বলেছে স্বদেশের মাটিতে বিদেশী শক্তির আধিপত্য-উপনিবেশ-স্থাপনের আখ্যান। পাগলের নিজের কোনো ঘর নেই, অথচ অসামান্য নৈপুণ্যে অন্যের ঘর গড়ে সে।

পাগলের এই গানটির মধ্যে রয়েছে কাল পরিবর্তনের ইঙ্গিত-

''ও সায়েব আস্তা বাঁধালে!

হায় কলিকালে!

কালে কালে সায়েব এতে আস্তা বাঁধালে-

ছোকরার ধুয়ো গাইলে

ছ মাসের পথ কলের গাড়ি দন্ডে চালালে।

ও সায়েব আস্তা-''[১৭৩]

''লালমুখো সাহেব এল কটা কটা চোখ-

দ্যাশ বিদ্যাশ থেকে এল দলে দলে লোক-

ও সাহেব আস্তা-

ও সাহেব আস্তা বাঁধালে - কাহার কুলের অন্ন ঘুচালে

পাল্কী ছেড়ে র‍্যালে চড়ে যত বাবু লোক!

ও সাহেব আস্তা-''[১৭৪]

হাঁসুলীবাঁকের কাহাররা ক্রোশ-এর পর ক্রোশ রাস্তা কাঁধে পাল্কী নিয়ে ছুটে চলে। বহনের গতিই কাহারদের জীবনচলনের গতি। কিন্তু ঐতিহাসিক রেললাইন পত্তন সার্বিক মানুষের জীবনে গতির সঞ্চার করল সত্যি কথা। অনেক দূরত্ব অনেক কম সময়ে অতিক্রম করা সম্ভবপর হল। কিন্তু রেলগাড়ির গতি প্রাথমিকভাবে কোশকেঁধে কাহারদের জীবনচ্যুত করল। কিন্তু এ অভিঘাত ছিল নিতান্তই প্রারম্ভিক। পাগলের কথায় কাহারদের সেই রুজিহীনতার প্রাথমিক অভিঘাতের কথা বলা আছে। কিন্তু যা বলা নেই তা হল করালীসহ পরবর্তী কাহার সম্প্রদায়ের সেই রেল-কোম্পানীতেই কাজ নিয়ে নতুনভাবে জীবনধারণ। আগে কোশকেঁধে বা আটপৌরের কাজ করে এই মানুষজন উচ্চবৃত্তিতে বাধ্য হয়েছিল।যাদের হয়ে এই কাহার সম্প্রদায় কাজ করত, সেই উচ্চবৃত্তীয় মানুষগুলি সভ্যতার এই পিলসুজের কাছে কৃতজ্ঞতায় লীন থাকার পরিবর্তে প্রভুসুলভ আচরণে সর্বদাই পায়ের তলায় রাখত। রেল কোম্পানীতে নগদের বিনিময়ে কাজের ব্যবস্থা হওয়ায় পারস্পরিক সম্পর্কের অবনমন বন্ধ হল। প্রাচীন সমাজকাঠামো এখানে ভেঙে গেল। পাগলের বাঁধা গানে প্রথমার্ধে তিনবার 'সায়েব' এবং শেষার্ধের তিনবার 'সাহেব' শব্দব্যবহার মহাপ্রাণতার গতি এবং সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। আঞ্চলিক উপভাষা থেকে মান্য চলিত ভাষা ব্যবহার বাঁকবদলের গতিমানতার নির্দেশক।

শুধু আনুষ্ঠানিক বা কর্মসঙ্গীতেই নয় পাগল গান গায় মৃত্যুবাসরেও। এক কাহারকূলের মাতব্বর বংশের অন্তিম জ্যোতি নয়ান্ চিরকালের রুগ্ন। কিন্তু তবু নয়ানই ছিল ঘরভাঙ্গাদের অন্তিম। এই নয়ানের মৃত্যুতে পাগল গান বাঁধল-

''অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায় রে!

অন্ধকারেই পরাণপাখি সেই দ্যাশেতে যায় রে !

চন্দ সূর্য্য লম্ফ পিদীম তাই রে, নাই রে নাই রে

না থাক, আছে একজনা ভাই,

এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়

দুই চোখে তার দুইটি পিদীম আঁধারে রোশনাই রে

আলোর তরে ভাবনা কেন হায় রে।''[১৭৫]

জীবনের চরম সত্য cosmic imagination অবিনশ্বরতা কি সহজ সুন্দর ভাষায় প্রকাশ করল পাগল। এ গান একজন পাগলের পক্ষে গাওয়া সম্ভব না। যে মানুষ এ গান গাইতে পারে সে পাগল হতে পারে না। গানটির মধ্যে বস্তুবাদী, ইহবাদী, অস্তিত্ববাদী, দেহবাদী লোকায়ত ভাবনা যেমন আছে, তেমনই রূপকাকারে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঘরভাঙাহীনদের উত্তরাধিকারহীনতার অন্ধকার ভবিষ্যতের কথাও।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্রনিসলো ম্যালিনোস্কি তাঁর 'Magic, Science & Religion and other Essays' গ্রন্থে আদিম জনজাতিগোষ্ঠীর জীবন-মৃত্যু সংক্রান্ত ধারনায় মৃত্যু শুধু বিচ্ছেদবিধুরতায় ম্লান হয়, বরং মৃত্যু হল ভিন্ন এক জগতের প্রবেশপথ,-

''Death is the gateway to the other world in more than the lateral sense''[১৭৬]

পাগল নামটার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে তার আত্মভোলা চরিত্রটি। কিন্তু আপনভোলা হলেও তার বাস্তববুদ্ধি যথার্থ। শান্ত কোমল স্বভাবের এই মানুষটি একদিকে যেমন লোকরঞ্জন করে, ঠিক তারই মধ্যে বলে পীর-ফকির-দরবেশ-বাউল-বৈষ্ণব সমস্ত সহজিয়া সাধনার মূল তত্ত্বদর্শন কথাখানি-

'এ দুনিয়া আজব কারখানা'[১৭৭]

পাগলপারা মানুষটির বাস্তবজ্ঞানও সমুচিত। তার পরিচয় ক্ষেত্রবিশেষে মেলে। আসলে মানুষটি বোকা নয়, সরল। সরল আর বোকার তফাৎটা কোথায় তা বোঝা যায় পাগল চরিত্র বিশ্লেষণে।

পাগল তার দৌহিত্রীর জন্য একটি ছড়া কেটেছে,-

''এ বুড়ো বয়সে তুমি আমার নতুন নেশা হে''[১৭৮]

ছড়াটির মধ্যে মাতামহ ও দৌহিত্রীর এক সুন্দর সম্পর্ক যা পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি পারস্পরিক সদস্যদের ভালোবাসা এবং বৃদ্ধ ও শিশুর ভাব তার ছবি ফুটে উঠেছে। পাগলের নিজের ঘরের প্রতি কোনো টান নেই-অথচ তার বৃদ্ধ বয়সে বেঁচে থাকার জীয়নকাঠি তার মায়ের ঘরের

নাতনি। কথায় বলে আসলের থেকে সুদের প্রতি মানুষের টান বেশি। এখানে যেন তাই-ই ফুটে উঠেছে। এইভাবেই পরিবার পরস্পরকে ভালোবাসার টানে বেঁধে রাখে। বার্ধক্য দ্বিতীয় শৈশব। শিশু ও বৃদ্ধ- দুই সমবয়স্ক মানুষের বন্ধুত্ব এখানে।এই সহজ সরল সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে কোথাও যেন মনে করিয়ে দেয় হেনরি লুইস মরগ্যান সাহেবের পারিবারিক ব্যবস্থার তত্ত্ব- যেখানে মরগ্যান মাতৃপ্রাধান্য থেকে পিতৃপ্রাধান্যে পরিবর্তনের মধ্যে যে তিনটি পরিবর্তের প্রস্তাব রেখেছিলেন, তার অন্তবর্তী ব্যবস্থায় ছিল এই মাতামহ-দৌহিত্রী ক্রমপরম্পরা।

ছোটকাকীমা (জল পড়ে পাতা নড়ে : গৌরকিশোর ঘোষ)

গৌরকিশোর ঘোষের ট্রিলজির প্রথম অংশ 'জল পড়ে পাতা নড়ে' (১৯৫৯) উপন্যাসে শীতলের স্ত্রী, যিনি ছোটকাকীমা নামে পরিচিত, উন্মাদরোগগ্রস্ত, সন্তান-প্রসবের সময়কার কোনো দুর্ঘটনায় মানসিক ভারসাম্য তার হারিয়ে যায়। তার পাগলামি এতটাই চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, তাকে শিকল বেঁধে ঘরে আটকে রাখতে হয়। ভাশুরঝি গিরিবালার সন্তানকে কাছে পেয়ে, কল্পিত রাজপুত্তুরের বাস্তবস্পর্শে তার উন্মাদগ্রস্ততা প্রশমিত হয়। উন্মাদগ্রস্ততার প্রথমদিকে যখন সে বাড়ির সবার সামনে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছিল, তখন স্বামী হিসাবে শীতলের যেখানে সবথেকে বেশি সহৃদয় হওয়া উচিত ছিল, তার বদলে সেই হয়ে উঠেছিল সবথেকে রূঢ়, নির্মম।

> '' একটানে পরনের কাপড় খুলে ফেলে এমন কুৎসিত সব কান্ড করতে লাগল যে, ছোটকর্তাদের মাথা কাটা গেল।''[১৭৯]

আর তখনই,-

> ''ছোটকর্তা যেন কী হয়ে গেলেন! তাঁর মনে ছোটবউয়ের প্রতি সহানুভূতি আর সমবেদনার যে উৎসটি সজীব ছিল, সেটি চট করে, সেই মুহূর্তেই শুকিয়ে গেল।.....ছোটকর্ত্তা দ্রুত পায়ে উঠনে নেমে গেলেন,বিনা দ্বিধায় সেই জানোয়ারটার মানুষের মত সরু ঘাড়ে মারলেন তাঁর অসুরের মত হাতের এক প্রচন্ড ধাক্কা।সেই জানোয়ারটা ছিটকে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।ছোটকর্তা অবলীলাক্রমে তাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলে নিলেন,তারপর ধানের বস্তার মত ভিতর বাড়ির উঠনে ছুঁড়ে দিলেন। সেটা ঝুপ করে মাটিতে পড়ল। কোত্থেকে যেন রক্ত পড়ছিল, ঠিক খেয়াল ছিল না। হয়তো কোথাও কেটে গিয়েছিল সেটার, হয়তো হাত পা ভেঙে গিয়েছিল। ছোটকর্তা ভিতর বাড়িতে ঢুকে সেই কুন্ডলীপাকানো মাংসের পিন্ডে খুব জোরে মারলেন একটা লাথি। একটু উল্টে গেল সেটা। তারপর আরেকটা লাথি মেরেছিলেন কি না, তাঁর ঠিক স্মরণ নেই। কুকুর

বিড়ালকে আমরা যখন মারি, তখন ক'ঘা মারি তার কি হিসেব রাখি! তাই ছোটকর্তা সঠিক বলতে পারবেন না আরেকটি লাথিও মেরেছিলেন কি না। কিংবা হঠাৎ অনেকগুলো লোক (কত লোক তাও তাঁর খেয়াল ছিল না) তাঁকে সেদিন পাঁজাসাপ্টা করে ধরে না ফেললে ওই জন্তুটাকে তিনি থেঁতলে ফেলতেন কি না, তাও জানেন না''[১৮০]

উন্মাদগ্রস্ততার দশবছর পরে গিরিবালার সন্তানকে কোলে নিয়ে গিরিবালার ছোটকাকীমার আচরণ অনেকটা স্বাভাবিক হলেও, তার মনের মধ্যে স্বামী শীতলের ছবি অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্য সবার প্রতি খাঁড়া নিয়ে তাড়া করলেও শীতলের স্ত্রী স্বামীর কাছে কোনোদিনই নির্মম মারের প্রতিবাদ বা কৈফিয়ৎ চায়নি, কেবল এক বোবা দৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি সমস্ত অভিমান ব্যক্ত করেছে সে।

মণীন্দ্রনাথ ভৌমিক (নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়)

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোনা ট্রিলজির প্রথমটি দেশবিভাগের পটভূমিকায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', দ্বিতীয়টি সামুদ্রিক পটভূমিকায় 'অলৌকিক জলযান' এবং শেষেরটি সোনার নাগরিক জীবন সংগ্রামের পটভূমিকায় 'ঈশ্বরের বাগান'। বাস্তব জীবনের পরিচিত চরিত্রগুলি উপন্যাসে চিত্রায়িত হয়েছে।

এক খন্ডে অখন্ড ভারত ও তার সমস্যা এবং অন্য খন্ডে খন্ডিত ভারতবর্ষের সূচনা ও বিভাজনযন্ত্রণা নিয়ে দ্বিখন্ডে গড়ে উঠেছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি। আধাসামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে গড়ে ওঠা ভৌমিক পরিবারের বড় ছেলে মণীন্দ্রনাথ পড়াশুনায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন । ভাল চাকরি করতেন। রোম্যান্টিক উন্নতমনা মণীন্দ্রনাথ কীটসের কবিতাও আওড়াতেন। সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতায় মণীন্দ্রনাথ জন্মালেও ভালোবাসল এক খৃষ্টান কন্যাকে। প্রবল দাপুটে পিতা মহেন্দ্রনাথ বড়পুত্রবধূ হিসাবে ভিন্ধর্মের মেয়ে ম্লেচ্ছ পলিনকে মানতে পারলেন না। পিতার মিথ্যা শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ দিয়ে ডেকে আনা হল মণীন্দ্রনাথকে এবং পরিবারের পছন্দ করা এক হিন্দু কন্যার সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেওয়া হল মণীন্দ্রনাথের। ভালোবাসাকে না পাবার এই আঘাত সহ্য করতে পারল না মণীন্দ্রনাথ। পাগল হয়ে গেলেন। রাতের অন্ধকারে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে থাকেন আর দুহাতে তালি বাজান আর রেগে গেলে বলতে থাকেন-

''গ্যাং চোরেৎ শালা।'[১৮১]

মণীন্দ্রনাথ সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। প্রায় ছয়ফুট লম্বা, গায়ের রং টকটকে ফরসা। অসাধারণ আবৃত্তি করতে পারত। প্রথম দর্শন এবং বাচনিক কুশলতায় খুবই আকর্ষণীয় ছিল মণীন্দ্রনাথ। স্ত্রী শশীবালা। পুত্র পল্টু।

১৯৩৪ সালের ১ মার্চ অবিভক্ত বাংলার ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশভাগের পর সপরিবারে চলে আসেন এপার বাংলায়। মনে দগদগে হয়ে রয়ে যায় বঙ্গভঙ্গের জ্বালাময় স্মৃতিগুলি।

অবিভক্ত বাংলার ওপারের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের বড় ছেলে মণীন্দ্রনাথ ভৌমিক। হিন্দু একান্নবর্তী পরিবার। ভৌমিক বাড়ি পাড়ায় পরিচিত ঠাকুরবাড়ি নামে। এই ঠাকুরবাড়ি তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিকতার চিত্র বহন করেছে। বাড়ির কর্তা মহেন্দ্রনাথের দোর্দন্তপ্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। এদের পারিবারিক সুখদুঃখে সামিল থাকত ঈশম শেখরাও। সংলগ্নবর্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক কাঠামোগতভাবে বেশ শক্তিশালী ছিল এই ভৌমিক পরিবার। বাড়িতে প্রচুর দাসদাসী, চাকর-বাকর। তবে হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে সবার বিপদে আপদে সর্বদাই সহায় সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই ভৌমিক পরিবার তথা ঠাকুরবাড়ি। মহেন্দ্রনাথের চার পুত্র। বড় মণীন্দ্রনাথ, মেজ ভূপেন্দ্রনাথ, সেজ চন্দ্রনাথ এবং ছোট শচীন্দ্রনাথ। সামাজিক দিক থেকেও ওপারবঙ্গে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ফেলেছে ভৌমিক পরিবার, ভূপেন্দ্রনাথ যে শুধুমাত্র মুড়াপাড়ার জমিদারবাড়ির আমলা তাই-ই নয়, তাদের সবসময়ের সুখ-দুঃখের সামিলও। আর ভূপেন্দ্রনাথের সততা সর্বজনবিদিত। চন্দ্রনাথ পরিচিত ধনকর্তারূপে। বড় কাছারির নায়েব সে। ছোট শচীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জনসাধারণের সেবা করছে। বড় মণীন্দ্রনাথ মেধাবী ছাত্র হলেও পিতার রক্ষণশীল মনোভাবের শিকার হয়ে উন্মাদে পরিণত হয়েছে।

যে পরিবার জাতিধর্মবর্ণ নির্বিচারে মানুষের সেবা করে সেই পরিবারই মেনে নিতে পারল না বাড়ির বড়ছেলের সঙ্গে ম্লেচ্ছকন্যার ভালোবাসা। যে ভূপেন্দ্রনাথের সততার তুলনা হয় না সেই ভূপেন্দ্রনাথের পরিবারই ম্লেচ্ছকন্যার প্রেম দূরীকরণের জন্য মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নিল তাদের পরিবারের ছেলেকে দূরে সরিয়ে আনতে। অথচ ঈশ্বরের কি নির্মম পরিহাস এই পরিবারেরই বংশধর অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক ওরফে সোনাবাবু এই বংশ পরিবার প্রতিপালনের জন্য বাধ্য হয়েছে বিফ খেতে। উন্মাদ মণীন্দ্রনাথ সেই খন্ডচিত্রের প্রতীক। মণীন্দ্রনাথের মানসিক ভারসাম্যহীনতা সেই অরন্তুদ সময়কালের বিশৃঙ্খলতার হৃতভারসাম্যের পরিচায়ক।

ভালোবাসার মানুষ পলিনকে পায়নি মণীন্দ্রনাথ। শশীবালার সঙ্গে ঘর করছে যে মানুষটা সে রোম্যান্টিক মণীন্দ্রনাথ নয়, সে আজ পাগল ঠাকুর। এই পাগল মণীন্দ্রনাথ কখনো তরমুজ ক্ষেতে জ্যোৎস্না রাতে নগ্ন হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিহারও করেছে। আবার সেই মণীন্দ্রনাথ-ই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেও পিছপা হয়নি। হা-ডুডু খেলোয়ার ফেলু শেখের একটা হাত হাতির পিঠের উপর বসে গুঁড়িয়ে দিয়েছে মণীন্দ্রনাথ। যদিও তার পরিণতি হয়েছে ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর। নিজের জীবনকে বাজি

রেখে কখনো পাগলা ষাঁড়ের হাত থেকে ফাতিমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে, আবার কখনো এই ফাতিমার হাত থেকেই রসগোল্লা খেয়েছে গাছের ডালে বসে। এরকমই মণীন্দ্রনাথ। একেবারে শিশুসুলভ সারল্য।

বড়বৌ এর সাথে মণীন্দ্রনাথের দাম্পত্যের রসায়ন ছিল একবারেই অন্যরকম। মণীন্দ্রনাথ ভালোবাসত পলিনকে। তাকে না পেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিল সে। কিন্তু শশীবালার আচরণে সেই কারণে তার প্রতি কোনোরকম বিরূপ আচরণ লক্ষ্যিত হয়নি। বরং প্রতিমুহূর্তে সে স্বামীর পাশে থেকেছে। মণীন্দ্রনাথ নগ্ন হয়ে শিশুসুলভ ভঙ্গিতে যখন নদীর চরায় ঘুরে বেড়াতেন তখনও পাশে থাকতেন তাঁর স্ত্রী। আবার এই মণীন্দ্রনাথই যখন স্ত্রীর কাপড় টেনে ধরে খুলে দিয়েছে বা নাভীর নীচে স্পর্শ করে আসঙ্গ লিপ্সা জানিয়েছে তখনও সেই ডাকে সাড়া দিয়েছে শশীবালা। তাইজন্যই এই মণীন্দ্রনাথের পাগলামি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতো, মণীন্দ্রনাথ যখন নিজের আবেগকে আর ধরে রাখতে পারত না, তখন বড়বৌ তার হাত চেপে ধরলে শান্ত হয়ে যেত মণীন্দ্রনাথ। আর কিছু করতে পারত না মণীন্দ্রনাথ। এ অদ্ভুত দাম্পত্যজীবন মণীন্দ্রনাথের।

মণীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পিতার সম্পর্ক যেমন অসম্পূর্ণ ছিল, ঠিক তেমনি ছেলে পল্টুও বাবার এসব আচরণ মেনে নিতে পারত না। প্রচন্ড একাকীত্ব আচ্ছন্ন করে রেখেছিল মণীন্দ্রনাথকে। যৌবনের ভালোবাসাকে হারিয়ে নিজের অস্তিত্ব সত্তাই হারিয়ে ফেলেছিল মণীন্দ্রনাথ। ফিরে গেছিল শৈশবে। সেখানে নিজের ছেলেকে পাশে তো পায়ইনি উল্টে এসেছিল প্রতিরোধ- অবমাননা। সে অখন্ড বাংলায় মানুষ জাতধর্মবর্ণের ভেদাভেদের উর্দ্ধে গিয়ে একসাথে বসবাস করেছে পরবর্তী প্রজন্ম সেই অখন্ডতা ধরে রাখতে পারল না। মেনে নিতে বাধ্য হল দেশবিভাগ। উত্তরসূরীদের হাতে সংস্কৃতি-ঐতিহ্য পরিস্থিতির চাপে ভূলুণ্ঠিত। মণীন্দ্রনাথকে মাঝখানে রেখে দুই প্রজন্মের পিতা-পুত্রের পারস্পরিক মানসিক ব্যবধান সেই ক্ষয়িষ্ণু সময়ের ইঙ্গিতবাহী।

মণীন্দ্রনাথের জীবনে এক বিশেষ মানুষ সোনাবাবু। মণীন্দ্রনাথের সেজভাই চন্দ্রনাথ ভৌমিকের পুত্র সোনাবাবু ওরফে অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক। শিশু সোনাবাবুকে নিয়ে জ্যাঠামশাই কখনও সখনও দূরদেশে পাড়ি জমান। মনের ভুলে ফেলে চলে আসেন হাসান পীরের দরগায়। আবার মনে পড়ে যাওয়ায় দ্রুত ফিরিয়ে আনতে যান সোনাবাবুকে। সোনাবাবু মুড়াপাড়ায় চলে গেলে মণীন্দ্রনাথও অবলীলায় নদী সাঁতরে মুড়াপাড়ায় চলে যেত দুর্গাপূজা দেখতে। চূড়ান্ত মানসিক অস্থিরতার মধ্যে যে দুটি মানুষের স্পর্শ মণীন্দ্রনাথকে শান্ত করতে পারে তাদের মধ্যে একজন এই সোনাবাবু। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মণীন্দ্রনাথ খুন হন এবং তার লাশ চিরদিনের জন্য গায়েব হয়ে যায়। আর সোনাবাবুরাও দেশ ছেড়ে এপার বাংলায় চলে আসে। কিন্তু চিরদিনের জন্য দেশ ছেড়ে চলে আসার সময়ও সোনাবাবু অর্জুন গাছের গায়ে তার জ্যাঠামশাই-এর উদ্দেশ্যে লিখে রেখে আসে দেশ ছেড়ে

চলা আসার কথা। পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে অনেকসময় বর্তমান প্রজন্ম পূর্বপ্রজন্মকে অস্বীকার করতে চাইলেও সবটা করা হয়তো, হয়তো কেন কখনই করা সম্ভবপর হয় না। পাগলাঠাকুর জ্যাঠামশাই-এর সঙ্গে সোনাবাবুর সম্পর্কের রসায়ন সেই কথাই বলে।

জ্যাঠামশাই-এর স্মৃতি-বিস্মৃতির অধিশাস্তায় ছিল শুধু পলিন, পলিনের নীল চোখ। নায়িকার চোখে আশ্রয় খুঁজে পাওয়া নতুন কোনো বিষয় নয়। জীবনানন্দ থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সবাই-ই তার কাঙ্খিত নারীর চোখে ভরসা খুঁজে পেয়েছিলেন। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও পলিনের নীলচোখে মণীন্দ্রনাথের আশ্রয় খোঁজার কথাই বলেছেন। পলিনের স্বপ্নমাখা নীলচোখ মণীন্দ্রকেও কালোটাই এর বদলে নীলটাই পরতে বলেছে। পলিনের অনুপস্থিতিতে মণীন্দ্রনাথ সর্বদাই সেই নীলরঙটাই খুঁজে ফিরত। জমিদারবাড়ির মেয়ে কমলার নীলচোখ মণীন্দ্রকে পলিনের কথা মনে করাত। সব নীল রঙ একীকৃত হয়ে গেছে - সব আবেগ ভালোবাসা একীকৃত হয়ে গেছে একটাই রঙে- নীলরঙ। আকাশের নীল রঙ আর খোকাবাবুর নীলপ্যান্ট একসাথে মিশে গেছে। অমলা সোনাবাবুকে যে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে তার খামের রং-ও নীল। আর নীল আকাশ আর সেই আকাশে উড়ে যাওয়া পাখি- নীলকণ্ঠ পাখি। সাদা চাদরের নীচে অমলা তাদের মায়ের পায়ের রং দেখেছে নীল। এই অমলা-কমলার মাও ভীষণ ভালবাসত কীটসের কবিতা পড়তে। কোথাও হয়ত এই অমলা-কমলার মায়ের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে হারিয়ে যাওয়া পলিনের ইঙ্গিত। জ্যাঠামশাই তো বনে জঙ্গলে ঘুরে ফিরে এই নীলকণ্ঠ পাখিরই খোঁজ করত।

মণীন্দ্রনাথের কাছে এই নীলকণ্ঠ পাখি ভালোবাসার প্রতীক। শুধু মণীন্দ্রনাথই নয়, এই নীলকণ্ঠ পাখি সমস্ত মানুষজনের কাছেই এক নতুন বার্তা নিয়ে আসে। নতুন স্বপ্ন। হিন্দুধর্মে নীলকণ্ঠ পাখির এক বিশেষ বার্তা রয়েছে। মা দুর্গা বৎসরান্তে একবারই মাত্র তিনদিনের জন্য বাপের বাড়ি আসেন। দুর্গাপূজার বিসর্জনে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে গিয়ে কৈলাসে মা দুর্গার ফিরে আসার পূর্বসংকেত দেয়। পাগলা ঠাকুর মণীন্দ্রনাথও সবসময় তার প্রাণের দোসর পলিনকে খুঁজে বেড়াত। তবে শুধু তিনি একাই নন ঈশম শেখ, সামসুদ্দিনদের কল্পনাতেও এই নীলকণ্ঠ পাখি সর্বমঙ্গলময়তার প্রতীক। কিন্তু এই নীলকণ্ঠ পাখি সহজে ধরা দেয় না, মানুষকে আশা জাগিয়ে আবার লুকিয়ে পড়ে। ‘মেঘদূত’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রতি মানুষের মানসসত্তার অগমতীরের মানসসরোবরের উল্লেখ করেছেন যেখানে মানুষ সশরীরে পৌঁছাতে পারে না বলে কেবলমাত্র নিজের কল্পনাটুকুকেই পাঠাতে পারে মাত্র। নীলকণ্ঠ পাখিও সেইরকমই। জ্যাঠামশাই-এর কাছে নীলকণ্ঠ পাখি পলিনের ফিরে আসার শুভসংকেত বার্তাবাহক। আর সামসুদ্দিনের কাছে নীলকণ্ঠ পাখি আবার অখন্ড বাংলা গঠনের স্বপ্ন।

মণীন্দ্রনাথের নীলকণ্ঠ পাখির মধ্যে পলিনের নীলচোখ খোঁজা বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ স্মরণ করায়। রাধাও নদীর কালো জল, কালো মেঘ এমনকি নিজের কালো চুলের মধ্যেও কৃষ্ণের গায়ের রঙ খুঁজে বেড়াত। এখানে মণীন্দ্রনাথের ভালোবাসার রঙ, প্রত্যাশার রঙ হল নীল। নীল রঙ রহস্যময়তার প্রতীক। রোম্যান্টিকতার রঙ নীল। মৃত্যুর রঙ নীল। মৃত্যু অর্থে চূড়ান্ত অবস্থা। প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রানুযায়ী নীলবর্ণ বীভৎস রসের, যার স্থায়ীভাব জুগুপ্সা। এর দেবতা মহাকাল। বিভাব অহৃদ্য, অপ্রিয়, অপবিত্র, অনিষ্টকর বিষয়াদি দেখা ও শোনা। অনুভাবের মধ্যে রয়েছে অঙ্গসংহার (withdrawal) , চোখ-মুখ কোঁচকানো, থুতু ফেলা ইত্যাদি। অপস্মার, আবেগ, মোহ, ব্যাধি, মরণ ছাড়াও উন্মাদ, বিষাদ, ভয়, মদ-এগুলি বীভৎস রসের ব্যাভিচারি ভাব। নীলকণ্ঠ পাখির মধ্যেই রয়েছে মণীন্দ্রনাথের সত্তা। অখন্ড বাংলার যন্ত্রণাময়তার খন্ডচিত্র। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসটিতে নিজের বড় জ্যাঠামশাই ক্ষীরোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নিজের সশ্রদ্ধ ভালোবাসার স্মৃতিতর্পণ করেছেন ঔপন্যাসিক।

বহুধর্ম বহুজাতির দেশ ভারতবর্ষ অতুলপ্রসাদী সুরে 'বিবিধের মাঝে' 'মিলন মহান'-ঐক্যের বাণী শোনায়। ইতিহাসের পাতায় দেখি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বহির্শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে ভারতবর্ষ। শক, হুণ, পাঠান, মোঘল সমস্ত জাতিই ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে আবার ভারতের মাটিতেই মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর হিন্দুবৌদ্ধ রাজ্য ১২০২-০৩ এর তুর্কী আক্রমণ পরবর্তীকালে মুসলমান শাসনাধীন হয়ে পড়ল। প্রথম পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতিগত সংঘাত থাকলেও অন্তমধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের কথা বলে। একদিকে নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু পুরাণ মহাকাব্য অনুবাদচর্চা অন্যদিকে আরাকান বৌদ্ধশাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান লেখকদের কলমে পীর-ফকির সুফি দর্শন। বাউল ও ফকির একসাথে মিলেমিশে একাকার। এরপরই ১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধ। সেখানে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লাকে পরাজিত করে ব্রিটিশ রাজশক্তির বাংলাজয়। তুর্কী আক্রমণের পরও হিন্দু ধর্ম সংকটের মুখে পড়েছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেই জনসাধারণের একসাথে যৌথনির্জ্ঞান তত্ত্ব প্রতিফলিত। কিন্তু যাই হোক বাংলা শেষ পর্যন্ত মুসলমান রাজশক্তিকে মেনে নিয়েছিল। বণিকের মানদন্ড যখন রজনী পেরোতেই রাজদন্ড হয়ে উঠেছিল তখন ইতিহাসের পাতায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মুসলমান রাজশক্তির কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা। ভারতবর্ষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজশক্তি দ্বারা শাসিত হয়েছে। মৌর্য, গুপ্ত, চোল, কুষাণ, পাল, সেন আরো অনেক। সেই ধারাতেই এসেছিল তুর্কীরা। তারপর ইংরেজরাও। কিন্তু ইংরেজ রাজশক্তি আর পারল না ভারতে একাত্ম হতে। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে শুধুমাত্র তাদের ঔপনিবেশিকতা সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি হিসাবেই ব্যবহার করল মাত্র। এর অবধারিত পরিণাম ইংরেজ রাজশক্তি আর ভারতের অভিভাবক হয়ে বিদেশি শক্তির

আক্রমণ প্রতিহত করার সুসম্পর্ক গঠন করতে পারল না। বরং নিজেরাই ভারতের মানুষদের কাছে বিদেশী জাতি হয়ে রইল। ভারতবাসী একত্রিত হল ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি পেতে। ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহে ভারতবাসীরা প্রথম গর্জে উঠল ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। অবশেষে ১৯৪৭ এ এল কাঙ্খিত স্বাধীনতা। ইংরেজ তো চলে গেল কিন্তু দগদগে ঘা হয়ে রয়ে গেল অবিভক্ত বাংলার বিভাজন-বঙ্গভঙ্গ।

এপার বাংলা-ওপার বাংলা। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষেরা রয়ে গেলেন পশ্চিমবঙ্গে আর মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষেরা চলে গেলেন বাংলাদেশ-পূর্ব পাকিস্তান। দেশভাগ এবং তার পরবর্তী রাজনীতি দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজরা এদেশে এসে নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে এদেশের মুষ্টিমেয় মানুষদের তাদের ভাষা ইংরাজী শিখিয়ে নিয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয় ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষার উদ্দেশ্যকল্পে। ফলত ইংরেজদের পাশ্চাত্য জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল বাঙালিদের কাছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি-রীতিনীতি সমস্ত কিছুই ভারতীয়দের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকল। পাশ্চাত্য-হাওয়া হিন্দু সমাজ খুব ভালোভাবে খোলা মনে গ্রহণ করল। মুসলিক সমাজ তাদের কু-সংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস, গোঁড়ামি, অশিক্ষা দ্বারা পাশ্চাত্যের উজ্জ্বল আলোক গ্রহণ করতে পারল না। শিক্ষাকে তারা উন্নতির পথের বাহন করতে পারল না। ফলে আরও পিছিয়ে পড়তে থাকল তারা। একদিকে নিজেদের অক্ষমতা সংকীর্ণ মনন আর ব্যর্থতার যন্ত্রণা অন্যদিকে হিন্দুদের আবার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই মুসলমান সমাজকে মানসিক দিক থেকে একেবারে পর্যদস্তু করে তুলেছিল। এরই অবশ্যম্ভাবিত ফলাফল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং শেষমেশ বঙ্গভঙ্গ-দেশভাগ। স্বাধীনতা অব্যবহিত পরেই চোদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছাড়ার যন্ত্রণা বাঙালীর জীবনে যে কতটা মর্মান্তিক ও মারাত্মক হতে পারে তারই জীবন্ত-জ্বলন্ত দলিল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’। এই যন্ত্রণার জাগ্রত প্রতিমূর্তি সোনাবাবুর জ্যাঠামশাই পাগলাঠাকুর ওরফে মণীন্দ্রনাথ ভৌমিক।

বিশণ সিং (টোবা টেক সিং : সআদত হোসেন মন্টো)

দেশভাগের যন্ত্রণা উন্মাদরোগগ্রস্ত মানুষদের জীবন কিভাবে বিপর্যস্ত করে তারই আরেক ছবি রয়েছে প্রতিবেশি সাহিত্যিক উর্দু লেখক সআদত হোসেন মন্টোর ‘টোবা টেক সিং’এ।দেশভাগের আগে অখন্ড ভারতভূমির এক গ্রাম ‘টোবা টেক সিং’ এর জমিদার ছিলেন বিশণ সিং। মাথার গন্ডগোল হওয়ায় চিকিৎসার জন্য পাগলা গারদে থাকছে বিশণ সিং। দেশবিভাগের দু-তিন বছর পরে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান দু’দেশের সরকারই সিদ্ধান্ত নিল কয়েদিদের মত পাগলদেরও বদলাবদলি আশু কর্তব্য। এদিকে মস্তিষ্ক-বিকৃতির জন্য বিশণ সিং নিজের নাম ভুলে গেছে। সবার

কাছে এখন সে পরিচিত 'টোবা টেক সিং' নামে। পাগল-বিনিময়ের নির্ধারিত দিনে সীমান্তে দু'পক্ষের সরকারী কর্মচারী, পাগলরা সবাই এসে মিলিত হবার পর পাগলদের মধ্যে এক মহা হাঙ্গামা দেখা দিল। চেনা পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে উৎখাত করা পাগলদের বেশিরভাগেরই অপছন্দ হয় ব্যাপারটা। এবার বিশণ সিং-এর পালা যখন এল তখন যেইমাত্র বিশণ সিং-কে শোনানো হল যে তার টোবা টেক সিং আগের ভারতভূমি ছেড়ে এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়েছে তখন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বিশণ সিং। পাগলা গারদে দীর্ঘ পনেরো বছর সে একটানা দাঁড়িয়ে থেকেছে। কেউ বিশণ সিং-কে কখনো শুতে দেখেনি। ফলে পা-দুটো তার ফুলে মারাত্মক ভারী আর ডিমগুলো শক্ত হয়ে গেছে। তাকে কোনো মতেই মাটি থেকে নড়ানো সম্ভব হল না। এবার বিশণ সিং গিয়ে দাঁড়ালো দুই দেশের সীমানার মধ্যবর্তী no man's land- এ। দুই দেশের মধ্যে পাগল-বিনিময় অবাধে চলতে লাগল। সূর্যোদয়ের কিছু আগে পনেরো বছর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা বিশণ সিং উপুড় হয়ে পড়ে গেল আর তার শরীর স্পর্শ করে রইল দুই দেশের সীমানা নির্ধারক কাঁটা তারের বেড়া।

১৯৪৭-এর স্বাধীনতা লাভ এবং তার পরবর্তী দেশভাগের যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে বিশণ সিং-এর মধ্যে। শুধু বাংলা নয় দেশবিভাগের জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করেছে সমগ্র দেশবাসী, এরই প্রমাণ বিশণ সিং চরিত্র। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের জ্যাঠামশাই মণীন্দ্রনাথ ভৌমিকের যন্ত্রণা আর বিশণ সিং-এর যন্ত্রণা দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে সমসুর ধ্বনিত করেছে। তাই এটি সরাসরি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের চরিত্র না হলেও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। উর্দু সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপকার সআদত হোসেন মন্টোর গল্পটি ভাষান্তর করেছেন অরুণা মুখোপাধ্যায়।

গল্পটিতে শুধু বিশণ সিং-ই একমাত্র পাগল চরিত্র, তা নয়। অনেকেই আছেন যাঁদের অসংলগ্নতা, অপ্রকৃতিস্থতা মানসিক বৈকল্যের নির্দেশ দেয়। বিশণ সিং এবং তার সাথে থাকা বাকি পাগলরা তাদের আচরণে সুস্থ-মস্তিষ্কের আমলাদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে যে, সব কিছুরই কি বাঁটোয়ারা সম্ভব। পাগলদের মধ্যে যে হৃদয় অনুভূতি রয়েছে স্বার্থ সচেতনতায় অ-পাগল আমলাদের মধ্যে তার ছিটেফোঁটাও নেই। পাগল এবং অপাগল; সুস্থ এবং অসুস্থ; মানসিক বৈকল্য এবং মানসিক সুস্থিতি- এর আবর্তে সমাজের তৎকালীন রাজনীতির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গের চাবুক হেনেছেন সাহিত্যিক।

বিশণ সিং আসলে লেখকের আত্মপ্রতীককল্প। দেশবিভাগের নির্মম আঘাত প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হেনেছিল লেখকের ব্যক্তিজীবনে। মুসলিম-রাষ্ট্রে নাম পরিচয়ে এক সুস্থির জীবনের আশায় মন্টো তৎকালীন বোম্বের চলচ্চিত্র জগতের ক্ষুদ্রতা, দীর্ণতা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছেড়ে চলে গেছিলেন। কিন্তু তার মন পড়ে রইল অখন্ড ভারতভূমিতেই। ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকার হলে নিজের জন্মভূমি

ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান দুই দেশেরই অমানবিক পদক্ষেপে বিধ্বস্ত ক্ষুব্ধ মন্টো তার প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছিলেন বিশণ সিং-এর চরিত্র চিত্রাঙ্কণে।

ঘাটবাবু (শ্মশান চাঁপা : সুবোধ ঘোষ)

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে সুবোধ ঘোষের খ্যাতি মধ্যগগনে। যদিও খুব বেশি পরিমাণ রচনা পাঠক তাঁর থেকে পায়নি। কিন্তু অল্পসংখ্যাতেই সুবোধ ঘোষ তাঁর স্বকীয়তার স্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন বাংলা কথাসাহিত্যজগতে। তাঁর পূর্বসূরী তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ এবং সমসাময়িক বিমল কর আর উত্তরসূরী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। লেখকের জীবনসংগ্রামের ব্যক্তিগত স্মৃতিকথাও কলমের মোড়কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। শংকর তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন-

''অনেকের কীর্তন গাইবার দল থাকে, সুবোধ ঘোষের (সেসব) কিছু নেই।''[১৮২]

এই যে একাকিত্ব তারই প্রতিফলন 'শ্মশান চাঁপা'র ঘাটবাবু।

ব্রাহ্মণ সন্তান মাধব গাঙ্গুলী সদবংশজাত। কিন্তু সঠিকভাবে গোত্র, গাঁই, মেল এর সঠিক দিশা জানাতে পারেনি লোকটা। সমাজপতিদের অজস্র সন্দেহজনক প্রশ্নবাণের কাছে ভ্যাবাচ্যাকা দশা লোকটার। বাবার নামও ঠিকঠাক বলতে পারেনি সে। বাপ মৃত তো কি হয়েছে সমাজপতিদের প্রতিনিধি কাঞ্চনবাবু কাকার-কাকাদের নামও জানতে চায়। কিন্তু সেই সদুত্তরও দিতে পারেনি লোকটা। সমাজের সমাজপতিদের চোখে লোকটার নাকি জন্মেরই কোনো ঠিক নেই। কোথা থেকে হঠাৎ করে এসে একদিন টাউনে এসে জুটেছিল। সেখানকার এক এক ভদ্রলোকেদের মেসে ভদ্রলোকেদের মতই থাকতে থাকতে একটা চাকরিও জুটিয়ে ফেলল। রাধু সাহার বিশাল কাপড়ের দোকানের ম্যানেজারের কাজ।

কিন্তু এ কাজও তার টিকল না। চেনা নেই, শোনা নেই, জানা নেই- হঠাৎ করে একটা লোক এত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার কি করে সামলাতে পারবে? গেল কিছুদিন বাদে কাজটা। কিন্তু কপাল ভাল লোকটার। আবার একটা কাজ জুটিয়ে ফেলল ঠিক। চেয়ারম্যান সুধাসিন্ধুর মন ভুলিয়ে শ্মশানে রেজিস্টারি খাতার দায়িত্ব সামলানোর কাজ জুটিয়ে ফেলল। সেই থেকে লোকটার নাম হয়ে গেল ঘাটবাবু।

একাই থাকত শ্মশানঘাট সংলগ্ন কোয়ার্টারে। কোয়ার্টার বলতে কুশঘাসে ছাওয়া প্রকান্ড মাঠের মধ্যে একটা টিনের ঘর, যার চারিদিকে রয়েছে মাদার গাছের বেড়া। দূর থেকে দেখলে মনে হতে যেন একটা প্রকান্ড ডাস্টবিন মাঠের মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

এই অন্ধকার বিবর্ণ ডাস্টবিনের ছবি একদিন পাল্টে গেল। পাতকুয়ার ধারের পেঁপে গাছগুলির বেশ বড় হয়ে ওঠা জীবনের সূচনা এবং প্রবর্ধমানতা ব্যাঞ্জিত করছে। পাতকুয়ার সামনে টকটকে লাল গাঁদার ফুলকারি জীবন তৃষ্ণার দ্যোতনা আনছে। মাদার গাছের বেড়ার উপর অপরাজিতার নীল নক্সা রহস্যঘন রোম্যান্টিকতার সূচনা করেছে। এই সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে পেঁপের সারির কাছে দড়ির গায়ে শুকোতে থাকা ভেজা শাড়ি জীবনের চালচিত্র ফুটিয়ে তুলছে।

ঘাটবাবু বিয়ে করেছে। শ্মশানের ছাই ধোঁয়া অন্ধকারের জীবনে শুকিয়ে যায়নি ঘাটবাবুর জীবনরস। ছয় মাসের দাম্পত্য জীবনে ঘাটবাবুর স্ত্রী পাঁচ মাসের গর্ভবতী। সপ্তপদী, কুশন্ডিকাসহ যাবতীয় শাস্ত্রীয় আচারবিধি পালন করে মন্ত্র পাঠ করে হোমযজ্ঞ করে বিবাহ করেছেন ঘাটবাবু। স্ত্রী বেশ সুন্দরী।

বিয়ের পর বেশ একটা পারিপাট্য এসেছে ঘাটবাবুর মধ্যে। চেহারাটা চিরকালই ছিল রোগার দিকে। কিন্তু বিয়ের পর সেই শুকনো রোগা চেহারাতে ফুটে উঠেছে একটা চকচকে হাসির ভাব। পরনে পরিচ্ছন্ন টুইলের কামিজ। এই ঘাটবাবু আসন্ন সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় স্ত্রী সন্তানসহ ভাগাড় ছেড়ে অন্যত্র ভদ্র পরিবেশে বাসা বদলের স্বপ্ন দেখেছে। মৃত্যু সমাকীর্ণ পরিবেশে থেকেও ঘাটবাবু জীবনীরস শুকিয়ে যায়নি। বরং দাম্পত্য এবং সংসার বাসনায় পরিপূর্ণ জীবনপ্রবাহ নিষ্ণাত হয়েছে ঘাটবাবুর জীবনে। সে যে কোনো কারণেই হোক না কেন এতদিন ঘাটবাবু তার পরিবার সম্পর্কে নির্বাক ছিল। আজ সেই ঘাটবাবুই অনাগত সন্তান স্ত্রী সহ পূর্ণ পরিবারের ছবি তোলাতে চায় স্টুডিও থেকে এখন ঘাটবাবু জীবন একটা ছন্দ পেয়েছে। সেই ছন্দবদ্ধতাই ফ্রেমবন্দী করতে চেয়েছে ঘাটবাবু।

কিন্তু হঠাৎ করেই কি সব হয়ে গেল। ঘাটবাবুর শূন্যঘর আবার শূন্য হয়ে গেল। ঘাটবাবু সবাইকে বলেন স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গেছেন। যে অনাগত সন্তানকে নিয়ে ঘাটবাবু পরিপূর্ণ সংসারের ছবি এঁকেছিলেন মনে মনে, সেই সন্তানের জন্মে সঠিক সংবাদও জানেন না ঘাটবাবু। স্ত্রী তার সন্তানকে গর্ভে নিয়ে ঘাটবাবুর বাড়ি শূন্য করে দিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন।

এই ঘটনার পর থেকে ঘাটবাবু লোকটা যেন আবার কেমন হয়ে গেল। যে ঘাটবাবু আগে এই বধ্যভূমি ছেড়ে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে থাকার কথা বলত সে-ই এখন আবার সারাদিন এই বদ্ধ ভূমিতেই থাকে। লোকটার চোখে ঘুমও নেই। সারাক্ষণ বিনিদ্র অবস্থায় মৃতদেহ সৎকারের সঙ্গে কাটাতে থাকে। আচরণে কেমন যেন পাগলাটে ভাবগতি। দিন হোক বা রাত সারাদিন বসে বসে কি যেন ভাবে। কোনদিকে তাকিয়ে থাকে আর কি-ই বা দেখে লোকটা বোঝাই দায়। শরীরটা শুকিয়ে চিমড়ে গেলেও মুখটা কিন্তু তার সেরকম নয়।

সুদীর্ঘ আটবছর ঘাটবাবু শ্মশানঘাটের রেজিস্টারের দায়িত্বপূর্ণ পদ সামলাচ্ছেন। বিয়ের আগের পাঁচ বছর। আর বিয়ের পরের তিন বছর। এই ঘাটবাবুর বিরুদ্ধে তৎকালীন পেট্রন কুমারসাহেব থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। মারাত্মক অভিযোগ! ঘাটবাবুর চরিত্রের দোষ। ঘাটবাবু প্রায়ই রাত্রির অন্ধকারে কুমার সাহেবের মধুপুর রোডের বাগান বাড়ির পাঁচিলের চৌহদ্দির আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। শুধু তাই-ই নয়, দারোয়ানদের কথানুসারে ঘাটবাবু নাকি প্রেতের গলার স্বর নকল করে কেঁদে কেঁদে লোকজনদের ভয় দেখাত। ধরা পড়ে মারও খেয়েছে ঘাটবাবু। পুলিশ সতর্ক করে প্রাথমিক পর্যায়ে ছেড়ে দিয়েছে ঘাটবাবুকে। কিন্তু রাত্রিবেলা ঘাটবাবুর টাউনের দিকে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুলিশ।

হঠাৎ করেই ঘাটবাবুর আচরণে পরিবর্তন লক্ষিত হয়। যে দৃষ্টি আগে ছিল শূন্য, যে দৃষ্টি আগে সবসময়ই কি যেন খুঁজে বেড়াত, যে দৃষ্টি আগে যেন কিসের দিকে তাকিয়ে থাকত, এখন সেই দৃষ্টির ভাষা-দৃষ্টিভঙ্গীতে বদল দেখা দিল। এখন এই দৃষ্টি সর্বদাই মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে। এই দৃষ্টি দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আর কিছুই দেখবার নেই। বহু দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ব্যর্থ ক্লান্ত রক্তাক্ত ঘাটবাবুর চোখদুটি শুধু বহু বিনিদ্র রাত্রি জাগরণের প্রতীকমাত্র নয়। এ লোহিত নয়ন দুটি হৃতভরসার প্রতিচ্ছবিমাত্র। শূন্যদৃষ্টিতে আগে কিছু কিছুর প্রতীক্ষা, কিন্তু এখনকার বাঙ্ময় দৃষ্টি হৃদয়ভঙ্গ বিশ্বাসভঙ্গতায় রিক্ততায় রুধিরসিক্ত।

যে ঘাটবাবু আগে রেজিস্টারির খাতার সাথে সৎকারের উদ্দেশ্যে আগত মৃতদেহের প্রতি সম্মান, সম্ভ্রমসূচক দূরত্ব বজায় রাখত, সেখানে এখন এই ঘাটবাবুর আচরণে ফিরে এসেছে চঞ্চলতা। বিবাহ-অব্যবহিত পরবর্তী জীবনেও ঘাটবাবু এই কাজ ছেড়ে চলে যেতে চাইত। এখন আবার তিনবছর পরে সেই আবার এই শ্মশানভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাইছে। কিন্তু তিনবছরের ব্যবধানের চাঞ্চল্য সমপ্রকৃতির নয়। এতদিনে- এই সুদীর্ঘ আটবছরের 'ঘাটবাবু' জীবনে এখন ঘাটবাবু মৃতদেহদের উদ্দেশ্যে টুকরো টাকরা রঙ্গরসিকতা করে- যাতে প্রতিভাত হয় জীবন ও মৃত্যুর অবিনশ্বরতা। গুন গুন করে সুর ভাঁজতে থাকে 'ঘাট'-'ঘাটবাবু'। মিতবাক ঘাটবাবুর কণ্ঠে মর্মরিত হতে থাকে জীবনের পরম সত্য-কাঞ্চনকায়াতো আর কখনই থাকবে না, চিতাতেই সব শেষ। একমুঠো ছাই-ই সবার ভবিতব্য। তবে এত মায়া কেন! মানুষ এসেছেও খালি হাতে, ফিরেও যেতে হবে খালি হাতে। একটুকরো সুতোও কেউ সাথে নিয়ে যেতে পারে না। আর কেউই পারেও না সারাজীবন এখানেই থেকে যেতে। চলে তো যেতেই হবে সবাইকে। সব মায়া এখানেই ছেড়ে রেখে। পৃথিবীতে কে কার! তবু জগৎ মায়াময়। যতক্ষণ জীবন, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই মানুষ বিভিন্ন মায়ায় জড়াতে থাকে। এই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ থাকাই তথাকথিত সুস্থ মানসিকতা। ঘাটবাবু হঠাৎ

করে জীবনের পরম সত্যটুকু কি করে যেন উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ঘাটবাবুর মানসিক সুস্থতা সমাজের চোখে যথাযথ নয়। মানসিক ভারসাম্যহীনতায় জীবনদর্শনের উপলব্ধি নাকি জীবন উপলব্ধিতে মানসিক ভারসাম্যহীনতা- সে যাই হোক মোট কথা ঘাটবাবু লোকটা পাগল- চরিত্রের দোষও আছে। এহেন লোক সমাজে থাকার উপযুক্ত নয়।

যাইহোক ঘাটবাবুর বিদায় নেবার আগেই রেজিগনেশন লেটার দেবার মুহূর্তেই এল একটি 'মরা'। কুমার সাহেবের রাণীজির দেহ। ইনি কুমার সাহেবের স্ত্রী নন। কুমার সাহেবদের অন্য অনেকরকম রাণীজি থাকেন। মধুপুর বাগানবাড়ির এই রাণীজিও সেইরকমই কোনো একরকম রাণীজি। মৃতদেহ সৎকারের জন্য আসা শবের শরীর দেখে কাঠের পরিমাণ আন্দাজ করতে আসেন ঘাটবাবু। এটাই তার কাজ। কিন্তু অবাক কান্ড! মৃতদেহটি দেখেও শ্মশানের সেই ন্যাড়াচাঁপা গাছটার মতই রিক্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল ঘাটবাবু। তারপর সুন্দরী রাণীজির মাথাভর্তি একরাশ কালোচুল-তার মাঝে সিঁথিভর্তি সিঁদুর আর কপালের মাঝে জ্বলজ্বল করতে থাকা টিপে সজ্জিত সুন্দর মুখশ্রীর উপর পরম ভালোবাসায় হাত বোলাতে বোলাতে মাটিতে বসে পড়লেন ঘাটবাবু। চোখ বন্ধ হয়ে গেল ঘাটবাবুর। পরম যন্ত্রণায় যেন সান্ত্বনার প্রলেপের মত ঘাটবাবুর রোগা শুকনো হাত শিরশির করে ঘুরতে লাগল সন্দরী রাণীজির শরীরে। ঘাটবাবুর অশান্ত আত্মা যেন পরম শান্তির ছায়া লাভ করল। আর রাণীজিকেও যেন মৃত্যু এনে দিয়েছে পরম প্রশান্তি।

রাণীজির দেহ দাহকার্যের পর-এতদিন পর ঘাটবাবুকে দেখা গেল রেজিস্টার খাতার উপর মাথা রেখে মুখ লুকিয়ে ঘুমাচ্ছে। এতদিন পরে ঘাটবাবুর চোখে ঘুম। যেন পরম নিশ্চিন্ততার প্রশান্তি এসেছে ঘাটবাবুর। আশ্চর্য হবার শেষ এখানেই নয়। ঘাটবাবু রেজিস্টার খাতায় সদ্য দাহ হওয়া রাণীজির নামপরিচয়ও লিখেছেন। আসলে এই রাণীজিই হলেন ঘাটবাবুর হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী। নাম সুমিতা গাঙ্গুলী। বয়স পঁচিশ। হার্টের অসুখে তার মৃত্যু হয়। আর তাদের একটি পুত্রসন্তানও আছে। এতদিন পর জানা গেল ঘাটবাবু কার জন্য এত বিনিদ্ররজনী কাটিয়েছিলেন। আজ তার স্ত্রী ফিরে আসায় তাই ঘাটবাবু পরম প্রশান্তির ছায়া লাভ করেছে।

ঘাটবাবুর পাগলামি এরপর আরেক ধাপ এগিয়ে গেল। কাঞ্চনবাবু ঘাটবাবুর থেকে রেজিগনেশন লেটারটা আনতে গেলে ঘাটবাবু সেটা পকেট থেকে বার করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। কারণ ঘাটবাবু এখন আর শ্মশানঘাট ছেড়ে যেতে চায় না। এতদিন একলা ঘাটবাবু জীবনের পরপারে স্ত্রীকে ফিরে পেয়েছেন। কাঞ্চনবাবুর থেকে জানতে পেরেছে তাদের একমাত্র পুত্রসন্তানও কঠিন অসুখে ভুগছে। তাই ঘাটবাবু এখন অপেক্ষা করে আছে তাদের একমাত্র সন্তানের তাদের সংসারে ফিরে আসার জন্য। ঘাটবাবু তাই হ্যালুশিনেশনে দেখতে পায় তাদের আগত সন্তানকে। যতই মৃতদেহ

আসছে ঘাটবাবু পরম আগ্রহে জানতে চায় সেটা কোনো বাচ্চার মৃতদেহ কিনা। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে স্বাভাবিক সামাজিক-পারিবারিক জীবন-যাপন করতে পারেননি ঘাটবাবু। সেই সংসার জীবন যাপনের স্পৃহা উদগ্র কামনা ঘাটবাবুকে মানসিক রোগীতে পরিণত করেছিল। আর শেষে জীবনের পরপারে পরিপূর্ণ সংসারের স্বপ্নেই ঘাটবাবু পূর্ণ জীবনের আকাঙ্খায় জীবন-পাগল হয়ে উঠেছে।

ঘাটবাবু প্রাকবিবাহিত পর্যায়ে নিজের পরিবারের পরিচয় দিতে পারেনি। সে যে কোনো কারণেই হোক। বিবাহের পর তাই ঘাটবাবু এক পূর্ণ পরিবারের স্বপ্ন দেখত। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে স্বপ্নের পরিবার। এই পরিবারকে ঘাটবাবু এক ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তার সেই স্বপ্নও ভেঙে গেল। মাধব গাঙ্গুলীর সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেই তাকে জন্মদানের পূর্বেই স্ত্রী সুমিতা গাঙ্গুলি কুমারসাহেবের রাণীজি হয়ে যান। যদিও সমাজ-পরিবেশের লোকজনের কাছে একথা কোনোদিনই প্রকাশ করেননি ঘাটবাবু। স্ত্রীর গায়ে যাতে কোনো কলঙ্কের দাগ না লাগে তাই জন্য ঘাটবাবু সবাইকে বলত স্ত্রী বাপের বাড়ি গেছেন। স্ত্রীর এই সুদীর্ঘ বাপের বাড়িতে থাকা নিয়ে সমাজ ঘাটবাবু সম্পর্কে কটুকথা বলতে অবশ্য ছাড়েনি। ঘাটবাবু অবশ্য তাতে কিছু মনে করত না। শুধু তাই-ই নয়। রাতের অন্ধকারে ঘাটবাবু কুমারসাহেবের মধুপুরের বাগানবাড়ির পাঁচিলের আশেপাশে ঘোরাফেরাও করত। এই জন্য পুলিশের খাতায় ব্যাড ক্যারেক্টার হিসাবে তার নামও উঠেছে। ধরা পড়ে মারও খেয়েছে ঘাটবাবু দারোয়ানদের হাতে। কিন্তু তাতে কি! নিজের স্ত্রী-সন্তানকে একবার চোখের দেখা দেখার উদগ্র বাসনায় সমস্ত কষ্টই তুচ্ছ ঘাটবাবুর কাছে। ঘাটবাবুর ভূতের মতন কান্না আসলে জনসাধারণের মনে ভয়ের বাতাবরন জাগিয়ে তুললেও ঘাটবাবুর মনের জমে থাকা কষ্টই অনুরণিত হয়েছে।

বৈষ্ণবপদাবলীতে দেখি রাধা কৃষ্ণের জন্য কতরকম কষ্ট স্বীকার করেছিল।নিবেদন পর্যায়ে চন্ডীদাসের রাধা বলেছিলেন-

''তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ''[১৮৩]

এ কথা আজ সত্যরূপে বাস্তবায়িত হল ঘাটবাবুর আচরণে। বৈষ্ণব সাহিত্যে কেবলমাত্র রাধার অভিসারের কথা থাকলেও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে পুরুষের অভিসার serenade এর উল্লেখ রয়েছে। ঘাটবাবু মাধব গাঙ্গুলির রাত্রের অন্ধকারে মধুপুর বাগানবাড়িতে যাওয়া সেই ঘটনারই অনুষঙ্গ মনে করায়। মাধব-নামটির সঙ্গেও বৈষ্ণবীয় ভাবনা জড়িত। বৈষ্ণব রসতত্ত্ব অনুযায়ী রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়নি। রাধাকে ছেড়ে কৃষ্ণ চলে গেলেন মথুরায় কংসকে ধ্বংস করলেন এবং যাদবদের রাজা হলেন। মাধব গাঙ্গুলিকে ছেড়েও সুমিতা গাঙ্গুলি চলে গেলেন-মধুপুর-কুমার সাহেবের রাণীজি হলেন। রাধাকৃষ্ণের মিলন হল রাধার ভাবসম্মেলনে। সুমিতা গাঙ্গুলিও ফিরে এলেন মাধব গাঙ্গুলির জীবনে-

মাধব গাঙ্গুলির হ্যালুশিনেশনে। বধ্যভূমির প্রতি মাধব গাঙ্গুলির অপ্রতিরোধ্য টান-প্রথমে স্ত্রী সুমিতার জন্য; তারপরে তাদের একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য- এ যেন এক অমোঘ আহ্বান-divine call-

'ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে' [১৮৪]

-এ পথ বড়ই দুস্তর-

'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া

দুর্গম পথস্তৎ কবয় বদন্তি' [১৮৫]

-কিন্তু এ পথ একাই পার হতে হবে।-

'একলি কএল পয়ান

পথ বিপথ নাহি মান' [১৮৬]।

ভারতীয় সাহিত্যে সীতা, উমা, কাদম্বরী, রাধা সমস্ত নারীদের অভিসার এবং অভিসারের যন্ত্রণা; সেই যন্ত্রণা অতিক্রমের স্মৃতি রয়েছে- কিন্তু নারীর জন্য পুরুষের এ হেন কষ্টস্বীকার - মাধব গাঙ্গুলি- বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত।

ক্ষ্যাপা (কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা : দন্ডপাণি জয়কান্তন ;তামিল ;অনুবাদ : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য)

শ্মশানকর্মীদের প্রত্যহকর্ম যখন তাদের কাছেই ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসে তখন শোকে তারা পাগল হয়ে যায়।বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি প্রতিবেশি তামিল কথাসাহিত্য থেকে একটি গল্প নির্বাচন করা হল।দন্ডপাণি জয়কান্তনের 'কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা' গল্পের মূল চরিত্র ক্ষ্যাপা পেশায় ডোম। শ্মশানভূমির উপরেই ছোট্ট একটা আস্তানা গড়ে নিয়েছে সে। সবুজ লতাপাতায় আবৃত পাঁচিল-ঘেরা শ্মশানভূমির পশ্চিম-কোণে তালপাতায় ছাওয়া এক কুঁড়েঘরে স্ত্রী মুরুগায়িকে নিয়ে তার ছোট্ট সংসার।শ্মশানভূমিতে যত মৃতদেহ আসে তাদের জন্য নির্বিকারচিত্তে গান গাইতে গাইতে কবর খোঁড়ে সে। অবশ্য এর জন্য সে মিউনিসিপ্যালটি থেকে মাসোহারাও পায় আর ঐ যে মাথা গোঁজার আস্তানাটুকু - সেটাও মিউনিসিপ্যালটি থেকেই পাওয়া। যখন তখন মনের অভ্যাসে গান গায় ক্ষ্যাপা। অনেক মৃতদেহের সঙ্গে রোজ সাক্ষাৎ ঘটলেও মৃত্যু ছুঁয়ে যেতে পারে না তাকে। সুদীর্ঘ পনের বছরের দাম্পত্যের পর তাদের সংসারে এল পুত্রসন্তান-ইরুল।

সন্তান-বাৎসল্যে ক্ষ্যাপা অনেকটা স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল। ভাগ্যের পরিহাসে মাত্র দু'বছর বয়সে ইরুলের হঠাৎ মৃত্যু হল। একমাত্র সন্তানের মৃত্যুশোক ক্ষ্যাপাকে সত্যিই পাগল করে দিল। এতদিন হাজার হাজার ফুটফুটে শিশুর মৃতদেহ কবর দিত গান গাইতে

গাইতে আজ সেই ক্ষ্যাপা আত্মজর মৃতদেহকে বুকে জড়িয়ে ধরে হয়ে গেল স্তব্ধ। এতদিন তার হাতে কবর দেওয়া মৃত শিশুরা স্তব্ধ হয়ে ক্ষ্যাপার গান শুনত আর আজ স্তব্ধ ক্ষ্যাপাকে গান শোনাচ্ছে সেই কবরের ঘুমন্ত শিশুরা। আর এদের মধ্যে ক্ষ্যাপা দেখতে পাচ্ছে তার আদরের ইরুলকে। ক্ষ্যাপা আর গান গায় না। বরং মৃতশিশুদের প্রতিটি মুখই আজ ক্ষ্যাপার চোখে তার সদ্যমৃত সন্তান ইরুলের মুক। আত্মজ ইরুলের মৃত্যু নিষ্পৃহ ক্ষ্যাপাকে সন্তানহারা পিতৃত্বে অভিষিক্ত করল।

ক্ষ্যাপার জীবনে কোনো বিষাদ ছিল না। মৃত্যুশোক যন্ত্রণা কী তা জানত না ক্ষ্যাপা। সবসময় গান গাইত সে। কোনো এক সন্ন্যাসীর থেকে শেখা সে গান।

''কুঞ্জবনে থাকে ক্ষ্যাপা আপনমনে,
দশটি মাস সে কুমোর ভাইকে জানায় মিনতি।
অবশেষে আনল বয়ে মাটির কলসী,
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া ভাঙল ক্ষ্যাপা তারে।''[১৮৭]

গানটি প্রথম থেকেই ক্ষ্যাপা গাইত। কিন্তু এর মর্ম উদ্‌ঘাটিত হল ক্ষ্যাপার আত্মজীবনঅভিজ্ঞতা দিয়ে। ''কুঞ্জবন'' অর্থাৎ বিশ্বজগৎ, 'ক্ষ্যাপা' অর্থ মানুষজন। অর্থাৎ এ বিশ্বসংসারে মানুষ নিজের মত থাকে। তার চোখে থাকে মায়াঞ্জন। শাক্তকবির ভাষায় কলুর বলদের মত চোখে ঠুলি পড়ে এই ষড়রিপুর আবেষ্টনীতে আনন্দে থাকে মানুষ। মানুষ ভুলে যায় এ জগৎ সংসারের একমাত্র সার সত্য মৃত্যু। মানুষের জন্ম-মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। এই মাঝের পথটুকু মানুষের কাছে জীবন নামে পরিচিত। সাধারণ মানুষ এই জীবন সম্পৃক্ত। আর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা এই জীবনের সারসত্যটুকু বুঝে গেছেন। তাই তারা মায়ামোহমুক্ত। ''কুমোর-ভাই'' অর্থাৎ ঈশ্বর ''দশটি মাস'' অর্থাৎ গর্ভাবস্থা বা নির্মাণপর্ব- কালসীমা অতিক্রম করে তৈরী করেন ''মাটির কলসী'' অর্থাৎ দেহভান্ড। আর গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ক্ষ্যাপা সেই ''মাটির কলসী'' অর্থাৎ মরদেহকে ''ভাঙল'' নশ্বরজীবনের পরিসমাপ্তির সূচনা করেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, হিন্দুশাস্ত্রপ্রথানুসারে শবদাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাবার পর চিতায় জল ঢেলে মাটির কলসীটি ভেঙে ফেলার সংস্কার রয়েছে। ঘটবন্দী জল বিশ্বপ্রকৃতিতে বিলীন হওয়ার মধ্যে নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হওয়া এবং ঘটাকাশ ও পটাকাশ-এর একীকরণে জীবাত্মার পরমাত্মায় পুনর্লীন হবার অনুষঙ্গটি রয়েছে।

সুখ-দুঃখ মিলেই মানুষ। সুখ-দুখের অনুবর্তনের মানবীয় সত্তার উন্মোচনে প্রকৃত মানুষ এর জন্ম। কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপার মতই আরেক ডোমের সন্ধান পাই 'অন্তর্জলি যাত্রা' (কমলকুমার মজুমদার) উপন্যাসে - বৈজু। কিন্তু বৈজুর মধ্যে প্রথমাবধিই ছিল এক নিজস্ব দর্শন। পক্ষান্তরে বালসুলভ ক্ষ্যাপার জীবন ভালোমন্দ সুখদুঃখের বোধ ছিল মাইলযোজন দূরবর্তী। তখনই চরিত্রটি ক্ষ্যাপা নামে অভিহিত হত। কিন্তু তখন তার জীবনে কোনো পাগলামির লক্ষণমাত্র ছিল না। সন্তান ইরুলের জন্মের পর আত্মভোলা ক্ষ্যাপা আরও বেশি জীবনসম্পৃক্ত হয়ে পড়তে থাকে। জীবনলগ্নতা জীবনকে ভালোবাসা ক্ষ্যাপা শিখল পিতৃত্বের আস্বাদে। পাগল পারা মানুষটা হয়ে উঠল স্বাভাবিক এক মানুষ।

রমেশচন্দ্র সেনের ছোটগল্প ''ডোমের চিতা''র নায়ক চরিত্র হারু। ক্ষ্যাপার মতই মৃত্যুশোক তাকে স্পর্শ করতে পারত না। হারুও নির্লিপ্ততার ঘোর কাটিয়ে মানবিক সত্তায় উত্তীর্ণ হয়েছিল নিজের হাতে সাজানো সহকর্মী বন্ধুর সাপের কামড়ে মৃত্যুর পর চিতায় ভাতের হাঁড়ি বসানোর পর চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রুবর্ষণ হওয়ায়। ক্ষ্যাপার হাতেও শত শত শিশু কবরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে নিদ্রামগ্ন হলেও ক্ষ্যাপার মধ্যে মৃত্যুশোক শ্মশানবৈরাগ্য সঞ্চারিত হয় নিজের সন্তান ইরুলকে পন্নীর গাছের তলায় চিরনিদ্রায় শায়িত করার পর।

সুবোধ ঘোষের কলমে ক্ষ্যাপার আরেক প্রতিবিম্ব পাই- শ্মশানঘাটের পৌরসভার কেরানী, যিনি ঘাটবাবু নামে পরিচিত। গল্পের নাম 'শ্মশানচাঁপা'। ঘাটবাবুর বউ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় জন্য একজনের সাথে পালিয়ে গেছিল। তখন থেকেই ঘাটবাবু কিছুটা মানসিকভাবে অসংলগ্ন। ঘটনাক্রমে একদিন কর্তব্যরত অবস্থায় ঘাটবাবুর সাথে তার স্ত্রী-এর সাক্ষাৎ হল। স্ত্রীর মৃতদেহ! শ্মশানঘাটে এসেছে শেষকৃত্যের জন্য। এতদিন স্ত্রী-সন্তানের জন্য অপেক্ষারত ঘাটবাবু আজ স্ত্রী-এর দেখা পেয়ে এবার অপেক্ষা করতে থাকে সন্তানের শবদেহ শ্মশানে আসার জন্য। ঘাটবাবুর কল্পনায় উঠে আসে এরপর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তাদের সুখে সংসার করার ছবি। যে সংসার আর ভাঙবে না। ক্ষ্যাপা যেমন নিজের সন্তানকে হারিয়ে জীবন-মৃত্যুর ভেদাভেদ ভুলে গেল ঘাটবাবুও তেমনই স্ত্রীশোকে সন্তানকে কেন্দ্র করে জীবন-মৃত্যুর সীমারেখা অতিক্রম করে গেল।

কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা মৃতমানুষের কবর খুঁড়তে খুঁড়তে কেমন যেন যান্ত্রিক হয়ে পড়েছিল। প্রতিদিন মৃত্যুশোকপ্রাপ্ত পরিবারের ছবি দেখতে দেখতে মৃত্যুশোক আর স্পর্শ করত না ক্ষ্যাপাকে। কথাটা নির্মম শোনালেও এটাই সত্য ক্ষ্যাপা মৃত্যুশোকগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে নিজের তফাৎ রাখতে পেরেছিল বলেই যে মৃতদেহ কবর দেবার কাজটি করতে পারত। নতুবা তাকেও যদি মৃত্যুশোক যন্ত্রণা স্পর্শ করত তাহলে ক্ষ্যাপা পারত না নিজের প্রিয়জনকে মাটির তলায় শুইয়ে দিতে। এই

যন্ত্রণাটা সে প্রথম অনুভব করল নিজের দু'বছরের ছেলে ইরুলের মৃত্যুতে। নিজ সন্তানের মৃত্যুতে এক হ্যালুশিনেশন গ্রাস করল ক্ষ্যাপাকে। ক্ষ্যাপার উঠোনে কবরস্থ শত শত শিশু আজ তার ইরুলের রূপ পরিগ্রহ করে এসে গান শোনাচ্ছে ক্ষ্যাপাকে। আবার সেই গান যে গান এতদিন তাদের শোনাত ক্ষ্যাপা। ম্যাজিক রিয়ালিজমের বাস্তব -অবাস্তব-পরাবাস্তব জগতের সীমারেখা একাকার হয়ে গেল ক্ষ্যাপার জাদু-বাস্তবতার স্পর্শে।

ক্ষ্যাপা চরিত্রে এক বিপ্রতীপতা লক্ষ্যণীয়। ক্ষ্যাপা সবসময় গান গায়। একই গান গায়। কিন্তু কবর খোঁড়ার সময় তার গান হয়ে যায় কর্কশ। আর যখন কাজ থাকে না, তখন ক্ষ্যাপা কুঞ্জবনের কাজ করে, তখন তার গান হয় কোমল -মধুর-আনন্দঘন। ক্ষ্যাপা যে গান গায় তা সম্পূর্ণ নয়। গানের কয়েকটি কলি মাত্র। গানটি ধুয়ার মত কাজ করছে সমগ্র গল্পটিতে। গানটিই ক্ষ্যাপা চরিত্রের মূল সুর। একই গান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুরে গাওয়ার জন্য লোকেরা তাকে ক্ষ্যাপা নামে ডাকে। জীবন সম্পর্কে নির্লিপ্ত ক্ষ্যাপার মনে মোহমায়ার বন্ধন এল প্রথম তার সন্তান। সন্তানের মৃত্যুতে ক্ষ্যাপার মনে প্যারানরম্যালিটির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তার প্রিয়জন মৃত্যুর পরও যেন তাকে সবসময় ঘিরে রেখেছে। আসলে ক্ষ্যাপার জীবন প্রকৃত যাপন শুরু হয়েছে সন্তান ইরুলের আবির্ভাবে, এতদিন ক্ষ্যাপা ছিল নিজের মত। কোনো মায়াবন্ধন-পিছুটান তার ছিল না। তার প্রিয়বিয়োগযন্ত্রণা কল্পনাও করতে পারেনি ক্ষ্যাপা। করুণরস বড়ই নির্মমভাবে করুণ ট্র্যাজেডিতে রূপান্তরিত হয়ে কশাঘাত হানল ক্ষ্যাপার জীবনে। যে ক্ষ্যাপার জীবনে কোনো মোহবন্ধনই ছিল না। নিজের মত থাকত, সেই ক্ষ্যাপা আবার একলাই হয়ে গেল-পুত্রশোকাঘাতে-শুধু মাঝে তার স্বাভাবিক জীবনযাপন দু'বছরের জন্য-পুত্রস্নেহ এবং পুত্রশোক।

ক্ষ্যাপা চরিত্রটির মাধ্যমে শ্মশানকর্মীদের জীবন যেমন প্রতিভাত হয়েছে ঠিক তেমনই আবার তার theme song টিতে ফুটে উঠেছে জীবন-মৃত্যুর শাশ্বত কথা।

''জন্মিলে মরিতে হবে

অমর কে কোথা কবে''[১৮৮]

নশ্বর মানবজীবনের এই সারসত্যটুকু তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু তবু মন মানতে চায় না। আমরা সবকিছুই মায়া দ্বারা বেঁধে রাখতে চাই। মন সবসময় বলে-

''যেতে আমি দিব না তোমায়''[১৮৯]

''I will not let thee go''[১৯০]

কিন্তু,

''তবু হায় যেতে দিতে হল ''[১৯১]

তাই তো কবি বলেছেন-

''নয়নসম্মুখে তুমি নাই

নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই''[১৯২]

মানুষের সবথেকে দুর্বলতার জায়গা তার সন্তান। মানুষ জানে সে মরণশীল। তবুও সামনে এগিয়ে চলে। তার যা কিছু সব রেখে যেতে চায় সন্তানের জন্য। সন্তানের মধ্যেই সে বেঁচে থাকতে চায়। ক্ষ্যাপা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে বাস করত। তাই তার কাছে মৃত্যু কোনো বড় ব্যাপার ছিল না। দাম্পত্য জীবনের সুদীর্ঘ পনের বছর কেটে যাওয়ার পরও সন্তান আসেনি তাদের ঘরে। তাই হয়ত ক্ষ্যাপা জীবনবিমুখ। কিন্তু দাম্পত্যের পনের বছর পর হঠাৎই তাদের জীবনের এল পুত্রসন্তান ইরুল। এই প্রথম ক্ষ্যাপা বাঁচতে শিখল। ভবিষ্যতের আলোয় উজ্জ্বল হল। পেল জীবনীশক্তি। তাই শেষপর্যন্ত পুত্র ইরুলের মৃত্যুতে ক্ষ্যাপা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ইরুলের জন্মের আগের ক্ষ্যাপা নিজের আত্মশোক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল। বাঁচা থেকে বিরহিত ছিল ক্ষ্যাপা। তাই মৃত্যুও দাগ কাটে নি তাকে। আর ইরুলের জন্মের সাথে সাথে ক্ষ্যাপারও নতুন জীবনজন্ম হল। পিতা ক্ষ্যাপার মৃত্যু হল ইরুলের মৃত্যুতে। লক্ষ্যহীন যে জীবন ছিল আগে ক্ষ্যাপার ইরুলের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই জীবনে একটা লক্ষ্য এল। পুত্রের জন্য বাঁচা। সেই প্রকৃত জীবন উপলব্ধির স্বাদ পেয়েও মাত্র দু'বছরে তার পরিসমাপ্তিতে এক মনগড়া হ্যালুসিনেশনেই পুত্রমুখ উপভোগ করল ক্ষ্যাপা।

শিবন মেথর (অরণ্যের অধিকার : মহাশ্বেতা দেবী)

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস বিরসার 'ধরতি আবা' হয়ে ওঠার আখ্যান। সেখানে অতি ছোট এক চরিত্র শিবন মেথর। উপন্যাসের একেবারে প্রথম পরিচ্ছেদে পাঠক শিবনকে পায়। ১৮৯৫ থেকে ১৯০০-তৎকালীন ইংরেজ শাসনশক্তির বিরুদ্ধে মুন্ডাজাতির যে সম্মিলিত বিদ্রোহ অভিযান তারই জীবন্ত দলিল 'অরণ্যের অধিকার'। বীরসার নেতৃত্বে ছোটনাগপুর অঞ্চলের মুন্ডা জনজাতি যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল তার আগুনে একের পর এক ভস্মীভূত হতে লাগল খৃষ্টানদের গির্জা, জমিদারী সম্পত্তি এবং থানাগুলি। সৈলরাকাব পর্বতের উভয়প্রান্তের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বহু মুন্ডা ধরা পড়ায় বিদ্রোহ প্রতিহত হলেও বিরসাকে ইংরেজ তখনও ধরতে পারেনি। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী সঙ্গিনী পরমীর সামান্য ভুলই ধরিয়ে

দিল সেন্ত্রার জঙ্গলে আত্মগোপনকারী বীরসাকে। এরপর থেকেই বীরসার ঠিকানা হল যথাক্রমে খুঁনটি, বন্দগাঁও ও রাঁচী জেল। জেলে অকথ্য পুলিশি নির্যাতনে ৯ই জুন, ১৯০০ মারা গেল বীরসা।

বীরসা মারা যাবার আগে রক্তবমি করেছিল। সকাল ৯টায় মারা গেলেও তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হল বিকাল ৫-৩০টা। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বল হল রক্ত আমাশার পর কলেরা সংক্রমণের কারণে বৃহদন্ত্রের উপরিভাগ কুঁচকে হৃদপিন্ডকে বাঁদিকের অংশ থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে মৃত্যু হয় বীরসার। বীরসার কলেরা হল, অথচ বীরসা কোনোদিন জেলের বাইরের কোনো জল খায়নি। তাই সরকারী ডাক্তার এই রিপোর্টের সঙ্গে পরিস্কার উল্লেখ করে দিলেন যে, কলেরার জীবাণু যে কোথা থেকে পাওয়া গেছে তা অজ্ঞাত।

মৃত্যুর পর বীরসার দেহ দাহ করার হুকুম জারি হল। যদিও বীরসার ধর্ম দেহ কবর দেবার কথা বলে। কিন্তু বীরসাইত মুন্ডারা যদি আবার কবর থেকে মৃতদেহ তুলে এনে হাঙ্গামা করে। সেই ভয়ও আছে প্রশাসনের। তাই মৃতদেহ দাহ করার নির্দেশিকা জারি হয়। বীরসার মৃত্যুর পর তার শেষযাত্রার সঙ্গী ছিল একমাত্র শিবন মেথর। তার উপরই বীরসার দেহদাহের গুরুভার অর্পিত হয়েছিল।

জীবনের শেষ কটা দিন সলিটারী সেলে বীরসা যখন মাত্র চোদ্দ পা জায়গায় শিকলের বোঝা টেনে হেঁটে বেরাত, মানুষের সাথে কথা বলা তো দূর থাক, মানুষের মুখ দেখা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল, তখন উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম চারধারের উঁচু দেওয়ালের ঘেরাটোপের মধ্যে একমাত্র মানুষ ছিল বীরসা ব্যতিরেকে, সে হল শিবন মেথর। শিবন আসত ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিস্কার করতে। কথা না হলেও শিবন দুচোখ ভরে শুধু দেখত বীরসাকে। আর বুঝতে পারত কিভাবে দিনের পর দিন ইংরেজের অমানবিক অত্যাচার সহ্য করেও টিকে রয়েছে বীরসা। শরীরে কিছুই ছিল না বীরসার। শিবনের চোখে শুকনো পাতার মত হয়ে গেছিল। কিন্তু তবুও বীরসা শরীরটাকে টেনে টেনে নিয়ে চলে বেড়াত। কারণ তার শিকলের শব্দই জেলে বন্দী বীরসাইত মুন্ডাদের জীবনীশক্তি জোগাত।

শিবন মেথর সরাসরি বীরসাইত ছিল না। কিন্তু তার জীবনেও দু:খ-কষ্টের অন্ত ছিল না। শিবনের ছোটবেলা কেটেছে হাজারীবাগে। শিবনের এক দাদা ও এক ভাই ছিল। তারা দুজন আর শিবনের বাপ তাদের ছেড়ে চলে গেছে। মা আর ছেলের সংসার। দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসার। জঙ্গলেই বড় হয়েছে শিবন। ছোটবেলায় জঙ্গল থেকে বসন্তকালে ওরা বনফুলের শুকনো ঝোপ কুড়িয়ে নিয়ে এসে উঠোনের এককোণে জমিয়ে রাখত। শীতকাল এলে সেই শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে তার আগুনে হাত-পা সেঁকে নিত। জীবন থেকেই শিখেছে শিবন যে কুলকাঠের আগুন অনেকক্ষণ জ্বলে। তারপর একদিন কাজে লেগেছে সরকারী জেলে। মেথরের কাজ করে শিবন। বীরসার সঙ্গে সংগ্রামে প্রত্যক্ষ যোগ না

দিলেও বীরসাকে শিবন ভগবান নামেই ডেকেছিল। অন্নদাতা প্রভুর ভর্ৎসনাও বীরসাকে ভগবান নামে ডাকা থেকে বিরত করতে পারনি শিবনকে। এমনই তার মানসিক দার্ঢ্যতা।

ময়নাতদন্তের পর বীরসার সেলাই করা শরীরটা কাঠের খাটুলিতে নিয়ে শেষকৃত্যের পথে এগিয়ছিল মেথররা। বীরসার শরীরটা তুলে নিতেই একটা আগুনের মত উত্তপ্ত বাতাস ভেদ করে সবার জেল থেকে বেরুতে কেমন যেন একটা ভয় ভয় অনুভব হয়েছিল। অন্যরা কোনো কথা না বললেও, শিবন মেথরের মুখে ধ্বনিত হয়েছিল সবার মনের মধ্যে গুমরাতে থাকা কথাটা-

''এ কি রকম হয়ে গেল হে? জাতের মানুষ, ধর্মের মানুষ কাঁধ দিবে, কবর দিবে,

না কি হয়ে গেল?''[১৯৩]

মানুষের ধর্ম থাকে-জাত থাকে। মৃতব্যক্তির প্রতি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। ঠিক এই কারণেই চোর-পুলিশের খেলাতে পুলিশের গুলিতে মৃত ব্যক্তি সে যতই দাগী আসামী, খুনে-বদমাইস যাই-ই হোক না কেন, পুলিশ তার সামনে টুপি খুলে কুর্নিশ জানায়। পথচলতি মানুষ মৃতদেহ দেখলে একপলকের জন্য থেমে শ্রদ্ধা জানায়। কিন্তু বীরসার ক্ষেত্রে এ এক অবিচার। যে মানুষটা মানুষের অধিকার দাবিতে প্রাণ দিল তার মৃত্যুর পর সামান্য সম্মানটুকুও জুটল না । এই প্রতিবাদের ধ্বনি শিবন মেথর।

বীরসার মৃতদেহ নিয়ে মেথরদের সাথে সিপাহী মুনেশ্বর প্রসাদ, সান্ত্রী, গার্ডরা এলেও শেষ অবধি থাকেনি তারা। কারণ বীরসা এদের কাছে ভগবান নয়। ইংরেজ সাহেবই এদের কাছে ভগবান।বীরসার থেকেও বড় ভগবান ইংরেজ সাহেব। তাই হরমু নদীতীরে বীরসার দেহ পৌঁছে দিয়ে সন্তর্পণে পুরো দাহকাজ শেষ করে আসার নির্দেশ মেথরদের দিয়ে উল্টো পথে পা দিয়েছিল তারা। তাদের বিবেক ধ্বনিত না হলেও, আবার ধ্বনিত হল শিবনের বিবেক বাণী। শিবনের মনে হতে লাগল, বীরসাকে তারা একটা নতুন কাপড়ও দেয়নি। মৃতদেহের প্রতি শেষসম্মানটুকু প্রদর্শন করে সৌজন্যতা বা মানবিকতা দেখায়নি যে শুধু ইংরেজ সরকার, তাই-ই নয়, ইংরেজ প্রভুর বেশ কিছু ভৃত্যের মনেও এই শুভবোধগুলি জাগরিত হয়নি। কিন্তু সবাই-ই যে ক্ষমতাপরায়ণের পদলেহনই করেছে তা নয়, ব্যতিক্রমী মানবতার মুখ শিবন মেথর।

চিতা সাজাতে দেরী হল না। মৃত্যুর পর বেশ কিছুটা সময় কেটে যাওয়ায় দেহে পচনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু শুকনো গোবরের ডেলায় সাজানো হয়েছিল চিতা। ধরমুর কথায় আক্ষেপোক্তি শোনা যায়, যে জঙ্গলমায়ের সন্তান বীরসার জন্য শেষযাত্রায় একটুকরো কাঠও জুটল না!কি ট্র্যাজেডি! শবদাহের নিয়মনীতি-মৃতদেহের স্নান, নতুনবস্ত্র, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ, মুখাগ্নি-কিছুই করা যায়নি বীরসার জন্য। কিন্তু তবুও বীরসার চিতার আগুনের শিখা উঠল গগনচুম্বী। ভিখন

এই উলগুলানের আগুন নিয়ে ঠাট্টা করতে গেলে তা মাঝপথেই থেমে যায়। এই চিতার আগুন শিবনের মধ্যে এক ভিন্ন অনুভূতির জাগরণ ঘটাল।

চিতার আগুন শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছালে শিবন শেষকাজটুকু একাই করার কথা বলে বাকিদের পাঠিয়ে দেয়। এবার শিবনের সঙ্গে বীরসার এক নতুন সম্পর্ক সৃজিত হয়। বীরসার জ্বালানো ধিকিধিকি আগুন উলগুলানে পরিণত হয়েছে। শিবন সেই শেষের আগুন আরোও উস্‌কে দিল লাঠির সাহায্যে। এ আগুন একেবারেই সবটা জ্বলে পুড়ে শেষ হল না। গুমরে গুমরে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে অনেকক্ষণ জ্বলল বীরসার চিতার আগুন। শিবনের স্মৃতিপটেও একে একে ভেসে উঠতে লাগল পুরানো দিনের বিভিন্ন ছবি। কখনোও নিজের ভাগ্যবিড়ম্বিত শৈশবচিত্র, আবার কখনোও অত্যাচারিত বীরসার জেলবাসের ছবি। প্রথমাবধিই বীরসাকে শিবন ভগবান নামেই ডেকে এসেছে, সে বীরসাইত না হওয়া সত্ত্বেও, অন্নদাতা ইংরেজপ্রভুর কোনো কারণই সে ডাক শিবনের মুখ থেকে চ্যুত করতে পারেনি। এতটাই মানসিক দৃঢ়তা ছিল শিবনের মধ্যে। বীরসার জীবৎকালে তার সঙ্গে কয়েক কদম মেলাতে না পারলেও বীরসার শেষযাত্রায় শেষ কদম পর্যন্ত মিলিয়েছে শিবন।

বীরসার চিতা নিভে গেলে হরমু থেকে জল এনে চিতা ধুইয়ে দিয়েছে শিবন। শিবনের সঙ্গী সালী। বা বলা যায় এখন সালীর সঙ্গী শিবন। চিতায় জল ঢালায় কিছুটা আগুন ছাই আর বাষ্প আকাশে উড়ে গেল। তারপর একমুঠো ছাই চিতা থেকে নিয়ে আঁচলে বেঁধে নিল সালী। উলগুলানের আগুন সারা জঙ্গলে ছড়িয়ে দিতে হবে যে! সালীর নৈকট্যজনিত সমনি:শ্বাসে তপ্ত শিবনের নিথর শরীরে এক অদ্ভূত গতি সঞ্চার করল। হতবাক শিবনের মুখে ধ্বনি স্ফূরিত হল। হঠাৎই প্রচন্ড আবেগে রুদ্ধ হয়ে আত্মহারা হয়ে শিবন চিতার উপরই কলসী আছড়ে মেরে ছুটতে লাগল। জেলখানার দিকে। অবশেষে জেলখানার কাছে এসে চিৎকার করতে লাগল-

''উলগুলানের শেষ নাই! ভগবানের মরণ নাই!''[১৯৪]

কৃষ্ণভারতের আদিম রক্ত তার মধ্যেও চলকে উঠেছিল। সালী বলেছিল ভগবানের মরণ নাই। এক বীরসার মৃত্যু জন্ম দেবে হাজার হাজার বীরসার। বীরসা চিতাভস্ম জঙ্গলের মাটিকে উর্বর করে তুলবে হাজার হাজার ধরতিমাতার জন্মসম্ভাবনার উজ্জ্বলতায়।

বীরসার চিতায় অগ্নিসংযোগে শিবনের মধ্যে যে এক শ্মশানবৈরাগ্যের অনুভূতি এসেছিল, সমস্ত মুন্ডাদের মধ্যে বীরসার শৃঙ্খলের শব্দস্তব্ধতা যে হতোদ্যমের হতাশাগ্রস্ততা দেখা দিয়েছিল তার অবসান ঘটাল শিবনের উন্মাদপ্রলাপ -

'ভগবানের মরণ নাই!'[১৯৫]

শিবনের মনে হল, তাহলে যাকে দাহ করা হল তাহলে সে কে। বীরসা তো আসলে ভগবানই। মুন্ডাদের ভগবান। ইংরেজরা বীরসার দেহ দাহ করে ফেলতে চেয়েছিল গোপনে, কারণ বীরসার দেবত্বের বিশ্বাসকে লঙ্ঘন করা। মুন্ডাদের হাতে বীরসার মৃতদেহ তুলে দেওয়া হলে আবার কোনো অতিলৌকিক, অলৌকিক আখ্যান সৃজন হতে পারত। কিন্তু এভাবে সত্যিকে আটকানো যায় না। শিবন মেথরের সহায়তায় সালী বীরসার দেহভস্ম পৌঁছে দিয়েছিল মুন্ডারীদের কাছে।

শিবন মেথরের এই শেষপর্যায়ের উন্মাদগ্রস্ততার মাধ্যমে লেখিকা সত্যোচ্চারণ করিয়েছিলেন। সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্ এর জয়গাতা উন্মাদ শিবন মেথর। মহাভারতে একলব্য তার গুরুকে গুরুদক্ষিণায় অঙ্গদান করেছিল, আর কলিযুগে শিবনও তার ভগবানকে গুরুদক্ষিণা দিল- আবেগে উন্মাদগ্রস্ততায়। অন্যান্য মেথরদের মত শিবন আত্মস্বার্থচরিতার্থতায় বীরসাকে অবমাননা করেনি। বীরসা যেমন নিজের আত্মীয়-পরিবার-আত্মসুখ বিসর্জন দিয়েছিল- ব্যষ্টিস্বার্থ ত্যাগ করেছিল গোষ্ঠীস্বার্থে- সেই মত পাগল ভক্ত শিবন মেথর। চরিত্রটি স্বল্প পরিসরে লেখিকার বিশেষ স্বার্থ চরিতার্থ করেছে।

রুণু (স্টীলের চঞ্চু : সাধন চট্টোপাধ্যায়)

১৯৯২-এ অনুষ্টুপ পত্রিকায় প্রকাশিত সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'স্টীলের চঞ্চু' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র রুণু। বাবা ভূপতি বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত স্কুল-মাস্টার। আর মা পুতুল ছয়বোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠা। পুতুলের রূপজাত উন্নাসিকতা একটু বেশি পরিমাণেই ছিল। রুণু ছোট এক বোনও আছে। মায়ের রূপরাজি বর্তেছে দুই-পুত্রকন্যার মধ্যে। টকটকে ফরসা গায়ের রং, আয়ত চোখ, গালে নরম শ্রশ্মুশোভিত সুদর্শন রুণু বরাবর লেখাপড়াতেও মেধাবী। উচ্চমাধ্যমিকে স্টার পাবার পর চাকরিটাও রুণু বেশ সহজেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রুণুর এই এক সমস্যা। সে মোটেই অফিসে যেতে চায় না। বাবা-মার সঙ্গে রুণুর সম্পর্ক-ব্যবহারও খুব একটা সৌজন্যমূলক নয়।

আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত বাঙালি ছেলেদের মতো রুণু কয়েকটা পাশ দিয়ে কোনোরকমে একটা কেরানীবৃত্তি জুটিয়ে নিশ্চিন্ত জীবনযাপনের পথে হাটেনি। তার চিন্তাভাবনার স্তর অপ্রয়োজনীয় রকমের উচ্চমার্গীয়। সে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের ভাবনাতেই রুণু অবলম্বন করে অবাস্তবতা। অতিসংবেদনশীলতায় রণু গঠনাত্মক হবার পরিবর্তে হয়ে ওঠে ধ্বংসাত্মক।

রুণুর চিন্তাচেতনায় সর্বদাই প্রতিভাত হয় অশুভ পাখি- কুদর্শন দাঁড়কাক। দৃষ্টিবিভ্রমে রুণু প্রায়ই দেখে একটা ন্যাড়া গাছের ডালে বিশাল এক দাঁড়কাক বসে থাকতে। দাঁড়কাকটির দৃষ্টি রক্তপিপাসু। আর ঠোঁটটা স্টীলের। আলো পড়লে ঠোঁটটা আরও ঝকঝক করে। চঞ্চুর তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য রুণু দেখে দাঁড়কাকটা মাঝে মাঝেই তার ডানায় ঠোঁটটা ঘষে নেয়।

আসলে রুণু যে গোপনচক্রের সদস্য সেখানে তাকে এবং তার মত কয়েকজনদের শেখানো হয় যে আমরা যে সমাজে বাস করছি তা একেবারেই পচে গেছে। তাই একে বর্জ্যপদার্থের মতই ত্যাগ করা উচিত। তার বদলে গড়তে হবে আর্থিক শোষণমুক্ত সবরকম ভেদাভেদহীন এক উন্মুক্তসমাজ। সমাজতন্ত্রের ভাবনায় এই প্রস্তাব সাধু। এপর্যন্ত সব ঠিকঠাকই আছে। কিন্তু সমস্যাটা হল অন্যজায়গায়। এই সভার প্রেসিডেন্ট মহাশয় বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন। সংসার চালাবার সামর্থ্যও তার নেই। যে মানুষটি সভার প্রেসিডেন্ট হয়ে সদস্যদের সম্পর্ক অস্বীকার করার শিক্ষা দেন সেই মানুষটিই বিবাহ করে অন্য আরেকটি মানুষের দায়িত্ব অস্বীকার না করে নতুন এক সম্পর্ক স্থাপন করেন। আর সংসার চলে উপার্জনহীন সভাসদস্যদের অর্থে। সভার সদস্যরা বুর্জোয়া ব্যবস্থায় যোগদান করবে না বলে আয়ের পথে যায় না, অথচ সভার প্রেসিডেন্ট সংসার চালানোর জন্য পরিবারের সদস্যদের অর্থ বিভিন্নভাবে নিয়ে এসে এরা প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেয়। এই দল মনে করে অস্ত্রের তীব্র কশাঘাতেই এই সমাজের মাথায় ডাঙস মারতে হবে। তবেই সমাজ সিধা হবে। এই চিন্তাভাবনা থেকেই সভাসদস্যরা দাতব্য চিকিৎসালয়ের নীচে লুপ্ত অস্ত্রশালা গড়ে তোলে।

এই পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারায় রুণুর মস্তিষ্কে প্রভাব পড়ে।রুণুর স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে মাথার গন্ডগোল দেখা দিতে থাকে। বাড়ির লোক রুণুর কাছে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাই এই বাড়ির লোকগুলোর সাথে রুণু প্রচন্ড খারাপ ব্যবহার করে। ইস্কিমিয়াকে রুণু এই চেতনা থেকেই বলে সামান্য হার্টের রোগমাত্র। অসুস্থ বাবাকে চিকিৎসকের কাছেও নিয়ে যায় না রুণু। কারণ এর পিছনেও রুণু দেখতে পায় ডাক্তারদের বুর্জোয়াইজম। বাবা-মা রুণুর কাছে খুব একটা ভাল সম্পর্কের জায়গায় নেই। বাবা-মা এর যৌবনের আনন্দের এবং বার্ধক্যের অবলম্বন সন্তান- এই কথাগুলো মোটেই মিথ্যা নয়। চূড়ান্ত বাস্তব সত্য বটে। কিন্তু সম্পর্কের মূলের ভালোবাসা এবং চূড়ান্ত বাস্তব- এই দুইয়ের টানাপোড়েনের চাপ নিতে পারে না রুণু।

সমাজচেতনার প্রজন্মগত ব্যবধানের চাপে পিষ্ট হয়ে রুণু নিজের মানসিক স্থিতি হারিয়ে ফেলেছে। সমাজপরিবর্তনের বুলি আওড়ানো সমাজতন্ত্রবাদের স্বপ্ন দেখানো নেতৃসম্প্রদায়রা আসলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু সুকুমার মতিত্বদের ব্যবহার করে মাত্র। এই পরিস্থিতির স্বীকারের ফল পরিণাম রুণু। রুণুর এরকম কথাবার্তায় একস্তরে রুণুকে মনে হতে পারে বোকা বলে যে কেবলমাত্র অন্যের কথা শুনে অন্যের প্রতি দরদ-আস্থা দেখাতে গিয়ে আরও জটিল। আবর্তে জড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত ‘স্টীলের চঞ্চু’ গল্পে লেখক চারের দশকের অতিবামপন্থা , কমিউনিজম এবং সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলন, মত সব মিলিয়ে শেষে বিপর্যস্ত সমাজ ব্যবস্হা শিকার রুণুর মত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম- সন্তান সম্প্রদায়।

লেখক যে সমাজের কথা বলেছেন তা হল একান্নবর্তী পরিবারের যৌথসত্তা ভেঙে বেরিয়ে আসা ছোট ছোট নিয়ক্লিয়ার পরিবার গঠনের সমাজ। এই সমাজ মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতার পথে ঠেলে দেয়। আত্মকেন্দ্রিকতার আবর্তের ঘূর্ণনে মানবসত্তা শেষ অবধি নিজের ভরকেন্দ্রেই হয়ে পড়ে ভারসাম্যহীন। মানবসত্তার এই অবনমনের শিকার কচি মাথাগুলোকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে আরও বিভ্রান্ত করে তোলে বিভিন্ন ইজমবাদী আসলে সুবিধাবাদী সম্প্রদায়। এই দোলাচলতার পাগলামির দৃষ্টান্ত রুণু। সমাজে সাম্যবাদ আনার প্রচেষ্টায় রুণু নিজেরই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

তাই রুণুর হ্যালুশিনেশনে বারবার আসে দাঁড়কাক। উল্লেখ্য কাক নয়, দাঁড়কাক। হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী বাড়িতে কাক এসে বসা, কাক ডাকা শুভ লক্ষণ- বাড়িতে অতিথির আগমন বার্তা শোনায় কাক। অতিথির আগমন মানেই বাড়িতে আনন্দঘন পরিবেশের সূচনা। বৈষ্ণবপদাবলীর বিভিন্ন পদেও দেখেছি রাধা কাক ডাকাকে অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বলে মনে করেছেন। কিন্তু এখানে রুণুর চেতনায় বারবার আসছে দাঁড়কাক। দাঁড়কাক শাস্ত্রানুযায়ী অশুভ বার্তা বহন করে। লক্ষ্যণীয় রুণুর দেখা দাঁড়কাকটির চঞ্চু আবার স্টীলের। স্টীল তথা ইস্পাত-শক্ত ধাতব অনুষঙ্গ- অস্ত্রবিশেষ। সমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুণুর প্রতিবাদী মন তাই দেখতে পায় স্টীলের চঞ্চুধারী দাঁড়কাক। তার কল্পনায় সমাজ সংশোধনের - সমাজসংস্করণের সুপ্ত বাসনা চেতন-অচেতন-অবচেতনে সর্বত্রই প্রতিভাত। তাই শেষ পর্যন্ত রুণু এই দাঁড়কাকের পিছনেই উড়ে চলে- সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্খায়।

রুণুর এই পাগলামি আসলে রুণুর বোকামির নামান্তর বলা যায়। সত্যিই তো, বোকা তো বটেই। তবেই তো সমাজের শোষণ-নিপীড়নের পাত্র হতে পারে এই মানুষগুলি- রুণু যার প্রতিনিধি। অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় চিন্তায় আকুল হলেই রুণু এই দোলাচলতায় মানসিক অপ্রকৃতিস্থ হল যে, সে বাবার মত ছাপোষা মধ্যবিত্ত জীবনই যাপন করবে, নাকি প্রেসিডেন্টের মতানুসারে সামাজিক বৈপ্লবিক স্তরের পরিবর্তনের দিকে অগ্রসর হবে। তাই সে শেষদৃশ্যে ছাদ থেকে ওড়ার চেষ্টা করেছে। সমাজ পরিবর্তনের ধারণায় রুণুর পদ্ধতিটাই আসলে ভুল ছিল। তারই ফলাফল রুণুর মানসিক ভারসাম্যহীনতা- mentally challenged রুণু।

বছর তিরিশের রুণুর সুদীর্ঘ আড়াই মাস স্নান না করার ফলে শরীরে জমে ওঠা একরাশ চুল-দাড়ি, বড় বড় নখের বুকের ভেতরে জমে থাকা মাটি, ঘামের চাপা গন্ধ- সবই যেন স্বাধীনতালব্ধ তিনদশকের যুবক স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীন বাংলায় যৌবনের ছবি-গ্লানি-ক্লেদ-আত্মপরাভবের যন্ত্রণা।তাই বাইরের জগতে মার্জিত রুণুর কথাবার্তায় চেতনায় অতীতটা

মূল্যবোধহীন। যে ছেলে কোনোদিন কলেজে কমনরুমে আড্ডা দেয়নি, সেই ছেলেই গোপনদলের সদস্য হল। যে ছেলের মানসজগতের সঙ্গী ছিল মা-বোন- মামার বাড়ির অনুষঙ্গ-দাদু-দিদিমা-বিবাহিত মাসিদের বাড়ি-তাদের পরিবার- পরিজন সেই ছেলেই কিভাবে মানসিক বিকৃতিতে হয়ে উঠল পরিবারবিরোধী। আজ সেই রুণুই আর নিজের অসুস্থ বোনের দায়িত্ব নিতে চায় না। সে রুণুর সখ ছিল বাড়ির সামনের বাগান করা- সেই রুণু আজ নিজের শরীরের যত্নটুকু নেয় না-চুল-দাড়ি-নখ-আগাছার মত বেড়ে চলতে থাকে, কোনো পারিপাট্যের সুকোমল স্পর্শ নেই। কারণ রুণু আজ আর ব্যক্তিক পরিসরে বিরাজ করে না। রুণু চিন্তাভাবনা প্রসারিত নৈর্ব্যক্তিক স্তরে। রুণুর বাবা-মা রুণুর শরীর পরিচ্ছন্ন করার কথা বলে- শরীরের মনের অসুখ সারাবার জন্য ডাক্তার গাঙ্গুলীর শরণাপন্ন হয়েছেন; কিন্তু রুণু তো সমাজের অসুখ সারাবার কথা ভাবে, সমাজের আর্বজনা ক্লিশতার পরিচ্ছন্নতার কথা বলে- রুণু সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখে।

রুণুর হ্যালুশিনেশনের মরা শুকনো শুকনো গাছটা সমাজের প্রতীক আর তার কঙ্কাল শাখা হল সমাজের মধ্যে চলা বিভিন্ন ইজম। রণু দেখতে পায় এক অরন্তুদ সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে সমাজ-সামনে সমূহ বিপদ। এর স্বরূপসহ কালো কাকটা তার বিশাল ডানা দুটো প্রসারিত করে বসে আছে। রুণুর ভাষায় ‘ঝিম কালো’। আসাধারণ আলংকারিক প্রয়োগনৈপুণ্য। প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রানুযায়ী কালো অশুভ দ্যোতক। ‘ভয়ানক’ রস ,যার স্থায়ি ভাব ভয়, তার বর্ণ কালো। আলংকারিক বিচারে এর দেবতা-কাল; বিভাব- বিকৃত স্বর, ভূত-পিশাচে দেখা, শেয়াল-পেঁচা ইত্যাদি দেখা, শূন্যগৃহ, অরণ্যপ্রবেশ, স্বজনের বধ-বন্ধন দেখা-শোনা বা স্মরণ করা, গুরু বা রাজার প্রতি অপরাধ করা প্রভৃতি; অনুভাব-হাত-পা কাঁপা, চোখ ঘোরা, রোমাঞ্চ, বিবর্ণ মুখ, স্বরভঙ্গ, ঘাম, চিৎকার, জিভ টাটা ইত্যাদি; আর ব্যভিচারি- বেপথু, স্বরভেদ, রোমাঞ্চ, স্তম্ভ, মরণ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, এছাড়াও মোহ, দৈন্য, আবেগ, চপলতা, জড়তা, ত্রাস, মূর্ছা ইত্যাদি। লক্ষ্যণীয় রুণুর দেখা দাঁড়কাকটাও বড় বড় গোল গোল চোখ চারিদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি যেন সন্ধান করতে থাকে। দাঁড়কাকটা তার ইস্পাতের ফলার মত তীক্ষ্ণ রোদে ঝকঝক করা ঝলসানো উদ্দীপ্ত অস্ত্রের ফলার মত চঞ্চু দিয়ে চারিদিকে ঘাড় ঘোরাচ্ছে। রুণুর চেতনায় দাঁড়কাকটা তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে লেগে থাকা রক্তের দাগটা এখনি সদ্য ইঁদুরকে মেরে নাড়িভুঁড়ি খাবার চিহ্ন। আর ‘ইঁদুর’ তো মানবচেতনার অবচেতনের প্রতিভূ। এবার দাঁড়কাকটা খুঁজছে শিশুদের যকৃৎ। যকৃৎ মানেই মূল পরিপাকতন্ত্রের কাঠামো। অর্থাৎ সমাজের শৈশব মূল আভ্যন্তরীণ কাঠামোগত গঠনগত দিক থেকে ধ্বংসের মুখে আপতিত হচ্ছে। দাঁড়কাকটার কালো রং সমাজের পরিকাঠামোগত ঘূণপোকার আক্রমণের যে ঝিম ধরাচ্ছে তার ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ। ঝিম ধরা সমাজ বলেই রুণুর চেতনায় সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত বিকেলের রোদও নরম বা মিঠে নয়- ঝিমানো রোদ। শেষাবধি তীক্ষ্ণ স্টীলের চঞ্চুধারী ঝিমকালো

বিকট বীভৎস দাঁড়কাক রুণু চেতনায় ধ্বংসের বার্তাবাহী থেকে নিজেই ধ্বংসপথে অগ্রসরমানতায় উদ্বর্তিত শিল্পিত ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হয়।

রঞ্জনা (স্টীলের চঞ্চু : সাধন চট্টোপাধ্যায়)

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'স্টীলের চঞ্চু' গল্পে ভূপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুতুল চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যবিত্ত দাম্পত্যের দুই সন্তান- বড় ছেলে রুণু এবং ছোট কন্যা রঞ্জনা। দুজনেই মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ। রুণু যেখানে অতি চিন্তাশীল, রঞ্জনা সেখানে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। রঞ্জনা বা রুণু দুজনেই আসলে উত্তাল আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিপর্যস্ততার মাঝে প্রজন্মগত ব্যবধানের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্তদের প্রতিনিধি। রঞ্জনার জড়বুদ্ধিত্ব আসলে ভবিষ্য সমাজের বুদ্ধির জড়ত্ব। এরা নতুন কিছু ভাবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সমাজ বৈকল্যে।

রঞ্জনা চিররুগ্না। ভগবান বুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রকৃতিস্থতার ক্ষেত্রে অমনোযোগী হলেও রঞ্জনাকে ভগবান রূপ দিয়েছেন প্রচুর। মা পুতুলও অপূর্ব সুন্দরী। সেইরূপই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে রঞ্জনা। তাই বিয়ের বাজারে এই অতুলনীয় রূপরাজির সম্ভারেই তার বাবা ভূপতিবাবুর পক্ষে রঞ্জনাকে পাত্রস্থ করা খুব একটা কষ্টকর হত না। কিন্তু বাবার মন। তাই মেয়ের প্রাণসংশয়ের আশঙ্কায় পিতৃহৃদয় সেই পথে অগ্রসর হয়নি। পুত্র রুণুর উপরও কন্যার দায়িত্বভার অর্পণ করার কথা ভাবেননি। বরং নিজের অবসরকালীন প্রাপ্ত নগদ টাকার একটা অংশ কন্যার ভবিষ্যতের জন্য ফিক্সড করার পরিকল্পনা নিয়েছেন যাতে একটা পেট কোনোরকমে চলে যায়।

রঞ্জনা এবং তার দাদা রুণু পরিবারের দুই সন্তানই মানসিকভাবে অসুস্থ। কিন্তু রণুর অসুস্থতার প্রকাশ ধ্বংসাত্মক-অশান্ত-উত্তাল হলেও রঞ্জনা একেবারেই তার বিপরীত। যে এতটাই জড়ভরত যে প্রচন্ড শান্ততা তার চরিত্রের মূল ভিত্তিস্তর। রুণুর প্রচন্ড রাগ যখন পিতার উপর বর্ষিত হয় তখন রঞ্জনার সহজ শান্ত মুখটাই পারে রুণুকে ঠান্ডা করতে। রুণু নিজে বলেছে সে রঞ্জনার শান্ত মুখটাকে ভয় পায়। সে রুণুকে রাগের মাথায় বাড়ির সবাই ভয় পায় সেই রুণু রঞ্জনার শান্তমুখটাকে ভয় পায়।

আসলে রঞ্জনা আর রুণু একই সময়ের সন্তান-সহোদর-সহোদরা। রুণুর ক্ষোভ তার অতীতের প্রতি। কিন্তু বর্তমান তো রুণুর চক্ষুশূল নয়। রঞ্জনাও মানসিকভাবে অসুস্থ। যদি সে সম্পূর্ণ সুস্থ হত তাহলে বলা যায় না রুণুর আচরণ তার প্রতি কিরূপ হোতো। রঞ্জনার প্রতি বাবার স্নেহ-ভালোবাসা মায়ের উদাসীনতার তুলনায় অনেকটাই সহৃদয়। সেখানে ইডিপাস কমপ্লেক্স আনুযায়ী অসুস্থ রুণুর প্রতি মাই ওষুধ এগিয়ে দেয় আর বাবার কাছে রুণুর আচরণ সহ্যাতীত হয়ে উঠেছে ক্রমান্বয়ে। রঞ্জনা একই সময়ের প্রতিনিধি হয়েও রঞ্জনার বহিস্ফোট শান্ত-সমাহিত। কারণ হয়ত সে

মেয়ে। সেই সময়কাল নারীর জন্য নিরাপদ সম্পূর্ণরূপে ছিল না। যদিও অনেক মহিলাই তখন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রুণু এবং রঞ্জনা চরিত্রের বৈপরীত্য contrast- ই চরিত্রের রং উজ্জ্বল করেছে।

কথাশেষ

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষধাপে ১৮৯৫-এ (শ্রাবণ, ১৩০২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে মেহের আলি পাগল। মানুষের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকা রূপজ তৃষ্ণার প্রতি মোহ কি ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনতে পারে তার উদাহরণ বলা যায় মেহের আলি। মেহের আলি সেই ভ্রম থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, তাই সে পাগল হয়ে গেছিল, যদি না বেরোতে পারত, তাহলে প্রাণই হারাত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যতার প্রবল সোচ্চার 'স্ত্রীরপত্র' (১৯১৪) গল্পের পার্শ্বচরিত্র বিন্দুর শাশুড়ী এবং স্বামীকে পাগল দেখানো হয়েছে। ছেলেটির পাগলামির কথা আর পাঁচজন জানতে পারে, তার অস্বাভাবিক আচার-আচরণে। কিন্তু বিন্দুর শাশুড়ীর হিপোক্রিট মানসিকতা বিন্দুর মত অতি সাধারণ নরম মনের মেয়েদের বাধ্য করায় মরে বাঁচতে। এই চরিত্রদুটি মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সমাজ পরিসরে নারীর অবস্থান সুচিহ্নিত করেছেন। একদিকে মৃণাল, যে নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের কথা বলছে, আর একদিকে বিন্দুর শাশুড়ীর মত মানুষ, যাদের দেখে বলা যায় মেয়েরাই মেয়েদের সবথেকে বড় শত্রু বা উন্নতির অন্তরায়, আর এই দুই-এর মাঝে অসহায় বিন্দু এবং পাগল ছেলের সঙ্গে বিন্দুর বিবাহ- এ শুধুমাত্র সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতার ফল নয়, নারীদেরও ভূমিকা এই কুপ্রথার সমর্থনে এবং ক্রমান্বয়তার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রাক্কালের ফ্রয়েড এবং মার্ক্স -এর অনুগামী কল্লোলীয়ান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে উঠে এসেছে অনেকগুলি চরিত্র, যাদের আমরা মানসিক প্রতিবন্ধীর পর্যায়ে ফেলতে পারি। অভিসন্দর্ভে নির্বাচিত 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) উপন্যাসে এমনই দুটি চরিত্র হল যামিনী কবিরাজ এবং পাগলাদিদি। এই দম্পতির মধ্যে দ্বৈত-সত্তা সর্বদাই পরিস্ফূটিত হয়েছে। একদিকে যাদব-পন্ডিত মৃত্যুভয়হীন, অথচ অন্ধকারে সাপের ভয়ে রাস্তায় লাঠি ঠুকে ঠুকে চলে, অপরদিকে তার স্ত্রী পাগলাটে স্বভাবের জন্য সবার কাছে পাগলাদিদি নামে পরিচিত হলেও তার ঘর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি করে গুছানো। মানবমনস্তত্ত্বের গহনতার সন্ধানকারী উপন্যাসে মানিক চরিত্রদুটিকে মানবমনের সতত দোলাচলতার প্রতীক হিসাবে অঙ্কন করলেন। যাদব পন্ডিত চরিত্রটি

উপন্যাসে মানিকের আরেকটি উদ্দেশ্যসিদ্ধি করেছে, সেটি হল শশীকে গ্রামে আটকে রাখল সূর্যবিজ্ঞানে বিশ্বাসী যাদব পন্ডিত শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত সম্পত্তি গ্রামে হাসপাতাল তৈরির জন্য শশীকে দিয়ে গিয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' (১৯৩৯) গল্পে ভুবন এবং ভুবনের পিতার মানসিক স্থিতিশীলতা ছিল না। বিশেষত ভুবনকে বলা যায় অটিজম-এর লক্ষণাক্রান্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী 'তারপর?' গল্পের হাবো-ও অটিজমের লক্ষণাক্রান্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভুবন এবং হাবো দুই চরিত্র সময়ান্তরে উপস্থাপিত করলেন মানসিকভাবে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ এবং তরুণী হিসাবে। তৎকালীন সময়কালের ভবিষ্যতের বৌদ্ধিক অস্থিতিশীলতার স্মারক চরিত্রদুটি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' গল্পের চারুর স্বামী অর্থাৎ ভুবনের বাবারও মানসিক স্থিতিশীলতার অভাব দেখানো হয়েছে। তাই চারু তার বুদ্ধিসংক্রান্ত বিকাশ না হওয়া ছেলে ভুবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত ছিল। মানিক ভুবন চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের এক বিশেষ ইতিবাচক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ভুবনের মা চারু জানে চিরদিন চারু তার বুদ্ধিহীন সন্তান ভুবনকে আগলে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। তাই সে মাতৃহীন পরিবেশে ভুবনের মানিয়ে নেবার ক্ষমতা মক্স করানোর প্রচেষ্টায় গৃহপরিচারিকাদের তত্ত্বাবধানে ভুবনকে রেখে কাশী চলে যায়। ঘটনাক্রমে চারুর মৃত্যুতে ভুবনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল অনাত্মীয় বনমালী। বনমালী ভুবনের বুদ্ধিসংক্রান্ত জড়তা কাটানোর জন্য অনেক রকম প্রচেষ্টা করেছিল, নিজের সাথে করে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরত, স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। বনমালীর ধারণা ছিল, ভুবনের মার যথাযথ guidance-এর অভাবে ভুবনের বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। বনমালীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ভুবন বনমালীর অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে অন্য সবাই ভুলে গেলেও নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথ ওষুধ খাওয়ায়। অর্থাৎ মানিক এখানে দেখালেন বুদ্ধিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর প্রতি সমাজের ক্ষমাসুন্দর ইতিবাচকদৃষ্টি ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধকতা আটকাতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী 'তারপর?' গল্পের হাবো-র জীবনে এ রকম কোনো সহৃদয়বান অভিভাবক-বন্ধু-শুভাকাঙ্খী না থাকায় তাকে আগুনে পুড়ে মরতে হয়েছিল। তবে সমাজে বনমালীর মত মানুষের পাশাপাশি পরীর মত কিছু মানুষও ছিল, যে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মায়ের মৃত্যুর পর ভুবনকে ট্রেনে চাপিয়ে অজানা ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঠেলে দেয়। সময়কালীন প্রতিবন্ধকতা দেখানো যেহেতু এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মুখ্য অভিমুখ, তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাকালের জটার জট' ছোটগল্পে সুচিত্রার অবদমিত যৌন আকাঙ্খার বিকৃত প্রকাশের পাশাপাশি সুচিত্রা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা, তার অস্তিত্ব রক্ষার জীবন সংগ্রাম মূল বিশ্লেষ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন সময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মহাকালের জটার জট’ গল্পের সুচিত্রা মানসিক প্রতিবন্ধী। তার মানসিক প্রতিবন্ধকতা বিপর্যস্ত সময়ের দর্পণ। মানুষের মধ্যে সম্পর্কহীনতা, একান্নবর্তী পরিবারের অন্তরের কোন্দল, দায়িত্ব এড়ানোর জ্বলন্ত নিদর্শন সুচিত্রা। সুচিত্রা আসলে সেই সময়কালের মানসিক বিকৃতি, অবদমিত যৌনবাসনার বিকৃত প্রকাশের পরিস্ফূটন। সুচিত্রা আসলে এই একটা বৃহৎ নারীগোষ্ঠীর ‘সু’ চিত্রিত রূপ- সু-চিত্রা।

বিংশ শতাব্দীর চারের দশকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ছোটগল্প ‘তিরোলের বালা’র পূর্ণিমা পাগল। বিভূতিভূষণ মানেই বলা যায়, প্রকৃতির কোলে ফিরে এসে প্রশান্তি সন্ধান। উন্মাদিনী পূর্ণিমাকে আনা হচ্ছে আরামবাগের নিকটবর্তী তিরোলে দীননাথ চক্রবর্তীর বাড়ির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা কালীর মন্ত্রপূত বালা ধারণ করানোর জন্য। এখানে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমত: বিশ শতাব্দী যখন আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকরণে ও অনুসরণে যন্ত্রনির্ভর হয়ে উঠেছে তখন বিভূতিভূষণ ফিরে দেখিয়েছেন অতিপ্রাকৃতকে। কথিত আছে, এই তিরোলের মা কালীর আশীবাদক বালা মা সারদার দুই আত্মীয়কে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিয়েছিল। চরম বিশ্বাসহীনতার সময়ে বিভূতিভূষণের পুনরায় বিশ্বাসে আস্থা ফেরানো অবশ্যই ভিন্নতর এক মাত্রা যোগ করে। দ্বিতীয়ত: বলা যায় সম্পর্কহীনতার বিপর্যস্ত সময়ে পূর্ণিমার দাদার পাগল বোনের দায়িত্বগ্রহণ পারিবারিক সম্পর্কের উষ্ণতাকে আরোও একবার জাগরিত করে। কথকেরও পূর্ণিমার দাদা হয়ে ওঠা বাঙালির রাষ্ট্রিক ভাঙনের সময়ও পুরাতন সংস্কার ঐতিহ্যকে মনে করায়। পথে আতিথ্যগ্রহণ এবং পূর্ণিমার ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আগের রূপ অতিথি-বাৎসল্যের কথা স্মরণ করায়। বিভূতিভূষণ অস্তিরতার সময়-পরিবেশে সম্পর্ক-মানবিকতা- মূল্যবোধ-সমস্ত কিছুর ভাঙনের সময়ে পাগলিনী পূর্ণিমার মধ্যে ঐতিহ্যের প্রশান্তি স্থাপন করলেন প্রকৃতির ঐকলগ্নতায়। পূর্ণিমার মানসিক বৈকল্য প্রকৃতির (অতিপ্রাকৃত) সংস্পর্শে সেরে উঠতে পারত, এরকম এক সম্ভাবনার মধ্যে আসলে বিভূতিভূষণ মানব এবং প্রকৃতির আদিমতম সম্পর্ককে জানান দিলেন।

স্বাধীনতা সমকালীন সময়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ উপন্যাসের পাগল এক প্রচন্ড ইতিবাচক শক্তির প্রতীক। সমস্ত কাজে তার উৎসাহ এবং উদ্দীপনা অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে পরিবেশকে হালকা এবং গতিশীল করে রাখে পাগল। আপনভোলা মানুষটি সমাজের চোখে ‘পাগল’ বলে আখ্যায়িত হলেও প্রখর বাস্তব বুদ্ধিতে তারাশঙ্করের লেখনীতে পাগল শুধু লোক-মনোরঞ্জক নয়, হয়ে উঠেছে লোকদার্শনিক।

‘মহাকালের জটার জট’তে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উন্মাদরোগগ্রস্ত সুচিত্রার বিবস্ত্রতার যে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষপাদে, গৌরকিশোর ঘোষ তার দুই দশক

পরে ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ উপন্যাসে উন্মাদরোগগ্রস্ত ছোটকাকীমাকেও একই পরিস্থিতিতে দেখালেন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রেক্ষিতে। সেই সময়কালে অসুস্থ স্ত্রীর পাশে থেকে আব্রু রক্ষার বদলে তার স্বামী শীতলের অমানবিক অত্যাচার পুরুষের হৃদয়হীনতার মধ্যেও আসলে সমাজের ব্যঙ্গ-হাসির কাছে মেরুদন্ডহীনতার, কাপুরুষতারই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ চল্লিশের দশকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তিরোলের বালা’ গল্পে পূর্ণিমার উন্মাদগ্রস্ততায় তার দাদা প্রাণ হারিয়েছিল। ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ উপন্যাসে শীতলের স্ত্রীর উন্মাদগ্রস্ততা রক্তপাত না ঘটালেও, স্বামীর দ্বারা রক্তাক্ত হতে হয়েছিল উন্মাদরোগগ্রস্ত মানুষটিকে। পরিবারের চোখে তার পরিচয় অসুস্থ রোগী তথা মানুষ নয়, জন্তু-জানোয়ার, এই এক ভয়ঙ্কর অমানবিকতার ছবি জীবন্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ঔপন্যাসিক গৌরকিশোর ঘোষ।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য হল ‘দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।’[১৯৬] তাই আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময়ে যে শক, হুণ, পাঠান, মোঘলের আমাদের দেশে বহির্শক্তি হিসাবে এসেছিল, তারাও একসময়ে ভারতবর্ষের ‘একদেহে হল লীন’[১৯৭]। সেই ধারাতেই ইংরেজও এসেছিল আমাদের দেশে। কিন্তু বণিকের মানদন্ড রাত পোহাতেই রাজদন্ডে পরিণত হয়েছিল। রাজশাসনকার্যে ক্ষমতাসীন ব্রিটিশ চিরকালই ভারতবর্ষকে তাদের উপনিবেশ হিসাবেই দেখে আসে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় কত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পেরিয়ে ভারতবর্ষ ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়। ভারত স্বাধীন তো হল, কিন্তু বিনিময়ে দেশ হল দ্বিখন্ডিত। এই দেশভাগের যন্ত্রণা জীবন্ত হয়ে রয়েছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ (১৯৭১) উপন্যাসে। উপন্যাসটির জ্যাঠামশাই মণীন্দ্রনাথ ভৌমিক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। একজন সাধারণ মানুষ এবং মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ-দুজনের উপর দেশভাগের যন্ত্রণা কিভাবে প্রভাব ফেলে তার প্রতিচ্ছবি রয়েছে এখানে। মণীন্দ্রনাথ, যার বাস্তব বোধবুদ্ধি লুপ্তপ্রায় তার উপরও দেশভাগের যন্ত্রণার চিত্র অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে স্পষ্ট।

স্বাধীনতা পরবর্তী দেশভাগ, দেশভাগের যন্ত্রণা, সাধারণ মানুষের বিপর্যস্ত জীবন, বিশেষত মানসিক প্রতিবন্ধীদের উপর দেশভাগের বিভেদমূলক আইন প্রণয়ন কি ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে তার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে প্রতিবেশী আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য থেকে একটি চরিত্র নির্বাচন করেছি। সাদাত হোসেন মন্টোর উর্দু ছোটগল্প ‘টোবা টেক সিং’ (১৯৫৫)-এর কেন্দ্রিয় চরিত্র বিশন সিং। স্বাধীনতার পর দেশভাগ একজন মানসিক ভারসাম্যহীন তথা সমাজের চোখে পাগলের মধ্যেও যে ভয়ঙ্কর আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে তা দেখালেন লেখক।

সমকালীন পরিস্থিতি বিষয় অনুযায়ী চরিত্রটি প্রাসঙ্গিক বলেই অ-বাংলা সাহিত্য থেকেও চরিত্রটি নির্বাচন করা হল।

ঘাটবাবুর ভেতরে হারিয়ে যাওয়া মাধব গাঙ্গুলির বেদনার্ত মানবসত্ত্বাটি পরিচয় রয়েছে সুবোধ ঘোষের শ্মশানচাঁপা গল্পে। মানসিক প্রতিবন্ধী চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে দুই প্রান্তবাসী মানুষ উঠে এসেছে। এরা ডোম। চরিত্র দুটি হল মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৫) উপন্যাসের শিবন মেথর এবং প্রতিবেশী আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের তামিল লেখক জয়কান্তন দন্ডপাণির ছোটগল্প 'কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা'-র ক্ষ্যাপা।দুটি চরিত্রই তার প্রিয়-বিয়োগ ব্যথায় পাগল হয়ে গেছে। শিবনের প্রিয় মানুষটি হলেন তাদের বীরনেতা 'ধরতি আবা' বীরসা মুন্ড এবং ক্ষ্যাপার প্রিয়জন ছিল তার একমাত্র নাবালক পুত্র ইরুল। দুই চরিত্রের প্রলাপে লেখকদ্বয় বিশেষ দুই সত্য উচ্চারন করিয়েছিলেন। মহাশ্বেতার প্রতিষ্ঠিত সেই সত্য হল 'উলগুলানের শেষ নাই।''ভগবানের মরণ নাই'। আর জয়কান্তন দন্ডপাণি মানুষের নশ্বর জীবনে মৃত্যুই একমাত্র সত্য-তা ম্যাজিক রিয়ালিজমে দেখালেন।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'স্টীলের চঞ্চু' গল্পে দুই ভাইবোন রুণু ও রঞ্জনা মানসিক প্রতিবন্ধী। এদের মধ্যে রঞ্জনাকে বলা যায় অটিজম লক্ষণাক্রান্ত। রুণুও পরিবেশ পরিস্থিতির চাপ সহ্য করতে না পেরে অসংলগ্ন আচরণ করেছে।সন্তানের মধ্যে মানুষের স্বপ্ন বপন করা আর সেই স্বপ্নপূরণের চাহিদায় সন্তানের প্রতি প্রত্যাশার প্রচুর চাপ স্বাভাবিক বাৎসল্যের মায়া-মমতা-স্নেহ-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা সব কিছু সুকোমল অনুভূতিগুলির বিনাশ করে প্রজন্মগত দূরত্ব-ব্যবধান-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, তাই-ই সাধন চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন চরিত্র দুটির মাধ্যমে।

ভিন্নতর প্রান্তিক

এই অধ্যায়ে যে চরিত্রগুলির কথা আসবে, তারা আপাতদৃষ্টিতে প্রতিবন্ধী বলে মনে হবে না। দৃষ্টি-শ্রবণ-বচন-হস্ত-পদ এ সমস্ত শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা সবার সামনে প্রত্যক্ষগোচর থাকে। এই অধ্যায়ে সেই চরিত্রের কথাই উঠে আসবে যারা একটু অন্যরকমভাবে প্রান্তিক মানুষ। লিঙ্গগত প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন মানুষদের নিয়ে আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়ে। এই পর্যায়ের মানুষরাও সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে ঠিকঠাক মিশতে পারেন না। সমাজও এদের আলাদা চোখে দেখে। এ অধ্যায়ের আলোচিত চরিত্ররা হল হিজড়ে, নপুংসক, খোজা। এদের সাথে আরোও কিছু চরিত্রের উল্লেখ করা যায়- সমকামী, উভয়কামী, রূপান্তরকামী, রূপান্তরিত। এর আগে পর্যন্ত যেসব মানুষদের নিয়ে আলোচনা করা হল, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে সমস্যা হয়ে থাকে, কিন্তু এই অধ্যায়ের আলোচ্য মানুষদের দৈনন্দিন জীবনচর্যার সমস্যা এবং তার থেকেও বড় কথা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগত এবং মানসিক যন্ত্রণা জীবনযাত্রায় কি প্রভাব ফেলে, তার প্রতিফলন সাহিত্যে কিরূপ তা আলোচনা করা হল। গবেষণা-অভিসন্দর্ভে প্রতিবন্ধী মানুষদের নিয়ে যেসব আইনের অনুশাসন রয়েছে, তাদের কয়েকটি উল্লিখিত হয়েছে। এই অনুশাসনগুলিতে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে লিঙ্গগত-প্রতিবন্ধকতার উল্লেখও আছে। সেই আইনের যুগের সমাজের চোখে যারা নপুংসক, বৃহন্নলা ইত্যাদি লিঙ্গগত প্রতিবন্ধী বলে পরিচিত ছিল, তারাই একবিংশ শতাব্দীতে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হিসাবে প্রতিবন্ধকতাহীন স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে-আইনের অনুশাসন দ্বারা সে স্বীকৃতি আরও দৃঢ় হয়েছে। সময়প্রেক্ষিতে এই বিবর্তনের ধারা দেখানোই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

খোজা

উইকিপিডিয়া অনুসারে, জননাঙ্গ অপসারণকৃত নপুংসক পুরুষ খোজা নামে পরিচিত। 'খোজা' শব্দটি গ্রীকমূলজাত। Eunoukhos শব্দ থেকে eunuch শব্দটির উৎপত্তি। সাধারণত: শুক্রাশয় আবার কখনোও শিশ্ন এবং শুক্রাশয় দুটিই কর্তন করে দেওয়া হয়। কয়েক হাজার বছরেরও প্রাচীন এই প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত ছিল। এই খোজারা গৃহকর্ম, গায়ক, ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ, সরকারী দাপ্তরিক, সেনাপ্রধান প্রভৃতি বিভিন্নরকম কাজে দায়িত্বশীল পদে বহাল থাকলেও এদের মূল পরিচয়, এরা হারেমের রক্ষাকর্তা। অতি অল্পবয়সে কিছু বোঝার আগেই শিশুদের খোজাকরণ করা হত। খ্রীষ্টপূর্ব ২১ শতকের সুমেরিয় ইতিহাসেও খোজার অস্তিত্ব রয়েছে। খোজারা রাজাদের অত্যন্ত কাছের এবং বিশ্বস্ত মানুষ হতেন এই কারণেই কারণ তাদের দ্বারাই রাজার হারেমের সমস্ত নারীর গর্ভস্থ সন্তানের একচ্ছত্র পিতৃত্ব নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং নিশ্চিত হত রাজার কাছে। খোজারা নারীদের রক্ষা করতেন এবং কোনোভাবেই ভোগ করতে পারতেন না।[১৯৮]

কাফ্রি খোজা (ক্ষুধিত পাষাণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' (১৩০২, শ্রাবণ ১৮৯৫, সাধনা) গল্পে দেখি প্রাসাদের সুন্দরীদের রক্ষাকার্যে নিযুক্ত কাফ্রি খোজা।

> ''আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজ-পরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া দুলিতেছে।''[১৯৯]

বাদশাহী অন্তঃপুরের রক্ষণাবেক্ষণে খোজা প্রহরীর নিয়োগ চিরকালই হয়ে আসছে। সেক্ষেত্রে রাজা-বাদশাহর কাম্য রমণীটির যথাযথ নিরাপত্তা যেমন রক্ষিত হয়, তেমনি প্রহরীটি নপুংসক হওয়ায় অন্তঃপুরচারিণীদের সঙ্গে যথেচ্ছ যৌনব্যভিচারের কোনো সম্ভাবনাও তৈরী হয় না। কিন্তু গল্পে বর্ণিত খোজা প্রহরীর body language -এ রয়েছে এক ঔদ্ধত্য পৌরুষ ভঙ্গী। তার উপর তার কোলের উপর থাকা খোলা তলোয়ার আগন্তুককে যেন challenge ছুঁড়ে দেয়।

এই কাফ্রি খোজার দেহভঙ্গী বর্ণনার পাশাপাশি অন্তরালবর্তিনী রমণীটির পদযুগলের বর্ণনাও চমৎকার বৈপরীত্য সৃষ্টি করে-

> ''কেবল জাফরান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির-চটি-পরা দুইখানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ গোলাপি মখমল-আসনের উপর অলসভাবে স্থাপিত....''[২০০]

বর্ণাঢ্য Foot-fetishism এবং বিকৃত যৌনতার সমান্তরালতা চিত্রিত হয়েছে বর্ণনানৈপুণ্যে।

কাফ্রি খোজা নিদ্রাচ্ছন্ন হলেও সে যে ভীষণ- তাই দূতীর পরিচিত পদধ্বনিতে তার নিদ্রাভঙ্গ না হলেও আগন্তুকের অপরিচিত পদধ্বনিতে সে সজাগ হয়ে উঠল।

''আমি কম্পিতবক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম, অমনি সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল- তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজেয় শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।''[২০১]

এই খোজাদের কোনো মন থাকতে পারে না। তারা যখের ধনের মতই বাদশাহদের ধনসম্পদ (ক্রীতদাসী বাদশাহদের কাছে ধনসম্পদ ছাড়া আর কিছু না । যদিও কারো সাথে সত্যিই মন দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হত, কিন্তু সে উদাহরণ বড়ই কম) রক্ষা করে মাত্র। খোজাদের কোনো অধিকার স্থাপিত হতে পারত না অন্তঃপুরিকাদের প্রতি। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পেও রবীন্দ্রনাথ খোজা সম্পর্কে আর কিছু না বলে তাদের প্রতি সামাজিক অবহেলার প্রতিই যেন ইঙ্গিত করলেন।

খোজার তলোয়ার মাটিতে পড়ে যাবার শব্দ একদিনে প্রহরীর সদাজাগ্রত আনুগত্যের যেমন প্রকাশক ঠিক আবার তেমনই এই তলোয়ার মাটিতে পড়ে যাবার শব্দের সঙ্গে একীকৃত হয়ে গেল বাস্তবের মেহের আলির চিৎকারে কথকের ঘুমভাঙা। মেহের আলির সতর্কবার্তা আর তলোয়ারের উদ্ধত সতর্কীকরণ মুকুর-ধর্মে বিম্বিত হল। তলোয়ারের খোজার দুই পায়ের মাঝে সশব্দে পতন এবং মেহের আলির বিকট চিৎকার কি কোথাও বলছে কাফ্রি খোজার 'ভীষণ'তার কথা? নিষিদ্ধ অভিসারের ভীষণ মারাত্মক পরিণতি emasculation-এর কথাই কি বলছে না কফ্রি খোজা আর তার প্রসারিত দুই পায়ের ফাঁকে সশব্দে পড়ে যাওয়া খাপচ্ছিন্ন তলোয়ার এবং মেহের আলির বীভৎস চিৎকার।

শ্রাবণ ১৩০২ (জুলাই ১৮৯৫) সাধনা পত্রিকায় 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছোটগল্পটি প্রকাশিত হবার দশমাস পূর্বে ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের (পত্র সংখ্যা ১১৯, ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) কিছু অংশে দেখি রবীন্দ্রনাথ লিখছেন-

''কেন জানি নে মনে হয়, এই রকম সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ, সেই পারস্য এবং আরব্যদেশ, দামাস্ক , সমরকন্দ , বুখারা -আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, সিরাজের মদ- মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস- নগরের মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ বাজারের পথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড়-পরা দোকানী খরমুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে- পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাব বিছানা-জরির চটি, ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলিপরা আমিনা জোবেদি সুফি- পাশে

পায়ের কাছে কুন্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো-কাপড়-পরা কালো হাব্‌শী পাহারা দিচ্ছে-এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশা-আকাঙ্খা নিয়ে রাত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরী হচ্ছে।''[২০২]

জমিদারীর কাজে সাজাদপুরে থাকাকালীন অনেক নির্জন দুপুর কবির কল্পনাকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তর্লীন করে তুলত। কল্পনা জালে ভেসে আসত বিভিন্ন চরিত্র, ছিন্নপত্রের সেই জমকালো পোষাক পরিহিত ভীষণ দর্শন হাবশী পাহারাদার খোলা তলোয়ার হাতে রূপায়িত হল ক্ষুধিত পাষাণের কাফ্রি খোজা চরিত্রে-

''শাহেনশা বাদশাহ শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটায়িতেছে। বাহিরের দ্বারে যমদূতের মত হাবশি দেবদূতের মতো সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া।''[২০৩]

এই পোষাকে বিরোধাভাস অলঙ্কারের প্রয়োগ দেবদূতের সাজে সজ্জিত যমদূত কাফ্রি খোজার জীবনের নির্মম পরিহাসের দিকেই ইঙ্গিত করছে। কাফ্রি খোজা বাদশাহের রাজপ্রাসাদের রয়েছে। কোনো কিছুর অভাব হয়ত তার নেই। কারণ সে যে রাজার লোক। তার দেখভালের দায়িত্ব স্বয়ং রাজা বাদশাহর। কিন্তু এত অতুল ঐশ্বর্য কাফ্রি খোজার হাতে থাকলেও সে তার রক্ষাকর্তা মাত্র। তাকে বিন্দুমাত্র ভোগ করার এমনকি স্পর্শ করার অধিকারটুকু তার নেই। তার দেবলোকের পোষাক তার বহিরাবরণ মাত্র। আসলে সে যে পরাজিত বিজিত সম্প্রদায়। সাগরমন্থনে উত্থিত অমৃতের অধিকার কেবলমাত্র সুরলোকের- অসুরদের যে তাতে কোনো অধিকার নেই!

অধ্যাপক ড: তপোব্রত ঘোষের 'ক্ষুধিত পাষাণ' আলোচনার একটি অংশ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য-

''সীতা দেবী জানিয়েছেন, 'দাক্ষিণাত্যের যে প্রাসাদটি' দেখে 'ক্ষুধিত পাষাণ' রচিত হয়-সেই প্রাসাদটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে 'অনেক কথা' বলেছিলেন।(সীতা দেবী- পুণ্যস্মৃতি,মৈত্রী,১৯৬৪,পৃ।৩৭) দাক্ষিণাত্যের প্রাসাদ?আমরা ধন্দে পড়ি এই ভেবে যে, আমেদেবাদের শাহিবাগ প্রাসাদ কি পশ্চিম ভারতেই নয়! আর ঠিক তখনই আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করতে হয়, জুনাগড় থেকে নিজামের হাইদ্রাবাদে- অর্থাৎ পশ্চিমভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে-স্থানান্তরিত হয়েই সূচিত হয়েছে 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের মূল কাহিনী। এই স্থানান্তরের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে নামান্তর। শাহিবাগ নয়, দাক্ষিণাত্যের বরীচে অবস্থিত 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের ক্ষুধিত প্রাসাদটির নাম গুলবাগ। অথচ ওই দাক্ষিণাত্যের বরীচেই

যখন আকাশপটে দেখা যায় আরালী ওরফে আরাবল্লী পর্বতমালা, তখন গুজরাটে-দাক্ষিণাত্যে-রাজস্থানে মেলানো ভূগোলের এই স্বচ্ছন্দ বিপর্যাসে ইতিহাসের যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন করতে আর ভরসা হয় না।''[২০৪]

এই আরাবল্লীর আড়ালের করুণ চিত্র দেখালেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। রবীন্দ্রনাথ শাহিবাগের প্রাসাদে ছবি দেখে 'চৈত্রের গান' কবিতায় যে রাজকন্যার কথা লিখেছিলেন, 'ক্ষুধিত পাষাণে' সে রাজকন্যা বা রাজকন্যার সখী না হয়ে হল নিতান্তই এক অতিসামান্যা ইরানী ক্রিতদাসী কন্যা। জ্যোতির্ময়ী দেবী 'আরাবল্লীর আড়ালে' সেই সামান্যা কন্যা ধাপির করুণ মর্মস্পশী জীবনকাহিনি বর্ণনা করলেন।

খুশ্‌নজরজী (আরাবল্লীর আড়ালে : জ্যোতির্ময়ী দেবী)

জ্যোতির্ময়ী দেবী সমকালীন লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে এক স্বতন্ত্রতার ছাপ রেখেছেন। জীবনের বেশ কিছুটা অংশ তিনি রাজস্থানে কাটিয়েছিলেন। তাই তাঁর লেখনীতে নারীদের কথা যেমন ফুটে উঠেছে, তার পাশাপাশি রাজস্থানের কিছু ছবিও ফুটে উঠেছে। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'আরাবল্লীর আড়ালে' গল্পটিতে রাজস্থানের বা ভারতের যে কোনো অঞ্চলেরই মেয়েদের করুণ জীবনচর্যার কাহিনির পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে খোজার জীবনকথা। খুশ্‌নজরজী এক বৃদ্ধ খোজা। সমাজনীতি অনুসারে সুন্দরী ধাপিকে তার বাবা সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় রেখে আসে হুজুরের মনোরঞ্জন করতে। ধাপির পিতার স্থান নিয়েছিল সেই রাজঅন্ত:পুরের সর্দার খোজা খুশ্‌নজরজী।

''ছোট লাল কুর্তা আর লাল চুড়িদার পাজামার ওপর ওড়না পাত্রীদের নির্দিষ্ট পোষাক-পরা ধাপির বালিকা-তনুদেহ ক্রমে ক্রমে অপরূপ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে। মেয়েরা সখীরা দেখে মুগ্ধ হয়। সর্দার খোজা 'খুশ্‌নজরজী'র মনে একটা অপূর্ব স্নেহ আর অদ্ভুত ভয়ভাবনা জাগে তার জন্য। এত রূপ। রানীদের পেশোয়ানদের ঈর্ষাতিক্ত দৃষ্টি অতিক্রম করে যায়নি। সকলের চোখ পড়েছে সেদিকে, কেউ বা মুগ্ধ হয়ে দেখেছে, কত জন বা তিক্ত, কত জন ভীত-শঙ্কিত চোখে দেখে তাকে- পাছে রাজার মুগ্ধ দৃষ্টিও তার ওপর পড়ে কোনও দিন, আর তারা তাদের বহু-মানসমাদৃত স্থানভ্রষ্ট হয়।''[২০৫]

বৃদ্ধ খুশ্‌নজরজীর এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হতে খুব বেশিদিন সময় লাগেনি। একদিন প্রেমরায়ের মহলে জলসা চলাকালীন প্রেমরায়ের পাত্রীদলের মধ্যে সহসাই দেখা যায় ধাপিকে। অবশ্য গ্রাম্য ধাপি নাম ছেড়ে মেয়েটি এখন গোদাবরী বাঈ নাম পেয়েছে। জলসা চলাকালীন তার অসাধারণ সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে,-

''চাঁপাফুলের মত উজ্জ্বল রং, কালো চুলে ঘেরা অপূর্ব সুন্দর মসৃণ পরিচ্ছন্ন কপাল, কালো সফরীনেত্র,

চমৎকার টুকটুকে দুখানি ওষ্ঠাধর সহসা যেন ঝকমক করে উঠল ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয়... ''[২০৬]

এর ফল হল মারাত্মক। প্রেমরায়ের মহলে তার ডাক পড়ে। প্রেমরায় গোদাবরীর উদ্দেশ্যে বলেন,-

''তোমাকে বারবার বলেছি না, তুমি হুজুর সাহেবের জলসায় যাবে না?'.....

'আমি চাই না, তোমাকে হুজুর সাহেব দেখতে পান।'' [২০৭]

এরপরই এল গোদাবরী বাঈ ওরফে ধাপির জন্য সেই ভয়ংকর নিদান, প্রেমরায়ের আদেশ,-

'আচ্ছা আর তোমাকে দেখতে কখনও কেউ পাবে না।'[২০৮]

প্রধান সখী বাড়ারণজীর দিকে চেয়ে বললেন,

'ওকে বাঁদী কুইয়ের একটা ঘরে রাখগে।''[২০৯]

খুশ্‌নজরজীর অভিজ্ঞ নজর বুঝতে পেরেছিল এ অন্ত:পুর সন্দরীদের জন্য বরাদ্দ। দেশ-গ্রাম-গঞ্জ থেকে সন্দরী অল্পবয়স্কা কুমারী মেয়েদের এখানে এনে রাখা হয় রাজার মনোরঞ্জনের জন্য। এই যোগ্য মেয়েদের এখানে নিয়ে আসে মেয়েরাই। কিন্তু অদ্ভুত ভয়ঙ্কর প্রথা এই অন্দরমহলের যে, সুন্দরী মেয়েদের অতিরিক্ত সৌন্দর্য নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনে। মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু। অদ্ভুত জটিল নারী মনস্তত্ত্ব। যে সৌন্দর্যের জন্য এই মহলে আসা সেই সৌন্দর্যের জন্যই জীবন থেকে নির্বাসিত হতে হয়। খুশ্‌নজরজী খোজা। তাই যে এই রমণীদের রক্ষাকর্তা হলেও কোনোদিন কাউকে নিয়ে ঘরবাঁধার স্বপ্ন দেখতে পারেনি। নারী হোক বা পুরুষ যৌবনের ধর্ম অনুসারে ঘর বাঁধার পরই আসে সন্তানকামনা। খুশ্‌নজরজী তাতে অপারগ ছিলেন। খুশ্‌নজরজীর সেই দীর্ঘসুপ্ত স্নেহ বর্ষিত হয়েছিল ধাপির উপর। ধাপি তথা গোদাবরী বাঈ নির্বাসিত হয়ে ফিরে যেতে চেয়েছিল তার মায়ের কাছে। খুশ্‌নজরজী শেষে ধাপিকে নিজের কাছে নিয়ে যাবার অনুমতি আদায় করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে যেদিন সকালে ধাপিকে নিতে আসে, সেদিন এসে দেখে,-

''ধাপির ঘরে কাল আর প্রদীপ জ্বলেনি, যেমন তেমন তেলে ভরা রয়েছে। রুটি পড়ে আছে, শুধু জলের ঘটিটা গড়িয়ে গেছে ঘরের একদিকে।ধাপির আর আর ঘুম ভাঙল না।''[২১০]

ধাপি মারা যায়। খুশ্‌নজরজীর দীর্ঘ সুপ্ত বাসনা অতৃপ্তই রয়ে যায়। ধাপির মৃত্যু আসলে খুশ্‌নজরজী আসন্ন পিতৃত্বের মৃত্যু। খুশ্‌নজরজী প্রবলভাবে চেয়েছিলেন একটি বাচ্চা মেয়েকে সমাজের কুপ্রথার বলি হওয়া থেকে বাঁচাতে, কিন্তু পারেননি। ধাপির জন্মের পর নামকরণ থেকেই বোঝা যায় তার পিতার কাছে কতটা অবাঞ্ছিত ছিল সে, কিন্তু বৃদ্ধ খুশ্‌নজরজীকে বাবা হওয়া থেকে বঞ্চিত করল সমাজের কুপ্রথার শিকার ধাপি।

নপুংসক

উইকিপিডিয়ার মতে যৌনসঙ্গমে অপারগ পুরুষ নপুংসক নামে পরিচিত। এটি একটি জটিল শারীরবৃত্তীয় অক্ষমতা। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারে এর সঙ্গে জড়িত থাকে স্নায়ুতন্ত্র (মস্তিষ্ক এবং শিরদাঁড়া, এগুলির সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুগুলি, এন্ডোক্রিন (হরমোন) ব্যবস্থা এবং কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম (হৃৎপিন্ড)। এর সাথে উচ্চরক্তচাপ, অ্যাথেরোস্কেরোসিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস, স্থূলতা, পারকিনসন্স ব্যাধি, মাল্টিপল স্কেরোসিস, কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, নেশাজাত বস্তুর সেবন, বর্ধিত শুক্রাশয় ও শুক্রথলি, মানসিক চাপ, অস্বাভাবিক থাইরয়েড হরমোন মাত্রা, বর্ধিত প্রোল্যাক্টিন মাত্রা, হাইপোগোনাডিজম এরকম আরোও বেশ কিছু কারণ।[২১১]

নসুরাম-নসুবালা (হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

করালীর পিসতুতো ভাই নসুরাম। সে বিয়ে করে বউ তাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর করালীর স্ত্রীহীন ঘরে বসবাস করেছে। তার সাজপোশাক ছিল মেয়েলি। করালী দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে তার বৌ-এর সাথে ননদ সম্পর্ক পাতাবে এই তার বাসনা। কাহার সমাজ নসুকে এই চরিত্র নিয়ে বিভিন্ন রকম কথা বললে কখনোও সে হয়েছে ক্রুদ্ধ আবার কখনো এক আশ্চর্য ব্রীড়া নসুকে আরক্ত করেছে।

নসু সম্পর্কে তারাশঙ্কর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন।নসুবালার চিত্র তারাশঙ্করের কাছে, চুল বেঁধে নাকছবি

পরিহিতা। উপন্যাসে দেখি নসুর বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রণ বাঁধা। অতি অবশ্যই সে যাবে। স্ত্রী-আচার পালন করবে। অন্যান্য কাজও সে নিজের মত বেছে নেয়। কাউকে বলে দিতে হয় না। এঁটোকাঁটা ফেলা, পাটকাম করা এগুলোও নসুর কাজের মধ্যেই থাকে। তার

> ‘‘পরনে মেয়ের সাজ, নাকে নথ,মাথায় খোপা, গায়ে গয়না,কাঁধে ঝুড়ি। গিয়ে ঝুড়িটি রেখে
>
> প্রণাম করে বলে-এয়োদের মঙ্গল হোক।’’[২১২]

আর যাবার সময় পারিশ্রমিক চেয়ে নিতেও দ্বিধা করে না নসু-

> ‘‘যাবার সময় একখানি শাড়ি লোব,খাবার লোব, গুণগান করে নাচতে নাচতে বাড়ি যাব।’’[২১৩]

আবার বরমশাই-এর কাছে ননদ-পোটারিও দাবী করেছে নসু।কিন্তু তার এই নারীবেশের জন্যই আবার তাকে যখন পাগল ক্ষেপায় তখন কিন্তু নসু তাকে মোটেই প্রশ্রয় দেয় না। বরং গালিগালাজ করতে থাকে সে। এখানেই নসু চরিত্রের মধ্যে এক প্রচন্ড দ্বিমুখীনতা দৃষ্ট হয়।

নসুর কথাবার্তার ভঙ্গি বড়ই বিচিত্র। একবার বলতে শুরু করলে আর যেন থামতেই চাইত না নসুর জবানি। কতকি প্রশ্ন তার। লেখকের খোঁজখবর-তত্ত্বতালাশ করে।নসুর বাচনভঙ্গীই তার চরিত্রের সবথেকে আকর্ষণীয় দিক। নসুবালা হাঁসুলীবাঁকের নারীসমাজের ভাষাভঙ্গী আয়ত্ত করেছে অনায়াস দক্ষতায়। নারীমনস্তত্ত্ব নারীকলহ নসুর কথায় বার বার উঠে এসেছে। নারীসমাজের কলহ তারাশঙ্করের কাছে ছিল অত্যন্ত আর্টিস্টিক একটা ব্যাপার। ঝগড়ার সময় পল্লিনারীরা যে কি অসাধারণ সুন্দর গুছিয়ে গুছিয়ে ছড়া কেটে কেটে অন্যের সর্বনাশ চিন্তা করত, তা সত্যিই খুব interesting।হাঁসুলীবাঁকের অন্যান্য নারীচরিত্র সুচাঁদ, বাসিনী বৌ, নয়ানের মায়ের সেই অসাধারণ কোন্দল ভঙ্গিমা রয়েছে নসুর মধ্যেও। ব্যাপারটি এতটাই সাবলীল যে তা আয়ত্ত করা না সহজাত তা বোঝাই দায়।

চরিত্রটি দ্বিমুখী না দার্ঢ্য তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। একদিকে নসু করালীর প্রথম স্ত্রী অবর্তমানে পাখী-করালীর বিবাহের আগে পর্যন্ত করালীর ঘরনির ভূমিকা পালন করেছে। তখন নসু আর করালী চরিত্রের মধ্যে সমকামিতা বা করালী চরিত্রের heterosexuality প্রতিভাত হলে তাতে কোনো প্রতিবাদ জানায়নি নসু। কিন্তু এই নসুই আবার যখন মিত্রগোপালপুর থেকে ফেরার সময় নাকছবি পরে আসে এবং এই মেয়েলি সজ্জায় সজ্জিত নসুকে বিবাহের কথা বলে মজা করে পাগল তখন কিন্তু নসুর প্রবল প্রতিবাদ আপত্তি লক্ষ্যণীয়, পাগলের সমকমিতার ইঙ্গিতে বা স্থান-কাল-পরিপ্রেক্ষিতে । কারণ উপকথার শেষস্তরে একাকী বনওয়ারীর পাশে থেকেছে নসু। তার মনে হয়েছে এই চরম বিপদের সময়ও যদি সে বনওয়ারীর পাশে না থাকে, তাহলে তার নারীবেশ ধারণের আর কোনোও ভূমিকাই থাকে না। তাহলে নসুর এই নারীরূপ ধারণ স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বতঃপ্রণোদিত ।

নসু ঝগড়া করত। তার পছন্দের মানুষ ছিল করালী। করালীর বিরুদ্ধে থাকা সমস্ত মানুষজনের বিরুদ্ধে ছিল নসুর সুতীব্র ক্ষোভ। কিন্তু তার মধ্যেও সনসুর মধ্যে থাকা মঙ্গলদায়িনী শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষ যখন মারা যায় তখন তার চারপাশে থাকা মানুষগুলি বলতে থাকে যিনি মারা গেলেন তিনি কতটা ভালো ছিলেন। এটি স্বাভাবিক মানবচরিত্র। নসুর মধ্যেও রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্য। নয়ানের বিরুদ্ধে অনেক ক্ষোভ ছিল নসুর মনে। কিন্তু নয়ানের মৃত্যুতে সব ক্ষোভ ভুলে গিয়ে নসু নয়ানের জন্য আক্ষেপ করেছে। রাগ-ক্ষোভ-অভিমান সব নিয়েই মানুষ-সংসার। কিন্তু মৃত্যু পরবর্তী জগতে আর এইসব রাগ-রোষের কোনো স্থান নেই। সবকিছুর উর্দ্ধে চলে যায় তখন মানুষ। মৃত মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলির মধ্যেও যেন সেই বোধ জেগে ওঠে।মানবতার এই পর্যায়ের প্রতিমূর্তি নসু।

আদিমতার সঙ্গে ভূতপ্রেতের সংযোগ বহুপ্রাচীন। হাঁসুলীবাঁকেও তার চিত্র রয়েছে। সংস্কৃতির এই প্রাচীনতার ব্যাখ্যানও রয়েছে নসুর জবানিতে। কাহারকন্যারা একপত্নীক। তারা বহুগামী। পুরুষেরও বহুবিবাহ স্বীকৃত। কিন্তু এক স্ত্রী বর্তমানে পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ কাহারসমাজে অনুমোদিত নয়। কিন্তু বাঁকবদলের সূচনালগ্নে বনওয়ারী গোপালীবালার জীবিতাবস্থাতেই কোশকেঁধে আর আটপৌরে দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির বন্ধনকল্পে সুবাসীর পাণিগ্রহণ করে। কিন্তু মাত্র ছমাস সতীনঘর করার পর গোপালীবালার মৃত্যু ঘটে। নিজস্ব ভঙ্গীতে নসু গোপালীবালার শেষযাত্রায় উপস্থিত হয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে গোপালীকাকির গুণকীর্তন করে সুবাসীকে পরামর্শ দিয়েছিল-

''সিঁদুর ঢেলে দে-সতীনের মাথায় সিঁদুর দে, বল-সোয়ামীর দাবি ছেড়ে দাও, তোমাকে আমি সিঁদুর দিলাম,আমার সিঁদুর তুমি বজায় একো''[২১৪]

সুখ-দুঃখ নিয়েই তো জীবন। আমাদের কবির ভাষায়-

''আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।''

মানুষ তো জীবনের সঙ্গে ছায়াসঙ্গী মৃত্যুকে প্রতিনিয়ত সাথে করে বয়ে বেরিয়েই বেঁচে থাকে।-

''Man has live life in the shadow of death, and he who is faced by death turns to promise of life''[২১৫]

নসুবালার মধ্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল প্রখর। করালীকে সে স্নেহ করত। যথাযোগ্য সম্মান দিত বনওয়ারীকে। সমাজের মতব্বর হিসাবে মান্য করত নসু বনওয়ারীকে। বনওয়ারীর সব সিদ্ধান্ত তাই বলে যে নসু অন্ধভাবে মেনে নিত তা কিন্তু নয়। বনওয়ারী নসুর প্রিয়ভাজন শ্রদ্ধাভাজন হলেও নসুর নিজস্ব মতামত ছিল। বনওয়ারীর কোনো সিদ্ধান্ত নসুর অনৈতিক বলে মনে হলে নসু তার বিরুদ্ধে নিজের মত প্রতিবাদও জানিয়েছে। যে বনওয়ারী একদিন পাখী-করালীকে পাড়াছাড়া করেছিল সেই বনওয়ারীই কাহারদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গাঁটছড়া বেঁধেছিল সুবাসীকে বিয়ে করে। বনওয়ারী সুবাসীর সঙ্গে বিয়েকে যতই আটপৌরে ও কোশকেঁধে-দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলবন্ধন বলে চালাতে চাক 'মানুষ' নসু কিন্তু সুবাসীর মধ্যে কালোশশীর ছায়ায় বনওয়ারী অবদমিত যৌন বাসনার প্রতিফলন স্পষ্ট বুঝেছিল। তাই বনওয়ারী-সুবাসীর বিবাহের আনন্দানুষ্ঠানে কাহারপল্লীর সমস্ত সদস্যরা মাতোয়ারা হলেও নসু শরীর খারাপের অজুহাতে নিজেকে সেই অনুষ্ঠানে সামিল করা থেকে বিরত থেকেছে। নসু যে ক্ষমতাবানের চাটুকার বা বশংবদ নয় এ আচরণ তারই প্রমাণ। শুধু

করালীর পক্ষ নিয়ে বনওয়ারীর সঙ্গে মতবিরোধিতায় গেল নসু তাই নয়, উপন্যাসের শেষপাদে এসে করালী যখন বনওয়ারীকে হীন করে তুলল তখন নিঃসঙ্গ বনওয়ারীর পাশে দাঁড়িয়ে বনওয়ারীর ভার নিয়েছিল নসু।

নসু তার মেয়েলি চালচলনের জন্য অনেকসময় অনেকের হাসির খোরাকও হয়েছে। তবু তার সাবলীলতা তার স্বতঃস্ফূর্ততাকে আঘাত হানতে পারেনি। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ক্ষয়িষ্ণু কাহারপল্লীর উপাখ্যান। ভেঙে যাওয়া সমাজের রীতিনীতি কৃত্যানুষ্ঠান বহন করছে নসু। অনেকসময় নসু কাহারসমাজের সংকীর্ণতা সীমাবদ্ধতাকেও নিজের মত অমান্য করে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

নসুবালা নাচও করত। পাগলের গানের সঙ্গে তার নাচ বৃহন্নলা-সমাজ ভাবনাকেও আভাসিত করে।

নসু নপুংসক চরিত্র। নসুর নিজের ব্যাখ্যায় নসুকে ভগবান পুরুষের শরীরের মধ্যে দিয়েছেন মেয়ের মন। নসুর মধ্যে সমকামিতার ব্যাপারটিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। লিঙ্গ-লিঙ্গভেদ শুধুমাত্র শারীরিক প্রক্রিয়ামাত্র নয়। অনেকাংশেই ব্যাপারটি মানসিকতার সঙ্গেও সংযুক্ত। একটি শিশুকে অনেকসময় ছোটবেলা থেকে অন্য পোশাকে সাজানো হলে তার মধ্যে দুটি identity-ই কাজ করতে থাকে সমান্তরালভাবে। নসুকেও ছোট থেকে মেয়েলি পোশাকে সাজানো হত। নসুর মনেও এক নারীসুলভ কোমল মন ক্রিয়াশীল ছিল। একজন পুরুষের নারীভাব আয়ত্তকরণ প্রক্রিয়াটি একদিনে সমাধা হয় না। সুদীর্ঘকালধরে নিজের মধ্যে চলে ভাঙা-গড়ার খেলা। যার শুরু হয় মেয়েদের পোশাক-আশাক, ভাষাভঙ্গি, চলন-শৈলী সমস্ত কিছু অনুকরণের মাধ্যমে।

নসু ঝগড়া করত,মেয়েলি স্বভাবের ছিল, নাচও করত,নসুর আরেকটি গুণও ছিল, কাহার সংস্কৃতির অন্যান্য মানুষজনদের মতই অসাধারণ ছড়া কাটত নসু। কখনোও সেই ছড়াতে আছে নরনারীর ব্যক্তিগত প্রেমাকর্ষণ-

''একি পাকা অঙ লাগল মনে মনে- ও সজনি''[২১৬]

আবার যে কাহার সমাজে নারীর স্বেচ্ছাবিহার স্বীকৃত সেখানে নসুর ছড়ায় উঠে এসেছে এক পুরুষ প্রধান পরিবারের কথা, যেখানে নারীর কোনো স্বাধীনতাই নেই-

''কিল ধমাধম পড়ে সই- কিল ধমাধম পড়ে গো''[২১৭]

মাতৃতান্ত্রিক আদিম সংস্কৃতির অবসান এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সূচনার ক্রান্তিলগ্নের বাঙ্ময় উপস্থাপক নারীবেশী নসুরাম।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' বাঁক বদলের গল্প। বনওয়ারীর থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাহিনি। প্রবীণ রক্ষণশীল সমাজ থেকে আধুনিকতা নবীনতার জোগান। যে কোনো বড় পরিবর্তনের মাঝে থাকে এক সন্ধি। আদিম মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতা থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রূপায়ণের মাঝে ছিল নপুংসক পৌরোহিত্য। নসু যেন তারই প্রতীক। বনওয়ারী নামটির সঙ্গে জড়িত বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ আর করালী আধুনিক শক্তিপীঠ। এর মানে নসুর দ্বৈতসত্তায় অবস্থান।

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়- একমেদ্বিতীয়ম্। কেউ বলেন তিনি সাকার, আবার কেউ বলেন ঈশ্বর নিরাকার। আবার ঈশ্বর অর্ধনারীশ্বর। প্রকৃতি এবং পুরুষ-উভয়ের সম্মিলনেই ঈশ্বর। ঈশ্বর পূর্ণতার প্রতীক। মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য ছিলেন 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু'। বৈষ্ণব সাধকগণের কাছে মুক্তিবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। তাঁরা সখীবেশে রাধাকৃষ্ণের লীলাসঙ্গী হতেই পছন্দ করেন। নসুও কখনো করালী কখনো বনওয়ারীকে সেবা করেছে-মঞ্জরীভাব সাধনায়।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' যে উত্তরাধিকারহীন তারও প্রমাণ নসু। বৈষ্ণবীয় চৈতন্যতত্ত্বধারক নসু একাধারে আদিম সমাজের transvestism এবং সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যবর্তী স্তর eunach prist-ship-এর স্মৃতি যেমন বহন করেছে তেমনি post modern সমাজ ও সাহিত্যে কুইয়ারের girling তত্ত্বরও ছায়াপাত নসু চরিত্রে। নসু সমকামী হোক বা নপুংসক হোক কিংবা রূপান্তরকামী-যাই-ই হোক না কেন সে হল মানুষ। প্রকৃত অর্থেই মানুষ। যার মান এবং হুঁশ দুই-ই আছে। তাইজন্যই বনওয়ারীর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি বলে সুবাসী-বনওয়ারীর বিবাহের আনন্দানুষ্ঠানে নসু যায়নি, কিন্তু করালী বা বনওয়ারী যখনই বিপদে পড়েছে তখনই তাদের শুধু পাশেই এসে দাঁড়ায়নি নসু বরং তাদের সমস্ত ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। আর শুধু নেতৃস্থানীয় করালী বা বনওয়ারীই নয় সমগ্র কাহারপল্লীর সমস্ত মানুষজনদেরই বিপদের দিনে হাজির নসু।

নসুরাম-নসুবালা (শুকসারী কথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) আর 'শুকসারী কথা' (১৯৬৭) -রচনাদুটির মাঝের ব্যবধান দীর্ঘ কুড়িবছর। হাঁসুলীবাঁকের নসুবালায় যা যা খামতি ছিল তারাশঙ্কর মধ্যবর্তী বিশবছরের অভিজ্ঞতায় আরও সমৃদ্ধতর হয়ে গড়লেন 'শুকসারী কথা'র নসুবালাকে। এখানে নসু করালীর পিসতুতো ভাই নয়। করালীর 'নসুদিদি'। বাপমরা ছেলে করালীকে ফেলে যখন তার মা পালিয়ে যায় তখন নসুর মায়ের স্নেহই করালীর অবলম্বন ছিল। সেই থেকেই নসু হয়েছে করালীর দিদি-'নসুদিদি'। ছোটবেলা থেকেই নসুর মা নসুকে মেয়েলি পোষাকে সাজাত। আর এই নারীবেশী নসুর গ্রামে চৈত্রমাসে ঘেঁটু পরবে, ভাদ্রমাসে ভাঁজো পরবে আর শ্রাবণ মাসের

মনসার ভাসানের নাচ-গানের আসরে ডাক পড়ত। নসুর গানের গলা ভালো ছিল আর নৃত্যেও দক্ষতা ছিল নসুবালার।

হাঁসুলীবাঁক থেকে কাহারদের উৎসন্ন হবার পর নসুবালা চন্ননপুর চলে এসেছিল পাগল আর সুচাঁদের সঙ্গে। কিন্তু এই নসুবালা আর আগের হাঁসুলীবাঁকের নসুর মধ্যে অনেক বদল রয়েছে। চন্দনপুর এবং তৎসন্নিহিত আকুটি বন্‌চাতরা রামভাঙা নবীনপুর গোপতলী যোগপুর প্রভৃতি নানা অঞ্চলে 'শুকসারী কথা'র নসুবালা আদরের ভাদুমণিকে নিয়ে নাচে গানে ভিক্ষার্জন করে। কাহার বেষ্টনী ছেড়ে নতুন ভৌগোলিক পরিমন্ডলে আসার ফলশ্রুতি এই নবনসুবালা।

হাঁসুলীবাঁকের নসুবালা রক্ষণশীলতা এবং আধুনিকতার সেতুবন্ধন করেছিল। হাঁসুলীবাঁকের নসুবালা আদিম মাতৃতান্ত্রিক থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্রান্তিলগ্নের স্মৃতি বহন করেছে। আর শুকসারী কথা-র নসুবালার অবস্থান শক্তি ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির স্তরায়নে। নসু নতুনস্থানে এসে অট্টহাসতল নিকটবর্তী স্থানে কুঁড়েঘর স্থাপন করে বসবাস করা শুরু করেছে। আদর করে নসু দেবী অট্টহাস তথা ফুল্লরাকে ডাকে 'আদারবুড়ী' নামে। 'বিশ্বব্রহ্মান্ডভান্ডধরী' বিশ্বজননী নসুর একান্ত ভালোবাসার মা-জঙ্গলের বুড়ীমা-'মহাবুড়ী' -আদারবুড়ী। এখানে ভক্ত-ভগবানের বাৎসল্যরসে শক্তি সংস্কৃতির প্রভাব বর্তমান। আবার বর্ধমানের মহারানি নসুর ভাঁজোতে মুগ্ধ হয়ে নসুকে নাম দেয় 'ভাদুর মা'। সেই থেকে নসুর সঙ্গে ভাদু-র আমৃত্যু-অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভাদু জড়িত বৈষ্ণব-সংস্কৃতির সঙ্গে।এখানে বৈষ্ণব-সংস্কৃতিতেও প্রতিবাৎসল্যে ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক সূচিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে বৈষ্ণব ও শক্তি বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য রসধারায় নিষ্ণাত হল।

'শুকসারী কথা'য় নসু ভাদুর মা। রাঢ় সংস্কৃতিতে ভাদুকথা বেশ জনপ্রিয়। রাজকন্যা ভাদুমণির গোপন অভিসার এবং রাত্রে রুদ্ধদ্বার কৃষ্ণমন্দিরে রাজকন্যা ভাদুর নৃত্যশব্দে রাজা রাজপুরোহিতের সঙ্গে ভাদুর অবৈধ প্রেমসম্পর্ক সন্দেহে ভাদুকে হত্যার আদেশ দেয়। রাজার এ হেন আদেশের পর মন্দিরে একমাত্র কৃষ্ণবিগ্রহ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ভাদুকেও জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল না। প্রেমাস্পদ কৃষ্ণেই লীনা হয়েছিলেন ভাদু। এ ঘটনার পর অনুতপ্ত রাজা কৃষ্ণবিগ্রহের পাশে স্থাপন করলেন ভাদুর মূর্তি। ভাদুপুজো প্রচলন এবং জনপ্রিয় হল। এই ভাদুরই মা হল নসুবালা।

কাহারসংস্কৃতি থেকে নতুন আবর্ত চন্দনপুরে আসার পর পুরাতন বৃত্তীয় সুচাঁদ আর পাগলের মৃত্যুর পর নসুবালার সম্পর্ক স্থাপিত হয় ফটিকদাসের সঙ্গে। ফটিকদাস বৈষ্ণব। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে বৈষ্ণবী তার টেকে না। ফটিক দাসের কৃষ্ণের রূপ রাখালরাজারূপ। এ হেন কৃষ্ণের

পাশে নেই রাধা। তবে অক্লেশেই এটি প্রতীত হয় যে নসুবালার ভাদুমণিই ফটিকদাসের রাখালরাজা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। এ সম্পর্কে নসুবালা ও ফটিক দাস বেয়াই-বেয়ান।

নসুবালা নারীবেশী পুরুষ। বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে কৃষ্ণ মধুর রসেই সর্বাধিক প্রীত হন। শুধু তাই নয় কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিততনু' শ্রীচৈতন্যদেব।

নসুবালাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারহীনতা। হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় লেখকের সেই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধিত করেছে নসু। কিন্তু নতুন কালপ্রবাহে নপুংসক নসু হয়েছে ভাদুর মা। বাস্তবে সীমা হয়েছে তার ভাদুমণি। তারাশঙ্কর সূচিত করলেন রূপান্তরকামী মানুষদের নতুন যাত্রা পথ।

হিজড়া

উইকিপিডিয়ার মতে, মূলত উর্দু শব্দ 'হিজরা' বা 'হিজড়া' শব্দটি সেমেটিক আরবি ধাতুমূল 'হিজর' থেকে আগত যার অর্থ 'গোত্র থেকে পরিত্যক্ত'। পরবর্তী কালে এটি হিন্দিভাষায় প্রবেশ করেছে বিদেশী শব্দ হিসাবে। অধিকাংশক্ষেত্রে এরা স্বাভাবিক পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এদের পুংজননাঙ্গ থাকে না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় ক্রোমোজমের ত্রুটির কারণে জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী, যাদের পরবর্তীকালে লিঙ্গ নির্ধারণে জটিলতা দেখা দেয় তারাই 'হিজড়া' রূপে পরিচিত।বাংলায় অনেক সময় হিজড়া আন্তলিঙ্গ মানুষ হিসাবে পরিচিত। হিজড়া সম্প্রদায় সুসংগঠিতভাবে একজন গুরু দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। অসহায় দরিদ্র পরিবারের সন্তান বা পরিত্যক্ত শিশুদের দত্তক নেবার মাধ্যমেই এরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নিজেদের টিকিয়ে রাখে। বর্তমানে দেখা যায় জীবিকার প্রয়োজনে এরা অনেকেই যৌনকর্মী হিসাবেও কাজ করে।[২১৮]

বদনচাঁদ (মতিলাল পাদরী : কমলকুমার মজুমদার)

'বদন' কমলকুমার মজুমদারের 'মতিলাল পাদরী' ছোটগল্পের এক উল্লেখযোগ্য পার্শ্বচরিত্র। বদন হিজড়ে। সাঁওতাল পরগণার অর্ন্তগত ছোট্ট গ্রাম হাঁসদোয়ার এক অতি সাধারণ গির্জায় ভামর মা মেরির মত যখন শিশুর জন্ম দিল তখন নবজাতককে পৃথিবীতে স্বাগত জানাতে এসেছিল আরোও কিছু স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে বদন হিজড়েও। লৌকিক সংস্কার রীতির উলঙ্ঘন করেননি এখানে গল্পকার। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই সাঁওতাল পরগণার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের আধিক্যে প্রচুর গির্জা গঠিত হয়েছিল। তারই একটিতে পাদরী মতিলাল। সেখানে নবজাতকের আগমন মতিলাল পাদরীর মত মানুষ যে প্রকৃত খ্রীষ্টান হতে চায় তার কাছে স্বয়ং ঈশ্বরের আগমন। তাই এই নবজাত শিশু দেবশিশু।

জনসাধারণের কাছে গির্জায় নবজাত সন্তান মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু মোটেই নয়। বরং তার মা ভামরির প্রতি প্রত্যেকের সন্দেহের দৃষ্টি। কারণ এর আগে তাকে এই অঞ্চলে কেউ দেখেনি। আর ভরা যৌবন ভামরির। বীণা ধাই-এর পর বদন হিজড়ে এ দেবশিশুকে সাদরে গ্রহণ করে। তখন বিকেল বেলা। সারারাত প্রকৃতির রুদ্রতার মধ্যে শিশু জন্মানোর পর বিকেলবেলায় শান্ত সমাহিত পরিবেশে আগমন ঘটল বদন হিজড়ের। প্রাথমিক ঘোর কাটিয়ে পাদরী সাহেব তখন আরামকেদারায় বসে বাইবেলে আত্মনিমগ্ন ছিলেন।

বদন এ দেবশিশুর দর্শন করতে এসেছে। কারণ সে দেবশিশুকে গান শোনাবে। যাতে পরজন্মে সে পিতৃত্বের অধিকার পায়। মানবজন্ম লাভ করেও পূর্ণত্বের স্বাদে বঞ্চিত থাকার কষ্টে

বদন হিজড়ের চোখের জল পাঠকহৃদয়কেও সিক্ত করে। দেবশিশু দর্শনে অভিভূত বদন জানায় যে স্বর্গ কি তা দেখেনি কিন্তু স্বর্গের মহিমা দেবশিশুর মুখদর্শনে লাভ করেছে। ভামরও তার শিশুসন্তানকে কোলে বসিয়ে দর্শনদেবার সময় যতই দেবীরূপ রপ্ত করুক বদনের চোখ কিন্তু এড়ায় না। ভামরকে দেখে - ভামরের রকমসকম দেখে এক অদ্ভুত অপ্রীতিকর অস্বস্তি হতে থাকে বদনের।

বদন হিজড়ের মধ্যে একই সঙ্গে নারী এবং পুরুষসত্তা বর্তমান। কিন্তু পুরুষসত্তাই বেশি। তাই সে পরজন্মে 'বাবা' হতে চায়। আর সেই অসম্পূর্ণতায় মরমে মরমে দগ্ধ হতে থাকে বদন। শুধু মানবশিশুকে পৃথিবীতে আসার অভ্যর্থনামাত্র নয় ভামরির পুত্র তো দেবশিশু! পাদরীবাবা বা অঞ্চলের অন্যান্য সমস্ত জনমানুষের কাছে এ শিশু তো দেবতার আশীর্বাদপুষ্ট। মতিলাল পাদরী যে প্রকৃত অর্থে খাঁটি খৃষ্টান হতে চেয়েছিল প্রভু যিশু তাঁর এতদিনের সেই ইচ্ছা পূরণ করলেন। অচেনা অপরিচিতা আগন্তুক ভামরির (মাতা মেরির কোলে যেমন যীশু এসেছিলেন) মাধ্যমে জগতের সমস্ত অন্ধকারকে দূর করার জন্য আবির্ভাব এ শিশুর। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। বিশ্বাসই বিশ্বাসের বৃদ্ধি করে। লোকমুখে এ শিশুর মাহাত্ম্য প্রচারিত ও প্রসারিত হতে থাকে। আর এই জনশ্রুতিতেই শুধু নবজাতকের সাদর অভ্যর্থনা নয়, নবজাতক দেবশিশুর থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে বদনের আবির্ভাব। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে যেমন পাষাণী অহল্যার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল তেমনি এ দেবশিশুর পাদস্পর্শে বদনের অন্দরে থাকে ঘুমন্ত পুরুষ-পৌরুষের জাগরণ বাঞ্ছা করেছিল হিজড়ে বদন।

হিজড়ে হলেও বদনের দৃষ্টি পুরুষদৃষ্টি। তাই ভামর এখন শিশুকোলে দর্শনার্থীদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করার কৌশল যতই রপ্ত করুক, আর পাঁচজনের চোখে শিশুকোলে ভামরের দেবীরূপ যতই প্রতিভাত হোক না কেন, ভামর সম্পর্কে বদনের দৃষ্টি এড়ায়নি। দেবশিশু দর্শন করতে গিয়েই বদন দেখে ফেলেছে ভামরকে। ভামরের শরীর-বিভঙ্গ উচ্ছ্বসিত যৌবন- শারীরিক আবেদন আর্ত করে তুলেছিল বদনকে। কিন্তু বদন জানে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে। স্থান-কাল-পাত্র-জ্ঞান রয়েছে বদনের। তাই সত্বর সেই স্থান থেকে বেরিয়ে এসে ছোট্ট আঙিনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল।

ছোট আঙিনা। সেখানে দাঁড়িয়ে বদন হিজড়ে দেবশিশুর উদ্দেশ্যে স্বাগত সংগীত গাইল-

''কিসের ভাবনা লো কিসের ভাবনা,
স্বগ্‌গ এখন ঠাঁই করেছে ঘরে
আমার কিসের ভাবনা.....''[২১৯]

লক্ষ্যণীয়, ছোট আঙিনা। আঙিনা হল গৃহসম্মুখবর্তী সেই প্রাঙ্গন তল যেখানে ঘর থেকে বেড়িয়েই প্রকৃতির স্পর্শসুখ ঘটে। আঙিনা মুক্ত অঞ্চল। হোক সে ছোট, তবুও তা হল আঙিনা। গৃহমঙ্গলকামনায় গৃহস্থ বাড়িতে আঙিনায় থাকে তুলসীমঞ্চ। সেই আঙিনাতেই বদন শুভ-মঙ্গলের জয়গান গাইল। হিজড়ে স্বভাব সুলভ ঝুমুর গানের তালে নাচতে নাচতে ভামরের দিকে তাকিয়ে দু-একবার চোখ টিপল বটে, মুখে দু-চারটে অশ্লীল শব্দ এসে গেলেও দেবশিশুদর্শনজনিত কারণেই হোক বা পাদরীবাবার প্রতি সম্মানেই হোক বদনের মুখে কোনো নোংরা কথা তো এলই না, উল্টে মতিলাল পাদরীর দিকে তাকিয়ে বদন অশ্লীল ঝুমুর গানকে ভাবময় করে তোলার চেষ্টা করল।

বদন হিজড়ে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে বারবার ঘুরে ফিরে আসে শিশু ও তার মায়ের কাছে। একবার করে বদন নাচে আর ফিরে এসে একটু কড়া ইঙ্গিত করে চোখ মটকায়। প্রথমটা ভামর কিছুই বুঝতে পারেনি। অবাক চোখে শিশুর মতনই তাকিয়ে দেখছিল বদনকে। কিন্তু বদনের বারবার একই আচরণের পুনরাবৃত্তি চোখের ইশারায় রোমাঞ্চিত ভামর ক্রমেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চোখ সরিয়ে নেয়। তির্যক চোখে শান্ত সমাহিত মতিলাল পাদরীর দিকে তাকিয়ে ভাবে হিজড়ের আচরণ যেখানে পাদরীবাবাকে সমাহিত রাখে সেখানে তার এত অস্বস্তির কারণ কি। শেষাবধি ভামর আর সহ্য করতে পারল না তার তক্তাপোষের চারিপাশে ঘুরে ফিরে নেচে যাওয়া বদন হিজড়ের ছায়া-অস্তিত্ব। শিশুকে চিমটি কেটে কাঁদিয়ে স্তন্যদানের অছিলায় সরে আসে বদন হিজড়ের পারিপার্শ্বিকতা থেকে।

ভামর কোলের ছেলেকে চিম্‌টি কাটে। কেঁদে ওঠে ছেলে। মতিলাল পাদরীর আদেশ, বাবা বদনচাঁদ যেন চলে যায়। কারণ ভামর শিশুকে 'মাই'[২২০] দেবে। এখানে পুরুষের সামনে নারীর স্তন্যদানের লজ্জা-মাতৃত্বের গৌরবের থেকে নারীত্বের সম্ভ্রম-নারী-পুরুষের আপাত আব্রু প্রকটিত করেছে হিজড়ে বদনের পুরুষত্বকে।

বদন জনমজুরের কাজ করে। তার নিজের জমি নেই। সেরেনডির সুবৃহৎ উৎরাই এলাকায় যদুর জমিতে খাটে বদন। হাল চষে বদন। একলা পেট কোনো ভাবে চালিয়ে নেয়। নিজের অন্নের সংস্থান বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে করে বদন।

ভামর এবং তার শিশুসন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে অঞ্চলের লোকজন কানাঘুষো করলেও শিশুর দেবত্বের গরিমার উপরে কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি। বদন হিজড়েই প্রথম সে বিষয়ে মুখ খুলল। তার চোখে ভামর 'লাঙসোঁয়ারি '[২২১]। যদিও বদন ভামরের পরিচয় নামোল্লেখ করেছে 'দূতবাবুর মা'[২২২] বলে। কিন্তু শুধুমাত্র দূতবাবুর মা এই পরিচয় বদন হিজড়েকে সত্যভাষণে বিরত

রাখতে পারেনি। যদিও ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানরা তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কথা বলেনি, কিন্তু যদু হিন্দু বিষয়টিকে প্রচারের আলোয় আনতে ছাড়েনি।

মতিলাল পাদরী একদিন সন্ধ্যায় নিমড়া থেকে ফেরার পথে একদল মানুষকে মদ্যপান করতে দেখেন। এই আসর বসেছিল সরতার ছোট শাল ও মহুয়ার কুঞ্জে। এই দলে যদু, জহর, ভোলা পাইক, পতাকীর সঙ্গে ছিল বদন হিজড়েও। মদের সঙ্গে তিতিরের মাংস ছাড়ানোর আয়োজনও বেশ জবরদস্ত চলছিল। পাদরীসাহেবকে দেখে যদু যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করলেও বদন হিজড়ে সহ বাকিরা বোতল আড়াল করেছিল।

প্রথমদিকে ভামরের কোলে দেবশিশুকে হিজড়েদের ঝুমুর নাচ-গানে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর সময়ও বদন পাদরীবাবাকে দেখেই হোক অথবা শিশুটির দেবত্বের মোড়কেই হোক স্বভাবসুলভ অশ্লীলতা থেকে বিরত থেকেছে। আর এখানেও মাংস মদের আসরে পাদরীবাবা এবং সাথে থাকা ছোট্ট দূতঠাকুরকে দেখে সম্ভ্রমসূচক আচরণ করেছে।

মতিলাল পাদরী সর্বদাই শিশুপুত্রের সামনেই প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানায়। ঘুমন্ত জাগ্রত এবং মায়ের কোলে স্তন্যপানরত শিশুর সামনেও। এখানে নেই কোনো আড়াল-লজ্জা। কিন্তু বদনের সামনে শিশুকে ভামরের স্তন্যদান না করানোর মধ্যে হিজড়ে বদনের পুরুষরূপ প্রকাশিত।

কিম্‌পুরুষ (ব্রহ্মভার্গব পুরাণ : কমল চক্রবর্তী)

'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ'(১৯৯৩) উপন্যাসটিতে কমল চক্রবর্তী হিজড়ে সমাজের ছবি তুলে ধরেছেন। কোনো একজন বিশেষ চরিত্র যে হিজড়ে তা নয়, এমনকি এমন কিছু চরিত্র রয়েছে যারা নিজেরাও শেষপর্যন্ত হিজড়ে হতে চেয়েছে- মানসিকভাবে পুরুষত্ব বিসর্জন দিয়েছে। যেমন- শশীকুমার নিজে একজন সক্ষম পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও হিজড়ে মির্চাকে ভালোবাসে না পাওয়ার যন্ত্রণায় শেষপর্যন্ত নিজে পৌরুষত্ব বিসর্জন দিয়েছিল। রুদ্রবর্ণ রাজাকে এখানে দেবতাদের দুরভিসন্ধির শিকার হয়ে পৃথিবীর প্রথম কিম্‌পুরুষ হতে হয়েছিল। রামভরোসা, হিজড়ে সর্দার কুতুই, আদু, বড়কিমাসি, কমলীমাসি, হালুয়া, পোনুদা, সুরতিয়াদের মত নিম্নবৃত্ত হিজড়েদের আখ্যানও রয়েছে এখানে।

এখানে কমল চক্রবর্তী অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে দেখিয়েছেন যে, সমাজর কাছে লিঙ্গ পরিচয়টা এতটাই মারাত্মক যে, মানুষ পরিচয় আসল নয়। মানুষ বা মানুষী হতে হবে। অর্থাৎ লিঙ্গগত একটি পরিচয় থাকতেই হবে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনাচরণ, টানাপোড়েন, রংবেরঙের অভিজ্ঞতা থেকে জাত জীবনবোধ শুধুমাত্র নারী ও পুরুষের জীবনকে সীমায়িত করে কিভাবে তা পরতে পরতে উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

উপন্যাসের বহু চরিত্র এবং বহু আখ্যানের মধ্যে দুটি উদাহরণস্বরূপ বলছি।

এক, রামভরোসার একটি ঘটনা। উপন্যাসের আখ্যান মোটামুটি একরকমভাবে ছিল, যে, 'ফাৎনা' নামক এক পত্রিকার উত্থানের কাহিনি। যার মূল লক্ষ্য সমাজের এই প্রান্তিক মানুষ তথা হিজড়েদের জীবনকাহিনি তুলে ধরা। এই প্রসঙ্গে একদিন 'ফাৎনা'র সম্পাদক মদনগোপালবাবুকে রামভরোসা আলাপচারিতায় বলেছিল,-

> ''বাবু আমি যদি অন্ধও হতুম তাও ভালো হত। অন্ধ ছেলেদের জন্যও স্কুল খুলেছে।..... ল্যাংড়া, বোবা, এক হাতু, হাবা, কোনো ক্ষতি ছিল না। শুধু আপনার মতো আমার যদি ওটা থাকত। ওটা নেই বলে পৃথিবীতে জন্মেও কিছু পেলাম না। রঙ তামাশা বদলে দিতে পারে এক টুকরো মাংস, পৃথিবীর সমস্ত।..... মাঝে শুনেছিলুম, বিদেশে নাকি মাংস খন্ড জুড়ে হিজড়েদের মানুষ করা হচ্ছে।..... আমরা সেসব কোনদিন পাব না। আমি আর সেসব ভাবি না। ছোটরা যদি পায়, তবেই হল।''[২২৩]

এই প্রান্তিক মানুষরা সেই প্রতিবন্ধী মানুষগুলো বরং হতে চাইছে যাদের সমাজ কি করুণার চোখে দেখল, তার থেকেও বড় কষ্ট তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনেও। কিন্তু রামভরোসার জবানিতে কমল চক্রবর্তী দেখালেন তথাকথিত প্রতিবন্ধীদের থেকেও কত ভয়ঙ্কর খারাপ অবস্থা তাদের।

দ্বিতীয়ত: উল্লেখ করব, 'ফাৎনা'র এডিটর মদনগোপাল বাবুর জীবনের এক অভিজ্ঞতার কথা। প্রথমেই যখন মদনবাবু এ কাজের বরাত পেয়েছিলেন তখন খুব বেশি খুশি হননি। কারণ আমরা বড় চাকরিতে গৌরবান্বিত হই তখনই যখন সমাজের আর পাঁচজন তাকে ঈর্ষার চোখে দেখে। মদনবাবুর এই কাজের বিষয় শুনে সবাই আড়চোখে দেখবে। কারণ হিজড়েদের সমাজ ভালোচোখে দেখে না। মদনগোপালবাবু হিজড়েদের নিয়ে কাজ করলেও তাঁদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলত। বাড়িতে মদনবাবু হাঁটা চলার ধরণ নিয়ে বোন নীতা আর তার বন্ধুবান্ধবরা হাসাহাসিও করেছিল। মদনবাবুই একদিন অন্ধকার রাতে কাঁদোল উৎসবে দুহাত উপরে তুলে গান গেয়ে উঠেছিল এবং হিজড়েদের প্রার্থনার সুরই অনুরণিত হয়েছিল তার গলায়। মদনগোপালবাবুও জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন পরজন্মে যেন তিনি ছেলে হয়ে জন্মাতে পারেন। তারপর হঠাৎই

> ''.... সম্বিৎ ফেরে, প্যান্টে হাত ঢুকিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করি, আমূলটি ঠিক আছে কি না।''[২২৪]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ মানুষ বিষমকামী সমাজের প্রতিনিধি এবং রামভরোসার মত মানুষরা কোথাও যেন এক হয়ে গেলেন তার তাদের সেতুবন্ধের কাজটি করলেন দুই সন্তানের জনক শশীকুমার। আসলে ঔপন্যাসিক দেখাতে চাইলেন হিজড়েরা আর বোধ হয় প্রতিবন্ধী হিসাবে

দূরে সরে থাকতে পারে না সমাজের চোখে। হিজড়েদের মধ্যে প্রেম অনেকসময় সমকামিত্বেরও উদাহরণ হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এরা আর প্রান্তিক নন, সামাজিক মানুষ হিসাবে স্বীকৃত। বিষয়টি স্থাপিত করার জন্য কমল চক্রবর্তীর লেখনীতে উঠে এসেছে একদিকে রামায়ণ ও মহাভারতের ইল ও ভঙ্গাসন, তেমনি আবার এসেছে শিখন্ডী, বাদ যায়নি লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, বরুণ দেবদেবীরাও।

হিজড়ে মহল্লার চরিত্ররা (অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা : সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

'অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা'(২০০২) উপন্যাসেও হিজড়েদের জীবনকথা ব্যক্ত হয়েছে। এই উপন্যাসটির রচয়িতা সোমনাথ মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বেশ কিছুদিন হিজড়েপল্লীর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ফলত: তার উপন্যাসের চরিত্ররা হিজড়ে সমাজের জীবন্ত দলিল যেমন সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনি সামাজিক মানুষের বহু বিচিত্র ধ্যানধারণা যা বহুকাল থেকে চলে আসছে হিজড়েদের সম্পর্কে তা ব্যক্ত হয়েছে। হিজড়েদের দুটি সম্প্রদায়ের ছবি রয়েছে উপন্যাসটিতে। একদিকে আকুয়া হিজড়েদের মধ্যে রয়েছে রাজু, কমলরা আর অপরদিকে নির্বাণলব্ধ ছিবড়ি হিজড়েদের মধ্যে রয়েছে সঞ্জনা, মেহেন্দি, বর্ষা, পূজারা। একবিংশ শতাব্দীতেও মানুষের মনে হিজড়েদের সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা আছে। শ্যামলী মায়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সুবীর তাই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,-

''কেন, ওরা কি জানে না, কত দু:খে মানুষ হিজড়ে হয়?''[২২৫]

এই একটি মাত্র বাক্যে হিজড়ে সমাজের ছবি বোঝা যায়। সাধারণ মানুষের অনেকাংশেরই সঠিকভাবে কোনো ধারণা নেই এই হিজড়ে সম্প্রদায় সম্পর্কে। জন্মগতভাবে যৌন-প্রতিবন্ধকতা নিয়ে খুব কম শিশু জন্মায়। কিন্তু এছাড়াও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতায় অনেকসময় হিজড়ে তৈরি হয়।

আনন্দী (অপৌরুষেয় : নলিনী বেরা)

২০০৭-এ প্রকাশিত নলিনী বেরার 'অপৌরুষেয়' উপন্যাসে আনন্দী হিজড়ে একবার পুরুষের পৌরুষ চায়, আবার নারী হয়ে টুসুর মা হতে চায়। নারী এবং পুরুষের সমাজে নারী এবং পুরুষ সৃষ্টি সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে আনন্দী তার কর্মদক্ষতায়। কুমোর পাড়ার 'আঁথোল' কুমোর আনন্দী সমস্ত গোষ্ঠীর ভাবনা নিজের করে নেয়। সমস্ত হতাশা-বিষন্নতাকে জয় করে একসময় জীবনের সচলতার পথেই এগিয়ে চলে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ আনন্দী।

পরি'- 'দুলালি'রা (হলদে গোলাপ : স্বপ্নময় চক্রবর্তী)

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ'(২০১৫) উপন্যাসেও ভিন্ন যৌন চাহিদাসম্পন্ন চরিত্ররা উঠে এসেছে। উপন্যাসটির আখ্যান রেডিও জকির অফিসে শুরু হলেও পরিমল, দুলালির মত চরিত্ররা উঠে এসেছে। পরিমলকে তার মেয়েলিপনার জন্য অনেকরকম টিট্‌কারি শুনতে হয়েছিল। কিন্তু সেইসবকে সে উড়িয়ে দিয়ে নিজের যৌনচাহিদার বশে 'পরি' হয়েছে। পরি এক সফল ফ্যাশন ডিজাইনার। আর অন্যদিকে দুলাল নিজের লিঙ্গ পরিচয়ে অসন্তোষের জন্য সফল গার্হস্থ্য জীবনযাপনের পর নিজের লিঙ্গ উচ্ছেদ করে হিজড়ে হয়ে যায়, তার নাম হয় দুলালি। দুলাল পুরুষ। সে বিয়ে করেছিল। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের সময় সে নারীদেহের প্রতি আকর্ষণের পরিবর্তে এক অদ্ভুত ভিন্ন ধরণের চাহিদা অনুভব করত। রেডিও জকি অনিকেতের কাছে দুলাল নিজের বউ সম্পর্কে বলেছে,-

> ''..... ওর গতর দেখে, মানে ম্যানাদুটো দেখে, আমার মনে কীরম ধারা হিংসে হত। ভাবতাম ওরম যদি আমার থাকত।''[২২৬]

পরিতোষ আধুনিক চিকিৎসায় পৌরুষত্ব বর্জন করে পরি হতে পেরেছিল। পরি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। কিন্তু দুলাল পারেনি। তার অপারগতায় সে তার অনাকাঙ্খিত পৌরুষকে কর্তন করেছে, নারী হতে পারেনি, হিজড়ে হয়ে থেকে গেছে।

লেসবিয়ান/ সমকামী মহিলা

উইকিপিডিয়া অনুসারে, যে সমস্ত নারী অন্য আরেক নারীর প্রতি যৌন আকর্ষণ বা ভালোবাসা অনুভব করে তারা লেসবিয়ান বা সমকামী মহিলা নামে পরিচিত। বিশশতকীয় নারীর যৌন অভিমুখীনতার এ এক বিশেষ দিক। তবে ইতিহাস জুড়ে দেখা গেছে নারীর সমকামীত্বের স্বাধীনতাও যেমন ছিল না, তেমনই আবার সেক্ষেত্রে তারা পুরুষদের মতো শাস্তিভোগও করত না। বাংলা সাহিত্যে এর খুব বেশি উল্লেখ না থাকলেও নারী সমকামী সাহিত্য পশ্চিমা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। বাংলা সাহিত্যে বর্তমান কালে এই সমকামিতা সমান্তরাল যৌন সত্তা রূপে স্বীকৃতি পাচ্ছে এবং এ নিয়ে মুক্ত সাহিত্য রচনা শুরু হয়ে গেছে।[২২৭]

পাশ্চাত্যে প্রাচীন গ্রীসে যেখানে নগরব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটেছিল, সেখানে মানুষের যৌনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়নি। প্লেটো হেরোডেটাস প্রমুখ দার্শনিকদের লেখায় বিভিন্নভাবে উঠে এসেছে এই সমকামী চিন্তাভাবনা। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মহিলা কবির স্যাফোর জন্মস্থান লেসবন থেকেই লেসবিয়ান শব্দটির উৎপত্তি বলে ধরা হয়। স্যাফোর লেখায় প্রতি ছত্রে ছত্রে নারী শরীরের অপূর্ব বর্ণনা রয়েছে। প্রাচ্যে পারস্যের সাহিত্য এবং বাৎসায়নের কামসূত্রে সমকামিতার উল্লেখ রয়েছে। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে সমকামিতার কথা উঠে এসেছে বিভিন্ন লেখায়। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল জগদীশ গুপ্তের 'অরূপের রাস', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বুটিক ছুটকি', বাণী বসুর 'স্বপ্নময়', স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ', তিলোত্তমা মজুমদারের 'চাঁদের গায়ে চাঁদ' হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্তের 'প্রেম সমকামী'। সমকামিতা আসলে বর্তমানকালে যৌনতার বিকৃতিজনিত অসুখ না হয়ে, বরং বেশি পরিচিতি পাচ্ছে সমান্তরাল যৌনতা হিসাবে। বর্তমানে এ সংক্রান্ত একটি ধারাই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ভিন্ন ধরণের যৌনতার চাহিদা বা যৌনতার ভিন্নতা নিয়ে যে একাংশ মানুষ রয়েছেন এরা বর্তমানে 'এল জি বি টি' বলে চিহ্নিত। এরাও সমাজের একটি বিশেষ অংশ এবং এদের নিয়ে সাহিত্যও বেশ কিছু লেখা হয়েছে এবং আরোও বেশি সংখ্যক লেখাও হবে। কিন্তু আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে এদের নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। কারণ এরা ভিন্ন ধারার মানুষ, কিন্তু অক্ষম নন। প্রাচীন অনুশাসনে বা চিকিৎসাশাস্ত্রের সংজ্ঞায় হিজড়ে, খোজা, নপুংসকরা প্রতিবন্ধী শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু সমকামীরা নন। তাই অভিসন্দর্ভটিতে লেসবিয়ান বা সমকামী চরিত্র আলোচিত হল না। শুধুমাত্র এই সমকামী চরিত্রদের নিয়ে পৃথক আলোচনার বিস্তৃত সুযোগ রইল।

যৌনতার নিরিখে সাধারণের সমাজ দুই ধরণের মানুষকে 'স্বাভাবিক'ভাবে। নারীর পুরুষের প্রতি যৌনতা এবং পুরুষের নারীর প্রতি যৌনতা। এই বিষমকামীতা অর্থাৎ হেটেরোসেক্সুয়াল মানুষরাই সমাজের চোখে স্বাভাবিক। কিন্তু এগুলি ছাড়াও মানুষের অন্যরকম যৌনতাও থাকে।

উভয়লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বা সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি আকর্ষণ অর্থাৎ সমকামিতাও খুব একটা অস্বাভাবিক চাহিদা নয়, মানুষের শরীর ও মনের প্রেক্ষিতে। এই চাহিদা পূরণের জন্য বা বাধ্য হয়ে অথবা বলপূর্বক অনেকসময় মানুষ রূপান্তরিতও হয়ে থাকে। এই ভিন্নধারার যৌনচাহিদাসম্পন্ন মানুষরা 'তৃতীয় লিঙ্গ' বা 'Third Gender' বা 'Third Sex'-এর শব্দবন্ধে একটি নির্দিষ্ট পরিচয় দ্যোতিত করে। এই বৃহৎ পরিধি এখন 'LGBT' (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) নামেই বেশি পরিচিত। এই চার নামের মানুষজনের মধ্যে একটা আন্ত:সম্পর্কও বর্তমান থাকে অনেকসময়। হিজড়ে মানে নারীসুলভ পুরুষ। অর্থাৎ যে পুরুষদের মধ্যে মেয়েলিভাব বেশি রয়েছে। সুতরাং এরা নারীর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। সেদিক থেকে এরা (Gay) সমকামী। আবার শুধু পুরুষই সমকামী নয়, বেশ কিছু নারীও স্বাভাবিকভাবে পুরুষের প্রতি আকর্ষণবোধের বদলে নারীর প্রতি আকর্ষণবোধ করে। এরাও সমকামী (Lesbian)। যে সমস্ত পুরুষরা বা নারীরা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণবোধ করার কারণে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চান তাঁরা রূপান্তরকামী। এই রূপান্তরকামীরা যারা লিঙ্গ-রূপান্তর করে নেন তাঁরা রূপান্তরিত। আবার কিছু রূপান্তরকামী আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োগে সক্ষম হন না। অনেকসময় এরা মানসিক যন্ত্রণার কিছুটা নিরাময়ের তাগিদে হিজড়ে হয়ে যায়। পুরুষদের পুরুষাঙ্গ ছেদ করা হলে তাদের খোজা বলা হয়। খোজা অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এক প্রথার নাম। এবার আসা যাক নপুংসকদের কথায়। নপুংসক পুরুষ তাদের বলা হয় যাদের যৌনক্ষমতা থাকে না। নপুংসকরা বিষমকামী বা সমকামী বা উভয়কামী সেটা উহ্যই থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে বলা যায় উভকামী বা উভলিঙ্গ মানুষ কিন্তু এক নয়। উভলিঙ্গ অর্থাৎ Hermaphrodite-শারীরিক বিরল ত্রুটি যা লাখে একজন মানুষের হবার সম্ভাবনা থাকে।

আইনের অনুশাসনগুলিতে প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ক্লীব, নপুংসক মানুষদের উল্লেখ রয়েছে অন্যান্য প্রতিবন্ধী মানুষদের সাথে। সেই কারণে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে ছড়িয়ে থাকা এই প্রান্তিক চরিত্রগুলির কথা আলোচনা করা হল। সাহিত্যের অগ্রসরতাতেই প্রতিভাত হয় সমাজে এই তৃতীয় লিঙ্গের অবস্থান আগের থেকে অনেক বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত। এদের ভিন্নতর যৌনতা এদের প্রতিবন্ধী পর্যায়ভুক্ত করবে না।

তথ্যসূত্র

১ কুন্তল চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। রত্নাবলী। কলকাতা-৯। পঞ্চম মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১০/ অক্টোবর ২০০৩. .পৃ.১৫০।

২. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, 'রজনী'। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৭৭। ঢাকা। প্রথম সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ। ফাল্গুন ১৪১৭। ফেব্রুরারী ২০১১। ISBN- 984-18-0176-X. পৃ. ৮ ।

৩. তদেব পৃ. ১৪ ।

৪ তদেব পৃ. ১৪ ।

৫ কর বিমল। বাছাই গল্প। মন্ডল বুক হাউস। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ। মাঘ ১৩৯৩ সন। পৃ. ৩৪৮ ।

৬. তদেব পৃ.৩৪৮ ।

৭. তদেব পৃ. ৩৫০ ।

৮ তদেব পৃ. ৩৫০ ।

৯. তদেব পৃ. ৩৫০ ।

১০ তদেব পৃ.৩৫০ ।

১১ তদেব পৃ.৩৫০ ।

১২. তদেব পৃ. ৩৫০ ।

১৩. তদেব পৃ. ৩৫৮ ।

১৪. তদেব পৃ. ৩৫৮ ।

১৫. তদেব পৃ. ৩৫৮ ।

১৬. তদেব পৃ. ৩৫৮ ।

১৭. তদেব পৃ. ৩৫৮ ।

১৮. তদেব পৃ. ৩৫৮ ।

১৯. তদেব পৃ. ৩৫৮ ।

২০. পাঠ উপকরণ। পিবিজি। পত্র চতুর্থ। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা। দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, জুন ২০১৭। পৃ. ২৭৫ ।

২১. তদেব পৃ. ২৭৫ ।

২২ তদেব পৃ. ২৭৫ ।

২৩. তদেব পৃ. ২৭৫ ।

২৪ তদেব পৃ. ২৭৫-২৭৬ ।

২৫. Basu Nirmal Kumar, "Calcutta : A Premature metropolis", Cities, Alfred A. Knoft, Kolkata 1971. পৃ. ৫৮-৬০ ।

২৬ কর বিমল। বাছাই গল্প। মন্ডল বুক হাউস। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ। মাঘ ১৩৯৩ সন। পৃ. ২৭৬-২৭৭ ।

২৭. তদেব পৃ. ২৭৬-২৭৭ ।

২৮. তদেব পৃ. ২৮২ ।

২৯ তদেব পৃ. ২৮৩ ।

৩০. তদেব পৃ.২৮৩ ।

৩১. তদেব পৃ. ২৮৩ ।

৩২ তদেব পৃ.২৭৭ ।

৩৩ তদেব পৃ. ২৮৬ ।

৩৪. তদেব পৃ. ২৮৭ ।

৩৫ তদেব পৃ. ২৮৭ ।

৩৬ তদেব পৃ. ২৮৮ ।

৩৭. তদেব পৃ. ২৮৮ ।

৩৮ সেন দীনেশচন্দ্র।বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় দ্বিতীয় খন্ড ।চন্ডিদাস পদাবলী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১৪। পৃ১০০১।

৩৯ চক্রবর্তী জাহ্নবী কুমার। চর্যাগীতির ভূমিকা। ডি. এম. লাইব্রেরী। কলকাতা। পুর্নমুদ্রণ- ফাল্গুন ১৪১১/ মার্চ ২০০৫। পৃ. ২০৫ ।

৪০ কর বিমল। বাছাই গল্প। মন্ডল বুক হাউস। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ। মাঘ ১৩৯৩ সন। পৃ. ২৮৭ ।

৪১ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ।সূর্যাবর্ত । বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা।। চৈত্র ১৪০৭। ISBN- 81-7522-292-1. পৃ ২৭৩ ।

৪২ কর বিমল। বাছাই গল্প। মন্ডল বুক হাউস। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ। মাঘ ১৩৯৩ সন। পৃ. ২৮৭ ।

৪৩ তদেব পৃ. ২৮৭ ।

৪৪ ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ, ‘গল্পগুচ্ছ’ (অখন্ড সংস্করণ), স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: দোল পূর্ণিমা মার্চ ২০০২। পৃ. ১২৯ ।

৪৫ তদেব পৃ.১২৯ ।

৪৬ তদেব পৃ.১২২ ।

৪৭. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, পত্রসংখ্যা ১৪৬, ৯ জুলাই ১৮৯৫ ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৪২৫। পৃ. ২৭৫ ।

৪৮. ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ, ‘গল্পগুচ্ছ’ (অখন্ড সংস্করণ), স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: দোল পূর্ণিমা মার্চ ২০০২। পৃ. ১২২ ।

৪৯. ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ, ‘গল্পগুচ্ছ’ (অখন্ড সংস্করণ), স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: দোল পূর্ণিমা মার্চ ২০০২। পৃ. ৬৪৮ ।

৫০. তদেব পৃ.৬৪৯ ।

৫১. ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ, ‘গল্পগুচ্ছ’ (অখন্ড সংস্করণ), স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ: দোল পূর্ণিমা মার্চ ২০০২। পৃ. ১২৪ ।

৫২. তদেব পৃ ১২৫ ।

৫৩. তদেব পৃ ১২৫ ।

৫৪. তদেব পৃ ১২৪ ।

৫৫ দেবী নিরুপমা । শ্যামলী । মিত্র ও ঘোষ। ১০,শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ,কলকাতা-১২।মাঘ, ১৩৬২।পৃ: ২০।

৫৬ মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৫। পৃ ১৪২ ।

৫৭ তদেব পৃ ১৪২ ।

৫৮ তদেব পৃ ১৪৪ ।

৫৯. তদেব পৃ ১৪৮ ।

৬০. তদেব পৃ ১৪৯ ।

৬১. তদেব পৃ ১৫২ ।

৬২. তদেব পৃ ১৫২ ।

৬৩ তদেব পৃ ১৫২ ।

৬৪. তদেব পৃ ১৫৩ ।

৬৫ তদেব পৃ ১৫৫ ।

৬৬ তদেব পৃ ১৫৫ ।

৬৭ তদেব পৃ ১৫৫ ।

৬৮ তদেব পৃ ১৫৭ ।

৬৯ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খন্ড, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা: লি:, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।পৃ.৩১০ ।

৭০. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর , হাঁসুলীবাঁকের উপকথা (১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) , চারুলতা প্রকাশন , কলকাতা , চতুর্থ প্রকাশ, বইমেলা ২০১১, পৃ: ৪৪ ।

৭১. তদেব (২য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) পৃ ৬১ ।

৭২. তদেব (১ম পর্ব,চার পরিচ্ছেদ) পৃ ৩৯ ।

৭৩. তদেব (শেষ পর্ব) পৃ ২৮৩ ।

৭৪. Malinowski Bronislaw.Magic, Science and Religion and other Essays.Doubleday.Anchor Books.Garden City.New York.1984. p-32 ।

৭৫. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর । হাঁসুলীবাঁকের উপকথা (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) । চারুলতা প্রকাশন , কলকাতা । চতুর্থ প্রকাশ, বইমেলা ২০১১ । পৃ: ২৭ ।

৭৬ তদেব (শেষ পর্ব) । পৃ ২৮৭ ।

৭৭ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৬ষ্ঠ খন্ড । পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা-৭০০০২০। ISBN 81-86908-66-8 (set). ISBN 81-7751-025-8 । পৃ: ১৫৩ ।

৭৮. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৬ষ্ঠ খন্ড । পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা-৭০০০২০। ISBN 81-86908-66-8 (set). ISBN 81-7751-025-8 । পৃ: ১৮৭ ।

৭৯ সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার । একশ এক গল্প । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ ১৪১০। ISBN: 81-7293-798-9। পৃ:৪৮ ।

৮০ তদেব পৃ ৪৮-৪৯ ।

৮১. তদেব পৃ ৪৮ ।

৮২. তদেব পৃ ৪৮ ।

৮৩ তদেব পৃ ৮ ।

৮৪. চৌধুরী রমাপদ । পশ্চাৎপট। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০০৯ । প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৫। ISBN 81-7756-462-5 । পৃ২৪-২৫ ।

৮৫. তদেব পৃ ২৫ ।

৮৬ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র , পঞ্চম খন্ড । পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি , কলকাতা-৭০০০২০। ISBN 81-86908-66-8 (set) । পৃ: ২০৩ ।

৮৭ তদেব পৃ: ২০৩ ।

৮৮ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর । হাঁসুলীবাঁকের উপকথা । চারুলতা প্রকাশন , কলকাতা । চতুর্থ প্রকাশ, বইমেলা ২০১১ । পৃ: ২৮৩ ।

৮৯. তদেব পৃ: ৩৭ ।

৯০ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ৬ষ্ঠ খন্ড । পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা-৭০০০২০। ISBN 81-86908-66-8 (set). ISBN 81-7751-025-8 । পৃ: ১৮৭ ।

৯১ ভাদুড়ী সতীনাথ । ঢোঁড়াই চরিত মানস । (প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ একত্রে)। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,১৪বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,কলকাতা-৭৩।আগস্ট,২০০৬।পৃ. ৮৭ ।

৯২ তদেব পৃ: ৮৮-৮৯ ।

৯৩ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ । সাহিত্যের বিচারক, সাহিত্য । বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ , কলকাতা । শ্রাবণ ১৪০৬ । পৃ: ২৩ ।

৯৪ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত (সম্পাদক)। অন্নদামঙ্গল। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। কলকাতা-৬। শ্রাবণ ১৪০৪। পৃ. ২০৩।

৯৫ ঘোষ শঙ্খ। বাবরের প্রার্থনা। একালের কবিতা সঞ্চয়ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৩। পৃ. ১২৫।

৯৬ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ।কণিকা।মাঝারির সতর্কতা।বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।কলকাতা। ১৩৫৫। পৃ. ৬৪ ।

৯৭ বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র। নবম খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ISBN 81-86908-66-8 (Set), ISBN 81-7751-058-4. পৃষ্ঠা-৩৭৬।

৯৮ ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ। নাগরী। রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খন্ড। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ফাল্গুন ১৩৭০ : ১৮৮৫ শক। পৃ. ৭০।

৯৯ গিরি ড. সত্য (সম্পা:)। বৈষ্ণব পদাবলী। রত্নাবলী। ৩৯ এ, পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা ৯। বৈশাখ ১৪১০। এপ্রিল ২০০৩। পৃ. ৩১২ ।

১০০ তদেব পৃ: ৩১২ ।

১০১ কর বিমল। জননী। বাছাই গল্প। মন্ডল বুক হাউস। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ। মাঘ ১৩৯৩ সন। পৃ. ২৮৬।

১০২. কর বিমল । দেওয়াল (তৃতীয় খন্ড) । ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ । প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৯ । পৃ. ২৭০ ।

১০৩. তদেব পৃ:২৮৮ ।

১০৪. তদেব পৃ:২৭০-২৭১ ।

১০৫ তদেব পৃ:২৩৪ ।

১০৬. তদেব পৃ:২৩৫ ।

১০৭. তদেব পৃ:২৩৪-২৩৫ ।

১০৮ তদেব পৃ:৪৩৬ ।

১০৯ তদেব পৃ:৪৩৬ ।

১১০. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর । হাঁসুলীবাঁকের উপকথা । চারুলতা প্রকাশন। ২০৪, রাজা ধীরেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৮১। চতুর্থ প্রকাশ, বইমেলা ২০১১। পৃ: ৮৪ ।

১১১. বন্দ্যোপাধ্যায় দীপেন্দ্রনাথ। গল্পসমগ্র একুশ শতক। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৫। পৃ: ২৭৯

১১২. তদেব পৃ: ২৭৮ ।

১১৩. তদেব পৃ: ২৭৭ ।

১১৪. তদেব পৃ: ২৭৫ ।

১১৫. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার । বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা । মর্ডান, কলকাতা।২০১৭। পৃ: ৬০ ।

১১৬.. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র। দ্বিতীয় খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ISBN 81-86908-66-8 (Set), ISBN 81-86908-76-6. পৃ: ১৭৭-১৭৮ ।

১১৭. পাত্র প্রফুল্লকুমার (সম্পাদক), মধুসূদন রচনাবলী (অখন্ড সংস্করণ), পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ- অক্টোবর ২০০১। পৃ:৯৩ ।

১১৮ ঘোষ শঙ্খ । কবিতা সংগ্রহ । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৬৭।পৃ:২২৮।

১১৯. তদেব পৃ:২২৮ ।

১২০. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত (সম্পাদক)। অন্নদামঙ্গল। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। কলকাতা-৬। শ্রাবণ ১৪০৪। পৃ. ২০৩।

১২১.. গুপ্ত নীহাররঞ্জন । উল্ক ।, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ । ষষ্ঠ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪০৫, ISBN: 81-7293-193-X । পৃ. ৪৪ ।

১২২. চট্টোপাধ্যায় ড. পার্থ। বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা (প্রাচীন-মধ্য- আধুনিক যুগ। তুলসী প্রকাশনী। কলকাতা-৯। আগষ্ট, ২০১১। ISBN 81-89118-04-8 । পৃ. ৭৮৩ ।

১২৩. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ । বাংলা উপন্যাসের কালান্তর । দে'জ ,কলকাতা ৭৩, ৭ম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১৬। ISBN: 978-81-295-1474-5.পৃ. ৩৩০ ।

১২৪ সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার । অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড । গ্রন্থালয় প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯। পৃ.৩৬০ ।

১২৫ তদেব পৃ.৩৬০ ।

১২৬ তদেব পৃ.৩৬০ ।

১২৭ তদেব পৃ.৩৬৫ ।

১২৮ তদেব পৃ.৩৬৫ ।

১২৯ কর বিমল । দেওয়াল ((দ্বিতীয় খন্ড) । ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ । ফাল্গুন ১৩৬৪। পৃ.৫ ।

১৩০ তদেব পৃ.২৭৮ ।

১৩১ কর বিমল । দেওয়াল (তৃতীয় খন্ড) । ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ । প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৯ । পৃ.৩২৪-৩২৫ ।

১৩২. বসু বাণী। অমৃতা। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা।২০০১। ISBN 97881775613O2। পৃষ্ঠা: ১৬৮-১৬৯. ।

১৩৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। 'বোঝাপড়া'। সূর্যাবর্ত : রবীন্দ্র-কবিতা-সংকলন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা। চৈত্র ১৪০৭। ISBN-81-7522-292-1 পৃষ্ঠা: ১৮৫ ।

১৩৪ কর বিমল। বাছাই গল্প। মন্ডল বুক হাউস। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ। মাঘ ১৩৯৩ সন। পৃ. ১৬৬ ।

১৩৫ তদেব পৃ. ১৬৬-১৬৭ ।

১৩৬ তদেব পৃ. ১৬৭ ।

১৩৭ তদেব পৃ. ১৬৭ ।

১৩৮ তদেব পৃ. ১৬৭ ।

১৩৯ তদেব পৃ. ১৬৮ ।

১৪০ তদেব পৃ. ১৬৮ ।

১৪১ তদেব পৃ. ১৬৮ ।

১৪২ তদেব পৃ. ১৬৮ ।

১৪৩ তদেব পৃ. ১৬৯ ।

১৪৪ তদেব পৃ. ১৭০ ।

১৪৫ তদেব পৃ. ১৭০ ।

১৪৬. গুপ্ত নীহাররঞ্জন । উল্কা । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ । ষষ্ঠ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪০৫ । ISBN: 81-7293-193-X. । পৃ. ৫৪ ।

১৪৭ তদেব পৃ. ৪ ।

১৪৮ তদেব পৃ. ২৩ ।

১৪৯ তদেব পৃ. ১৬ ।

১৫০ কর বিমল। বাছাই গল্প। মন্ডল বুক হাউস। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ। মাঘ ১৩৯৩ সন। পৃ. ২৬ ।

১৫১. রায়গুপ্ত প্রদীপ।প্রজাপতির আকাশ। ঘর ফরার সময় ।অনুষ্টুপ প্রকাশনী ।কলকাতা।২০০১। পৃ.৭৫ ।

১৫২. তদেব পৃ. ৭৫।

১৫৩. তদেব পৃ. ৭৪।

১৫৪. ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ (অখন্ড সংস্করণ) । স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা ।২০০২।. পৃ. ২৭৫ ।

১৫৫. তদেব পৃ. ২৭৫ ।

১৫৬. তদেব পৃ.২৭৫ ।

১৫৭. তদেব পৃ. ২৭৭ ।

১৫৮. তদেব পৃ.২৭৮-২৭৯ ।

১৫৯ তদেব পৃ.২৭৯ ।

১৬০. তদেব পৃ. ২৭৯ ।

১৬১. তদেব পৃ. ২৭৯ ।

১৬২. তদেব পৃ. ২৭৮ ।

১৬৩. ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ (অখন্ড সংস্করণ) । স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা । ২০০২।. পৃ.৫৭২ ।

১৬৪. তদেব পৃ.৫৭২ ।

১৬৫. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র। দ্বিতীয় খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ISBN 81-86908-66-8 (Set), ISBN 81-86908-76-6. পৃ৪৬৩ ।

১৬৬. তদেব পৃ.৪২৩ ।

১৬৭. তদেব পৃ. ৪২৩ ।

১৬৮ তদেব পৃ. ৪২৩ ।

১৬৯ বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র। পঞ্চম খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ISBN 81-86908-66-8 (Set). পৃ. ২০৬ ।

১৭০. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর। হাঁসুলীবাঁকের উপকথা । চারুলতা প্রকাশন। ২০৪, রাজা ধীরেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৮১। চতুর্থ প্রকাশ, বইমেলা ২০১১। পৃ.১৪৬ ।

১৭১, তদেব পৃ.১৪৬ ।

১৭২ তদেব পৃ. ১৪৭ ।

১৭৩. তদেব পৃ.১৪৬ ।

১৭৪ তদেব পৃ.১৪৭ ।

১৭৫ তদেব পৃ.২০০ ।

১৭৬ Malinowski Bronislaw.Magic, Science and Religion and other Essays.Doubleday.Anchor Books.Garden City.New York.1984. p-47 ।

১৭৭ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর। হাঁসুলীবাঁকের উপকথা । চারুলতা প্রকাশন। ২০৪, রাজা ধীরেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৮১। চতুর্থ প্রকাশ, বইমেলা ২০১১। পৃ.৮৫ ।

১৭৮. তদেব পৃ.১৪০ ।

১৭৯ ঘোষ গৌরকিশোর (রূপদর্শী)। জল পড়ে পাতা নড়ে। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-২২। প্রথম সংস্করণ: বৈশাখ, ১৩৬৭ । পৃ: ১২৮।

১৮০ তদেব পৃ. ১২৮ ।

১৮১. বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে। প্রথম খন্ড। করুণা, কলকাতা। পৃ.১১ ।

১৮২. ঘোষ সুবোধ। রচনা সমগ্র (অষ্টম খন্ড) ,(সম্পাদনা-উত্তম ঘোষ, সমীরকুমার নাথ) ।নাথ পাবলিশিং, কলকাতা । ১৯৯৯। পৃ. ৯ ।

১৮৩ গিরি ড. সত্য (সম্পা:)। বৈষ্ণব পদাবলী। রত্নাবলী। ৩৯ এ, পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা ৯। বৈশাখ ১৪১০। এপ্রিল ২০০৩। পৃ.৩০২ ।

১৮৪. রবীন্দ্রসঙ্গীত। পূজা ও প্রার্থনা পর্যায়। সংখ্যা ৩০। রাগ সাহানা। তাল ঝাঁপতাল। রচনাকাল ১২৯১ বঙ্গাব্দ (১৮৮৫ খ্রী:)।

১৮৫ কঠোপনিষদ ১/৩/১৪। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী। প্রথম ভাগ। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। বসুমতী-সাহিত্য। ১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১২, ১৩৫৩। পৃ.২১২ ।

১৮৬ বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে। প্রথম খন্ড। করুণা, কলকাতা। পৃ.২৩২ ।

১৮৭. জয়কান্তন দন্ডপাণি। কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা। পাঠ উপকরণ (ইবিজি ৭)। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা। ২০১০। পৃ.২০৬ ।

১৮৮. পাত্র প্রফুল্লকুমার (সম্পাদক) । মধুসূদন রচনাবলী (অখন্ড সংস্করণ) । পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলকাতা । পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ- অক্টোবর ২০০১। পৃ.১৯৪ ।

১৮৯. ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ। সোনার তরী। বিশ্বভারতী। পৌষ ১৪০৮। ISBN- 81-7522-108-9। পৃ.৬২ ।

১৯০. Stedman, Edmund Clarence, A Victorian anthology. Cambridge : Riverside Press, 1895. pg145 ।

১৯১ ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ । সোনার তরী। বিশ্বভারতী। পৌষ ১৪০৮। ISBN- 81-7522-108-9 । পৃ.৬২ ।

১৯২ ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ । চয়নিকা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২১০ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা। পৌষ ১৩৪৪।পৃ .৩২৭ ।

১৯৩. দেবী মহাশ্বেতা । অরণ্যের অধিকার । করুণা, কলকাতা । ভাদ্র ১৪১২। পৃ.১৪ ।

১৯৪ তদেব পৃ ১৭ ।

১৯৫ তদেব পৃ ১৭ ।

১৯৬. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ।গীতবিতান (অখণ্ড)।বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।কলিকাতা।বৈশাখ ১৪০০।পৃ।২৫১

১৯৭. তদেব পৃ ২৫১ ।

১৯৮ English translation of Rudople Guilland`s essay on Byzantine eunuchs "Les Eunuques dans l`Empire Byzantin: Etude de titulature et de prosopographie Byzantines, vol. I (1943). pp- 197-238 ।

১৯৯ ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ । গল্পগুচ্ছ (অখন্ড সংস্করণ) । স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা । প্রথম সংস্করণ: দোল পূর্ণিমা মার্চ ২০০২। পৃ. ২৭৫ ।

২০০ তদেব পৃ. ২৭৫ ।

২০১ তদেব পৃ. ২৭৫ ।

২০২ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ । পত্রসংখ্যা ১১৯, ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) ছিন্নপত্র । বিশ্বভারতী । শ্রাবণ ১৪২৫। পৃ. ২৩৭-২৩৮ ।

২০৩ ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ । গল্পগুচ্ছ (অখন্ড সংস্করণ) । স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা । প্রথম সংস্করণ: দোল পূর্ণিমা মার্চ ২০০২। পৃ. ২৭৭ ।

২০৪ ঘোষ তপোব্রত । রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ । দে'জ, কলকাতা । ২০০৩। ISBN 81-7612-806-6. পৃ. ১৪৪ ।

২০৫ দেবী জ্যোতির্ময়ী । সোনা রূপা নয় । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৯। পৃ.২৫৮-২৫৯ ।

২০৬ তদেব পৃ. ২৬০ ।

২০৭ তদেব পৃ. ২৬০ ।

২০৮ তদেব পৃ. ২৬০ ।

২০৯ তদেব পৃ. ২৬০ ।

২১০ তদেব পৃ. ২৬২ ।

২১১. https://en.wikipedia.org/wiki/Eunuch ।

২১২ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর । হাঁসুলীবাঁকের উপকথা । চারুলতা প্রকাশন , কলকাতা । চতুর্থ প্রকাশ, বইমেলা ২০১১ । পৃ: ১৫৮ ।

২১৩ তদেব পৃ. ১৫৮ ।

২১৪ তদেব পৃ. ২৪৮ ।

২১৫ Bronislaw Malinowski; Magic, Science and Religion and other Essays; Doubleday Anchor Books; Garden City; N.Y.; 1948; page 47 ।

২১৬ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর । হাঁসুলীবাঁকের উপকথা । চারুলতা প্রকাশন , কলকাতা । চতুর্থ প্রকাশ, বইমেলা ২০১১ । পৃ: ৭৫ ।

২১৭ তদেব পৃ. ৭৫ ।

২১৮ https://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_%28South_Asia%29 ।

২১৯ মজুমদার কমলকুমার । মতিলাল পাদরী ‘গল্পসমগ্র’ । সুপ্রকাশনী, কলকাতা । ১৯৬৫। পৃ. ৭৫।

২২০ তদেব পৃ. ৭৬ ।

২২১ তদেব পৃ. ৭৬ ।

২২২ তদেব পৃ. ৭৬ ।

২২৩ চক্রবর্তী কমল । ব্রহ্মভার্গব পুরাণ । কৌরবী প্রকাশনী, জামশেদপুর । প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৩ । পৃ: ৫৩-৫৪ ।

২২৪ তদেব পৃ. ১২৩ ।

২২৫ বন্দ্যোপাধ্যায় সোমনাথ । অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা । প্রতিভাস, কলকাতা । ২০০২। পৃ: ১২ ।

২২৬ চক্রবর্তী স্বপ্নময় । হলদে গোলাপ । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, মাঘ ১৪২১, ISBN: 978-81-295-2318-1 পৃ. ১৭৭ ।

২২৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Lesbian ।

সপ্তম অধ্যায় :

বাংলা শিশু কিশোর সাহিত্যের ধারা ও নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

বাংলা শিশুসাহিত্যের সার্থক সূচনা বলতে পারি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' থেকেই হয়েছিল। ছোটদের রূপকথার গল্প শোনানোর পাশাপাশি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এলেন 'ছোট্ট রামায়ণ', 'মহাভারতের কথা', 'গল্পমালা', 'টুনটুনির বই' নিয়ে, যেখানে তিনি গল্পের পাশাপাশি ছোটোদের মনের চাহিদাও অনেকাংশে পূরণ করলেন। পরবর্তীকালে 'হাসিখুশি'র কবি যোগীন্দ্রনাথ সরকার শিশুমন অনুযায়ী সাহিত্য রচনা করেন। চিত্রশিল্পী অবনঠাকুর 'বুড়ো আংলা'য় কল্পবিজ্ঞান, 'খাজাঞ্চির খাতা' ও 'বাদশাহী গল্পে' উদ্ভট কল্পনার জাল বিস্তার করে 'রাজকাহিনী'তে কিশোর মনের কল্পনা বিলাস পূরণ করেন। অবনীন্দ্রনাথ যেখানে শেষ করলেন সেখান থেকেই সুকুমার রায় শুরু করেন গল্পের প্রয়োজনে উদ্ভট সব ভাষা (nonsense jargon) ব্যবহার, যা পাঠক মনে নির্মল আনন্দাভূতির উৎসার ঘটায়। এই সময় পরিবেশে লীলা মজুমদার তার পাঠকদের কল্পনার জগতে আনন্দ-বিহার না করিয়ে বরং সরাসরি কঠিন বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালের সুনির্মল বসুর রচনার উদ্ভট শব্দ ব্যবহার সুকুমার রায়কেই স্মরণ করায়। এই সাহিত্যধারায় আধুনিককালের লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়রা রয়েছেন।

আপাতভাবে তা মূল সাহিত্যধারার থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ধারার সাহিত্য বলে মনে করা হয়। শিশু সাহিত্য বলতে মূলত: রূপকথা, উপকথা, রাজকন্যা-রাজপুত্রের গল্প। কিশোর সাহিত্য শিশুসাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও আরেকটু বৈচিত্র্যময় সাহিত্য। প্রথমদিকে মূলত: বিনোদনের উদ্দেশ্যে শিশুসাহিত্যের সূচনা হলেও পরবর্তীকালে এর সঙ্গে প্রশিক্ষণ এবং নীতিশিক্ষায় যুক্ত হয়। কিশোর বয়স যেমন একই সঙ্গে শৈশব এবং যৌবনের সঙ্গে জড়িত, কিশোর সাহিত্যেও তেমনি রূপকথা, নীতিশিক্ষার সঙ্গে আসে অ্যাডভেঞ্চার-এর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। শিশু-কিশোর উভয় সাহিত্যেই মূলত: যে কটি বিষয় থাকে, বা বলা যায় শিশু-কিশোর সাহিত্যের পাঠকদের পছন্দের বিষয়গুলির মধ্যে থাকে রূপকথার গল্প, নীতিকথামূলক গল্প, হাসির গল্প, গোয়েন্দা গল্প, ভৌতিক গল্প,কল্প-বিজ্ঞানের গল্প, উদ্ভট গল্প প্রভৃতি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষীরের পুতুল’-(১৮৯৬) এ দেখি দু:খী সুওরানীর দাসীটি বোবা-কালা। শিশুরা এটা বুঝল শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এবং দু:খকষ্ট পরস্পরের সঙ্গী-সাথী। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যদশকে শিশুপাঠ্য কাহিনিতে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে যে ছবি পরিস্ফুটিত হয়েছে মদন মোহন শর্মা তর্কালঙ্কারের ‘শিশুশিক্ষা’ প্রথম ভাগে (১৮৫০), তার নিদর্শন,-

→ মানুষের দুই পা, যাহার পা আছে সেই চলিতে পারে, যাহার পা বিকল সেই খোঁড়া। দুই হাত। হাত দিয়া কাজ করা যায়। যাহার হাত নাই সে কিছুই করিতে পারে না, তাহাকে নুলো বলে।[১]

→ আমাদের জিভ, তালু দাঁত ঠোঁট আছে, অতএব কথা কহিতে পারি। যে কথা কহিতে পারে না লোকে তাকে বোবা বলে।.....[২]

→ কান না থাকিলে আমরা কথা শুনিতে পাইতাম না। কালারা কিছু শুনিতে পায় না।.....[৩]

→ কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না, তাহা বলিলে তাহারা মনে দু:খ পাইবে।[৪]

বইটির দ্বিতীয় ভাগে ‘অন্ধজনে দয়া করো’ শীর্ষক আখ্যানে ছোট্ট বাচ্চাটি অন্ধব্যক্তিকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে এসে মায়ের থেকে অর্থ এবং বস্ত্র সাহায্য চাইলে শিশুমাতা শিশুর কোমলার্দ্র হৃদয়ে আহ্লাদিত বোধ করলেও আসলে প্রতিবন্ধী মানুষজনদের অক্ষমতার প্রতি সমাজের করুণার দৃষ্টিই প্রতিফলিত হয়েছে।

কালের অগ্রগতিতে সাহিত্যের ক্রমপরম্পরায় লীলা মজুমদার এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যে প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যাবার ক্ষেত্রে মানুষ এবং সমাজের পরিবর্তন ইতিবাচকতার স্বাক্ষরবাহী।

সর্দারের ছেলে ও ভাল্লুকের ছানা (হলদে পাখির পালক : লীলা মজুমদার)

লীলা মজুমদারের একটি অসাধারণ উপন্যাস ‘হলদে পাখির পালক’ (১৯৫৭)। স্বপ্ন ও বাস্তবের অসাধারণ মিশ্রণ ঘটেছে এখানে। দুমকার বিচিত্র সব গল্প রয়েছে এখানে। ডানাওয়ালা পক্ষীরাজ ঘোড়া, নীল মৎস্যকন্যা, সুন্দরী ময়ূর-মানবী, সোনার মত উজ্জ্বল হলুদ রঙের পাখি সব মিলিয়ে শিশুমনোরঞ্জন অসাধারণ রূপকথার বুনোট, এদের মধ্যেই একটা জঙ্গলের দাবানলের কাহিনি রয়েছে। যেখানে দাবানলে বেরিয়ে আসছে একটা ভাল্লুক। তার সাথে রয়েছে তার ছোট্ট ছানাটা। যে পায়ে ক্ষতের জন্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। ভাল্লুককে দেখে সর্দার তীর নিক্ষেপে প্রস্তুত। কারণ এর

আগে সর্দারের ছোট ছেলের পা চিবিয়ে খেয়েছিল ভাল্লুকটা। সুতরাং দারুণ একটা প্রতিশোধের সুযোগ। বাচ্চারা যারা গল্পটা পড়ছে তারাও বেশ উত্তেজিত। এই সময় লীলা মজুমদার দেখালেন ভাল্লুক এই বিপদে পড়ে তার শাবককে জড়িয়ে ধরে তাকিয়ে রয়েছে তীরোদ্যত সর্দারের দিকে। আর সর্দারও শরসন্ধান না করে অন্যত্র চলে গেলেন। আর এরপর লীলা মজুমদার বললেন, জন্তু-জানোয়ারকে ভালোবাসা চাট্টিখানি কথা নয়। কুকুর-বেড়ালকে ধরে আটকে রেখে ভালোবাসাটাই ভালোবাসা নয়। প্রকৃত ভালোবাসা উদারতা শেখায়। এখানে ভাল্লুকের ছানা এবং সর্দারের ছেলে দু'জনেই পায়ে ক্ষতের জন্য হাঁটাচলায় স্বচ্ছন্দ নয়। সমাজের চোখে এরা ল্যাংড়া। কিন্তু এই চরিত্ররাই উদারতার শিক্ষা দিয়ে গেল। প্রতিশোধস্পৃহা নয় ক্ষমাই পরম ধর্ম।

পানু (নেপোর বই : লীলা মজুমদার)

লীলা মজুমদারের আরেক চরিত্র পানু। 'নেপোর বই' (১৯৬৯) উপন্যাসের নায়ক সে। গাছ থেকে পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়ায় আঘাত পাওয়ার জন্য তার হাঁটাচলায় সমস্যা হচ্ছে। সাতমাস ধরে সে হাঁটতে পারছে না। যদিও ডাক্তার বলেছে এটা তার মনের রোগ। পানু নাকি ইচ্ছা করলেই আবার হাঁটতে পারবে। হঠাৎই একদিন দেখা গেল পানুর সামনে তার বন্ধুরা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। তখন পানু তাদের সুস্থ করার জন্যা তাড়াতাড়ি তাক থেকে কুঁজো পেরে জল দিতে গিয়ে দেখল, সে দিব্য চলতে পারছে। অর্থাৎ পানুর পা ভাল হয়ে গেল। সে প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠল। পানুর এই সাময়িক চলৎশক্তিহীনতাকে লীলা মজুমদার সাময়িক সমস্যা-আবর্ত হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। মনের জোরে যেকোনো সমস্যা থেকে উত্তরণ করা সম্ভব এটা দেখাতে চাইলেন লেখিকা ।

পুঁটি (কাঠের ঘোড়া : লীলা মজুমদার)

পুঁটি, একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়ে পুঁটি লীলা মজুমদারের 'কাঠের ঘোড়া' গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র। রিক্‌শা থেকে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে জখম থাকার জন্য পুঁটির একটা পা ছোট হয়ে গেছে। পুঁটি রাস্তায় চললে তাকে দেখে সবাই হাসাহাসি করে। সম্ভবত সেই কারণেই সে দাদু-দিদার কাছেই থাকে। পুঁটি সারাদিন খাটে শুয়ে থাকে আর নিজের দুরাবস্থার জন্য কান্নাকাটি করে। যে খাটে সারাদিন পুঁটি শুয়ে থাকে তার চারটে পায়ার মধ্যে একটা ঘোড়ার আকৃতির আর বাকি গুলো সাধারণ আকৃতির। এই ঘোড়ার আকৃতির পায়াটা রোজই পুঁটির কাছে বলতে থাকে পুঁটি যেন ঐ বাকি তিনটে পায়াকেও ঘোড়া করে দেয়। যাতে ঐ একটি পায়ার একাকীত্ব কাটতে পারে। কিন্তু পুঁটি নিজের দু:খের জগতে এতটাই নিমগ্ন থাকে যে সেই পায়ার কথা তার ভাববার সময়ই নেই। তারপর হঠাৎই একদিন পুঁটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমন্ত-জাগন্ত অবস্থায় দেখে ভোর হয়ে গেছে। তখন পুঁটি উঠে

এসে দেখে খাটের পায়াগুলোর কাছে ছুতোরের যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। তা দেখে পুঁটি খাটের ঐ বাকি তিনটে পায়াতেও ঘোড়া খোদাই করার কাজ শুরু করল। এই কাজ করার সময় ঐ নির্মীয়মান ঘোড়াগুলো পুঁটিকে নানারকম নির্দেশ দিতে থাকে। আর তার অন্যথা হলেই ঘোড়াগুলো পুঁটির খারাপ হাঁটুটায় লাথি মারতে থাকে। একেবারে শেষপর্যায়ে এসে দেখা যায়, ঘোড়া তিনটি নির্মাণও সম্পূর্ণ হয়েছে আর পুঁটির হাঁটুর ক্ষতও সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছে। খাটের চারটে পায়া সমান হয়ে গেল আর পুঁটির দুটো পাও সমান হয়ে গেল। অর্থাৎ লীলা মজুমদার এখানে দেখালেন আত্মকরুণা (self-pity) থেকে বেরিয়ে এসে গঠনাত্মক কাজে নিয়োজিত হতে পারলে প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

কুমু (পাখি : লীলা মজুমদার)

লীলা মজুমদার 'পাখি' ছোটোগল্পে কুমু নামক আরেকটি ছোট মেয়ের কথা বলেছে। কঠিন অসুখের জন্য সে তার ডান পা এক বিঘত-এর বেশি তুলতে পারে না। সেও নিজের বাড়ি ছেড়ে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে মুখ লুকিয়ে থাকে। সারাদিন দোতলার একট ঘরে শুয়ে থাকে আর নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে মন খারাপ করে। সে বাড়িতে থাকা একটা ছেলে কুমুকে ল্যাংড়া বলে খেপায়। ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে একদিন কুমু দেখে একঝাঁক পরিযায়ী পাখি উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎই একটা পাখির গুলি লাগে। আর সে পড়ে যায়। তখন তাদের বাড়িতে থাকা ছেলেটা পরিযায়ী পাখিটাকে যথাসম্ভব সেবা শুশ্রূষা করে। শেষে একদিন পাখিটা সুস্থ হয়ে তার দলের সাথে উড়ে যায়। জানলা দিয়ে এই ঘটনাটা দেখতে দেখতে কুমু উপলব্ধি করে পরিযায়ী পাখিটা একটা ডানা ছোটো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যখন আবার স্বাভাবিক স্রোতে মিশে যেতে পারল তখন কুমু কেন পারবে না? পাখির জীবনসংগ্রাম survival দেখে কুমুরও প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের সদিচ্ছা দেখানোয় লীলা মজুমদার আবার দেখালেন জীবন মানেই সংগ্রাম। সবসময় যে happy ending হবে, স্বপ্নপূরণ হবে তা নয়। 'কাঠের ঘোড়া' গল্পে পুঁটির পা একদম সেরে গেছিল। কিন্তু কুমু তার সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই এগিয়ে চলল জীবনের পথে। লীলা মজুমদার দেখালেন পৃথিবীতে সবাই কিছু না কিছু প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আছে। কিন্তু তাকে মেনে নিয়ে স্বাভাবিক জীবনস্রোত চালাতে হবে।

তানি (তানির ডায়েরী : লীলা মজুমদার)

'তানির ডায়েরী' গল্পে লীলা মজুমদার আরেকরকমভাবে এই সক্ষমতার-অক্ষমতার ধারণাটি ব্যক্ত করলেন। তানির পায়ের সবকটা আঙ্গুল তলার দিকে দুমড়ানো। তাই সে গোঁড়ালিতে ভর দিয়ে হাঁটাচলা করে। সবাই তাইজন্য তাকে ল্যাংড়া বলে। এমনকি তার কনিষ্ঠ পুণ্যও তাকে দাদা বলে না, ল্যাংড়াই বলে। বাড়িতে বড়রাও হতচ্ছেদা করে। তখন মনের দু:খে তানি একদিন জঙ্গলে

চলে যায়। সেখানে দূর থেকে দেখে এক বিরাট কালো জন্তু, যাকে তানি কালো বড়ো বিড়াল ভাবলেও, আসলে সেটা ছিল একটা মস্ত চিতাবাঘ। সেই জন্তুটা বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছিল, এদের মধ্যে একটা বাচ্চাকে সবাই দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। এমনকি মা-ও তাকে দেখছিল না। কারণ বাচ্চারা খারাপ দেখতে, রোঁয়া ওঠা। তাকে কেউ চায় না। এই বাচ্চাটার সাথে তানি একাত্ম অনুভব করল। কারণ বলাইবাহুল্য পরিবারেও তার অবস্থা শারীরিক অস্বাভাবিকত্বের জন্য একেবারে অবাঞ্ছিতের মত। তখন তানি গিয়ে সেই বাচ্চাকে উদ্ধার করে নিজের ফতুয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে চলে আসে। এদিকে শিকার করার জন্য এক সাহেব সেখানে ছিলেন। তিনি সমস্ত দেখে ভাবলেন তানি তো ভারি সাহসী। তাই তার উপকার করার জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং শেষপর্যন্ত তানির পা-ও সেরে যায়। তানির গল্পে লীলা মজুমদার দেখালেন শুধু নিজের দু:খে কাতর থেকে থেমে থাকলে চলবে না; বরং আরও অনেক দু:খ আছে পৃথিবীতে। অন্য দু:খীকে সাহায্য করলে নিজের দু:খ-sorrows-sufferings থেকেও পরিত্রাণের পথ ঠিকই পাওয়া যায়।

নয়টি ভূত (অহিদিদির বন্ধুরা : লীলা মজুমদার)

বাচ্চাদের একটি অন্যতম প্রিয় বিষয় ভূতের গল্প। শিশুমনস্তত্ত্বের প্রকৃত সমঝদার লীলা মজুমদার ভৌতিক বাতাবরণের গল্পও লিখলেন। 'অহিদিদির বন্ধুরা' গল্পে দেখি অহিদিদি বাচ্চাদের খুব যত্ন করে খাওয়ান। খাবারের শেষে মশলাও দেন। এই বাচ্চাদের মধ্যে নয়টি বাচ্চা কোনো কথা বলে না। একটি বাচ্চা কেবল খোনা খোনা গলায় অল্পবিস্তর কথা বলে। জানা যায় দীর্ঘ কয়েক বছর আগে এই বাড়িতে একবার পুলি-পিঠের অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই দশটি বাচ্চাও সেখানে খেতে এসেছিল। খাবার পর তাদের প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচি উল্লাসে বাড়ির মালিক রেগে গিয়ে নয়টি বাচ্চার জিভ কেটে দেয় আর একটি বাচ্চা বেঁচে যায়। এই দশটি বাচ্চাই ভূত হয়ে আসে অহিদিদির কাছে। অনেকে এটিকে Horror Story বলতে চান, উদ্ভট গল্পও বলতে চান। কিন্তু লীলা মজুমদার বাচ্চাদের দেখালেন দয়ার মত পরমধর্ম বহু বছর পরেও মানুষের মনের ক্ষত নিরাময় করতে পারে।

বুড় ও তার পোষ্যরা (চিড়িয়াখানা : লীলা মজুমদার)

'চিড়িয়াখানা' গল্পে দেখি বিশুর কাহিনি। একদিন বড়বাজারে বিশুর বাবার পকেটমারি হয়ে যায়। তাতে বিশুর বাবার মাইনের সবটাকা শেষ। এখন বিশুদের খুব দু:খ। পূজোয় নতুন জামা হবে না, গৌহাটিতে দিম্মার বাড়ি যাওয়াও হবে না বিজয়ার পর। পকেটমারির সময় বিশুর বাবা শুধু দেখেছিল লোকটার বুড় আঙ্গুলের নখটা ছ্যাঁচা। এখন মনের দু:খে রাগ করে বিশু জঙ্গলে চলে যায়। সেখানে গিয়ে দেখতে পেল একটা লোক মাছ ধরছে। লোকটার বুড় আঙ্গুলের নখটা ছ্যাঁচা। বিশুর

আর বুঝতে বাকি থাকে না যে এই লোকটাই তার বাবার মাইনের সব টাকা নিয়ে নিয়েছে। আলাপ করে এই লোকটার বাড়ি গেল বিশু। সেখানে গিয়ে দেখল সামনে জাল লাগানো অনেকগুলো খাঁচা। তাতে একরাশ পাখি। বিশু যখন লোকটাকে বলছে যে আকাশের মুক্ত পাখিকে লোকটা খাঁচায় আটকে রাখছে কেন? লোকটা জানিয়েছিল তার খাঁচায় সেইসব পাখিই রাখা আছে যাদের ডানা ভাঙ্গা, ঠ্যাং খোঁড়া। এরা আকাশে উড়তে পারে না। তাই ছেড়ে দিলে কাক প্যাঁচারা যাতে ঠুকরে খেয়ে না ফেলে তাই কুড়িয়ে এনে খাঁচায় রেখেছে এদের। এবার বিশু দেখে একটা বেঁজি রয়েছে। লোকটা জানায় যে বেঁজিটার তিনটে ঠ্যাং খোঁড়া। তাই সে পাখি ধরে খেতে পারার স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়েছে। তার একটা ঠ্যাং নেই। তাই সাপের ভয়ে সে পাখিদের খাঁচার উপর ছাদে বসে থাকে। এই চিড়িয়াখানায় একটা ধেড়ে কালো সাপও আছে। কিন্তু তারও বিষদাঁত নেই, শিরদাঁড়া ভাঙা, চলতে পারে। বাইরে বেরালে শিয়ালে খাবে। তবে এই চিড়িয়াখানায় একটা শিয়ালও আছে, সে আবার চোখে দেখে না। অর্থাৎ লীলা মজুমদার দেখালেন এখানে প্রত্যেকটি সদস্যের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। কিন্তু তবুও এরা একত্র সহাবস্থান করছে। তাদের প্রত্যেকের সীমাবদ্ধতা নিয়ে তারা বেঁচে আছে। সব থেকে বড় কথা এই যে লোকটা এদের ভরণপোষণ করছে, তার নিজেরও খুব বেশি সম্বল নেই। তবুও নিজের যখন যা জোটে তাই দিয়ে নিজের সাথে অন্যের পেট ভরানোর মত উদার মানসিকতা লীলা মজুমদার দেখাতে চাইলেন। গল্পের শেষে দেখব যে মানুষটার উপর বিশুর প্রচন্ড রাগ হয়েছিল, তাকেই জড়িয়ে ধরে বিশু বলছে তুমি মরে যেও না। তুমি না থাকলে এদের কি হবে। অর্থাৎ বিশু যে নিজে দু:খকষ্টে আছে সে তার দু:খকষ্টের কারণের প্রতি প্রতিশোধস্পৃহায় তার ক্ষতি করল না। বরং বিশু এটা বুঝতে পারল যে, যে উদারতা সে বা তার মত অনেকে দেখাতে পারেনি, তা দেখাতে পেরেছে এই বুড় আঙ্গুল ছ্যাঁচা, গায়ে গন্ধওয়ালা বিশ্রী পচা লোকটা। তাই বিশু শেষপর্যন্ত এই লোকটার মহত্ত্বকে যথার্থ সম্মান জানিয়েছে। বিশুর মত বাচ্চাও বুঝতে পেরেছে টাকার প্রকৃত দরকার কোথায়-কতটা?

লীলা মজুমদার শিশু-কিশোর সাহিত্যের ধারায় এ এক অভিনব আঙ্গিক রূপায়ণ করলেন। লীলা মজুমদার শিশুদের সরাসরি দেখালেন পৃথিবীটা মোটেই ঠিক সুবিধার জায়গা নয়। প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করতে হবে। তাই তার শিশু-কিশোর সাহিত্যে দেখব অনেক বাচ্চা আছে যাদের পা খুঁতো। কিন্তু তারাই আবার অন্যকে সাহায্য করেছে। আবার প্রতিবন্ধী বাচ্চারাও কাউকে পাশে পেয়েছে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য। লীলা মজুমদার আসলে বলতে চেয়েছেন খারাপ-ভালো-দুই-ই জানতে হবে। খারাপের মধ্যে থেকে প্রসন্নতাটুকুকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। দয়া ক্ষমার মধ্য দিয়ে কান্নাকাটির স্তর পেরিয়ে আলোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে।

ছোটোদের জন্য লেখা মানেই চরিত্র হিসাবে আসবে পশুপাখিরা। শিশুর সাথে অবলা প্রাণীরা খুব সহজেই বন্ধুত্ব করে ফেলতে পারে। 'সুভা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন বাক্‌হীনা বালিকা সুভার সঙ্গে প্রকৃতি ঐকলগ্নতা। সর্বশী-পাঙ্গুলি নামক দুটি গাভীর সাথে সুভার নীরব কথোপকথন। লীলা মজুমদারের গল্পেও বাচ্চাদের বন্ধু হিসাবে পশুপাখি এল। তারাও প্রতিবন্ধকতার শিকার হিসাবে দেখানো হল। এবং সেই প্রতিবন্ধকতা নিয়েই কিন্তু প্রতিটি পশুচরিত্র জীবনসংগ্রামে চরৈবতির সুরমূর্ছনা সৃষ্টি করল। অর্থাৎ লীলা মজুমদার দেখাতে চাইলেন জীবনে যে কোনো মুহূর্তে যে কারোর যে কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা আসবে এবং তাকে পেরিয়ে যেতে হবে।

কাকাবাবু (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই উজ্জ্বল সৃষ্টি কাকাবাবু। যদিও তাঁর আরও একটি নাম আছে রাজা রায়চৌধুরী। কিন্তু কাকাবাবু নামেই তিনি বেশি পরিচিত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভয়ঙ্কর সুন্দর' রচনায় তাঁর আর্বিভাব। আর শেষ উপস্থিতি 'গোলক ধাঁধায় কাকাবাবু'তে। ইতিহাসবেত্তা গবেষক কাকাবাবু ভারতসরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা। একবার আফগানিস্তানে গিয়ে জনৈক বন্ধু কামালকে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে গিয়ে কাকাবাবু নিজে পঙ্গু হয়ে যান। কিন্তু এই পঙ্গুত্ব কাবু করতেও পারেনি কাকাবাবুকে। কাকাবাবুর চলার পথ স্তব্ধ করতে পারেনি ক্র্যাচ। বরং এই দুর্বলতাই শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল কাকাবাবুর। এই ক্র্যাচকেই কাকাবাবু বিভিন্ন কাহিনিতে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।

বেশ কিছুদিন কাকাবাবু সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন তথা সি.বি.আই. এর উপদেষ্টা পদেও আসীন ছিলেন। কাকাবাবুর বিশেষ বন্ধু স্থানীয় ছিলেন এই সি.বি.আই. এর কর্মকর্তা নরেন্দ্র ভার্মা মহাশয়। কাকাবাবুর এই বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী ছিলেন ভাইপো সুনন্দ রায়চৌধুরী ওরফে সন্তু, আর সন্তুর বন্ধু জোজো। শুধুমাত্র দেশেই নয়, কাকাবাবুর এই অ্যাডভেঞ্চার ঘটেছিল বিদেশের বিভিন্ন জায়গাতেও।

সে দেশই হোক আর বিদেশ, বেশিরভাগ অ্যাডভেঞ্চারই ঘটেছে কাকাবাবুর বেড়াতে গিয়ে। আসলে মানুষটা দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালোবাসে। অজানাকে জানার নেশা কাকাবাবুর পায়ে চাকা লাগিয়েছে। কাকাবাবুর প্রতিটি অ্যাডভেঞ্চারেই তাই নতুন নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে থাকে পাঠক।

মোট ৩৬টি উপন্যাস এবং ৬টি গল্প লেখা হয়েছে কাকাবাবুকে নিয়ে। সেগুলি হল-

উপন্যাস:ভয়ঙ্কর সুন্দর (১৯৭১),সবুজ দ্বীপের রাজা (১৯৭৬),পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক (১৯৭৯-৮০), ভূপাল রহস্য (১৯৮২),জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল (১৯৮৬),জঙ্গলগড়ের চাবি (১৯৮২-৮৩),খালি জাহাজের রহস্য (১৯৮৩), কলকাতার জঙ্গলে (১৯৮৫),নীলমূর্তি রহস্য (১৯৮৬-৮৭),রাজাবাড়ির রহস্য (১৯৮৭), বিজয়নগরের হীরে (১৯৮৮),কাকাবাবু ও বজ্রমালা (১৯৮৯),উল্কা রহস্য (১৯৯০),কাকাবাবু হেরে গেলেন? (১৯৯১),সন্তু ও এক টুকরো চাঁদ (১৯৯২),আগুন পাখির রহস্য (১৯৯৩),কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি (১৯৯৮),সন্তু কোথায়? কাকাবাবু কোথায়? (১৯৯৫),কাকাবাবুর প্রথম অভিযান (১৯৯৬),জোজো অদৃশ্য (১৯৯৭),কাকাবাবু ও চন্দন দস্যু (১৯৯৮),কাকাবাবু ও এক ছদ্মবেশী (১৯৯৯),কাকাবাবু ও শিশুচোরের দল (২০০০),কাকাবাবু ও মরণফাঁদ (২০০১),কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার (২০০২),কাকাবাবু ও আশ্চর্য দ্বীপ (২০০৩),কাকাবাবু ও সিন্দুক রহস্য (২০০৪),কাকাবাবু ও একটি সাদা ঘোড়া (২০০৫),এবার কাকাবাবু আর বাঘের গল্প (২০০৮),আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে (২০০৯),আরবদেশে সন্তু কাকাবাবু (২০১০), কাকাবাবু ও জলদস্যু (২০১১),গোলকধাঁধায় কাকাবাবু (২০১২)।

ছোটগল্প: কাকাবাবু বনাম মূর্তিচোর (১৯৯৭),একটি লাল লঙ্কা (১৯৯১),সাধুবাবার হাত (১৯৯২), মহাকালের লিখন (১৯৯০),জয় গোমস ভার্সেস কাকাবাবু ,জোজো সন্তুর গল্প কাকাবাবুর উত্তর (২০০২)।

কাকাবাবুর আরেকটি নেশা ম্যাপ দেখা। সময় পেলেই তিনি বিভিন্ন জায়গার ম্যাপ দেখেন। ম্যাপের বইও আছে তার কাছে। কোনো নতুন জায়গায় গেলে আগে সে সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশুনা করে নেন কাকাবাবু।

অকৃতদার কাকাবাবু অদম্য সাহস এবং মনের জোর আর তার সাথে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। প্রতিবন্ধকতা জয় করে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে এতটাই অনুপ্রেরণা রয়েছে যে তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই নবজাগরণের দীপ্ত বাণীতে সোচ্চার।

কাকাবাবু চরিত্রটি এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকবার চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে।-১৯৭৯ সালে সবুজ দ্বীপের রাজা,১৯৯৫ সালে কাকাবাবু হেরে গেলেন, ২০০১ সালে এক টুকরো চাঁদ,২০১৩ সালে মিশর রহস্য (পরিচালক: সৃজিত মুখোপাধ্যায়),২০১৭ সালে ইয়েতি অভিযান,২০১৯ সালে কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন।

এছাড়াও খালি জাহাজের রহস্য (১৯৯৯, পরিচালনায় সুরজিৎ সেনগুপ্ত, ডি ডি বাংলা ১৩ পর্ব), জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল, কলকাতার জঙ্গলে টেলিফিল্মও হয়েছিল। কাকাবাবুর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সমিত ভঞ্জ, সব্যসাচী চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন চক্রবর্তী, সুমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিভিন্ন অভিনেতা। ২০০৮-০৯ সালে কলকাতা দূরদর্শনে সুব্রত দাস ও সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সম্প্রচারিত হয়েছিল কাকাবাবু ফিরে এলেন।

কথাশেষ

সাহিত্যের একটি বিশেষ ক্ষেত্র শিশু-কিশোর সাহিত্য। মূলত: গল্প শোনার প্রবণতা থেকেই সাহিত্যের শুরু। তবে শিশু-কিশোর সাহিত্য বললে মনে হয় তা যেন মূলস্রোত সাহিত্য থেকে বেশ কিছুটা দূরবর্তী। একটু এড়িয়ে চলার সাহিত্য। বাচ্চাদের সামনে যেন সবকিছু বলা যায় না। তাই বাচ্চাদের সাহিত্যের খোরাক মোটামুটি বেশ সব পেয়েছির দেশের গল্প। আনন্দ-উজ্জ্বল আলো চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। এই অধ্যায়টিতে শিশু-কিশোর সাহিত্য থেকে অল্প কয়েকটি কথাসাহিত্য নির্বাচন করেছি যারা বিশেষভাবে সক্ষম। বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদারের কয়েকটি চরিত্র এখানে আলোচনা করা হল। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য প্রতিবন্ধী চরিত্র। এই অধ্যায়ে সেই সব শিশু-কিশোর চরিত্র আলোচ্য যারা প্রতিবন্ধকতার শিকার। এক্ষেত্রে কয়েকটি চরিত্রকে নির্বাচন করে আলোচনা করা হল।

শিশু-কিশোর সাহিত্যে পশুবিষয়ক কাহিনি, উপকথা-এগুলি বারবার ঘুরে ফিরে আসে। শিশু-কিশোররা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে খুব বেশি। 'সুভা' গল্পে সুভাষিণী প্রকৃতিকন্যা হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। সর্বশী ও পাঙ্গুলি নামক দুই গোরু মূক সুভার কথা বলার সঙ্গী। সুভার না বলা কথা বুঝতে পারছে অবলা জীব এবং প্রকৃতিমাতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা' গল্পের সুভাষিণী বালিকা। শিশু-কিশোরদের মনস্তত্ত্ব অনেকসময়ই যে বড়রা বুঝতে পারেন না তা দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তবে এক্ষেত্রে সুভা আবার মূক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা' অবশ্যই বড়দের গল্প। কন্যাবিবাহ সমস্যা, কন্যাদায়গ্রস্ত অসহায় পিতামাতা, নির্মম সামাজিক রীতিনীতি, নিয়মকানুন- এসব 'সুভা' গল্পটিতে বড়দের গল্প করে তুলেছে। সুভা কিন্তু বড় নয়, শিশু-কিশোর চরিত্র সুভা। সমাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে সুভার মত অল্পবয়সীরাও রেহাই পায় না।

লীলা মজুমদার শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসে তিনি শিশুদের সামনে কঠোর বাস্তবকে খুব সহজেই তুলে ধরলেন। সাধারণভাবে বড়দের সব

কথাবার্তা শিশু-কিশোরদের সামনে বলা হয় না। কিন্তু লীলা মজুমদার প্রথমেই কাহিনির শুরুতেই কঠিন কঠিন কথা বলে দেন বাচ্চাদের। 'হলদে পাখির পালক' উপন্যাসে বাচ্চার জানছে একটা ভাল্লুক সর্দারের ছেলের পা চিবিয়ে খেয়ে নিচ্ছে। এতে গল্পকার বীভৎসরসের সৃষ্টি করলেন না পাঠকচিত্তে, বরং এই হিংসা-হানাহানির ব্যাপারটা যে অত্যন্ত বাস্তব তা দেখালেন। এর ফলে সর্দারের মনেও ভাল্লুকের প্রতি একটা প্রতিশোধস্পৃহা জন্ম নিল। এই যে রাগ, ক্ষোভ, প্রতিশোধস্পৃহা এগুলি সবই মানবিক গুণাবলী, যেগুলি লীলা মজুমদার শিশুদের সামনে চেপে রাখলেন না।

লীলা মজুমদারের আরেকটি উপন্যাস 'নেপোর বই'-এর পানু গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মেরুদন্ডে এমন আঘাত পায় যে সে আর হাঁটতে পারে না। তার কষ্টগুলো লীলা মজুমদার খুব অবলীলায় দেখালেন পাঠকদের। শিশু মনস্তত্ত্বের একটা বিশেষ দিক বন্ধুপ্রীতি- এটিকেই মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলেন লীলা মজুমদার। অসুস্থ বন্ধুকে জল দিতে গিয়ে পানুর অসুস্থতা সেরে যায়। পানুর না হাঁটতে পারা সম্পর্কে অবশ্য ডাক্তার বলেছিল যে, হাঁটতে না পারাটা পানুর মনের রোগ। লীলা মজুমদার শিশুমনস্তত্ত্বের গহনতার সন্ধানী বাচ্চাদের দেখালেন যে, যেকোনো প্রতিবন্ধকতাকে জয় করা যায় মনের জোরে। অর্থাৎ শিশুদের সামনে পানুর অসহায়তা, অনুকম্পার পাত্র হওয়া একদিকে, আরেকদিকে মনের জোরে পানুর হাঁটতে পারা- দুটোই দেখালনে লীলা মজুমদার।

লীলা মজুমদারের গল্পেও ছোটো ছোটো বাচ্চাদের সাথে পশু-পাখির নিবিড় একাত্মতা রয়েছে। 'চিড়িয়াখানা' গল্পে দেখি বিশু নামক বাচ্চা ছেলেটি বুড় আঙ্গুল ছ্যাঁচা লোকটার ওপর ভীষণ রাগ করেছে, কারণ লোকটা তার বাবার পকেট থেকে মাইনের সব টাকা তুলে নিয়েছে, ফলে বিশুদের পুজোয় নতুন জামা হবে না, তারা দিদিমার বাড়িও ঘুরতে যেতে পারবে না। শিশু পাঠকদেরও মন ভার হয়ে যায়। কিন্তু এরপরই বিশু যখন জানতে পারে, আঙ্গুল-ছ্যাঁচা বাজে লোকটা সেই টাকা দিয়ে প্রতিবন্ধী সব পশুপাখিদের ভরণ পোষণ করে, তখন এক মহত্বের সঙ্গে একাত্ম হয় বিশু ও সমস্ত পাঠকদের হৃদয়। বিশু বলে তার টাকা চাই না, বরং সে চায় যাতে ওই বাজে বুড় লোকটা যেন ভালো থাকে, কারণ বুড় লোকটা ভালো থাকলেই পশুপাখিরা ভাল থাকবে। এখানেও লীলা মজুমদার প্রতিবন্ধী কিছু পশুপাখি চরিত্রের অবতারণা করে শিশুদের মহত্ত্ব, ঔদর্য, ক্ষমাশীলতার শিক্ষা দিলেন। 'তানির ডায়েরী' গল্পেও লীলা মজুমদার পঙ্গু পা নিয়ে তানি এবং এক বিকৃতরূপী নেকড়ের বাচ্চার মধ্যে সমপ্রাণতা সৃষ্টি করে সাহসিকতার পুরস্কারস্বরূপ পা সুস্থ হবার গল্প বললেন।

'কাঠের ঘোড়া' গল্পে লীলা মজুমদার দেখালেন পুঁটির খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা দেখে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। বাচ্চা মেয়ে পুঁটির মনে তাই খুব দু:খ। পাঠকদের এই কাহিনি পড়ে

মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করেননি লীলা মজুমদার। পুঁটি দাদু-দিদার কাছে থাকত এই সমাজের হাস্যস্পদ থেকে মুখ লুকিয়ে। বাচ্চাদের কাছে দাদু-দিদার বাড়ি অর্থাৎ মামার বাড়ি চিরকালের বেশ আকর্ষণীয় একটা জায়গা, যা সেই বয়সে সব পেয়েছির দেশ। কিন্তু পুঁটির কাছে সেই পরম প্রিয়বাড়িটা খুব একটা সুখকর নয়। পুঁটির কাছে তার বাবা-মাও থাকেন না। এই পরিস্থিতিটা বাচ্চাদের খুব মনোরম নয়। কিন্তু লীলা মজুমদার এই পরিবেশই বাচ্চাদের দেখালেন এবং দেখালেন পুঁটি কিভাবে তার দু:খ থেকে উত্তীর্ণ হল যখন সে তার দু:খবিলাস বন্ধ করে খাটের পাগুলো সবকটি ঘোড়ার আকারে গড়ল। এখানেও লীলা মজুমদার দেখালেন দু:খকে কিভাবে জয় করতে হয়।

লীলা মজুমদারের 'পাখি' গল্পে কুমুকে সারাদিন ল্যাংড়া বলে সবাই খেপাত। এটা কুমুকে যেমন দু:খ দিত, বলাই বাহুল্য পাঠকও কুমুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে দু:খ অনুভব করবে। শিশু-কিশোর সাহিত্য মানেই যে মধুর সাহিত্য, সেই concept ভেঙে লীলা মজুমদার বাচ্চাদের দু:খের জগতের সঙ্গে পরিচিত করালেন। কুমুর পা পরবর্তী কালে পুরো সারল না, কিন্তু কুমু আহত পাখিদের আবার দলে ফিরে যাওয়া থেকে নিজের অক্ষমতা নিয়েই জীবনের পথে এগিয়ে যেতে থাকল- থেমে থাকল না আর কুমু। এখানেই লীলা মজুমদারের স্বাতন্ত্র্য।

শিশু-কিশোর সাহিত্যের আরেকটি বিশেষ বিষয়বস্তু ভৌতিক গল্প। শিশু-কিশোর সাহিত্য, ভৌতিক এবং অভিসন্দর্ভের আলোচ্য প্রতিবন্ধী চরিত্র- সব মিলিয়ে লীলা মজুমদারের 'অহিদিদির বন্ধুরা' গল্পের নয়টি ভূতের কথা উল্লেখ্য। বাচ্চারা ভূতের গল্প শুনতে বেশ ভালোবাসে। অহিদিদি যে নটি বাচ্চাকে সাদরে খাওয়ায় তাদের কেউই কথা বলে না, কেবল একজন খোনা খোনা গলায় কিসব বলে। গল্পের মধ্যে জানা যায়, এই বাচ্চারা আসলে ভূত, যাদের জিভটা কেটে দেবার জন্য, এরা কথা বলতে পারে না। এই গল্পটি শিশু-কিশোর মনে এক ভয়ঙ্করতার অনুভূতি জাগায়। খাবার পর উল্লাস করার কারণে বাচ্চাদের জিভ কেটে দেওয়ার মত ভয়ঙ্কর দুষ্টু লোকও আছে পৃথিবীতে! এ অভিজ্ঞতা বাচ্চাদের মধ্যে সুন্দর কোমল সুখপাঠ্য অনুভূতি সৃষ্টি না করলেও শেষে বাচ্চা-পাঠক বোঝে ক্ষমার-মানবিকতার কোনো সময়সীমা হয় না। জিভ কেটে দেবার মত নির্মম মানুষও যেমন আছে পৃথিবীতে, তেমনই অহিদিদির মত ভালোমনের মানুষও আছে, যে বাচ্চাদের খাবার পর মুখশুদ্ধিও দেয়। সুতরাং পাঠক এটা শিখল ভালো আর খারাপ দুই-ই থাকবে, তার মধ্যে ভালটাকে বেছে নিতে হবে। কারণ যে ভালো তার ভালো হয়। লীলা মজুমদার বাচ্চাদের নীতিশিক্ষাও দিলেন, কিন্তু কঠোর বাস্তব জগৎ থেকে তাদের আড়ালও করলেন না।

শিশু কিশোর মন আরেকটি যে বিষয় প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে পড়তে ভালোবাসে সেটি হল গোয়েন্দা কাহিনি। শিশু-কিশোর সাহিত্য ধারায় তাই অনেক গোয়েন্দাকাহিনি আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের পান্ডব গোয়েন্দা, সমরেশ মজুমদারের অর্জুন, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন মাসি, বুদ্ধদেব গুহ'র ঋজুদা, নীহাররঞ্জন গুপ্তের কিরীটি রায় এবং আরও অনেকে। এর মধ্যে কাকাবাবু চরিত্রটি এখানে আলোচিত হল তার কারণ গোয়েন্দা মাত্রই যে কোনো পাঠকের আর বিশেষত শিশু-কিশোর মনকে সাংঘাতিকভাবে আকর্ষণ করে। অভিসন্দর্ভটির মুখ্য অভিমুখ প্রতিবন্ধী মানুষরা, তাই কাকাবাবুর প্রতিবন্ধকতা উত্তরণ এক্ষেত্রে আলোচ্য।

গোয়েন্দারা শিশু-কিশোর মনের বীরপূজার নায়ক। এই চরিত্ররা সমস্ত কিছু খারাপকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সত্যিকে খুঁজে বার করে গোয়েন্দারা। কাহিনিগুলিতে আমরা দেখব, গোয়েন্দা যাদের সাহায্য করছে তারা আসলে ভাল লোক। দুষ্টু লোকের শয়তানির কবল থেকে উদ্ধার করছে গোয়েন্দারা। কি পরম আশ্চর্য শক্তি গোয়েন্দাদের। অনেকটা যেন সেই মধ্যযুগীয় বাতাবরণের ধর্ম আর অধর্মের মধ্যকার যুদ্ধকাহিনিগুলির মত। অনুবাদ সাহিত্য পেরিয়ে মঙ্গলকাব্যেও দেখেছি ভক্তবৎসলা দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন এবং ধর্মপথের মানুষজনের সাথে দেবকৃপার অলৌকিক সব কাহিনি। গোয়েন্দা কাহিনিগুলিতে শিশু-কিশোর মনে সেই পুরাতন কথাই যেন আবার ঘুরে ফিরে আসতে লাগল। বিংশ শতাব্দীর কাকাবাবু নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জীবনে চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেননি তাঁর অসাধারণ ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তার জোরে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে একবার এক সাক্ষাৎকারে যখন জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, কাকাবাবু প্রতিবন্ধী হলেন কেন? তার উত্তরে সুনীলবাবু বলেছিলেন, পাহাড় জয় করি আমরা মস্তিষ্ক দিয়ে, পা দিয়ে নয়।

কাহিনিকার এখানে যেন বলতে চাইলেন, দেখো পাঠক যে নিজে সমস্ত সমস্যার সমাধান করছেন, সেই কাকাবাবুও বিশেষ কোনো এক শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের পাঠকদের নায়ক ও মানুষের উর্দ্ধে নয়। মানুষ হিসাবে সেও কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকতে পারে। লীলা মজুমদারের গল্পগুলো যেমন বলে নিজের দু:খ-কষ্ট নিয়ে কেঁদে ভাসানোই জীবন নয়। কান্নাকাটি ছেড়ে বেরিয়ে আসা জীবন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও কাকাবাবু চরিত্রের যে image স্থাপন করলেন পাঠকল-চিত্তে তা কোনো super-hero-এর image নয়। কাকাবাবুও খঞ্জত্বের শিকার। জীবন মানেই খুব সুন্দর রূপকথার জগৎ নয়। তবুও কাকাবাবু তার প্রতিবন্ধকতা ভুলে hero হয়ে উঠলেন।

শিশু-কিশোর সাহিত্য বাংলায় যেমন রূপকথার গল্প শুনিয়েছে, হাসির গল্প শুনিয়েছে তেমনিই পাশাপাশি কঠোর এক সমাজ-বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে তার পাঠককে। জীবনের চলার পথটাতে আরো ভয়ঙ্করভাবে বাঁচার শিক্ষা দিয়েছে। শিশু-কিশোর সাহিত্যের উদ্দিষ্ট পাঠকের বয়:সীমা কম হলেও বড়দের মধ্যে বেঁচে থাকা ছোটরাও এর রসিক সমঝদার। এমনকি সাধারণ-পাঠকও। তাই শিশু-কিশোর সাহিত্যের পাঠক পরিসীমা সেই অর্থে সর্ব্বোচ্চ। এর একটি বিশেষ চরিত্র হিসাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার চরিত্ররা ভয়ঙ্কর সমাজ পরিবেষ্টনী এবং তার মধ্যে থেকেই আলোকতার উৎসারের গল্প শুনিয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. খাস্তগীর আশিস সম্পাদিত। শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ। মদন মোহন শর্মা তর্কালঙ্কার। ১৮৫০। বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। জানুয়ারি ২০০৬ । পৃ: ২০৭।

২. তদেব পৃ: ২০৭।

৩. তদেব পৃ: ২০৮।

৪. তদেব পৃ: ২০৬।

অষ্টম অধ্যায় :

কৌতুকরসাশ্রিত সাহিত্যধারা ও নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের নয়টি রসের দ্বিতীয়টি হল হাস্যরস। হাস্যরস সম্পর্কে ভরতের অলঙ্কারশাস্ত্র (খ্রী: পূ: ৫ শতাব্দী) বলেছে,-

''অথ হাস্যো নাম হাসস্থায়ি ভাবাত্মক:। স চ বিকৃতবেষালঙ্কারধার্ষ্ট্যলৌল্য-
কুহকাসৎপ্রলাপব্যঙ্গদর্শনদোষেদাহরণাদিভিবিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্যৌষ্ঠদংশননা-
সাকপোলস্পন্দনদৃষ্টিব্যাকোশাকুঞ্চনস্বেদাস্যরাগপার্শ্বগ্রহণাদিভিরনুভাবৈরভিনয়:
প্রযোক্তব্য: ব্যভিচারিণশ্চাস্য আলস্যবহিত্থাতন্দ্রানিদ্রাস্বপ্নপ্রবোধাসূয়াদয়:।
দ্বিবিধাশ্চয়মাত্মস্থ: পরস্থশ্চ। যদা স্বয়ং হসতি তদাত্মস্থ:। যদাপরং হাসয়তি তদা পরস্থ:।''[১]

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,-

''হাস্যের স্থায়িভাব হাস। এই (হাস্য) বিকৃত বেষ, অলঙ্কার, ধৃষ্টতা, লোভ, কুহক (এর অর্থ যাদুবিদ্যা বা প্রতারণা), অসৎ প্রলাপ, বিকলাঙ্গদর্শন, দোষখ্যাপন প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয়। ওষ্ঠদংশন, নাসিকা ও গন্ডস্থলের কম্পন, নেত্রের বিস্তার ও আকুঞ্চন, ঘর্ম, মুখরাগ, পার্শ্বদেশে হস্তস্থাপন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এর অভিনয় প্রযোজ্য। এর ব্যাভিচারিভাব আলস্য, অবহিত্থা, তন্দ্রা, নিদ্রা, স্বপ্ন, জাগরণ ও অসূয়া প্রভৃতি। এই (রস) দ্বিবিধ -আত্মগত ও পরগত। যখন কেউ নিজে হাসে তখন আত্মগত। যখন অপরকে হাসান হয় তখন পরগত।''[২]

অর্থাৎ, ভরতের নাট্যশাস্ত্রেই উল্লিখিত রয়েছে যে, বিকলাঙ্গতা সক্ষম মানুষদের মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা যখন অন্যের মধ্যে হাস্যরসের সঞ্চার করে, তখন সেক্ষেত্রে এটি হয় পরগত। এ বিষয়ে ভরত আরোও বলেছেন,-

৪৯-৫০। বিপরীতলঙ্কারৈর্বিকৃতাচারাভিধানবেষৈশ্চ।
বিকৃতৈরঙ্গবিকারৈর্হসতীতি রস:স্মৃতো হাস্য।।

বিকৃতাকারৈর্বাক্যৈরঙ্গবিকারৈর্বিকৃতবেষৈশ্চ।

হাসয়তি জনং যস্মাৎ তস্মাদ্ জ্ঞেয়ো রসো হাস্যঃ।।

বিপরীত অলংকার, বিকৃত আচার, কথা, বেষ, বিকৃত অঙ্গভঙ্গী হেতু কেউ হাসলে যে রস হয় তা হাস্য নামে কথিত। বিকৃত রূপ, বাক্য অঙ্গভঙ্গী ও বেষের দ্বারা লোককে হাসায় বলে (এই) রস হাস্য নামে জ্ঞাত।

৫১। স্ত্রীনীচপ্রকৃতাবেষ ভূয়িষ্ঠং দৃশ্যতে রসঃ।

ষড়্ ভেদাশ্চাস্য বিজ্ঞেয়াস্তাংশ্চ বক্ষ্যাম্যহং পুনঃ।।

এইরূপ রস স্ত্রীলোক ও নীচ প্রকৃতি লোকের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। এর ছয়টি ভেদ;.....

৫২। স্তিতমথ হসিতং বিহসিতমুপহসিতঞ্চাপহসিতমাতহসিতম্।

দ্বৌ দ্বৌ ভেদৌ স্যাতামুত্তমমধ্যমাধমপ্রকৃতৌ।।''[৩]

ভরত উত্তম, মধ্যম এবং অধম- এই তিন প্রকৃতির লোকসাধারণের মধ্যে হাস্যরসের বিভিন্ন প্রকার দেখিয়েছিলেন।

উত্তম প্রকৃতির মানুষের হাসি হবে স্মিত ও হসিত ।

৫৩। স্মিতহসিতে জ্যেষ্ঠানাং মধ্যানাং বিহসিতোপহসিতে চ।

অধমানামপহসিতং হ্যতিহসিতং চাপি বিজ্ঞেয়ম্।। [৪]

এই হাসির ক্ষেত্রে দাঁত দেখা যায় না। সৌষ্ঠবযুক্ত কটাক্ষ সহকারে গন্ডস্থল ঈষৎ বিকশিত করে স্মিত হাসি পরিবেশিত হয়

৫৪। উত্তমানাম্-

ঈষদ্বিকসিতৈর্গ ন্ডৈঃ কটাক্ষৈঃ সৌষ্ঠবান্বিতৈঃ।

অলক্ষিতাদ্বিজং ধীরমুত্তমানাং স্মিতং ভবেৎ।।[৫]

হসিত-এর ক্ষেত্রে অল্প দাঁত দেখা যায়, চোখ মুখ উৎফুল্লিত থাকে, গাল অর্থাৎ গন্ডদেশ বিকশিত হয় ।

৫৫। উৎফুল্লাননেত্রৈস্তু গন্ডিধিকসিতৈরথ।

কিঞ্চিল্লক্ষিততদন্তং চ হসিতং তদ্বিধীয়তে।।[৬]

মধ্যম প্রকৃতির মানুষের হাসি হয় বিহসিত ও উপহসিত ।

৫৩। স্মিতহসিতে জ্যেষ্ঠানাং মধ্যানাং বিহসিতোপহসিতে চ।

অধমানামপহসিতং হ্যতিহসিতং চাপি বিজ্ঞেয়ম্।।[৭]

বিহসিত-এর ক্ষেত্রে চক্ষু এবং গন্ডদেশ আকুঞ্চিত হয়ে থাকে, এটি ধ্বনিযুক্ত হয়, মধুর উপলক্ষ্যের উপযোগী এবং উৎফুল্লিত মুখরাগযুক্ত হয় বিহসিত ।

৫৬।। আকুঞ্চিতাক্ষিগন্ডং যৎ সস্বরং মধুরং তথা।

কালাগতং সাস্যগারং তদ্বৈ বিহসিতং ভবেৎ।।[৮]

উপহসিতের ক্ষেত্রে নাসিকা হয় উৎফুল্লিত, এক্ষেত্রে বক্রদৃষ্টিতে অবলোকন করা হয় এবং মাথা ও কাঁধ থাকে অবনমিত ।

৫৭। উৎফুল্লনাসিকং যচ্চ জিহ্মাদৃষ্টিনিরীক্ষণম্।

নিহঞ্চিতাংসকশিরস্তদ্বোপহসিতং ভবেৎ।।[৯]

অধমদের হাসি হয় অপহসিত ও অতিহসিত ।

৫৩। স্মিতহসিতে জ্যেষ্ঠানাং মধ্যানাং বিহসিতোপহসিতে চ।

অধমানামপহসিতং হ্যতিহসিতং চাপি বিজ্ঞেয়ম্।।[১০]

অস্থানে হাসিকে বলা হয় অপহসিত। এক্ষেত্রে চক্ষু থাকে অশ্রুপূর্ণ, কাঁধ এবং মাথা হয় উৎকম্পিত*।

৫৮। অস্থানহসিতং যত্র সাশ্রুনেত্রং তথৈব চ।

উৎকম্পিতাংসকশিরস্তচ্চাপহসিতং ভবেৎ।।[১১]

অপহসিত-এর ক্ষেত্রে চক্ষু থাকে সংরব্ধ অর্থাৎ এক্ষেত্রে ক্রোধ, উৎসাহ, অহংকার বা ঔদ্ধত্য প্রকটিত হয়। এক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর হয় তীব্র, উদ্ধত এবং অশ্রুপূর্ণ। এক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য হাত পাশে স্থাপিত হয়।

ভরত কথিত হাস্যরসের বিভিন্ন প্রকার ও কারণের মধ্যে একটি অবশ্যই অসংলগ্নতা বা বলা যায়, যা স্বাভাবিক নয়। সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা যায়, গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী মানুষজন খুঁড়িয়ে হাঁটেন বলে প্রাথমিকভাবে তা হাস্যরসের সৃষ্টি করে। শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী মানুষ

উল্টো-পাল্টা শোনার ফলে বেশ মজার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যেমন, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘বরযাত্রী’ গল্পে ন্যায়রত্ন মশাই কানে কম শোনেন। গল্পের মূল চরিত্র গণশা তোত্‌লা। বরযাত্রী গিয়ে তার তোত্‌লামো, বিশেষ করে উত্তেজনার বশে কথা আরও বেশি করে আটকে যাওয়া নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

ভরত পরবর্তী খ্রীষ্টীয় ১৪ শতাব্দীর বিশ্বনাথ কবিরাজের ‘সাহিত্যদর্পণে’ হাস্যরস সম্পর্কে বলা হয়েছে,-

‘‘বিকৃতাকার বাগ্‌বেশ চেষ্টাদে: কুহকাদ্ ভবেৎ।

হাস্যো হাস-স্থায়িভাব: শ্বেত: প্রমথদৈবত:।

বিকৃতাকার বাক্‌চেষ্টং যমালোক্য হসেজ্জন:।

তদত্রালম্বনং প্রাহুস্তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্।

অনুভাবোহক্ষিসংকোচ বদনস্মেরতাদয়:

নিদ্রালস্যাবহিত্থাদ্যা অত্র স্যুর্ব্যভিচারিণ:।।

জ্যেষ্ঠানাং স্মিতহসিতে মধ্যানাং বিহসিতাবহসিতে চ।

নীচানামপহসিতং তথাহিতসিতং তদেষ ষড়্ ভেদা:।।’’[১২]

(ভ) ‘‘ঈষদ্ বিকশিনয়নং স্মিতং স্যাৎ স্পন্দিতাধরম্।

কিঞ্চিল্লক্ষ্যদ্বিজং তত্র হসিতং বুধৈ:।।

মধুরস্বরং বিহসিতং সাংসশির:কম্পমবহসিতম্।

অপহসিতং সাস্রাক্ষং বিক্ষিপ্তাঙ্গাং চ ভবত্যতিহসিতম্।।২০০’’[১৩]

এর টীকায় বলা হয়েছে,-

‘‘হাস্যরসমাহ-বিকৃতেতি। বিকৃতা আকারদয়ো যস্য তস্মাৎ কুহকাৎ নর্তকাৎ। এতদুপলক্ষনং, বিকৃতাকারাদিবিষয়কশ্রব্যকাব্যাদপি। ‘কুতকাদি’তি পাঠে বিকৃতাকারদিজন্যাৎ কৌতুকাদিত্যর্থ:। অত্র হাস্যরসে। তচ্চেষ্টা বিকৃতাকারাদিপুরুষচেষ্টা। হাস্যরসস্থায়িভাবাস্য হাসস্য ভেদানাহ- জ্যেষ্ঠানামিতি। উত্তমানামিতি অর্থ:। তদিতি। হাস্যভেদাদিত্যর্থ:।এষ হাস্যরস:।।’’[১৪]

এর বঙ্গানুবাদে বলা আছে,-

''আকার, কথাবার্ত্তা,বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি দ্বারা জাত কুহক (মনোবিভ্রম) হইতে হাস স্থায়িভাবযুক্ত হাস্য (রস) হয় ; ইহার বর্ণ শ্বেত, দেবতা প্রমথ ; বিকৃত আকার, কথাবার্ত্তা ও অঙ্গভঙ্গিযুক্ত যাহাকে দেখিয়া লোকে হাসে সেই ব্যক্তি এখানে আলম্বন (বিভাব) এবং তাহার চেষ্টা হইতেছে উদ্দীপন (বিভাব); চক্ষুর সঙ্কোচন, বদনের হাস্যভাব প্রভৃতি হইতেছে অনুভাব; এখানে নিদ্রা, আলস্য, অবহিত্থা প্রভৃতি ব্যভিচারী (ভাব)। ইহার ছয়টি ভেদ- উত্তম ব্যক্তিদিগের (হাসি হইতেছে)- 'স্মিত' ও 'হসিত'; মধ্যগণের 'বিহসিত' এবং 'অবহসিত', নীচগণের 'অপহসিত' এবং 'অতিহসিত'। যে হাস্যে নয়ন ঈষৎ বিকশিত ও অধর স্পন্দিত-তাহা হইতেছে 'স্মিত' ও যাহাতে দন্ত ঈষৎ লক্ষিত হয়, পন্ডিতগণ তাহাকে 'হসিত' বলিয়া থাকেন। মধুর স্বরযুক্ত হাস্য হইতেছে 'বিহসিত'; যে হাস্যে অংগদেশ ও মস্তক কম্পিত হয়, তাহা হইতেছে 'অবহসিত'। যে হাস্যে চক্ষে জল আসে তাহা 'অপহসিত' এবং যে, হাসিতে অঙ্গ বিক্ষেপ হয়, তাহা হইতেছে 'অতিহসিত'।''[১৫]

এক্ষেত্রে হাসির বহু বিভেদ প্রকার আছে। বিকৃত আকার হাসির জন্ম দেয়, তা এখানেও উল্লিখিত। প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ভারতের নাট্যশাস্ত্র' এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ'- দুটিতেই সমাজে বিকৃতদেহী মানুষদের অবস্থানসম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়। বিকৃতদেহযুক্ত প্রতিবন্ধকতা সম্পন্ন মানুষ সমাজে হাসির খোরাক হত।

রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' (ফাল্গুন, ১৩০১) প্রবন্ধে বলেছেন,-

''অসংগতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দু:খবোধ হয়।.....

স্থূল কথাটা এই যে, অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময়ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।''[১৬]

পাশ্চাত্যে হাসি সম্পর্কে দুটি মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। একটি, নিকৃষ্টতাবাদ (Theory of Degradation), যার প্রধান প্রবক্তারা হলেন অ্যারিস্টটল, হব্‌স্, বেন প্রমুখ দার্শনিকরা। অন্যের সাপেক্ষে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে উন্নততর ব্যক্তি এক্ষেত্রে হাসেন। এই হাসিতে মূলত দ্বেষ, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, ঈর্ষা, মাৎসর্য প্রকটিত। এই হাসি মূলত অন্যকে অপমান করে এবং যাকে দেখে হাসির সৃষ্টি হয় যে মানসিকভাবে আহত হয়, নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিতে অন্যের কাছে করুণার পাত্র হওয়া বা হাস্যাস্পদ হওয়ায় প্রবল অস্বস্তিতে ভোগেন ব্যক্তি। হাসি সম্পর্কে দ্বিতীয় মতটি হল অসঙ্গতিবাদ

(Theory of Incongruity), এর প্রবক্তা হলেন কান্ট, সোপেনহাওয়ার।ফ্রয়েড ও এই মত সমর্থন করেন।এইমত অনুসারে কোনো কিছু সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে যে কোনো কিছু অসঙ্গতি ঘটলেই তা হাসির কারণ হয়।

৫৭। উৎফুল্লনাসিকং যচ্চ জিহ্মাদৃষ্টিনিরীক্ষণম্।

নিহ্ঞিতাংসকশিরস্তদ্ধোপহসিতং ভবেৎ।।[১৭]

সোপেনহাওয়ারের ''an incongruity between a conception and a real object''[১৮] এবং স্পেন্সারের ''a descending incongruity''[১৯] উভয়ই উপহাস, কৌতুকের হাসির কথাই বলেছে। Humour, Wit, Satire, Irony, Fun ইত্যাদি বহুপ্রকার হাসির মধ্যে নির্মল হাস্যরসসৃষ্টিকারী Humour-ই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ এটি কখনোই কারোর হৃদয়কে বেদনায় বিদ্ধ করে না।

সমাজের চোখে প্রতিবন্ধী মানুষরা সবসময়ই করুণার পাত্র। রবীন্দ্রনাথের মত স্মরণ করেই বলা যায়, হাসি এবং কান্নার মধ্যে খুব সূক্ষ্ম প্রভেদ রয়েছে। হাসতে হাসতে যেমন চোখ দিয়ে জল বেরয়, তেমনি অনেক সময় প্রবল দু:খে মানুষ হাসে। শারীরিক অক্ষমতাসম্পন্ন মানুষরা সমাজের চোখে হাস্যাস্পদ হয়, তাদের বিকৃত রূপ এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গভঙ্গির জন্য। ঠিক তেমনি মানসিক প্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন মানুষরা তার উন্মাদের আচরণের জন্য অনেকসময় হাসে বা কাঁদে এবং তাদের আচরণ সমাজকে হাসায়। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে নির্বাচিত আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতিবন্ধী চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে এই চরিত্ররা কিভাবে কৌতুক সৃষ্টি করেছে এ অধ্যায়ে তা আলোচ্য। এই চরিত্ররা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাস্যতত্ত্বের নিকৃষ্টতাবাদ তত্ত্বের উদাহরণ হয়েছে। কারণ এদের আচরণ সমাজকে হাসালেও, সেই হাসিতে এই চরিত্ররা সমভাবে অংশগ্রহণ করে আনন্দরস উপভোগ করতে পারেনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাকালের জটার জট' গল্পে সুচিত্রাকে যখন ছেলের বাড়ির লোকজন দেখতে এল, তখন সুচিত্রার যে অবস্থা লেখক বর্ণনা করেছেন, তা লেখকের ভাষাতেই-

''যেমন অচিন্ত্যনীয়, তেমনই বীভৎস। অর্ধনগ্ন অবস্থায় উঠানে গড়াগড়ি দিয়া সুচিত্রা চিৎকার করিয়া কাঁদে। মরিয়া গেলেও দুবার বিবাহ সে কিছুতেই করিবে না, এই কথা সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টায় পাগল মেয়েটার যেন প্রাণ বাহিত হইয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।''[২০]

কিন্তু সমাজ সুচিত্রার আর্তি বুঝল না। বরং,

''যাহার মেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন খানিকক্ষণ মজা দেখিয়া মুচকি হাসিয়া তাহার প্রস্থান করেন।''[২১]

শুধু তাই নয়, সুচিত্রার ছোটো ভাই হেমন্ত,-

''ঝড়ের মতো বাড়িতে ঢুকিয়া সে বলিল, ব্যাটাদের আচ্ছা করে গালাগালি দিয়ে এলাম, মামা। পাগল মেয়ে দেখতে এসে তার পাগলামি দেখে হাসবে, এ কী ইয়ার্কি নাকি?

সুলতা ঘোমটা একটু টানিয়া দিল, লজ্জায় নয়, মুখের ভাব গোপন করিবার জন্য সুমিত্রা হাসিয়া বলিত, হাঁ দাদা, রাস্তায় ভিড় জমেছিল? গালাগালি শুনে পথের লোক প্রাণভরে খুব হেসেছিল?

অযথা পরিমাণে হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া হেমন্ত বলিল, না, হাসবে কেন?

সুলতা তীব্র চাপা গলায় সুমিত্রাকে বলিল, বলো না, মেজো ঠাকুরঝি, ওঁর ভঙ্গি দেখে আমাদের সকলের হাসি পাচ্ছে, পথের লোক হাসি চেপে রাখবে কোন দু:খে।'' [২২]

সুচিত্রার মানসিক অস্থিতি, পাগলের আচরণ যে শুধুমাত্র বাইরের লোককে হাসিয়েছে তা নয়, বাড়ির একান্ত আপনজনরা নিজেদের মধ্যে মস্করাও করেছে।

রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' উপন্যাসে জুঁই বোবা-কালা। কিন্তু অসাধারণ সুন্দরী। এক বিয়েবাড়িতে শাড়ি-গয়নায় সেজে তাকে রানীর মত লাগছিল। কিন্তু সমাজ তার সৌন্দর্যের থেকেও বড় করে দেখছে তার প্রতিবন্ধকতাকে।

''একজন আরেকজনকে বলছে, অত ঢং করে সাজগোজ কেন রে বাপু, আসলে তো বোবা-কালা। তাকিয়ে দেখি অন্যজন হেসে উঠে ঠোঁট বেঁকাল।- ছাই সুন্দর।''[২৩]

এখানে যে হাসি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অসূয়া প্রকটিত হয়েছে। জুঁই-এর সৌন্দর্য অন্য নারীদের সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিচ্ছে। এই হীনতার ভাব থেকে আধুনিকা নারীদের মধ্যে একধরণের ঈর্ষা জাগে। তা থেকে তারা উর্দ্ধতম বা উত্তম অবস্থানের জুঁই-এর অক্ষমতাকে ইঙ্গিত করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। এখানে জুঁই-কে ছোট করার চেষ্টায় আসলে এই নারীদের মানসিক হীনতা অমানবিকতার পরিচয় পরিস্ফুট করেছে। লেখক ব্যঙ্গের হাসির মাধ্যমে আসলে কশাঘাত হানলেন তথাকথিত আধুনিক অমানবিকতার প্রতি।

হাস্যরস সৃষ্টির আরেকটি কারণ অসঙ্গতি। আচরণের অসঙ্গতিও অনেকসময় হাস্যরসের উৎসার ঘটায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে নসু পুরুষ হলেও নারীবেশ ধারণ করে থাকে, তার আচার আচরণে মেয়েলি স্বভাবসুলভ সমস্ত বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। আদিরসাত্মক এক কৌতুক সৃষ্টি হয় নসুকে কেন্দ্র করে কাহারদের দৈনন্দিন জীবনে। সুচাঁদ, বনোওয়ারী, নসু, পাগল- সবার মধ্যে আলাপচারিতায় পাগলের রসিকতার এক ঘটনার উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যায়,-

''সে (পাগল) হঠাৎ সুচাঁদের পা টিপে এবং ইঙ্গিত দেয় উচ্চকণ্ঠে বললে- তা এই বারেতে আমার বেবস্থা একটা কর। না কি?

নসু চমকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে গালাগাল দিয়ে উঠল- মর্, মর্, খালভরা।

কথাটা কৌতুকের। পাগল নসুবালাকে ওই স্ত্রী-বেশের জন্য ক্ষ্যাপায়, বলে-বিয়ে করব। নসু একেবারে ক্ষেপে যায়। ছুটে পালায়।

এই হাসি কৌতুকের মধ্যেই কোপাইয়ের পুল পার হয়ে নটার ট্রেন চলে গেল।'' [২৪]

এই কৌতুক সৃষ্টি হল নসুর রূপান্তরকামিতার চাহিদার জন্য। বর্তমান প্রেক্ষিতে নসুর মত তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা সমাজে ও আইনের চোখে অনেক বেশি সুপ্রতিষ্ঠিত। এখন এরা লিঙ্গগত প্রতিবন্ধী মানুষ নন। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাহারপল্লীর চিত্র অঙ্কন করেছেন সেই প্রেক্ষিতে নসুরা লিঙ্গগত প্রতিবন্ধী মানুষ হিসাবেই পরিচিত ছিল। তাই আলোচ্য অভিসন্দর্ভে চরিত্রটি আলোচিত হল। আলোচ্য অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করলাম, নসুরাও সমাজে কৌতুকের শিকার হলেও হাসি-কান্নায়, সুখ-দু:খ মিলিয়ে যে জীবনের সচলতা তা প্রতিষ্ঠা করলেন ঔপন্যাসিক।

কৌতুক তথা হাস্যরস অর্থাৎ পাঠক মনে এক প্রসন্নতার অনুভূতিসৃজন। হাসি যে সবসময় সরব, উচ্চকিতই হতে হবে, তা নয়, সাহিত্যে নীরব হাসিরও উদাহরণ রয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্ধ' গল্পে সনাতন চক্রবর্তী দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলার পর মেয়ে-জামাইকে নিজের বাড়ি থাকার ব্যবস্থা করেন। তখন জামাই-এর সাথে তার মা-ও আসেন এবং গল্পে দেখি সনাতন চক্রবর্তী অন্ধত্বের ভিত্তিতে কি অসাধারণভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সনাতন চক্রবর্তী তার বেয়ান মহাশয়ার কথার উচিত জবাব দেবার জন্য হাতিয়ার করেছেন তার অন্ধত্বকে। প্রথমেই হঠাৎ করে না দেখতে পেয়ে বেয়ানের বেতো হাঁটুতে পড়ে যাওয়া, তারপর বেড়াল তাড়ানোর অছিলায় হাতের লাঠি চালিয়ে বেয়ানের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া, শেষে আবার বেয়ানের মুখের আঘাত কতটা গুরুতর বোঝার চেষ্টা করানোর জন্য বেয়ানের চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেওয়া পাঠক-হৃদয়ে এক হাস্যরসের সৃষ্টি করে। দুষ্টুলোক তার অপকর্মের জন্য শাস্তি পাচ্ছেন, এ বোধ পাঠক মনে এক রিলিফের জন্ম দেয়।

প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে দেখেছি বিকৃত রূপ স্বাভাবিক-রূপধারী মানুষের মনে হাস্যরসের জন্ম দেয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'খাখ্' গল্পে ভোম্‌রার বামন চেহারা দেখে পতিতাপল্লীর মেয়েদের হাসির কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়।

''ওকে (ভোম্‌রাকে) দেখে সবগুলি মেয়ে কিলবিল করে হাসে, এ ওর গায়ে ঢ'লে পড়ে- নানান কথা ক'য়ে ক্ষেপায়। বেঁকিও হাসে- তেমনি, মুখের মধ্যে কাপড় ঠেলে।

যেন অনেকদিন ওরা মন প্রাণ খুলে হাসতে পায়নি-''[২৫]

ভালোবাসার মানুষ বেঁকিও ব্যঙ্গের হাসি হাসে বামন ভোম্‌রাকে দেখে। এ হাসিও নিকৃষ্টতাবাদের হাসি। এ হাসি মানুষকে কষ্ট দেয়। এ কষ্ট শেষ পর্যন্ত প্রাণঘাতি হল ভোম্‌রার ক্ষেত্রে। তাচ্ছিল্য ব্যঙ্গ আর সহ্য করতে না পেরে আগুনে আত্মাহুতি দেয় ভোম্‌রা।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বরযাত্রী' গল্পে গণশার তোতলামো এবং ন্যায়রত্ন মশাই-এর কানে কম শোনা হিউমারের সৃষ্টি করেছে। ন্যায়রত্ন মশাই সম্পর্কে ঘ্যোঁৎনা বলেছিল,

''সে বুড়ো তো রাতকানা, আবার কালাও তার ওপর ; কার সঙ্গে বিয়ে দিতে কার সঙ্গে দিয়ে দেবে।''[২৬]

সেই ন্যায়রত্নই গল্পের শেষে হাস্যকরভাবে তার উপস্থিতি সরবভাবে জানান দেয়,

''রাজেন বলিল, এরা বলছে- এঁরা বলছেন বরযাত্রীরা ডাকাত।

ন্যায়রত্ন মহাশয় একটু ধাঁধায় পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ঠিক অর্থ গ্রহণ হচ্ছে না ডাকাতরা বরযাত্রী, না বরযাত্রীরা ডাকাত?''[২৭]

গণশা সবচেয়ে বুদ্ধিমান হলেও তার বাচনভঙ্গী হাস্যরসের প্রবাহে পাঠকহৃদয়কে সিক্ত করে। প্রসঙ্গত: গণশার একটি সংলাপ উল্লেখ করা যাক্-

''তিলুর বিয়েতে আমি যাব না! এরপর আমার নি-নিজের বিয়েতে বলবি, গ-গণশা তোর গিয়ে কাজ নেই, তুই চা-চাকরির খোঁজ করগে।''[২৮]

গল্পকার comedy of circumstances- এর অসাধারণ প্রয়োগে অসাধারণ হাস্যরস পরিবেশন করেছেন।

হাসি বলতে সবসময়ই যে তা উচ্চৈস্বরের হবে তা নয়, অনেক সময় নীরব হাসিতেও আমাদের মন প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। সমাজ অনেকসময় মানুষের অক্ষমতাগুলি নিয়ে হাসি-মজায় ব্যঙ্গের হাসিতে মেতে উঠলেও সমস্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার ঊর্দ্ধে সমাজের চোখে ব্যঙ্গের পাত্র হওয়া মানুষরা আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পেরেছে। সনাতন চক্রবর্তী, গণশার মত চরিত্রদের প্রতি সর্বদাই পাঠকের মন একটু পক্ষপাতিত্ব করে ফেলে। চরিত্রগুলি জীবনযুদ্ধে জিতে যায়। গবেষণা-অভিসন্দর্ভের অভিমুখ অনুসারে বলা যায়, সমাজে প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতিষ্ঠা পাবার পথে আত্মবিশ্বাস এবং সমাজের হাসির খোরাক হয়ে নিজেরাই শেষ হাসি হাসার মধ্যে সেই দৃষ্টান্তই স্থাপিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ড: সুরেশচন্দ্র। ভরত নাট্যশাস্ত্র।(১ খন্ড) নবপত্র প্রকাশন। কলিকাতা- ৭৩। ISBN: 81-8065-048-0।, নভেম্বর, ২০০৯. পৃ. ১৪২-১৪৩।

২. তদেব, পৃ. ১৪৩ ।

৩. তদেব: পৃ.১৪৩-১৪৪ ।

৪. তদেব: পৃ ১৪৪ ।

৫. তদেব: পৃ.১৪৪ ।

৬. তদেব: পৃ.১৪৪ ।

৭ তদেব: পৃ.১৪৪ ।

৮ তদেব: পৃ.১৪৪ ।

৯ তদেব: পৃ.১৪৪ ।

১০ তদেব: পৃ.১৪৪ ।

১১ তদেব: পৃ.১৪৫ ।

১২ মুখোপাধ্যায়, ড: বিমলাকান্ত। (অনু:)। বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃত: সাহিত্যদর্পণ:। সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার, কলকাতা-৬, ২০০৮। পৃ. ১৬৩ ।

১৩ তদেব: পৃ.১৬৩ ।

১৪ তদেব: পৃ.১৬৩ ।

১৫ তদেব: পৃ.১৬৪ ।

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। পঞ্চভূত। বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ। কলিকাতা। অগ্রহায়ণ ১৩৯৯, পৃ. ১৩৩-১৩৪ ।

১৭ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড: সুরেশচন্দ্র। ভরত নাট্যশাস্ত্র।(১ খন্ড) নবপত্র প্রকাশন। কলিকাতা- ৭৩। ISBN: 81-8065-048-0।, নভেম্বর, ২০০৯. পৃ. ১৪৪ ।

১৮ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, প্রসঙ্গ পঞ্চভূত পান্ডুলিপি কলকাতা-৯ সেপ্টেম্বর ২০০২. পৃ. ৫৭ ।

১৯ তদেব: পৃ.৫৭ ।

২০ বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র। ২য় খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ISBN 81-86908-66-8 (Set), ISBN 81-86908-76-6. পৃষ্ঠা- ৪২২।

২১ তদেব: পৃ.৪২২ ।

২২ তদেব: পৃ.৪২৪ ।

২৩ চৌধুরী রমাপদ, 'পশ্চাৎপট'। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৫। ISBN 81-7756-462-5. পৃ.৩৪ ।

২৪ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর , হাঁসুলীবাঁকের উপকথা , চারুলতা প্রকাশন , কলকাতা , চতুর্থ প্রকাশ, বইমেলা ২০১১, পৃ: ১৪০ ।

২৫ সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার ,খাখ, অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী , ২য় খন্ড। প্রা: লি:. কলকাতা-৭৩। ১৩৫৯. পৃ: ৩৭২-৩৭৩ ।

২৬ মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৫। পৃ:২১ ।

২৭ তদেব: পৃ.৪৩ ।

২৮ তদেব: পৃ.১৮ ।

নবম অধ্যায় :

প্রতিবন্ধকতা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি : নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র

প্রতিবন্ধকতা প্রতিবন্ধী মানুষদের কাছে যতটা না শারীরিকভাবে কষ্টকর তার থেকেও বেশি কষ্টকর সমাজ পরিবেশের আচরণে। সমাজ প্রতিবন্ধী মানুষদের দিকে তাকায় দুটি চোখে - এক হল সহানুভূতি বা করুণা আরেক হল হাসি-মজা। ট্র্যাজেডি এবং কমেডি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন হাসি আর কান্নার তফাৎ খুবই সূক্ষ্ম। মানুষ হাসতে হাসতে কাঁদে আবার কাঁদতে কাঁদতে হাসে। প্রতিবন্ধী মানুষদের ক্ষেত্রেও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী এই দুইরকম। কমেডি বা হাস্যরসের সৃষ্টি হয় যেকোনোরকম অসঙ্গতি থেকে। একদল মানুষ রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। হঠাৎই একজন তার মধ্যে কলার খোলায় পা পিছলে পড়ে গেল। হাঁটাটা স্বাভাবিক। হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যাওয়া অসংগতির উদাহরণ। এই পড়ে যাবার পর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হাসি এবং তারপর আহা! উহু! -সহানুভূতি। প্রতিবন্ধী মানুষরা হলেন আর পাঁচটা গড়পড়তা সাধারণ মানুষদের থেকে একটু আলাদা। হয়তো কোনো অংশে কম। কোনো অঙ্গহানি বা অঙ্গহীনতা বা ইন্দ্রিয়হীনতা। সমাজের চোখে দুর্বল হাস্যাস্পদ মানুষগুলির চোখে সমাজ কেমন? কেমন করে এই মানুষগুলো জীবনসংগ্রামে বাজিমাত করে এগিয়ে চলে? এই সবকিছুর ছোট ছোট নিদর্শন সাহিত্যিক চরিত্রগুলি। সাহিত্যের পাতায় হেঁটে বেড়ানো চরিত্রগুলি এক নতুন দিগন্ত দ্বার উন্মোচন করে। শুধু আধুনিক সাহিত্য বলে নয়, আদিগন্ত কাল থেকেই এইসব মানুষেরা আছেন সমাজে ও সাহিত্যে থাকবেনও,নিজস্ব জীবন্তছন্দে।

দৃষ্টিহীন মানুষরা সাহিত্যক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে এসেছেন। কখনো কেবলমাত্র মানুষ হিসাবে। কখনোও আবার তাদের চাওয়া-পাওয়া বাণীরূপ পেয়েছে বিশেষ কোনো সম্পর্কের সীমানায়। গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়ড-ওডিসির রচয়িতা হোমার ছিলেন জন্মান্ধ। কিন্তু সেই প্রতিবন্ধকতা তাকে জীবনদর্শনে ক্ষান্ত করতে পারেনি। টাইরেসিয়াস, সফোক্লিসের 'অয়দিপউস'[১] নাটকে ডেলফির দেব-পুরোহিত জন্মান্ধ হলেও ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। রাজা অয়দিপাউস এবং থিব্‌স্ নগরীর ভবিষ্যৎ যাঁর অন্ধদৃষ্টির সম্মুখেই উন্মোচিত হয়েছিল।

হিন্দু রামায়ণে পেয়েছিলাম অন্ধকমুনিদম্পতির কাহিনি। এদের দৃষ্টিহীনতা পূরিত হয়েছিল পুত্রসান্নিধ্যে। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুর পর তাদের জগতের অন্ধকার আরও তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

মুনিঋষিরা তপোসিদ্ধ মানুষ ছিলেন। তাদের সাধনশক্তির সাহায্যে তারা অনেক অসাধ্যসাধন করতে পারতেন। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুনি ঋষিরা কুপিত হতেন এবং শাপশাপান্ত করতেন। এর ফলে অনেকসময় অবশ্য শাপে বর হত। দশরথের ক্ষেত্রে তাই-ই হয়েছিল। অন্ধকমুনিদম্পতির রামায়ণে ভূমিকাই ছিল রাজা দশরথের সন্তানলাভের অনুঘটক হওয়া। এর বাইরে অন্ধকমুনিদম্পতির জীবন কিভাবে অতিবাহিত হত সে নিয়ে খুব একটা বেশি সময় ব্যয় করেননি রামায়ণকার। পুত্রহারা দম্পতির শোক কারুণ্য ব্যক্ত হয়েছে কিন্তু চিত্রিত হয়নি পুত্রহারা হবার পরের জীবনের কথা।

মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। তার এই দৃষ্টিহীনতার জন্য দায়ী তার জন্মইতিহাস। মুনি বেদব্যাসের কাছে মায়ের ভয়ে চোখ বন্ধ করে নেবার ফল ধৃতরাষ্ট্রের চোখের দৃষ্টিহীনতা। ধৃতরাষ্ট্র নিজের চোখে জগতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন না। তার স্ত্রী গান্ধারী অত্যন্ত পতিপরায়ণা। গান্ধারী নিজের চোখের দৃষ্টিশক্তিও রহিত করে দিলেন। গান্ধারী নিজের চোখদুটি বস্ত্রখন্ডে আবৃত করে নিজেই অন্ধত্ব বরণ করলেন। গান্ধারীর এই আত্মত্যাগের মূল্য ধৃতরাষ্ট্র কি দিয়েছিল তার সাক্ষী রয়েছে মহাভারত। কিন্তু গান্ধারীর এই দৃষ্টিদান পরবর্তীকালে মহাভারতকারের বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় নিজসন্তানকে রক্ষাকবচ দিতে পেরেছিল অন্ধত্ববরণকারী মা গান্ধারী। যদিও ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে গান্ধারীর সেই উদ্দেশ্যও চরিতার্থ হতে পারেনি। মায়ের দৃষ্টিজোর সন্তানকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচাতে পারেনি। মহাভারতকার হয়ত এটাই দেখাতে চেয়েছিলেন মায়েরা সবসময় চায় সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু হায়! মানুষ যে মরণশীল। এটাই ধ্রুবসত্য। যদিও মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য ধর্ম ও অধর্মের যুদ্ধে ধর্মের জয় প্রতিষ্ঠা।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। বলা হয়ে থাকে পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। তার এই পুত্রপ্রেম প্রবাদে পরিণত হয়েছে। নিজ সন্তানদের খুবই ভালোবাসতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই ঠিক কথাই। মহাভারত তো ধৃতরাষ্ট্রের এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যই প্রতিভাত করতে চেয়েছিলেন। এতে কোনো মিথ্যারোপ নেই বটে। কিন্তু তার এই অতি পুত্রস্নেহান্ধতাই তার জীবনে সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। কথায় বলে পাপ বাপকেও ছাড়ে না। ধৃতরাষ্ট্রকে স্বামীত্বে বরণ করে গান্ধারী স্বামীর সহধর্মিনী হবার জন্য নিজে অন্ধত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করলেও গান্ধারীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারেননি ধৃতরাষ্ট্র। প্রাকবিবাহিত জীবনপর্বের এক দুর্ঘটনা নিয়ে গান্ধারীর পরিবারকে হেনস্থা এবং অত্যাচার করেছিল ধৃতরাষ্ট্র। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শনের সৌজন্যতা লঙ্ঘন করেছিল ধৃতরাষ্ট্র। স্বামীর বাড়ি স্ত্রীর আপন যদি হয় তাহলে স্ত্রীর পরিবার স্বামীর আপন হবে না কেন? এই কথাগুলি গান্ধারীর মুখে বসাননি মহাভারতকার। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধাররাজ্য আক্রমণ এবং ধ্বংসের পরিণামে কৌরববংশের ধ্বংসও সূচিত হয়েছিল। শকুনিমামা যার প্রধান উদ্যোক্তা। ধৃতরাষ্ট্র পিতা হিসাবে যেমনই হোক না কেন স্বামী

হিসাবে আদর্শ বলা যায় না। তার এই আচরণের পিছনেও হয়ত কোনোভাবে ক্রিয়াশীল তার শারীরিক ত্রুটি। অন্ধ পিতার সাথে মাতাও অন্ধ। এই অন্ধত্ব কোনোভাবে যাতে সন্তানদের স্পর্শ না করতে পারে সেইজন্যই সন্তানস্নেহে এতটাই অন্ধ ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বামী সর্বদাই হবেন স্ত্রীর থেকে উন্নত। নারী পুরুষের হাতের পুতুল। যখন ইচ্ছা করবে পুরুষ তাকে সোহাগ করবে। করুণা প্রদর্শন করবে অবলা নারীর প্রতি। সেখানে ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বলিদান দিচ্ছে এটা হয়ত কোথাও স্বামী হিসাবে ধৃতরাষ্ট্রের পৌরুষে আঘাত হেনেছিল। খুব কম পুরুষই হয় যারা নারীর শ্রেষ্ঠত্বকে কুর্নিশ জানাতে পারে। গান্ধারীর দৃষ্টিবন্ধন আরোও একবার সেই শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ দেয়।

মহাভারতের দীর্ঘতমা গর্ভস্থ অবস্থায় মাকে পরপুরুষের লালসা থেকে রক্ষা করতে গিয়ে শাপভ্রষ্ট হয়ে জন্মান্ধ হয়েছিলেন। তিনি সৎগুণবান হলেও যত্রতত্র সঙ্গম করে বেড়ানোর জন্য পত্নী এবং পুত্রদের দ্বারা ত্যক্ত হয়েছিলেন। যদিও তাঁর এই খ্যাতির কারণেই পরবর্তীকালে রাজ্যবিস্তার সম্ভবপর হয়েছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম এবং অন্ধত্বের পিছনে যেমন মুনির শাপ ছিল তেমনিই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে দীর্ঘতমার ক্ষেত্রেও। কিন্তু দীর্ঘতমার ক্ষেত্রে কাহিনির বিস্তার অন্যত্র। দীর্ঘতমা যখন পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিল তখন বলিরাজা তাঁকে উদ্ধার করে শরণ নেন ক্ষেত্রজ সন্তান লাভের জন্য। সেই ধৃতরাষ্ট্রের জন্মকাহিনিরই পুনরাবর্তন। তবে কাহিনিতে সামান্য রদবদল রয়েছে। রানি সুদেষ্ণা প্রথমে দীর্ঘতমাকে প্রত্যাখ্যান করে দাসীকে পাঠালেও দ্বিতীয়বার দীর্ঘতমার অঙ্গস্পর্শেই পঞ্চপুত্রের জননীর গৌরব লাভ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য অন্ধ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সমাজের চোখে মোটেই ব্রাত্য ছিলেন না দীর্ঘতমা। বরং তার চারিত্রিক ত্রুটির জন্য স্ত্রী সন্তান তাকে ত্যাগ করেছিলেন। জন্মের পূর্বের দীর্ঘতমা এবং জন্মপরবর্তী দীর্ঘতমা, চরিত্রের মধ্যে এক বিস্তর ফারাক রয়ে গেছে।

মহাভারতের অপর রাজা পৌষ্য নিজকর্মদোষে উতঙ্ক মুনির অভিশাপে সাময়িক অন্ধত্বের কবলে পড়েছিলেন। পরে অবশ্য নিজ দোষ স্বীকারে অন্ধত্বমোচন ঘটেছিল রাজার। রাজার এই অন্ধত্ব মনোযোগহীনতা এবং কর্মে গাফিলতির ফলাফল। নিজদোষ স্বীকারের সৎসাহস রয়েছে রাজা পৌষ্যের মধ্যে। পৌষ্যের অন্ধত্ব এবং পুনরায় আলোতে ফিরে আসা কুকর্ম এবং সুকর্মের দ্যোতক।

উপমন্যুর অন্ধত্ব আবার নতুন এক দিগন্তের সন্ধান দেয়। খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলেও যে অন্ধত্ব নেমে আসতে পারে তার স্মারক উপমন্যু। আবার বলা যায়, মানুষ নিজ কর্মদোষে দু:সময়গ্রস্ত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ মহাভারতের উপমন্যু। খিদে তেষ্টায় যদি উপমন্যু কবলিত না হত খিদে তেষ্টাকে যদি জয় করতে পারত, তাহলে ভুলভাল আকন্দ পাতার বিষক্রিয়ায় দৃষ্টিহীনতা তার

ঘটত না। মানুষের কর্মফলভোগ নিজ কর্মদোষেই ঘটে থাকে, তার প্রমাণ উপমন্যু। তবে উপমন্যু চরিত্রের মধ্যেও উত্তরণের পথ নির্দেশিত হয়েছে। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে কূপের মধ্যে পড়ে গিয়ে উপমন্যু নিজের কণ্ঠস্বরে নিজের দুরাবস্থার কথা জানিয়েছে। গুরুকে শরণ করেছে উপমন্যু। বিপদে পড়লে গুরুর শরণ নেবার কথা চর্যাগানেও উল্লিখিত হয়েছে। গুরুই শেষাবধি উদ্ধার করেন উপমন্যুকে এবং অন্ধত্ব থেকেও মুক্ত দেন যথাযথ উপায়ে। এখানে গুরু-শিষ্য সু-সম্পর্কের ছবি চিত্রায়িত হয়েছে।

মহাভারতের আরেক চরিত্র দ্যুমৎসেন পুত্র সত্যবানের শৈশবকালে দৃষ্টিশক্তি হারান। পরবর্তীকালে সত্যবানের মৃত্যু হলে পুত্রবধূ কঠোর কৃচ্ছসাধনায় যমরাজকে তুষ্ট করে সত্যবানের প্রাণ এবং দ্যুমৎসেনের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে। কাহিনিটির সঙ্গে মনসামঙ্গলের কাহিনির সাদৃশ্য বহুলাংশে রয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য সাবিত্রী-সত্যবানের আখ্যানের অঙ্গ হিসাবে দ্যুমৎসেন চরিত্রটি মহাভারতে বিখ্যাত।

মনসামঙ্গলের প্রধানা দেবী মনসা কানি, একচক্ষু-আঘাত প্রাপ্ত। মনসার এই অঙ্গহানির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে গ্রামবাংলার চিরন্তন পারিবারিক হিংসার কাহিনি। শিবকন্যা মনসা পার্বতীর গর্ভজাত নয়। এহেন মাতা-কন্যার সম্পর্ক কখনোই সুমধুর হতে পারে না। একদিন কলহ মুহূর্তে মাতা পার্বতীর আঘাতে একচক্ষুবিশিষ্টা হয়েছিলেন মনসা। এরপর থেকে মনসার অধিষ্ঠান পাতালে। জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিবাহও সুখের হয়নি মনসা। বিচ্ছেদ হয়ে গেছিল। প্রথমে পিতার স্বীকৃতি না পাওয়া, তারপর বিমাতার সঙ্গে বনিবনা না হওয়া এবং শেষে অসুখী দাম্পত্য সব মিলিয়ে এক সার্বিক না পাওয়ার ভয়ঙ্কর একাকীত্বে মনসা হয়ে উঠেছিল ক্রূরা কোপন স্বভাবা দেবী। এর সঙ্গে ছিল শারীরিক অক্ষমতা এবং প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু সব মিলিয়েও মনসারও উত্তরণ ঘটেছিল সর্পমাতা হিসাবে। পুরাতত্ত্বানুযায়ী সর্প প্রজননের প্রতীক। দেবী মনসাও কৃষ্টির সঙ্গে জড়িত। শস্যদেবী মনসা। সিজবৃক্ষ যার প্রতীক। মনসার হীনতার উত্তরণ ঘটেছিল নবসৃজনে।

অন্ধ মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির কথা প্রথম বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ‘রজনী’ উপন্যাসে। ‘রজনী’ জন্মান্ধ। কিন্তু বয়সের ধর্মের সাথে সাথেই তার মধ্যে সমস্ত অনুভূতিগুলির বিকাশ হতে শুরু করে। রজনী তার চক্ষুহীনতা অতিক্রম করেছিল অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির অতি সক্রিয়তায়। কথা শুনে কথাগুলি অনুসরণ করে রজনী মানুষ চিনতে পারত। বুঝতে পারত মানুষের মনোভাবের কথাও। যথানিয়মেই তার মধ্যেও প্রেমের অঙ্কুরোদগমও হয়। কিন্তু সে প্রেম অন্ধ হয়ে যায়নি। তাই উপকারীর উপকার সে ভোলেনি। অকৃতজ্ঞ নয় রজনী। রজনীর অতীন্দ্রিয়তাবোধ তার চরিত্রের সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই সূচিত করেছিল।

বাংলা সাহিত্যের দরবারে আরেক অন্ধচরিত্র কুমু। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিদানের নায়িকা। রজনীর মত সে জন্মান্ধ নয়। পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ছিল সে। স্বামীর চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষানবিশির ফল কুমুর দৃষ্টিশক্তিহীনতা। কুমু সম্পর্কে কিছু বলার আগে বলতে হয় কাহিনির নামকরণ সম্পর্কে। কাহিনির শিরোনাম দৃষ্টিদান। স্বামী এবং দাদার মধ্যে ইগোর লড়াইয়ে কুমু বেছে নিল স্বামীকে। স্বামীর সম্মানকে। যদিও কুমু কিন্তু একবারেই অজ্ঞ ছিল না। নিজের শারীরিক স্থিতি সম্পর্কেও সে যেমন ওয়াকিবহাল ছিল তেমনিই তার অসুখের চিকিৎসার গতিবিধি সংক্রান্ত ব্যাপারেও সে সম্যক সচেতন ছিল। আদর্শ ভারতীয় নারী কুমু। স্বামীকেই সে যুদ্ধে জিতিয়ে দিল। 'তাসের ঘরে'র নায়িকা যেমন শ্বশুরবাড়ি আর বাপের বাড়ি দুই-এরই সম্মানরক্ষার প্রয়াস করেছিল, কুমুও সেইরকমই তার স্বামী এবং দাদা দুজনের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় রাখার সর্ববিধ প্রয়াস সাধন করেছিল। তার এই মহৎ প্রচেষ্টায় বলিদান দিয়েছিল তার দৃষ্টিশক্তি। এই দৃষ্টিশক্তি কেবলমাত্র আঙ্গিক ইন্দ্রিয়জ দৃষ্টিশক্তি। এই শক্তি বলিদানের পরিবর্তে কুমু লাভ করতে থাকল অন্য এক অতীন্দ্রিয়শক্তির। এই অতীন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে রজনীর মতই সে তার নিজস্ব দৈনন্দিন কাজকর্মও যেমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারছিল, ঠিক তেমনিই বিকশিত হচ্ছিল তার অন্তরের দৃষ্টিশক্তিও। কুমু আরোও একবার প্রমাণ দিল নারী হল মহাদেবীর অংশ। মহামায়ার ফাঁদে যেমন ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে, তেমনি নিজের সংসারকে বেঁধে রাখার জন্য নারী সমস্ত কিছুই করতে পারে। বিভিন্ন রূপে নারী পুরুষকে তথা সমস্ত জগৎ সংসারকে বেঁধে রাখে। এই কুমুই স্বামীর সম্মান রক্ষার্থে দাদার পরামর্শমত চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসরণ না করে নিজের অঙ্গ বলিদান দিয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটি অত্যন্ত সুচতুরভাবে সম্পন্নও করেছে যাতে দাদা এবং স্বামী পরস্পরের প্রতিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে বরং হয়ে থাকে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসী এবং সহযোগিতাময়। এই কুমুই অন্ধত্বের প্রাথমিকপর্যায়ে স্বামীর ক্লেশলাঘবের জন্য স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু অসপত্নস্বামীত্বের গৌরবে বিশ্বাসী কুমু শেষাবধি স্বামীর চারিত্রিক অধ:পতনের বিরুদ্ধে কোমলা কল্যাণীর বদলে ধারণ করেছিল ছিন্নমস্তারূপ। নারী শক্তি। কোনো বিশেষ ইন্দ্রিয় বা অঙ্গহীনতা নারীর শক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা। বরং এক বিকল্প পথে আরোও বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে সে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের এক পার্শ্বচরিত্র সেনদিদি। তৎকালীন সমাজের মেয়েদের দুর্ভাগ্যের স্মারক সেনদিদি। নিজে অল্পবয়সী সুন্দরী যুবতী হলেও স্বামী তার বৃদ্ধ যামিনী কবিরাজ। তরুণ শশী তাকে সেনদিদি নামে ডাকে যেহেতু সম্পর্কে যামিনী কবিরাজ শশীর পিতামহস্থানীয়। শশীর পিতা গোপালের সাথে সেনদিদির এক গোপন সম্পর্কের ইঙ্গিত করে পাড়াপ্রতিবেশীরা। সেনদিদিও শশীকে সন্তানসম স্নেহ করে। সেনদিদির একচোখে দৃষ্টিক্ষমতা থাকলেও অপর চোখের আলো নিভে গেছে। সেনদিদির জীবনের দ্বিস্তরীয় অবস্থান

মানসিক দোলাচলতা সেনদিদির এই একচক্ষুতার পরিচায়ক। সেনদিদিকে সমাজ তথা পুরুষসমাজ নিজের মতো ব্যবহার করেছে, নাম দিয়েছে নিজের প্রয়োজনমন বিভিন্ন সম্পর্কের। কিন্তু কখনোই জানতে চাওয়া হয়নি সেনদিদি কি চায়। অতৃপ্ত মাতৃত্বের আকাঙ্খা এবং কাঙ্খিত মাতৃত্বের আস্বাদ সেনদিদি।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্ধ পিতা সনাতন চক্রবর্তী বাংলার সমস্ত মেয়েদের প্রতি তার শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের বদলা নিলেন। সনাতন চক্রবর্তীও প্রতি মুহূর্তে তার সমগ্র বাংলার মেয়েদের উপর হওয়া অত্যাচারকে স্মরণ করে অন্ধত্বকে কাজে লাগিয়ে প্রতিশোধস্পৃহ হয়েছে।

আরেকটি চরিত্র পাই হামিদা। সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প 'সুন্দরম্'এ। সে পুরোপুরি অন্ধ নয়। তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু জগৎ সম্পর্কে সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তার বিকৃত চেহারা মানুষের সহানুভূতি আদায় করতে পারে। তার স্বামীরও কুষ্ঠরোগে বিকৃতঅঙ্গ। কোলের এক সন্তানের সঙ্গে আছে তাদের পরিবারে এক যুবতী মেয়ে। যার শরীরে যৌবনের আগমন ঘটায় কোনো কার্পণ্য নেই। মা হয়ে হামিদা কি সেটা দেখতে পেত না। তার একটা চোখ তো ঠিকই ছিল। আসলে জীবন সংগ্রামের কঠোর বাস্তবতা রূঢ়তা হামিদার মাতৃত্বের থেকেও বড় করে তুলেছিল জীবনাকাঙ্খা। তাইতো নিজের যুবতী কন্যা তুলসীকে ভিক্ষা করার কাজে যেতে কোনোরকম বাধাসৃষ্টি করেনি। শেষ অবধি তুলসী খাবারের লোভে বিত্তবান যুবকের লালসার শিকার হয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত নিজের কুকীর্তি চাপা দেবার জন্য তুলসীকে শিশুভ্রূণ সহ পৃথিবীর মায়া কাটাতে হয়েছিল। মা হামিদার একচক্ষুবিশিষ্টতা আসলে এরই প্রতীক।

দশরথ, রামায়ণের চরিত্র নয়। যদিও রামায়ণের দশরথের মতই এই সোমেন চন্দের ''সংকেত'' ছোটগল্পের দশরথও রাম-লক্ষ্মণের পিতা। এই দশরথ অন্ধ। অন্ধ জেলে সে। নদীতে মাছ ধরে। সাথে থাকে পুত্র রাম। রামের চোখেই দশরথ জাগতিক দৃষ্টিহীনতার বাধা পেরিয়ে যেতে পারে। রামায়ণে দশরথের 'বাবা' ডাক শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল অন্ধকমুনিদম্পতির থেকে 'বাবা' ডাক শোনার সৌভাগ্য কেড়ে নেবার পর। আর আধুনিক দশরথ নিজেই অন্ধ। কিন্তু জগৎ সম্পর্কে সে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। তার অভিজ্ঞতায় সে নিজের অঙ্গহীনতার অপূর্ণতা পূরণ করে নেয়। দশরথই প্রথম দিনবদলের সংকেত বুঝতে পারে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' ছোটগল্পে পেয়েছি যামিনীর মাকে। যামিনীর মাও অন্ধ। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে বুড়ি অপেক্ষা করে রয়েছে মেয়ের বিয়ের জন্য নিরঞ্জনের আসার আর বৃদ্ধা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছেন অমোঘ মৃত্যুর দিকে। তার অন্ধত্ব

জগৎসম্পর্কে অজানার অন্ধকার। জগৎ সংসার কতটা নির্মম উদাসীন স্বার্থপর সেই জগৎটাকে দেখতে পায়না যামিনীর মা। অন্ধত্ব যামিনীর মায়ের অন্তর্জগতে।

'জননী' বা 'মা' শব্দটির সঙ্গে সর্বদাই জড়িত থাকে এক বিশেষ অনুভূতি। মা মানেই 'স্বর্গাদপি গরিয়সী'। 'জননী' মূর্তির এক বিশেষ রূপ দেখতে পাওয়া যায় দীনেন্দ্রর চোখে। বিমল করের 'জননী' ছোটগল্পের protagonist দীনেন্দ্র অন্ধ। কিন্তু দীনেন্দ্রর চোখেই মাতৃমূর্তির ভাঙাগড়া নবরূপায়ণ সাধিত হয়েছে। সন্তানের ভালোমন্দের জন্য মা অনেক কিছু কাজ করতে বাধ্য হয়। হয়ত তার মধ্যে কোনোটা সন্তানের মনোপূত নাও হতে পারে। কিন্তু তা বলে কি মায়ের সেই সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। এটার ঠিক বিপরীতে আবার অন্যরকম এককথা বলা যায়। মাও তো একজন মানুষ। তারও তো ভুলত্রুটি কিছু হতে পারে। আর সন্তানরাও তো মানুষ। প্রত্যেক মানুষের চাহিদার স্তর নিজস্ব। সবার পক্ষে সব ভালটা করা বা পাওয়া সম্ভব নয়। সন্তানদের ভালোর জন্য মাতৃচরিত্র যা যা করেছিলেন সবই ছিল সম্মানজনিত ঘটনা। আর সন্তানরা মানসিক দিক থেকে হয়ত অন্য কিছু করতে চেয়েছিল। এই সন্তানরা মায়ের কাছে পায়নি তাদের মানসিক শক্তি। সামাজিকভাবে প্রত্যেক সন্তানই সসম্মানে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেখানে তারা এই সুপ্রতিষ্ঠার বদলে চেয়েছিল একটু মানসিক আশ্রয়-শান্তি। মা এবং সন্তানের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের ফাঁকটুকু দেখতে পেয়েছিল অন্ধ দীনেন্দ্র। দীনেন্দ্রর 'বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে' বলেই হয়ত তাই 'ভিতর দুয়ার' এত বেশি উন্মুক্ত হতে পেরেছে।

একটা প্রদীপ জ্বালানো হল একটা ঘরে। ঘরের জানালা দরজা সমস্ত খোলা এবং বাইরে হাওয়ার প্রবল দাপট। এই দাপটে প্রদীপ নিভে যাবার প্রবল সম্ভাবনা। কিন্তু দরজা-জানলা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাহলে নিবাত পরিবেশে প্রদীপের শিখা থাকবে নিষ্কম্প। দৃষ্টিহীন মানুষদের ক্ষেত্রে ঘটনাটি তাই-ই ঘটেছে। চর্যাপদের কবি সেই কোন সুদূর অতীতে বলেছিলেন এই ইন্দ্রিয়জ মোহ এবং চাঞ্চল্যের কথা,-

'কা আ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।

চঞ্চল চিএ পইঠো কাল।।'[২]

মানবজীবন দু:খময়। ইন্দ্রিয়জ ভোগতৃষ্ণাই এই দু:খের মূল কারণ। ইন্দ্রিয়জয় সাধারণ মানুষ করতে পারেননা। তাই তাদের জীবনে এত দু:খ। রূপকার্থে দৃষ্টিহীন মানুষরা ইন্দ্রিয়হীনতায় সেই অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকে রানী সুদর্শনাও যেমন রূপের জগৎ পেরিয়েই সন্ধান পেয়েছিলেন রূপাতীত জগতের। সীমা ও অসীমের মিলন সাধনা দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

শুধু সাহিত্য জগতে কেন বাস্তব জগতেও অন্ধকবি হোমার, বিখ্যাত সুরসাধক সুরদাস কাউকেই তো ইন্দ্রিয়হীনতা দমিয়ে রাখতে পারেনি। সমস্ত প্রতিকূলতাকে পেরিয়ে গেছে বারবার। হয়েছে বিশেষ সক্ষমতার অধিকারী।

মহাভারতের শকুনি। খল চরিত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পিছনে রয়েছে মূলত: শকুনিমামা। শকুনির একটা পা আঘাতপ্রাপ্ত-ভাঙা। শকুনির ক্রূরতা ছলনাই মহাভারতকার জানিয়েছেন। শকুনির ভাঙা পা নিয়ে অনেক হাসি মজাও হয়েছে। কিন্তু শকুনির এই অঙ্গবিকৃতির পিছনে জমা থাকা দু:খ রাগ অতিমান কষ্টের কথা অনালোকিতই থেকে যায়। শকুনি চরিত্র আলোচনা অংশে আছে শকুনির এই পরিচয়ের জন্য দায়ী ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। নিজের শরীরের অক্ষমতার যন্ত্রণা জুড়ানোর জন্য আক্রোশ ফুঁসে বেরিয়েছে ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রটিতে। শকুনিকে আমার খলচরিত্র হিসাবে জানি। কিন্তু শকুনি চরিত্রের খলতা খঞ্জত্বের কারণে নয়। যেখানে ধৃতরাষ্ট্রের শারীরিক অক্ষমতার জন্য নিজের প্রতি সবার চোখে করুণা দেখতে দেখতে এক হীনমন্যতার জন্ম নেয়। মানুষ সবসময় নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসাবেই দেখতে চায়। নিজের অক্ষমতা মেনে নিতে পারে না অনেকসময় মানুষ। মানুষ দুভাবে বড় হয়। এক যারা নিজেরাই অন্যের থেকে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণির সাধারণত: বিশেষ কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু আরেক শ্রেণি আছে যারা অন্যের থেকে শ্রেষ্ঠতর নয়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষজন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করার জন্য অন্যকে ছোট করতে চায়। ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাই-ই ঘটেছিল। একে ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ। তাকে বিবাহ করল সর্বাঙ্গসম্পন্না নারী। সুতরাং স্ত্রী স্বামীর তুলনায় শ্রেষ্ঠতার। এখানে থামল না ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী। নিজের চোখ বেঁধে রাখলেন স্বামীর সমকক্ষ হবার জন্য। একজন নারীর বলিদান। তাতে তো স্বামীর উচ্চকক্ষতায় উত্তরণ ঘটল না। বরং গান্ধারীর এই ত্যাগ ইতিহাসখ্যাত হয়ে রইল। পুরুষের পৌরুষ এ কি করে সহ্য করতে পারে। সময়ের অপেক্ষা। জানা গেল গান্ধারী বিবাহপূর্ব জীবনের এক ঘটনা। ঘটনাটি মারাত্মক কিছু না হলেও ধৃতরাষ্ট্র সুযোগ পেয়ে গেল গান্ধারীর পরিবারকে ধ্বংস করার। ইতিহাস জানে পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। সুশাসক ধৃতরাষ্ট্র। আর শকুনি দুষ্ট। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য শকুনি স্বেচ্ছায় বরণ করেছিল খঞ্জত্ব। শকুনিকে হারাতে হয়েছিল স্বরাজ্য এবং পরিবার-পরিজন। অথচ তাদের দোষ কিছুই ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র যেমন গান্ধাররাজ্য ধ্বংস করেছিল গান্ধার রাজপুত্র শকুনি তেমনিই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের এবং ধৃতরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যের ধ্বংসবার্তা সূচিত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। শকুনি তার এবং তার পরিবারের উপর হওয়া ধৃতরাষ্ট্রের অন্যায় অত্যাচার পীড়ন যাতে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে না পারে, মামা-ভাগ্নের সুসম্পর্কের আবেগে যাতে ভেসে না যেতে পারে, সেইজন্য প্রতি মুহূর্তে খোঁড়া পা এবং তার উপহাস শকুনির মনের মধ্যে জমে থাকা আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। শকুনির খঞ্জত্ব প্রতি মুহূর্তে তার পরিবারের প্রতি হওয়া অবিচার-অন্যায়কে মনে করিয়েছে তাকে।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছিল বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এই নাটগীতিমূলক কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের অনুঘটকের কাজ করেছে বড়ায়ি বুড়ী। বড়ায়ির শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অনেক। দেখতেও বিকট। আঙ্গিক বিকৃতিও রয়েছে। কিন্তু কাহিনিতে সেই রাধার অভিভাবিকা। যদিও কাহিনির প্রথমাংশে দেখা যায় রাধিকা আয়ান ঘোষের বিবাহিতা স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে মূল ভূমিকা নিয়েছিল বড়ায়ি। নিজের অপমানের বদলা নিতেই বড়ায়ি শ্রীকৃষ্ণকে জোর করেছিল সম্পর্কিত মামীর সঙ্গে পরকীয়া প্রেম সম্পর্ক স্থাপন করায়। বড়ায়ির প্রথম দিকে কোথাও একটা মনে হয়েছিল রাধা সুন্দরী বলে রাধার মেন অহংকার তথা গুমর রয়েছে। আসলে এটা মনে হবার পিছনে কোথাও একটা হয়ত বড়ায়ির মনে কাজ করেছে নিজের রূপজ বিকৃতি। সুন্দরী রাধা বিবাহিতা। যদিও তার স্বামী নপুংসক। কিন্তু বড়ায়ির জীবনে বিবাহের কোনো উল্লেখ নেই। বড়ায়ির জীবনের এই অক্ষমতাগুলি থেকেই কি রাধার প্রতি বড়ায়ির এরূপ আচরণ ছিল। সে যাই হোক না কেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষ পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধার প্রতি রূঢ় আচরণ করেছিল তখন শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনাও করেছিল বড়ায়ি। একেবারে শেষ পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধাকে ছেড়ে মথুরায় চলে যান তখন রাধার বিরহবেদনায় রাধার পাশে সবসময় ছিলেন বড়ায়ি। সমগ্র কাহিনি জুড়েই এই বড়ায়ি রাধার অভিভাবিকার দায়িত্বভার পালন করেছে।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত শঠচরিত্র ভাঁড়ুদত্ত। তাকে সবাই চেনে। এই ভাঁড়ুদত্তের এক দাদা ছিল শিবা। তার পায়ে দোষ। তাই জন্য চল্লিশ বছর হয়ে যাওয়াতেও তার বিয়ে হচ্ছে না এখনও। শিবার মনে সেইজন্য একটা দু:খবোধ ছিল। সমাজ তার এই খঞ্জত্বকে নিয়ে হাসাহাসিও করত। ভাঁড়ুদত্ত দাদার এই অক্ষমতাকে কাজে লাগালো নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য। দাদাকে দিয়ে ভাঁড়ুদত্ত ভেটের জিনিসপত্র বহন করাল। প্রলোভন দেখালো ভাঁড়ুদত্তের সুদিন এলে আগে সে তার দাদা শিবার বিয়ে দেবে। শিবা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অন্যের স্বার্থচরিতার্থতায়।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ সিরিজের এক চরিত্র ফণিভূষণ। 'অর্থমনর্থম্' এর চরিত্র। ছোটবেলা থেকেই না পাওয়ার যন্ত্রণায় দগ্ধ ফণিভূষণ। মামার বাড়িতে থাকত সে। মামার প্রচুর সম্পত্তি। কিন্তু এ বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকার একমাত্র ফণিভূষণ নয়। কারণ নি:সন্তান করালীচরণবাবুর বাড়িতে পোষ্যের অভাব ছিল না। নিজের তিন ভাগ্নে এবং শ্যালিকার এক ছেলে এবং এক মেয়ে। এতজন পোষ্যের মধ্যে সবথেকে খারাপ অবস্থা ফণিভূষণের। কারণ তার পায়ের সমস্যা। এই শারীরিক সমস্যার জন্যই সে পড়াশোনাও খুব বেশি দূর চালিয়ে যেতে পারেনি। মামার সাথে সবারই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা আছে। কিন্তু শারীরিক কারণেই ফণিভূষণ বাড়ির বাইরে খুব একটা যাবার কথা ভাবতে পারে না। তার পড়াশোনাও সেজন্য ব্যাহত হল। আর বাইরে

চাকরিও সে তেমন ভাল পাবে না। বয়সের ধর্ম অনুযায়ী প্রেমও এল ফণিভূষণের মনে। বাড়ির বাইরে নয়। বাড়ির মধ্যেই। মামির বোনের মেয়ে সত্যবতী। সেও এ বাড়িরই আশ্রিতা। কিন্তু নিজের অক্ষমতা এবং সত্যবতীর সর্বগুণসম্পন্নার জন্য সে কথাও প্রকাশ করতে পারেনি কোনোদিন ফণিভূষণ। পরিস্থিতির চাপে এবং সুযোগে সে খুন করল তার মামা করালীবাবুকে। পরিকল্পনা দারুণ ছিল। কিন্তু শরদিন্দুর নায়ক ব্যোমকেশ। তাই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল ফণিভূষণ। নিজের শরীরের অক্ষমতাকে সঙ্গী করে সুখী সংসার গড়া আর তার হল না। হেরে গেল জীবনযুদ্ধে। আত্মহত্যা করে নিল। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কষ্ট এবং সামাজিক গ্লানিকে জয় করার মত মনের জোর দেখাতে পারল না ফণিভূষণ। শিবের মত সমস্ত গরল পান করে নীলকণ্ঠ হতে পারল না। এক ট্র্যাজিক চরিত্র হয়েই রয়ে গেল পাঠকহৃদয়ে।

গভীর গহন মানব মনস্তত্ত্ব বিভিন্নরূপে চরিত্রায়িত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন লেখনীতে। তারই একটি ছোটগল্প 'নারী ও নাগিনী'। মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর সম্পর্ক বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সম্পর্কে চিত্রায়িত হয়েছে। আলোচ্য গল্পের সম্পর্কের রসায়নের মূল কাম। মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি কাম। এক মানবের সঙ্গে মানবেতর প্রাণীর সম্পর্ক স্থাপন তার উপর সেই সম্পর্কের ভিত্তি ষড়রিপুর আদিমতম। এ এক ভয়ঙ্কর গভীর সম্পর্ক। ওঝার সাথে পোষা উদয়নাগিনীর সম্পর্ক। মাকড়সার রস, সাপের বিষ এ সবই জীবনহন্তারক। কিন্তু এগুলির মধ্যেই রয়েছে মারাত্মক মাদকাসক্তি। এই মারাত্মক জিনিসগুলি একদিকে হতে পারে জীবনদায়ী আবার অন্যপক্ষে হতে পারে জীবননাশীও। পোষ্যর সঙ্গে পোষকের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক সাধারণত বাৎসাল্যরসের আধারে স্থাপিত হবার উদাহরণ রয়েছে প্রচুর। কিন্তু একেবারে দেহজ কাম-সম্পর্ক খুব একটা বেশি দৃষ্ট হয় না। 'নারী ও নাগিনী'র ওঝার আসল নাম কি কেউ জানে না। শারীরিক ত্রুটিই তার নাম তথা পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোঁড়া শেখ। তার বৌ আছে। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনও সুখের।কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ আগমন উদয়নাগিনীর। প্রথমাবধিই উদয়নাগিনীকে খোঁড়া শেখ বিবি রূপে বরণ করে নিয়েছিল। আচরণও ছিল তদুপ। তাই শেষাবধি উদয়নাগিনী সতীনকে সহ্য করতে না পেরে খোঁড়ার বিবি জোবেদাকে মরণ ছোবল বসায়। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ খোঁড়া কিন্তু উদয়নাগিনীকে হত্যা করতে পারল না। এক অদ্ভুত টান তাকে এ কাজ করা থেকে বিরত করতে পেরেছিল। খোঁড়া শেখ যে শুধুমাত্র খোঁড়াই ছিল তাই নয়, অদ্ভুত বিকৃত দর্শনও ছিল। কাম এবং প্রেমের মধ্যে অন্তর্লীন সম্পর্ক থাকলেও কাম এবং প্রেমের সহাবস্থান সর্বদা সম্ভবপর হয় না। কাম এবং প্রেমের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। কাম প্রবৃত্তি আর প্রেম আবেগ। খোঁড়া শেখ নিয়ন্ত্রিত হতেন কামের দ্বারা। বিবি জোবেদার সঙ্গে দাম্পত্যের চিত্রে বেশি করে স্পষ্ট হয়েছে কাম, প্রেম ভালোবাসা সেখানে চাপা পড়ে গেছে খোঁড়া শেখের প্রবল কামাবেগ। পুরুষের বহুমুখী বিচিত্র কামতাড়নার প্রকাশ

উদয়নাগিনীর প্রতি খোঁড়া শেখের কামপ্রবণতা। প্রবৃত্তি সর্বদাই হয় নিম্নগামী। নিম্নগামী প্রবৃত্তিকে সংযত করার সাধনাই জিতেন্দ্রিয়ের সাধনা। খোঁড়া শেখ মানবমনের গভীর গহন প্রবৃত্তির কামদ্বারা তাড়িত হবার নগ্নরূপ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের এক অতি গৌণ চরিত্র মোহন। নায়ক শশীর বড় বোন বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী সে। পিতা গোপালের ধুরন্ধতায় তাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। গোপাল চেয়েছিল মেয়েদের বিয়ে দিয়ে কোনোরকমে পার করতে। সেক্ষেত্রে জামাই-এর যদি কোনো খুঁত থাকে তাহলে গোপালের পক্ষে সেটা সুবিধাজনক হতে পারে। টাকাপয়সার খরচাপাতি কম হবে। এই ব্যবসায়িক বুদ্ধির দ্বারা মোহন সর্বাঙ্গসুন্দর বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী হয়েছিল।মোহনের এই শারীরিক পঙ্গুত্ব প্রভাব ফেলেছিল তাদের দাম্পত্য জীবনে। মোহনও এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। বাড়ির বড়দের স্বার্থসিদ্ধিকল্পে। মোহনের দু:খ কষ্ট জানার চেষ্টা কেউই করেনি।

মানুষ অনেকসময় নিয়তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার কথা বলে। মানুষ যতই বিজ্ঞানের অগ্রগতির চূড়ান্ত শিখর স্পর্শ করুক এখন বিধাতার উপর অনেকাংশে বিশ্বাসী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্ক্সবাদ দ্বারা প্রভাবিত হলেও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে দেখালেন কিভাবে মানুষ নিয়তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত-নিয়তির হাতের পুতুলমাত্র। উপন্যাসের একটি ছোট্ট চরিত্র ভূতো। অতি সামান্য কয়েকটি শব্দ খরচ করেছেন ঔপন্যাসিক তার চরিত্রাঙ্কনে। ভূতো একটি দুরন্ত বালক। যে হঠাৎ করেই গাছে উঠে ফল পাড়তে গিয়ে পড়ে যায়। এটা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা মোটেই নয়। গ্রামের ছেলে গাছে উঠে ফল পাড়বে সে আর কি এমন বড় কথা! আর গাছ থেকে পড়ে যাবে সেটাও স্বাভাবিক। আর তারপর তার হাত-পা-ও ভেঙে যেতে পারে। ভূতোরও তাই-ই হয়েছে। দেশঘরে এরকম ঘটনা আকছার ঘটে থাকে। অনেকসময় তারা ডাক্তারও দেখায় না। অনেকসময় না বলে বেশিরভাগ সময় বলাটাও বাহুল্য হয় না। এতে হাত-পা ভাঙা সেরেও যায়। কারণ গ্রামের মানুষ প্রকৃতির সন্তান। গাছগাছালি শিকড়-বাকড়ের সাহায্যে অনেক অসুখ তারা সারিয়ে তোলেন। ভূতোকেও বাড়ির লোকজন হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যেতে রাজি হয়নি। তাই শেষপর্যন্ত এগিয়ে আসে ঘরের ছেলে শশী ডাক্তার। ভূতোকে শশী ইনজেকশন দেয়। কিন্তু দ:খের কথা এরপরই ভূতো মারা যায়। জীবন এবং মৃত্যুর ব্যবধান যে কিছুমাত্র নয় সেটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ভূতো চরিত্রের মাধ্যমে।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের চরিত্র মালা। তার স্বামী কুবের। মালা অপূর্ব রূপবতী এবং গুণবতী হলেও দরিদ্রতম জেলে কুবেরের ঘরণী হয়ে এসেছে তার পায়ের খঞ্জত্বের কারণে। নতুবা কুবেরও জানে মালার মত বৌ পাবার সৌভাগ্য বা যোগ্যতা নেই কুবেরের। মালার শারীরিক অক্ষমতার জন্যই মালার জগৎ খুবই সীমিত। ঘরের মধ্যেই সে রচনা করেছে এক সুখনীড়। মালার

খঞ্জত্বের কারণেই মালা তার স্বামী কুবেরকে ধরে রাখতে পারেনি। মালার শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনযাপনের থেকে বেশি আকর্ষণীয় হয় কুবেরের কাছে কপিলার জীবনমুখী তরঙ্গ। শেষাবধি কুবের কপিলার সাথেই ঘর বাঁধল হোসেন মিঞার নতুন স্বপ্নের রাজ্য ময়নাদ্বীপে। মালাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় না। কারণ মালা যে হাঁটতে চলতে পারে না। স্থবিরতা দিয়ে নতুন সৃষ্টির সূত্রপাত হতে পারে না। তাই মালা কেতুপুরেই রয়ে গেল। মালা তাতে অবশ্য অসুখী নয়। কারণ অ-সুখ-এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে সুখ। মালা রূপকথার গল্প বলত অবসর সময়ে। তার আশেপাশে তার স্বামী না থাকলেও রয়েছে সন্তানাদি পুরো পরিবার। মানুষ এগিয়ে চলে সামনের পথে। আধুনিকতা অগ্রগতির পথে। কিন্তু পিছনে পড়ে থাকে তার ঐতিহ্য-সংস্কৃতি। মালা সেই সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রত্ন-প্রতিমা। কুবের যদি কোনোদিন ফিরে আসে তো সে দেখতে পারবে তার আঙিনায় মঙ্গলকামনায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিচ্ছে তার স্ত্রী মালা। কুবের আধুনিকতার প্রগতিশীলতার পথে এগিয়ে যাবার পথে ত্যাগ করেছে তার সন্তানদেরও। কিন্তু মালা তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছে হাসিমুখে স্বেচ্ছায়। মালা হল সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মী কল্যাণী নারী। নারী যে সৌন্দর্যের পূর্ণমূর্তি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মালা। মালার পঙ্গুত্ব তার স্বামীর কাছে জীবনের অসম্পূর্ণতার প্রতীক হতে পারে কিন্তু অসম্ভব মনের জোরে পঙ্গু মালাই সন্তানদের এবং বাড়ির বয়স্ক অন্যান্য সদস্যদেরও দায়িত্ব নিয়েছে। যথার্থই সে গৃহলক্ষ্মী। উর্বশী কামনাময়ী ছলনাময়ী নয় মালা। এক সুন্দর মনের অধিকারিনী মালা যথার্থই পরিপূর্ণ নারী-সর্বগুণসম্পন্না।

অন্ধকার পথে হলেও জীবনে প্রতিষ্ঠা আদায় করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তারপর?’ গল্পের গজেন। গজেন অন্ধকার জগতে পা বাড়িয়েছে, কিন্তু হারিয়ে যায়নি। এখানে মানবিকতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবস্থা নির্মমভাবে স্ফুরিত হয়েছে।শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় সমাজ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার পরিবর্তে আরো নির্মম হয়েছে।এই সমাজ অর্থ দ্বারা বিক্রিত হয়।সংসারের সারসত্যটুকু বুঝে নিয়েছে গজেন।

ঠিক একইভাবে শারীরিক অক্ষমতার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল খোঁড়া কাহারও। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ উপন্যাসের এক অতি ছোট পার্শ্বচরিত্র সে। সুচাঁদ কাহারপল্লীর অভিভাবিকা স্বরূপ। তার একমাত্র মেয়ে বসন্ত বিয়ের আগেই জমিদারবাড়ির মেজবাবুর ভালোবাসায় অন্ত:সত্তা হয়ে পড়েছিল। মেয়ে এবং মেয়ের হবু সন্তানকে সমাজের চোখে একটা স্বীকৃতি দেবার জন্য খোঁড়া কাহারের সঙ্গে বসন্তের বিয়ে দিয়ে দেয় সুচাঁদ। খোঁড়া কাহার স্ত্রী সন্তান লাভ করলেও কোনোদিন সুখী হতে পারেনি। বসন্তের সাথে তার দাম্পত্যসম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। জমিদারবাড়ির মেজবাবুর মৃত্যুতে বসন্ত বৈধব্যজীবন যাপন করেছিল। খোঁড়া কাহার একে তো

শারীরিক পঙ্গুতার জন্য মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলই। তার উপর বিবাহিত জীবনেও সে প্রতারিত হল। খোঁড়া কাহার নিজের দুর্ভাগ্য মনে করে তা মেনে নিল, অন্য পুরুষ হলেও এরূপ স্ত্রী সন্তানকে স্বীকৃতি দিতে পারতনা ।বিশেষত: কাহার সমাজ যখন বিবাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা সেখানে খোঁড়া কাহার বিবাহ পরবর্তী পর্যায়ে বসন্ত এবং পাখিকে ত্যাগ করে অন্যজীবনযাপন করতেই পারত। কিন্তু সে তা করেনি।চিরকাল তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অবিচল থেকেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভয়ঙ্কর' গল্পের ফুলি, 'লেভেল ক্রসিং'-এর অবলা, 'নব আলপনা'র নটুক প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের এক-একটি সোপান।জীবনের প্রতিপর্যায়ে ছোটোখাটো প্রতিবন্ধকতাকে পেরিয়ে যেতে পারলে কীভাবে জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করা যায় চরিত্রগুলি তার কথাই বলে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে খোঁড়া চখুরী ও রামিয়ার বাবাও সমাজে পঙ্গু মানুষদের অবস্থান ও সমাজ কীভাবে তাদের নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে তার প্রতিনিধিত্ব করেছে।এখানে ফুলঝরিয়া অন্যান্য মেয়েদের থেকে আলাদা।সে ঘর গড়ার স্বপ্ন দেখে।কিন্তু তার পঙ্গুত্ব তার বিয়ের মূল প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াল।রামিয়ার সাথে ঢোঁড়াই এর বিয়ে টেকে নি।যদি রামিয়ার বদলে ফুলঝরিয়ার সাথে ঢোঁড়াই এর বিয়ে হত,তাহলে ঢোঁড়াই এর ঢোঁড়াইজী হয়ে ওঠা হতনা।ঢোঁড়াই এর জীবনের বন্ধনমুক্তির এক সোপান ফুলঝরিয়া ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প 'অভিনেত্রী'তে এক ছোট্ট চরিত্র বিন্তু। তারও একটা পায়ে সমস্যা। কাহিনিতে গতিসঞ্চার করেছে বিন্তু। শিশু চরিত্র সে। তার মধ্যে তৎকালীন সমাজের অর্থহীনতা এবং তজ্জনিত কারণে পিতামাতার সন্তানকে যথাযথভাবে ভরণপোষণ করতে না পারার কষ্ট নির্মমভাবে প্রতিফলিত। বিন্তুর শৈশব এখানে চাপা পড়ে গেছে। বিন্তু কি চায় সে কথা শোনার সমাজ প্রতিবেশ গড়ে ওঠেনি তখন। বিন্তুর সত্তা হারিয়ে গেছে চূড়ান্ত প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক পরিবেশে। বিন্তুর বাবা-মা তার চিকিৎসার পথ্যটুকু জোগাড় করতে পারছে না। ভবিষ্যতের শিশুর উজ্জ্বল স্বপ্নও দেখতে পারছে না। নিস্ফল শুকিয়ে যাওয়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছবি বিন্তু। সেও সময়ের দাবি মেনে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যবহার ফুরিয়ে গেলে তার নিজস্বতার কোনো স্বীকৃতি নেই।

জমিদার চন্দ্র চৌধুরী। আগে তার প্রবল প্রতাপ প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু বর্তমানে বয়স এবং বাতে তিনি পঙ্গুপ্রায়। তাতে তার জীবনধারণে খুব একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। কারণে পয়সা। প্রচুর বিত্তশালী ব্যক্তি তিনি। সমাজ অর্থনীতির মূল মাপকাঠি অর্থ। অর্থ দ্বারা সমাজ এবং জীবন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তাই-ই চিত্রিত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' ছোটগল্পে।

প্রতি পদক্ষেপে খঞ্জত্বের যন্ত্রণা নিয়েও জীবনের পথে থেমে থাকেনি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘সামনে চামেলি’ ছোটগল্পের কথক চরিত্র। তার জীবনেও সুবর্ণসময়কাল যৌবনে এসেছে পঙ্গুত্ব। যখন বাড়ির লোকজন ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সোপানে চড়ার সুস্বপ্নে বিভোর তখনই এক পথদুর্ঘটনা ভেঙে দিল ভবিষ্যতের সিঁড়িতে ওঠার পাকেই। পা ভেঙে সে হুইলচেয়ারে বন্দী হয়ে থাকল না। ক্র্যাচে ভর করে এগিয়ে চলতে থাকল। এই দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটা সরকারী চাকরি জুটে গেছিল অবশ্য প্রভাবশালী ব্যক্তির জন্য। যেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষরা একটা চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, সামান্য একটা চাকরি, যার দ্বারা দুবেলার সাম্মানিক গ্রাসাচ্ছাদনের চাহিদাটুকু মিটে যায়, সেই দুর্মূল্য চাকরির বাজারে কথক একটা চাকরি পেয়ে গেলেন। বাচ্চাদের স্কুলে পড়ানোর কাজ। কাজটা ভালই। সম্মানের। কিন্তু বাচ্চাগুলো যখন স্যারের অপারগতা নিয়ে সহমর্মিতা জানায় তখন কোথাও একটু খারাপ লাগা আসে কথক চরিত্রে। কিন্তু এত কিছুতেও সে পরাজিত নয়। বাচ্চারা ভাবে কিভাবে এই খোঁড়া স্যারের বিয়ে হবে। কিভাবে স্যারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। এই চিন্তা কথক চরিত্রে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে না। বরং এটা সে ভাবতে পারে যে ভাগ্যিস তার ছাত্ররা বাচ্চা। তাই সরল সহানুভূতি সমবেদনা পায়। এটাই তার সৌভাগ্য। কিন্তু যদি তার ছাত্ররা আরেকটু উঁচু ক্লাসের হত, তাহলে হয়ত জুটত ঠাট্টা-ব্যঙ্গ-টিটকারি। দুর্বলের দুর্বলতা নিয়ে মজা করতে মানুষ খুব ভালই বাসে। শুধু এখানেই শেষ নয়। একটু ভালোবাসার বদলে সুন্দরীদের কাছ থেকে কথকের জোটে ভিক্ষা। এত কিছুও দাবিয়ে রাখতে পারে না কথককে। তার চরিত্রের স্থায়িভাব উৎসার। বীররসের উৎসার তার মধ্যে প্রবল। তাই পুরো কাহিনি জুড়ে রয়েছে গৌরবর্ণের ঔজ্জ্বল্য। জুঁই, হাসনুহেনা আরোও অনেক ফুল পেরিয়ে এবার সে চলেছে নতুন এক ফুল চামেলির সন্ধানে। সামনে এগিয়ে চলাই তার জীবনের ব্রত। চরৈবেতির মন্ত্রে দীক্ষিত সে। তাই ক্র্যাচ তার জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং হয়ে উঠেছে বাধা পেরিয়ে যাবার অবলম্বন। মানুষ তার দুর্বলতাকে ধরে যখন এগিয়ে যায় তখন তাকে আর আটকে রাখা যায় না। তার দৃষ্টান্ত ‘আমি’ চরিত্র।

বিমল করের ছোটগল্প ‘জননী’। তার চরিত্র শচীনবাবুর নাতনি। অতি স্বল্প পরিসরে তার অবস্থান। তার পঙ্গুত্ব তার কাছে যতটা না কষ্টকর তার থেকেও বেশি কষ্টকর আপত্তিকর তার পরিবারের কাছে। একটি যুবতী কন্যার পঙ্গুত্ব পরিবারের মাথায় যে কিভাবে আকাশ ভেঙে আনতে পারে তারই দৃষ্টান্ত মেয়েটি। একটি পরিবারের যুবকের পঙ্গুত্বও পরিবারের ভবিষ্যৎ অস্থিরতার সৃষ্টি করে। যেমন ‘সামনে চামেলি’ ছোটগল্পে। কিন্তু পরিবার থেকে তাকে গঞ্জনা সহ্য করতে হয় না। কিন্তু একটি মেয়ে সে তো সর্বপ্রধান পরিবারের গলগ্রহ। তার উপর দারিদ্র্যের সংসার। গোদের উপর বিষফোঁড়া মেয়েটির পঙ্গুত্ব। ছেলেদের পঙ্গুত্ব বরং কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার কাছে আশীবাদস্বরূপ। যার

উদাহরণ বসন্তের স্বামী বা বিন্ধ্যবাসিনীর স্বামী। তখন পঙ্গু ছেলের পঙ্গুত্বও আর কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কারণ সমাজ অর্থনীতি। ছেলেরা সোনার আংটি। সোনার আংটি আবার বাঁকা হয় নাকি! আর মেয়েরা তো মাটির ঢেলা। তার পঙ্গুত্ব পরিবারের পক্ষে আরও কষ্টকর।

বিনোদন জগতের চরিত্ররাও তো আসলে উঠে আসছে সাহিত্যের পাতা থেকেই। আর সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত চরিত্র কাকাবাবু। গোয়েন্দা চরিত্র। বাংলা সাহিত্যে তাবড় তাবড় গোয়েন্দারা রয়েছেন। ব্যোমকেশ, কিরীটি আরোও অনেকে। তাদের পাশে কাকাবাবুর মানসিক বৌদ্ধিক তীক্ষ্ণতা কোনো অংশে খাটো বলা যায় না। কিন্তু একটা বিষয়ে তাদের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে কাকাবাবুর। কাকাবাবু প্রথমে শারীরিকভাবে সক্ষম হলেও একটি রহস্য উন্মোচনকালেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে ক্র্যাচনির্ভর হয়ে পড়েন। গোয়েন্দা মানেই অপরাধীকে ধরার জন্য যে কোনোরকম বাধা বিপদের সম্মুখীন হতেই হবে তাকে। যে কোনো সময়ে যে কোনো দিক থেকে যে কোনো প্রকার বিপদ আসতে পারে। তাই মানসিক তীক্ষ্ণতার সঙ্গে শারীরিক ক্ষিপ্রতারও অধিকারী হতে হয় গোয়েন্দাদের। কিন্তু এখানে কাকাবাবুর একটা পা আঘাতপ্রাপ্ত। তবুও কাকাবাবুকে আটকে রাখা যায়নি দু:সাহসিক অভিযানগুলি থেকে। বরং কাকাবাবু হয়ে উঠেছিলেন আরো বেশি সক্রিয়।

এবার কয়েকটি অন্যধারার চরিত্র নিয়ে বলা যাক। এঁরা সবাই মূলত বিনোদন জগতের বিখ্যাত চরিত্ররা। এঁরা প্রত্যেকেই পঙ্গুত্বের কারণে হুইলচেয়ারে বন্দী। হাঁটাচলা করতে পারে না। কিন্তু এদের শারীরিক অক্ষমতা এদের জীবনকে থামিয়ে রাখতে পারেনি।

আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যখন ঠান্ডা লড়াই চলছিল দুইপক্ষই বিপক্ষের উপর পরমাণুশক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনা করেছিল। তখন ড: স্ট্রেইঞ্জলাভ[৩] প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিছু মানুষকে মাটির অনেকটা গভীরের একটা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করার। ঘরটা মাটি থেকে একটাই গভীর হতে হবে যেখানে পারমাণবিক শক্তির বিস্ফোরণ পৌঁছাতে পারবে না। স্ট্রেইঞ্জলাভ আরও বলেন এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অনুপাত হবে ১০:১। এর ফলে জীবজগতে মানবসম্প্রদায়ের ধারা অব্যাহত থাকবে সুন্দরভাবে। এখানে উল্লেখ্য ড: স্ট্রেইঞ্জলাভ নিজে হুইলচেয়ারে বন্দী। কিন্তু কাহিনির শেষে দেখা যায় কথোপকথনকালে এক উত্তেজনাময় মুহূর্তে স্ট্রেইঞ্জলাভ হুইলচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণকে পিছনে ফেলে নিজের পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। পিটার জর্জ (Peter George) এর রেড এলার্ট (Red Alert) উপন্যাসের উপর (১৯৫৮) ভিত্তি করে এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে,- Dr. Strangelove or : How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.

বিনোদন জগতের আরেক চরিত্র জন লক (John Locke)[৪]। একবার তার বিমানযাত্রাকালে তাদের বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বহুযাত্রী হতাহত হয়। জন লকের যখন জ্ঞান ফেরে তখন তিনি উপলব্ধি করেন পায়ে প্রচন্ড আঘাত পেয়েছেন। জানা যায় এরপর হুইলচেয়ার নিত্যসঙ্গী হয়েছিল। কিন্তু সেই দুর্ঘটনাকালে নিজের পায়ের আঘাতকে অতিক্রম করতে পেরেছিল জন লক। পায়ে হাঁটতে না পারলেও এক লাফাতে লাফাতে তিনি অন্যান্য যাত্রীদের উদ্ধারকাজে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে জানা যায় বাবার চাপে একটি কিডনিও দিতে বাধ্য হয়েছিলেন জন লক। কিন্তু কোনোভাবেই তাকে থামিয়ে রাখা যায়নি। জীবনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি তার শারীরিক অঙ্গহীনতা।

বিখ্যাত চিত্রপরিচালক হিচককের (Hitchcock) অন্যতম সেরা সৃষ্টি জেফ জেফিরিজ[৫]। চরিত্রটি পেশাদার ফটোগ্রাফার ছিল। কিন্তু একটি দু:সাহসিক কাজ করার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তার পায়ে আঘাত লাগে। তখন থেকেই সে হুইলচেয়ারে বন্দী। কিন্তু এই বন্দী জীবনে আরও মনমরা না হয়ে থেকে নতুন করে জীবনের রসাস্বাদ সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকে জেফিরিজ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরকে নিকট করে নিলেন তিনি। তার এই কাজের ফলেই প্রতিবেশি সিরিয়াল কিলারের জীবন কাহিনি উন্মোচিত হয়েছিল। কোনো প্রতিবন্ধকতাই থামিয়ে রাখতে পারেনি জেফ জেফিরিজ (Jeff Jeffries)কে।

এরকমই আরেকটি অপ্রতিরোধী চরিত্র জ্যাক স্যুলী (Jake Sully)[৬]। যে নিজে খোঁড়া কিন্তু কল্পবিজ্ঞানের দেশ প্যান্ডোরায় (pandora) কৃত্রিম মানুষ নাভি (Navi) পরিচালনার মাধ্যমে জয় করেছেন সমস্ত প্রতিকূলতা।

কার্টুন চরিত্রগুলির মধ্যেও আছে প্রতিবন্ধকতা জয়ের কাহিনি। টিমি এবং জিমি[৭] (Timmy and Jimmy) দুই ভাই। তারা শারীরিক এবং মানসিক উভয়দিক থেকেই প্রতিবন্ধকতার শিকার। কিন্তু সমস্ত কিছু অতিক্রম করে তারা জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছে। আরেকটি শিশুচরিত্র স্কুলে পড়ে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য স্কুলে বা নিত্যদিনের চলার পথে বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মুখোমুখি হয়েছে। বয়:সন্ধিকালের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে প্রতিবন্ধী বালকের সমস্যাগুলি রূপায়িত হয়েছে এই চরিত্রগুলিতে। কিন্তু কাহিনির শেষে এরাও সমস্ত বাধা পেরিয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যে 'সুভা' চরিত্রের মধ্যে বয়:সন্ধিকালের প্রতিবন্ধকতার সমস্যাগুলি ফুটে উঠেছে। যদিও সুভার প্রতিবন্ধকতা পায়ে নয়, বাচিক।

পাশ্চাত্য জগতেও এরকম চরিত্র রয়েছে, প্রফেসর এক্স[৮] (Professor X)। তিনি হুইলচেয়ার বন্দী ছিলেন। কিন্তু মাথায় হাত রেখে অনেক দূরবর্তী মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতেন। আরেক

চরিত্র লিঙ্কন রাইম[৯] (Lincoln Rhyme) দুর্ঘটনায় চলৎশক্তিহীন হলেও তদন্তকার্য থেকে ব্যাহত হননি। আগের মতই দক্ষতার সঙ্গে তিনি ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞতা চালিয়ে যান। জো সোয়ানসন[১০] (Joe Swanson) যতই প্রতিবন্ধী বদরাগী যাই হোক না কেন পুলিশী-দক্ষতা নিয়ে তিনি প্রশ্নাতীত।

পায়ের প্রতিবন্ধকতা মানুষকে একটা জায়গায় আটকে রাখতে পারে মাত্র। কিন্তু ক্র্যাচ বা হুইলচেয়ারের সাহায্যে মানুষ পায়ের বিকল্প খুঁজে নিয়েছে। যদিও অধুনা বিজ্ঞান আরোও উন্নতি করেছে। কৃত্রিম পা-ও আবিষ্কৃত হয়েছে। যার সাহায্যে প্রতিবন্ধী মানুষদের কাছে আর জীবনের বাধা কাটিয়ে ওঠা খুব একটা চিন্তার বিষয় নয়। স্কুটার বা বাইক চালাতে হয় পা দিয়ে। কিন্তু যদি কোনো মানুষের পা না থাকে, তাহলে হাত দিয়ে চালানোর গাড়িও এসে গেছে। আর আস্ত পা-ও বিজ্ঞান উপহার দিয়েছে। এখন দরকার শুধু মানসিক জোরের- প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে যাবার বিশেষ সক্ষমতার- এই সক্ষমতা যতটা না আর্থিক ও যান্ত্রিক তার থেকেও বেশি প্রয়োজন মানসিক জোরের।

মনে পড়ে মহাভারতের একলব্যের কথা। সেও গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তার ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দান করেছিল। এতে তার গুরুর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি যেমন প্রতিফলিত তেমনি কাহিনির ক্রমপরিণতিতে দেখি একলব্য ঐ একটি বিশেষ আঙ্গুল ছাড়াই সমস্ত ক্রিয়াসম্পাদনে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব হয়ত একলব্য নিতে পারেনি কিন্তু একটি প্রধান অঙ্গুলি ছাড়াই অস্ত্রচালনায় যে দক্ষতা একলব্য দেখাতে পেরেছে তাতেই সে যুদ্ধজয়ী হয়েছে। এ যুদ্ধ ধর্ম-অধর্মের যুদ্ধ। সততা এবং ন্যায়ের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিজয়ী বীর অবশ্যই একলব্য।

চিকিৎসাবিজ্ঞান এখন অনেক উন্নত। শুধু কাঠের পা নয়। নকল হাতও পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি কোনো অঙ্গহানি ঘটলে সেই কাটা অঙ্গ নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেলে সেই কাটা অঙ্গই জোড়া লাগানো সম্ভবপর হচ্ছে। সাহিত্যের পাতায় যেসব চরিত্র ফুটে উঠেছে তাদের এতটা উত্তরণ সম্ভবপর হয়নি হয়ত। কিন্তু মানসিক শক্তিতে তারাও প্রতিবন্ধকতার বাধা টপকেছে।

এই আলোচনা পর্যায়ের সবার প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মাণিকলালের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ'এর পার্শ্বচরিত্র মাণিকলাল। দস্যু মাণিকলাল। সাধারণত অঙ্গহানি ঘটে থাকে দুর্ঘটনাবশত বা অতর্কিতে তথা চরিত্রের অজ্ঞাতে। কিন্তু মাণিকলাল নিজ হাতে অঙ্গহানি ঘটিয়েছিল। নিজের অপরাধের শাস্তি সে নিজেই বরণ করেছিল। মাণিকলালের দস্যুবৃত্তির জন্য রাজা রাজসিংহ তাকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করলে নিজের মা-মরা বাচ্চা মেয়েটার কথা ভেবে রাণার কাছে প্রাণভিক্ষা করেছিল মাণিকলাল। এটা তার চরিত্রের কাপুরুষতা

মোটেই নয়। বাবার কর্তব্যপরায়ণতা থেকেই ছিল মাণিকলালের এ প্রাণভিক্ষা। তবে সে কিন্তু তার মেয়েকে তার সুবিধার্থে ব্যবহার করেনি। মাণিকলাল তার অপরাধের শাস্তিস্বরূপ নিজের ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কেটে ফেলেছে। এ ছিল রাজসিংহকে নবজীবনের গুরু মানার গুরুদক্ষিণাও বটে। এই অঙ্গুলিহীনতাতেই মাণিকলালের বুদ্ধির প্রাখর্যের পরিচয় মেলে। শত্রুশিবিরে আঘাত হানার সময় তার দুর্বলতাই সবলতায় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল মাণিকলালের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায়। ভিড়ের মধ্যে একজন আঙ্গুলকাটা মানুষকে চিনে রাখা খুবই সবিধাজনক। সুতরাং মাণিকলালের পক্ষে আঙ্গুলহীনতা ছিল একপ্রকার দুর্বলতা। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিবলে মাণিকলাল তার সেই দুর্বলতাকেই কাজে লাগাল শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার কাজে। মাণিকলাল ছদ্মবেশ ধারণ করল এই কাটা আঙ্গুলের সাহায্যেই, কখনোও আঙ্গুল কাটা অবস্থায় থাকল। আবার কখনোও সেই কাটা অংশের উপর কৃত্রিম আঙ্গুল তৈরী করে অন্য পরিচয় সৃষ্টি করেছে। মাণিকলালও জীবনযুদ্ধে জয় লাভ করেছে তার প্রতিবন্ধকতার কাছে হেরে না গিয়ে বরং সেটার সাহায্যেই উত্তরণে।

বিনা চিকিৎসা বা ভুল চিকিৎসায় অঙ্গহীনতার ঘটনাও নতুন কিছু নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'প্রাগৈতিহাসিক'এর ভিখু ডাকাত তারই দৃষ্টান্ত। ভিখু ডাকাতের হাত নষ্ট হয়ে যাবার কারণ বিনা চিকিৎসা। হাত নষ্ট হয়ে যাবার কষ্ট যেমন প্রতি মুহূর্তে কষ্ট দিত ভিখুকে তার সাথেই ভিখুর মধ্যকার কামপ্রবৃত্তিও পদে পদে অতৃপ্ত থেকেছিল। ভিখুর অঙ্গহীনতা তার জীবনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ ভিখুর মাধ্যমে গল্পকার মূলত মানুষের মধ্যকার কাম প্রবৃত্তির তীব্রতাকেই দেখাতে চেয়েছিলেন। মানুষ বেঁচে যখন আছে তখন যে কোনোভাবেই তার গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা মিটে যাবে। আলোচ্য গল্পে সেই সমাজ-আর্থিক পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। বরং লেখক এখানে ভিখু ডাকাতের চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের মধ্য অবদমিত থাকা কামপ্রবৃত্তির ডাকাতি শক্তির ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই অঙ্গহীনতা ভিখুর জীবনে খুব একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। কামচরিতার্থতার পথে একটা হাত না থাকা খুব একটা সমস্যার নয়। 'নারী ও নাগিনী'তে তারাশঙ্করের কলমে খোঁড়া শেখ যেমন কামপ্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন তেমনি ভিখু ডাকাতের মধ্যেও আদিম প্রবৃত্তিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাধিকার অভিভাবিকা স্বরূপ বড়ায়ি বুড়ীর মতই মদনের মাসির উল্লেখ পাই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' ছোটগল্পে দেখেছি বস্ত্রবয়নশিল্পের সংকটকালে দেশজ তাঁতিদের দুরাবস্থার কথা। সোমেন চন্দের 'সংকেত' ছোটগল্পে যে সমস্যার ইঙ্গিত পেয়েছিল অন্ধ দশরথ তারই প্রত্যক্ষরূপ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী'। মদন জাত-তাঁতি হলেও যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির জন্য

আজ সে কর্মহারা। শিল্পীমানুষদের সংকটের মূল হোতা যতটা যন্ত্রসভ্যতা তার থেকেও বেশি দায়ি মধ্যমশ্রেণীর দালালগোষ্ঠী। ফলে কাজও আছে, কাজ করার মানুষও আছে অথচ কাজ হচ্ছে না। ভেঙে পড়ছে দেশের বাজার-অর্থনীতি। এই চরম দুরাবস্থার সময়ও বাংলার ঘরে ছিল একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে থাকত যেমন বহুদূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনরা, তেমনি আবার বহু মানুষ থাকতেন যারা রক্ত নয় আত্মার সম্পর্কের আত্মীয়। সুখে দু:খে আনন্দে-ঝগড়ায় দিনগুলো একসাথে কেটে যেত। সমস্ত বিপদের মোকাবিলা মানুষজন একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করত। এমনই এক চরিত্র মদনের মাসি। একে মদনের যা রোজগার তাতে তার নিজের বৌ-বাচ্চারই পেট-প্রতিপালন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু তার সঙ্গেই রয়েছে মদনের মাসি তার বাচ্চাদের নিয়ে। মাসির একটা হাত নুলো। ফলে খুব একটা কোনো কাজকর্ম বিশেষ কিছু সে করতে পারে না। মদনের সাথে প্রায়ই তার মনোমালিন্যও হয়। মদন তাকে দুচারকথা শুনিয়েও দেয়। কিন্তু মদনের মাসি তাতে খুব একটা কিছু মনে করে না। কারণ সে বোঝে মদনের ব্যথা। পুরুষ মানুষের হাতে কাজ না থাকলে তাদের মাথার ঠিক থাকে না। তার উপর মদন জাত শিল্পী। তাই মদনের মেজাজ দেখানোর মধ্যেকার অক্ষমতার ক্ষোভকে যথাযথ বুঝতে পারে মদনের মাসি। মদনের পোয়াতি বৌকেও যথাসাধ্য যত্নআত্তি এবং দেখাশোনা করে এই মাসি। মাসির নিজের জীবনের অপূর্ণতা অক্ষমতা কখনোই তার পরিচিত প্রিয়জনদের উপর বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি। মদনের মাসি নিজ স্বভাব ঔদার্যে যথার্থই মাতৃস্থানীয়া হয়ে উঠেছে।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাটা চরিত্রটির মাধ্যমে এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। প্রতিবন্ধী মানুষরা তাদের শারীরিক অসংগতির জন্য যে মানুষের কাছে হাসির খোরাক হয় তার উদাহরণ কলকাটা। কলকাটার শারীরিক অসম্পূর্ণতা তার দৈনন্দিন জীবনযাপনে যথেষ্ট পরিমাণে অসুবিধার সৃষ্টি করত। কারণ কলকাটার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়া বাকি চারটি আঙ্গুলই কাটা ছিল।

কথায় বলে আপনা হাত জগন্নাথ। মানুষকে যখন নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়, অন্য কাউকে পাশে পায় না তাকে সেই কাজে সাহায্য করার জন্য তখন মানুষ উক্ত প্রবচনটি প্রয়োগ করে। বলে বটে কথাটা। কিন্তু কি আশ্চর্য! জগন্নাথদেবেরই তো হাত নেই। মূর্তি অসম্পূর্ণ। সাধারণ দেবতার উদ্দেশ্যে কিছু দান করলে তা হয় নিখুঁত। কারণ আমরা মানি দেবতারা হন সর্বাঙ্গসুন্দর। ভগবানের কোনো দোষ থাকতেই পারে না। তাহলে জগন্নাথদেবের এরূপ মূর্তি কিসের বার্তা বহন করে? জগন্নাথমূর্তি বোঝাতে চায় প্রতিবন্ধকতা আসলে কোনো বাধাই নয়, সমস্ত বাধাই পেরিয়ে

যাওয়া সম্ভব হয় মনের ইচ্ছাশক্তিতে। সেই সৎ চিৎ এবং আনন্দের পূর্ণমূর্তি সচ্চিদানন্দ ভগবান- যার এক রূপবিশেষ জগন্নাথদেব।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের এত উন্নতি যখন হয়নি তখন কোনো কোনো রোগ ছিল যাকে তখনও মানুষ অতিক্রম করতে পারেনি, এমনই একটি রোগ ছিল কুষ্ঠ। এখন আধুনিক চিকিৎসায় কুষ্ঠ পুরোপুরি সেরে যায়। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন কুষ্ঠরোগের জন্য মানুষের অঙ্গহানি ঘটত অবশ্যম্ভাবী। কুষ্ঠরোগের ব্যাকটিরিয়া প্রথমে চামড়ায় আক্রমণ করে এবং তারপর তা ধীরে ধীরে স্নায়ুর উপর প্রভাব বিস্তার করে অঙ্গহানি ঘটায়। এই কুষ্ঠরোগ শুধুমাত্র যে আক্রান্ত ব্যক্তিকেই অক্ষম করে তুলত তা নয়, সাধারণ মানুষের মনে এই রোগ নিয়ে বিশাল একটা ভয়ের জায়গা ছিল। রোগটি যে একেবারেই ছোঁয়াচে নয়, তা বলা যায় না। কিন্তু দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার রোগ নয় কুষ্ঠ। কিন্তু এই কুষ্ঠ নিয়ে মানুষের মনে আতঙ্কের শেষ ছিল না। ফলত: কুষ্ঠরোগ দু'ভাবে মানবসমাজে আতঙ্ক বিস্তার করত। প্রত্যক্ষ রোগীর মধ্যে এবং পরোক্ষত: ছড়িয়ে পড়ার আতঙ্কে। কারণ ওষুধ ঠিকঠাক আবিষ্কৃত না হওয়ায় তখনকার দিনে কুষ্ঠরোগে একবার আক্রান্ত হলেই অঙ্গহানি নিশ্চিত। ফলে সেই মানুষটিও সমাজ থেকে ব্রাত্য হয়ে পড়বে।

'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষের মনোবলহীনতার ছবি এঁকেছেন। নিজের অক্ষমতা পুরুষ মেনে নিতে পারে না। পুরুষের সমস্ত বীরদর্প পৌরুষত্বের আস্ফালন ঘটে স্ত্রীর উপর জোর করে। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রও যা পারেননি এতদিন পরে আধুনিক মানুষ যতীনও তা পারল না। মহাশ্বেতা যতীনের কুষ্ঠরোগ হওয়ায় কোনোরকম হীনতার চোখে দেখেনি। বরং সবসময় চেষ্টা করেছে যতীনকে বড় দেখাতে এবং তার জন্য নিজে সমস্ত দোষ-পাপ নিজের বলে চালিয়েছে। নিজেকে ভেঙে-চুরে মহাশ্বেতা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে, শেষ করে দিয়েছে নিজেকে স্বামীকে বড় দেখানোর জন্য। কিন্তু পারেনি। কারণ এ যে ভয়ংকর কুষ্ঠরোগ। যতীনের সন্দেহ শেষ পর্যন্ত আর রক্ষা করতে পারল না তাদের দাম্পত্য।

সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্' গল্পে হাবু বোষ্টম কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত। তার হাতের আঙ্গুলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তাই সমাজের জনপদের মধ্যে থাকার অধিকার তার নেই। সমাজ তাকে নির্জন স্থানে থাকার অনুমতি দেয়। যদিও এজন্য তার ব্যক্তিগত জীবন থেকে থাকেনি। হামিদাকে বিয়ে করেছে। দুই সন্তানের জনকও হয়েছে। নিজের কোনো কাজ করার ক্ষমতা তো নেই-ই। আর ভিক্ষাও করতে পারবে না তার রোগের জন্য। তাই বড় সন্তান তুলসীর ভিক্ষার্জনই তাদের চারজনের বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার জন্য উচ্চশ্রেণির বাবুদের থেকে যখন কিছু আদায় করতে হয়, তখন হাবু তার রোগকে কাজে লাগাতে ভোলে না। সন্তানের জন্ম তো সে দিয়েছে। কিন্তু পিতা

হিসাবে সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়নি হাবু। শুধুমাত্র তার হাত নয় কুষ্ঠরোগ হাবুর মানবিকতা মনটিকেও গ্রাস করেছে। পঙ্গু করেছে। হাবুর কুষ্ঠরোগ তাদের দাম্পত্যজীবনে কোনো প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু যতীন আর মহাশ্বেতার সুখী দাম্পত্য ভেঙে গিয়েছিল যতীনের কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়ায়।

ড. নীহাররঞ্জন গুপ্ত 'উল্কা' উপন্যাসটিতে পথবাসী কুষ্ঠরোগে বিকৃত আরেকটি চরিত্র সৃজন করেছেন অরুণাংশুর অসহায়তা স্পষ্টতর করে তোলার উদ্দেশ্যে।

কুষ্ঠরোগে শুধু হাত পা নয়, অনেকসময় নাক, চোখ বা অন্যান্য অঙ্গবিকৃতিও ঘটে। মানুষ বিকটদর্শন হয়ে পড়ে। জীবনযাপনে হয়ত এদের খুব একটা কিছু অসুবিধা হয় না, কিন্তু এরা জনসাধারণের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিশতে পারে না। দুর্ঘটনা বা যে কোন কারণেই হোক না কেন মানুষ অনেকসময় বিকৃত বীভৎস দর্শন হয়ে যায়। পুরাণ রামায়ণ মহাভারতে এরকম অনেক চরিত্র পেয়েছি। যেমন রামায়ণে পাই উরুহীন অরুন, শরীরের আটটি স্থানে বক্রতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করা অষ্টাবক্র, মাথায় মৃগের মত শৃঙ্গ নিয়ে জন্মানো ঋষ্যশৃঙ্গ, সর্বাঙ্গ বিকৃত কুশনাভের শতকন্যা, কুব্জা মন্থরা, নাককাটা শূর্পনখা ; পুরাণে পাই গজানন গণেশ, বিকৃত শরীর কুবের, স্থবির জড়ভরত, দেহের বহুলাংশে ক্ষত এবং বিকৃতিযুক্ত যম এরকম আরোও অনেককে। রামায়ণে পেয়েছি ভগীরথকে। এদের মধ্যে পুরুষ চরিত্ররা সবাই-ই শেষ পর্যন্ত বিকৃত চেহারা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। মুক্তি পেয়েছিল এবং পুনরায় সুন্দরদেহের অধিকারী হয়েছিল। কুশনাভের শতকন্যাও পূর্বসৌন্দর্য ফিরে পাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। একমাত্র কুব্জা মন্থরা এবং শূর্পনখা প্রতিবন্ধী চরিত্র হয়েই থেকে গেছিল। দুজনেই পরিচিত খলচরিত্ররূপে।

মন্থরা খলনায়িকা হিসাবে পরিচিতা রামায়ণে। তার বুদ্ধিতেই কৈকেয়ীর অনুরোধে দশরথ রামকে চোদ্দ বছর বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল।

রামায়ণের অপর চরিত্র শূর্পনখার নাক কাটা গেছিল। তারই পরবর্তী ঘটনা রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং রাম-রাবণের যুদ্ধ। এই সমস্ত ঘটনার মধ্যেও রাক্ষসকন্যার সুকোমল প্রেমিকামনের পরিচয় পরিস্ফূট হয়েছে।

জার্মান ও উত্তর-ইউরোপের চরিত্র Changeling তার বিকৃত ভয়ঙ্কর দর্শনের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ছিল শয়তানের প্রতিভূ।

চেহারার রূপ-সৌন্দর্য বাহ্যিক। আজ আছে কাল নেই। এই চরমসত্য মেনে নেওয়ার মত মনের জোর খুব কম সংখ্যক মানুষের থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহামায়া' ছোটগল্পের নামচরিত্র

মহামায়া। প্রথমাবধিই তাকে দেখানো হয়েছে যথেষ্ট শক্তিশালী চরিত্র হিসাবে। তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব রয়েছে বলেই মনে করা হয়েছে। তাই গল্পের নায়ক রাজীব চিরকালই মহামায়ার কথা মেনে এসেছে। মহামায়ার অসম্ভব দার্ঢ্য চরিত্রের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তার ছিল না। রাজীব অতি কষ্টে অনেক সাহস সঞ্চয় করে মহামায়াকে জানিয়েছেন নিজের ভালোবাসার কথা। কিন্তু মহামায়া তার দাদার উর্দ্ধে গিয়ে রাজীবকে বরণ করে নিতে পারেনি। কিন্তু বিবাহের রাতেই সহমরণের জ্বলন্ত চিতা থেকে উঠে এসে হয়েছিল রাজীবের ঘরণী। একটাই শর্ত মহামায়ার অগ্নিদগ্ধ বিকৃতরূপ চিরকালই আবৃত থাকবে রাজীবের কাছে। যে সম্পর্কের ভিত্তি হবে বিশ্বাস স্বচ্ছতা এবং গোপনীয়তাহীন সেই সম্পর্কের সূত্রপাত মহামায়া করল সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে। এখানেই রোপিত হল মহামায়া চরিত্রের ট্র্যাজেডি। সত্য সর্বদাই নিজগুণে প্রকাশিত হয়। সত্যকে কোনোদিন চেপে রাখা যায় না। শুধু থাকে কিছুটা সময়ের অপেক্ষামাত্র। এরপর ঘটনাচক্রে একদিন যখন রাজীবের সামনে উন্মোচিত হয় মহামায়ার অগ্নিদগ্ধ চেহারা মহামায়া সেই আঘাত আর মেনে নিতে পারল না। ত্যাগ করে হারিয়ে গেল নিরুদ্দেশের পথে। মহামায়ার তুলনায় বরং রাজীবের চারিত্রিক সংযম এবং দৃঢ়তা অনেক বেশি অঙ্কিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ‘স্ত্রীরপত্র’ গল্পে দেখালেন বিন্দু শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিত হয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা যায়।মৃণাল শিক্ষিত শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে পিষ্ট না হয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বেরিয়ে যান এবং স্বামীকে লেখা চিঠিতে বলে,এবার সে বাঁচবে।বাণী বসুর ‘অমৃতা’ উপন্যাসে অমৃতা যেন বিন্দু ও মৃণালের দুই রূপ একসাথে।মৃণাল প্রশ্ন রেখে যায়,শ্বশুরবাড়ির লোক আর তার খোঁজ করবে কিনা,মৃণাল তার বেছে নেওয়া স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারবে কিনা,ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এ প্রশ্ন নিয়ে কাহিনিটি শেষ না হয়েও শেষ হয়ে যায়।এবার এল বাণী বসুর অমৃতা ।সে শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে গিয়ে আইনী বিচ্ছেদ,সন্তানের একক মাতৃত্ব সব নিয়ে যখন নিজের জীবন নিজের মত গুছিয়ে নিতে প্রস্তুত তখনই তার ওপর হল অ্যাসিড আক্রমণ।সেই দহন-জ্বালা ধীরে ধীরে প্রশমিত করে অমৃতত্বের পথে অগ্রসর হয়ে চলে অমৃতা।

মহামায়ার মতই ফাতিমাকে পাই ফণীশ্বরনাথ রেণুর ‘জ্বলবা’ বা ‘দাহ’ গল্পে। ফাতিমা অ্যাসিড হানার শিকার। সুন্দরী যুবতী আজ বিকৃতরূপী। যদিও মুসলমান সমাজ বোরখায় ঢেকে রাখে মেয়েদের। সেখানে ফাতিমা বোরখার আবরণ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। জ্বলন্ত দৃপ্ত প্রতিবাদে মুখর হয়েছে। পুরুষসমাজ নারীর এই স্পর্ধা সহ্য করতে না পেরে ফাতিমার মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছে। যাকে রূপবিকৃতি সহ্য করতে না পেরে ফাতিমা বোরখার আশ্রয় অবলম্বন করে। কিন্তু না মুসলমান সমাজের কোনো রক্ষণশীলতাই আটকে রাখতে পারেনি ফাতিমাকে। বরং ফাতিমা তার দাহের মধ্যে

প্রচ্ছন্ন থাকা অন্তরের আগুনকে দেখতে পেয়েছে। সমাজের চোখে তার পোড়ার ক্ষত লুকাতে চায়নি ফাতিমা বরং পোড়ার ভিতরে থাকা আগুনের আরও প্রজ্জ্বলিত শিখাকে দেখতে বলেছে। 'মহাভারত'এর শকুনি যেমন নিজের প্রতিবন্ধকতাকে শক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছে তেমনি ফাতিমাও তার অসম্ভব মনের জোরে প্রতিবন্ধকতাকে আরও ইতিবাচক রূপে প্রতিভাত করেছে।

রূপবিকৃত তথা প্রতিবন্ধী স্বামী চরিত্রের পাশাপাশি বিপরীত রূপচিত্রও আছে বাংলাসাহিত্যে। বনফুলের বিখ্যাত ছোটগল্প 'তাজমহল'। ইতিহাসের শাজাহান তার মমতাজ বেগমের স্মৃতিরক্ষার্থে তাজসৌধ বানিয়েছিলেন। তাই তাজমহলের সঙ্গে মমতাজের দু:খের ইতিহাসের থেকেও বিশ্বজগতের চোখে সবার আগে আসে সম্রাট শাজাহানের নাম। সে তো গেল সম্রাট শাজাহানের কথা। কিন্তু দিল্লীর পথে এরকম অনেক শাজাহান ঘুরে বেড়ান। যারা হন ফকির শাজাহান। কিন্তু মনের উদারতার দিক থেকে তার মহান ঐশ্বর্যের অধিকারী। ফকির শাজাহানের স্ত্রী ভয়ঙ্কর অসুস্থ। অসুখ কেড়ে নিয়েছে বেগমের রূপসৌন্দর্য। বিকৃতরূপী অসুস্থ পচাগলা দেহ থেকে দুর্গন্ধ বেড়চ্ছে। কিন্তু তাকে নিয়ে পরম আদর যত্নে যেটুকু সময় পারে রক্ষা করে যাচ্ছে ফকির শাজাহান। আর তার বিবিজানও প্রতিমুহূর্তে খেয়াল রাখছে স্বামীর। প্রতিবন্ধকতা তাদের দাম্পত্যে কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি। মারা যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সুন্দরভাবে জীবন্তভাবে বেঁচে থাকা যায় কিভাবে তার প্রতিচ্ছবি ফকির শাজাহানের বেগম। তার কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধকতাই তাদের সুখী জীবনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।

একজন শিশুসাহিত্যিকের শিশুদের প্রতি এই বার্তা যে কতটা প্রাসঙ্গিক, তার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, ড. নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' উপন্যাসটির কথা। 'উল্কা' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র অরুণাংশু তার বিকৃত রূপের জন্য জন্ম থেকেই পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে আশ্রমে বড় হয়ে উঠেছে। আশ্রমের মহারাজ অরুণাংশুকে অত্যন্ত স্নেহ-পরবশতায় ছোট্ট থেকেই জগতের দু:খ-কষ্ট-ব্যঙ্গ থেকে অরুণাংশুকে আড়াল করে এসেছিলেন। কিন্তু মহারাজের মৃত্যুর পর অরুণাংশুকে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতেই হল। তখনকার অরুণাংশুর অসহায় অবস্থা প্রসঙ্গে অবশ্যই লীলা মজুমদারের শিশুশিক্ষা প্রাসঙ্গিক।

রূপবিকৃতি যে কোনো দুর্ঘটনা বা অসুখ থেকে হচ্ছে শুধু তাই নয়, রূপবিকৃতির কারণ অনেকসময় প্রোথিত থাকে সন্তানের জন্মের পূর্বেই। বিমল করের 'জননী' গল্পের বড় মেয়ে অনুপমার ছেলে জন্ম থেকেই বিকৃতদেহী। পুরাণ বা মিথে যেমন দেখি বিকৃত শিশু জন্মের কারণ গর্ভাবস্থার কোনো বিশেষ ঘটনা বা দুর্ঘটনা তেমনি অনুপমার এই ছেলের বিকৃতদেহী হয়ে জন্মানোর কারণ অনুপমার স্বামীর গুপ্তরোগ।

আধুনিক কবি শঙ্খ ঘোষ ‘বাবরের প্রার্থনা’য় যার কথা উল্লেখ করেছিলেন,-

‘না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে

কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?’[১১]

জীবন সংগ্রামময়। প্রতিমুহূর্তে লড়াই করে নিজের অধিকারটুকু স্থাপন করতে হবে। এই কঠোর কথাগুলি বড়রা সাধারণত: শিশুদের কাছ থেকে লুকিয়ে যাই। ফলত: শিশুরা ছোট থেকে জগতের কঠোর দিকটা না জেনে যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন বড়ই নির্মমতার শিকার হয়ে কষ্ট পায়। লীলা মজুমদার তাও তার সমস্ত লেখাতেই শিশুদের কঠিন বাস্তবকে দেখিয়েছিলেন। লীলা মজুমদারের গল্পের প্রতিবন্ধী চরিত্ররা তাই জন্য প্রথম অবস্থা থেকেই বিপদে পড়ে, তাতে কেঁদে কেটে, তারপর উঠে দাঁড়িয়েছে এবং জীবনসংগ্রামে জয়ের পথে এগিয়ে গেছে। গবেষণা-অভিসন্দর্ভের নির্বাচিত গল্পের-উপন্যাসের চরিত্ররা হল, ‘হলদে পাখির পালক’ উপন্যাসের সর্দারের ছেলে এবং ভালুকছানা, যারা দুজনেই গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার শিকার ; ‘নেপোর বই’ উপন্যাসের পানু, সেও গমন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ; ‘পাখি’ গল্পের কুমুও কঠিন অসুখের জন্য একটা পা ঠিকঠাক তুলতে পারে না ; ‘তানির ডায়েরি’ গল্পের তানিরও পা বিকৃত ; ‘চিড়িয়াখানা’ গল্পে হাতের বুড় আঙুল ছ্যাঁচা বৃদ্ধের পালিত পশুপাখিরা প্রত্যেকেই তাদের বিভিন্নরকম শারীরিক অক্ষমতার জন্য ঠিকঠাক চলাফেরা করতে পারে না। ‘ অহিদিদির বন্ধুরা’ গল্পের ভূতগুলির জিভ-কাটা। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই শেষ অবধি দু:খবিলাস না করে দু:খকে জয় করেছে।

আয়তনে খর্ব মানুষজনেরাও সমাজের চোখে এক অন্য মানুষ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রেও সমাজের চোখে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সবার আগে প্রয়োজন যে self-respect বা আত্মবিশ্বাস, তারই প্রতিফলন রয়েছে ও বিমল করের ‘দেওয়াল’ উপন্যাসের ‘উমা’ এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘খাখ্’ ছোটগল্পের ভোম্‌রা চরিত্র। ভোম্‌রা একটি ছেলে। তার বামনাকৃতির জন্য সে ছোটবেলা থেকেই অনেকরকম অকথা-কুকথা শুনেছে। তবু সে থেমে থাকেনি। এগিয়ে গেছে জীবনের পথে। শেষে তার ছোট থেকেই ভালোবাসার পাত্রীর উপেক্ষা সে আর সহ্য করতে পারল না। জীবনের মধ্যবয়সে এসে আর্থিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েও শুধুমাত্র ঘর-গড়ার স্বপ্ন বারবার বিফল হওয়ায়, একটি মাত্র মেয়ের উপেক্ষার হাসির আঘাতে আগুনে আত্মাহুতি দেয় ভোম্‌রা। সেখানে উমা একটি মেয়ে। তার খর্বাকৃতির জন্য সে সমাজের চোখে বারংবার বিদ্রূপের শিকার হয়েছে। কন্যাদায়গ্রস্ততার দেশ বাংলায়, দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতেও বিবাহ-ব্যবস্থায় প্রত্যাখ্যাত হয়েও আগুনের বদলে বেছে নিয়েছে জীবনকে।

রূপজ বিকৃতি মানুষের জীবনে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সমাজ মানুষের যে কোনো তুচ্ছাতিতুচ্ছ অসামঞ্জস্যকেই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে। কারণ জীবন-জগৎ বড়ই নির্মম। মানুষকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বলা হয়, জগৎ একটা বিশাল আয়নার মত। তার দিকে যেভাবে তাকানো হবে, জগৎ সেইরূপই দেখাবে। তাই যেকোনো অক্ষম মানুষদের নিজের দুর্বলতাকে অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

গ্রামবাংলার এক সাধারণ মেয়ে যখন কথা বলতে পারে না। মনের মধ্যে জমে থাকা একরাশ কথা ফুটে বেরোতে চায়, কিন্তু ভগবানের নির্মম পরিহাসে ভাষা পায় না, তখন নির্বাক প্রকৃতিই তার সাথে একাত্মতার সম্পর্ক স্থাপন করে। পিতা বাণীকণ্ঠ সুহাসিনী ও সুকেশিনীর সঙ্গে মিলিয়ে ছোট মেয়ের নাম রেখেছিলেন সুভাষিণী। আর এই সুভাষিণী ওরফে সুভাই হল ভাষাহীনা। সুভা কানে শুনতে পায়, শুধুমাত্র বলতে পারে না। তাই তার সামনেই হয়ে চলা তার সম্বন্ধে সমস্ত কথাই তার অন্তরকে বিদ্ধ করতে থাকে। সুভা জগৎকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু জগৎকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। আর জগৎ সংসার গ্রহণের পক্ষে বেশি আগ্রহী। সাধারণ মূকত্ব এবং বধিরত্ব একসঙ্গে আসে। কিন্তু এ যে পল্লীগ্রামবাংলার ভাগ্যবিড়ম্বিত মেয়ে। তাই নিজের দুর্ভাগ্যের প্রতিটি যন্ত্রণা তাকে দগ্ধে দগ্ধে গ্রহণ করতে হবে। শেষপর্যন্ত সুভার বাবা-মা সুভাকে পাত্রস্থ করে নিজেরা কন্যাদায়গ্রস্থ থেকে মুক্ত হলেন। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর স্বামীর বাড়ির লোকজন যখন জানতে পারল সুভার কণ্ঠে ভাষা নেই তখন তারা সেই বৌ নিয়ে ঘর করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। অথচ গ্রামবাংলার চাহিদা বৌ এর মুখে যেন কোনো কথা না থাকে। সমস্ত অত্যাচার সে মুখ বুজে সহ্য করবে। কোনো প্রতিবাদ করা চলবে না। সুভার তো আর কোনো শারীরিক সক্ষমতার অভাব ছিল না। এরকম বৌ তো গ্রামবাংলার ঘরে কাম্য! বৌ ঘরের যাবতীয় গঞ্জনা সহ্য করবে। কোনো কথা বলতে পারবে না। নিজের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য মরমে মরে থাকবে। এত আদর্শ গুণ থাকা সত্ত্বেও সুভার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ হতে থাকল। সুভার কথা কেউই জানতে চাইল না। সুভা কি চায় সেটা তার বাবা-মাই কোনোদিন জানতে চায়নি তো শ্বশুরঘর কি করে তার মর্যাদা দেবে! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভাষিণী' আবার ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীর বঞ্চনার কথাই বলল। প্রতিবাদে নিজের স্বাধীন জীবনযাপনের কথা ভাবতেও পারল না।

নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' উপন্যাসে দেখেছি বোবা-কালা-হাবা শ্যামলীর বিয়ে এক খোঁড়া ছেলের সাথে তার বাবা দিতে চাইলেও,ছেলের মা সে সম্বন্ধ অস্বীকার করেছে।সমাজ পরিসরে খোঁড়া পাত্র প্রতিবন্ধকতাযুক্ত হলেও বোবা পাত্রীকে মেনে নেয় না।একজন নারীর কলমে এক নারীর অব্যক্ত যন্ত্রণাদীর্ণতার কথা ব্যক্ত হয়েছে শ্যামলীতে।যে শ্যামলী বিবাহ-পূর্ব জীবনে জন্তু রূপে

আখ্যায়িত হত,সেই শ্যামলীই স্বামী অনিলের ভালোবাসার স্পর্শে পরিপূর্ণ নারীত্বে উত্তীর্ণ হয়েছিল।সমাজের রক্তচক্ষুর হাত থেকে বাঁচতে প্রকৃতি ও গর্ভধারিণীর আঁচলের তলায় লুকাত,সেই স্বামীর উষ্ণসান্নিধ্য ও যথাযথ প্রশিক্ষণে স্বাভাবিক জীবন ছন্দে ফিরে আসতে পেরেছে।তার সন্তান সুস্থ স্বাভাবিক হয়েছে,মায়ের কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা তার মধ্যে আসেনি।

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পঙ্গু মালার রূপকথার গল্প শোনার শ্রোতাদের মধ্যে হাজির করেছিলেন বগলীকে। সিধুর এই মেয়েটা হাবা-তোতলা। তাইজন্য সে সমবয়স্কদের সাথে মিশতে পারে না। তার জগৎ মালার রূপকথার জগতের মধ্যেই শান্তি খুঁজে পায়। মালা তার অক্ষমতাকে জয় করতে পেরেছিল। হয়ত রূপকথার জগৎ থেকেই তার শক্তি সঞ্চয় করেছিল। বগলীও তাই রূপকথার গল্প শোনে আর মালাকে দেখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বোনে।

'বরযাত্রী' গল্পেরই আরেক চরিত্র গণেশ। বরের বন্ধু সে। বন্ধুরা তাকে গণশা বলে ডাকে। সে তোতলা। কিন্তু তার অসম্ভব জীবনীশক্তি প্রাণশক্তি তার এই কথা বলা আটকে যাওয়া তথা তোতলামির প্রতিবন্ধকতা কোনো ক্লেশদায়ক তো হয়ইনি বরং সমস্ত কাহিনীর গতি ত্বরান্বিত করেছে। গণেশের এই তোতলামিই বরযাত্রী গল্পের মূল প্রাণ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের এক অনাবিল হাসির গল্প 'বরযাত্রী'। বিবাহ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মানুষের সমাবেশ এবং তাদের মধ্যে বিভিন্নরকম কথোপকথন হাস্যরসের ফোয়ারা তোলে। গল্পটিতে চরিত্রের মেলা বসেছে। তারই মধ্যে একজন বরের পিসেমশাই, আরেকজন কনের বাড়ির লোক। দুই বয়স্ক মানুষই কানে খাটো। তাদের পারস্পরিক কথোপকথন নির্মল হাস্যরসের উৎসার ঘটিয়েছে।

উত্তরাধিকারহীন পঞ্চমবর্গীয় সাহিত্যের উদাহরণ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি। উপকথার কথক সুচাঁদ বুড়ী। চোখেও দেখে না, কানেও ঠিকঠাক শোনে না। পাটাও একবার ভেঙে গেছিল। বুড়ী ইনিয়ে বিনিয়ে সারাক্ষণ হাঁসুলীবাঁকের উপকথা শোনাতে থাকে। শ্রোতারা যে খুব বেশি আগ্রহী তা নয়। কিন্তু তাতে বুড়ীর কিছুই যায় আসে না। বুড়ী দিব্য নিজের মতো করে কথকতা শুনিয়ে যেতে থাকেন। তার প্রতিবন্ধকতা তার গল্পশোনার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। তবে সুচাঁদ এখন বয়স কালে এরকম হয়ে গেলেও যৌবনে তার দাপট ছিল ঐ অঞ্চলে যথেষ্ট। মাতব্বর বনওয়ারী তাকে পিসী বলে ডাকে। মাতৃহীন বনওয়ারীকে সুচাঁদ নিজের স্তন্যও দান করেছে। সুচাঁদের একমাত্র মেয়ে বসন্ত যখন বিয়ের আগেই অন্তঃসত্তা হয়ে পড়েছিল তখন সুচাঁদই মা এবং অনাগত সন্তানের যথাযথ সামাজিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা করেছিল। যৌবনে সুচাঁদের দাপট থাকলেও বুড়ী সুচাঁদ যখন ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প শোনাত তখন অনেকেরই হাসির পাত্রও হয়েছিল।

‘গায়েন’ গল্পে ‘রাজেনের স্ত্রী’ বোবা হলেও তার ভালোবাসায় সমস্ত বাধা অতিক্রান্ত হয়েছে। পাশাপাশি ‘পেরানটা’ গল্পের ফুলবানু তার প্রবল চারিত্রিক দার্ঢ্যতায় তার সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে।

একদিকে কৌলিন্য প্রথা অন্যদিকে এক নারীর ভালোবাসা-দুই এর রূপ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ছোটগল্প ‘গাছ’-এর গঙ্গামণি। গঙ্গামণি কথা বলতে পারে না। কিন্তু ভালোবাসা বোঝে। গঙ্গামণির মনের হদিশ সাধারণ সমাজ করতে পারে না। গঙ্গামণিকে সমাজ এক বোবা মেয়ে হিসাবে স্বাভাবিক সমাজে মেনে নিতে পারে না। গঙ্গামণিও তাতে বিপন্ন না হয়ে প্রকৃতির মধ্যে আত্মস্থ হয়ে নিজস্ব জগৎ গড়ে তুলতে পেরেছে।

গণেশ তো কমেডি চরিত্র। কিন্তু সুভাকে দেখে সবাই হেসেছে। সুভার অক্ষমতা অন্য সবার কাছে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে তাকে। বগলীও সমবয়স্কদের সাথে মেশার যোগ্যতা হারিয়েছে। কিন্তু যদি এমন হয় যে একজন মানুষের মৌনতা অন্যদের হাসি কেড়ে নেয়, তখন ব্যাপারটা কেমন হয়। বাংলাদেশী ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানের বিখ্যাত উপন্যাস ‘ক্রীতদাসের হাসি’। এর মূল চরিত্র ক্রীতদাস তাতারী। চরিত্রটি পুরোপুরি মূক নয়। সরাসরি প্রতিবন্ধী চরিত্র বলা যায় না একে। বাদশাহ আলমপনা তাতারীর হাসিও কিনতে চেয়েছিল। যার বিনিময় মাধ্যম ছিল প্রচুর ধনদৌলত। কিন্তু তাতারীর থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তার প্রাণখোলা হাসির মূল উৎস তার স্ত্রীকে। প্রাণখোলা হাসি কেনা যায় না। তাই তাতারী সাময়িক মৌন হয়ে গেছিল। আবার স্ত্রীকে ফেরত পেয়ে তার মুখে হাসি ফুটেছিল। মৌনতা কিভাবে প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে চরিত্রটির মধ্যে তাই প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও এটি একটি রূপক উপন্যাস। তাই তাতারী প্রতিবন্ধী চরিত্র মোটেই নয়, তাতারী প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র। তাতারীর মৌনতা প্রতিবন্ধকতার ভাষাহীনতা নয়, তাতারীর মৌনতা প্রতিবাদের মুখরিত নির্বাক চিত্র।

প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রমাপদ চৌধুরীর ‘পশ্চাৎপট’ উপন্যাসের দম্পতি চরিত্র সুশান্ত-জুঁই। সমাজ এদের গুণাবলী না দেখে অক্ষমতা নিয়ে চর্চা করাতেই সুখী। কিন্তু এরা এ সমস্ত কিছু পাত্তা না দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। তাদের পরিবার তাদের পাশে থেকেছে। মানুষের জীবনে পরিবারের অনস্বীকার্য ভূমিকা এখানে স্পষ্ট।

ভালোবাসার আকাঙ্খায় পাগল হয়ে গিয়েছিল মেহের আলি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ ছোটগল্পের মেহের আলি। মেহের আলি আসলে মাশুল-কালেক্টরের বিকল্প সত্তারূপে ক্রিয়া করেছে। আমাদের সবার মধ্যেই যেন এরকম এক মেহের আলি বাস করে। সৌন্দর্যের প্রতি মোহ

এবং সেই মোহভঙ্গের যন্ত্রণায় মেহের আলিরা পাগল হয়ে যায়। আর এই পাগল মেহের আলিরাই আবার নতুন কাউকে মেহের আলি হওয়া থেকে সতর্কবাণী শুনিয়ে রক্ষা করতে চায়।

'স্ত্রীরপত্র' গল্পে বিন্দুর স্বামীও ছিল পাগল। বিন্দুর উপর অত্যাচার করাতেই তার শাস্তি। মণীন্দ্রনাথও পাগল ছিল, কিন্তু স্ত্রী শশীবালার সান্নিধ্যে শান্ত হতেন। আসলে মণীন্দ্রনাথের উন্মাদগ্রস্ততা ভালোবাসার আকাঙ্খায়। কিন্তু বিন্দুর স্বামী তো আগে থেকেই পাগল। তার পাগলামির কারণ জানা যায় না। হতে পারে মাতৃসূত্রে প্রাপ্ত। কারণ বিন্দুর শাশুড়ীও পাগল। পাগল বলতে ছেলের মত অতটা পাগল নয়, কিন্তু রেগে গেলে আর হিতাহিতজ্ঞান থাকে না। পাগল ছেলেকে সামলানোর জন্য বিন্দুর সাথে তার বিয়ে দিয়েছিল। অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিন্দুর সঙ্গে তার স্বামীর বনিবনা হয়নি মোটেই। ফলশ্রুতিতে বিন্দু আত্মহত্যা করেছিল।

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় কোনো এক 'বিপন্ন বিস্ময়ে'র উল্লেখ করেছিলেন। সব পেলেও মানুষের চাহিদা মেটে না। অশান্তিতে ভোগা অপরকে সন্দেহ করার মধ্যেই তার বিপন্নতার বীজ রোপিত থাকে। যেমন 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসের যাদব পন্ডিত। সব পেয়েছির মধ্যেও এক খ্যাতির লোভে সস্ত্রীক আত্মবলিদান দেন। এটা পাগলামির লক্ষণ। যদিও সমাজ-পরিবেশ এরকম মানুষকে পাগল বলে মনে করে না। সমাজের চোখে এঁরা বাক্‌সিদ্ধ ভগবান। পাশাপাশি আরেকটি চরিত্র রয়েছেন যামিনী কবিরাজ। তাঁর পাগলামির লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে শশীর অবৈধ সম্পর্ক সন্দেহে। এরূপ মানসিক বিকৃতির ফলে সন্দেহের বশে যামিনী কবিরাজ শশীকে ছোট করার জন্য নিজে একজন ডাক্তার হয়েও স্ত্রীকে শশী ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের বদলে নিজে ভুল ওষুধ খাইয়ে দেয়। তুলনীয়, জগদীশ গুপ্তের 'পয়োমুখম' গল্পের কৃষ্ণরাজ কবিরাজের কথা। তিনিও আত্মস্বার্থ চরিতার্থতায় ছেলের বৌদের ভুল ওষুধ খাইয়ে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেন। এরা সমাজের চোখে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। পাগলামির কোনো লক্ষণ নেই এদের মধ্যে। এরা চিৎকার করে, ভাঙচুর করে না। কিন্তু এদের মানসিক বিকৃতি চূড়ান্ত পর্যায়ের। এই বিকৃতি সমাজের পক্ষে হানিকর।

সমাজ যাকে পাগল বলে জানে, তাদের ব্যবহারে অনেকসময় পাগলামি নয়, বরং অতি সংবেদনশীলতা পরিস্ফূট হয়। 'পুতুলনাচের ইতিকথা' উপন্যাসে যাদব পন্ডিতের স্ত্রী পাগলাদিদি নামে পরিচিত। তার আচরণ স্বভাব নাকি পাগলাটে। কিন্তু কোথায় তার আচরণে অসংলগ্নতা? তার স্বামী যাদব পন্ডিত বাক্‌সিদ্ধ হবার লোভে নিজের মৃত্যুর সময়ক্ষণ উল্লেখ করেছিলেন। শশী ডাক্তার হিসাবে বুঝেছিল এটা বলা সম্ভব নয়। যাদব পন্ডিতের পর তার স্ত্রী পাগলাদিদিকে এ সিদ্ধান্ত বদলের জন্য অনেক অনুরোধ-উপরোধ করেছিল শশী। কিন্তু পাগলাদিদি তার উত্তরে শশীকে যা বলেছিল তা কখনোই এক পাগলের উপলব্ধি হতে পারে না। স্বামীর সম্মানরক্ষার্থে এবং মরণশীল

মানুষের মৃত্যুর পরও মানুষের মনে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য বেঁচে থাকার লোভ কোনো পাগলের থাকতে পারে না।

পাগল বরের আরেক উল্লেখ আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' গল্পে। মাত্র সতেরো বছর বয়সে চারুর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল রামতারণবাবুর পাগল ছেলের। এখানে চারু বিন্দুর মত স্বামীকে ছেড়ে চলে আসেনি। বরং পাগল স্বামীর সামনেই চারুর বনমালীর সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চারুর বরের পাগলামির কোনো আচরণ লেখক দেখাননি। বরং বলা যায় বাবার ভয়ে সে প্রচন্ডই ভীত ছিল। রামতারণবাবুই তার ছেলেকে পাগল সাজিয়ে রেখেছিলেন।

চারুর একমাত্র সন্তান ছিল ভুবন। বাবার চরিত্রের অসহায়তা এবং মায়ের চারিত্রিক স্খলনের প্রতিফলন ঘটেছে ভুবনের মধ্যে। ভুবন অস্বাভাবিকা সথূলকায়া। যার ফলে চলাফেরা করাও তার পক্ষে অনেকটাই দু:সাধ্য। আর মানসিক দিক থেকেও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। নষ্ট দাম্পত্যের সন্তান ভুবন। ভুবন এবং তার পিতা উভয়ের প্রতিন্ধকতা মূলত শারীরিক বা মানসিক যতটা নয় তার থেকেও বেশি চারিত্রিক বৌদ্ধিক বিকাশের।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাকালের জটার জট' গল্পের সুচিত্রা আদর্শ নিদর্শন পারিবারিক-সামাজিক প্রতিকূলতার।

প্রেম-মাতৃত্ব-পূজার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে পাগলি পূর্ণিমার চরিত্রে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'তিরোলের বালা'র অভিযাত্রী। সুন্দরী কল্যাণী মেয়েটির হঠাৎ যে কি হয় মারাত্মক মূর্তি ধারণ করে সে। পাগলামির চূড়ান্ত রূপ দেখানো হয়েছে পূর্ণিমা চরিত্রে। পূর্ণিমার পূর্ব-ইতিহাস সম্পর্কে একেবারেই নীরবতা পালন করেছেন গল্পকার। পূর্ণিমা জন্ম থেকেই পাগল ছিল না, এটা স্পষ্ট বলা আছে। এমন কিছু ঘটনা আছে যা পূর্ণিমাকে মানসিক ভারসাম্য হারাতে বাধ্য করেছিল। পূর্ণিমা আসলে যখন শান্ত থাকে তখন তার দু:খ বা কষ্টের ইতিহাসটাকে ভুলে থাকে। আর যখনই বিশেষ কোনো অনুষঙ্গে পূর্ণিমার মনের আঘাতের জায়গাটা অনাবৃত হয়ে পড়ে তখন আর ভারসাম্য রাখতে পারে না পূর্ণিমা। একেবারে ভায়োলেন্ট হয়ে পড়ে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারপর?' গল্পে হাবো এবং 'সরীসৃপ' গল্পের 'ভুবন' দুজনই অটিজম লক্ষণাক্রান্ত। দুটি চরিত্রই চেয়েছিল জীবনযুদ্ধে সামিল হতে। কিন্তু নির্মম সমাজ দুই তরুণ-তরুণীর জীবনপথ অন্ধকারে স্তব্ধ করে দেয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসের একটি চরিত্র পাগল। সবাই তাকে পাগল নামেই চেনে। এই পাগলের মধ্যে কোনো ধ্বংসাত্মক উপাদান নেই। বরং সে হল

গঠনাত্মক। সৃষ্টির মূলে রয়েছে অপার আনন্দ ও বিস্ময়। সেই আবেগের নাম পাগল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকে বিশু পাগলাকে আমরা যেমন দেখেছিলাম তারই আরেক রূপভেদ হাঁসুলীবাঁকের পাগল কাহার। এই পাগল বা পাগলি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিদের লেখনিতেও। কখনোও জয় গোস্বামীর কলমে, 'পাগলি তোমার সঙ্গে' আবার কখনো নজরুলের বিদ্রোহী সত্তায় 'পাগলি মেয়ের এলোকেশি'। শুধু ধ্বংসাত্মক নয় গঠনাত্মক শুভবোধক সত্তায় উত্তরণ ঘটেছে পাগল-পাগলির।

ভালোবাসার মানুষকে না পারার যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে গেছিলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের মণীন্দ্রনাথ ভৌমিকও। দেশভাগের যন্ত্রণার কথা রক্তাক্ষরে লিখিত রয়েছে উপন্যাসে। তৎকালীন সম্ভ্রান্ত হিন্দুঘরের রক্ষণশীলতার চূড়ান্ত উদাহরণ ভৌমিক পরিবার - মহেন্দ্র ভৌমিক। বাড়ির বড় ছেলে মণীন্দ্রনাথের বৌ হিসাবে ম্লেচ্ছ কন্যা পলিনকে মেনে নিতে পারলেন বলে ভৌমিক পরিবার হারালো বাড়ির বড় ছেলেকে। পাগল হয়ে গেল মণীন্দ্রনাথ। আশেপাশের লোকজনের কাছে তিনি পরাজিত হলেন পাগলাঠাকুর নামে। পলিনের নীল-চোখ সর্বত্র খুঁজে বেড়ায় মণীন্দ্রনাথ। মনে পড়ে রূপম ইসলামের সেই গানটার কথাগুলো-

''নীল রঙ ছিল ভীষণ প্রিয়

তাই সব কিছু নীলিয়ে দিল

মনে পড়ে কি সেদিন

বলেছিলাম তোমায়

আজ নীল রং এ মিশে গেছে লাল

আজ রং চিনে নেবার আকাল

নীল বাতাসেও বে-নীল ভেজাল

ভেসে বেড়ায়।''

ভালোবাসার রং লাল আর নীল মিলেমিশে একাকার। পলিনকে পায়নি মণীন্দ্রনাথ। কিন্তু স্ত্রী হিসাবে শশীবালার স্পর্শে শান্ত হয়েছে মণীন্দ্রনাথ।

প্রখ্যাত উর্দু কথা সাহিত্যিক সাদাত হোসান মন্টো 'টোবা টেক সিং' উপন্যাসে দেখিয়েছেন দেশভাগের যন্ত্রণা কী প্রভাব ফেলে পাগলদের মধ্যে। সমাজের দৃষ্টিতে পাগলকে দেখানোর বদলে

পাগলের চোখে সমাজ এবং সমাজ-সমস্যা, সমাজ-নীতি কিরকম তার স্পষ্ট চিত্র বিশন সিং-এর আচরণ।

শ্মশানকর্মীদের জীবনের দু:খ নিয়ে বাংলাসাহিত্যে চরিত্রায়ন রয়েছে। কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাস 'অন্তর্জলি যাত্রা', রমেশচন্দ্র সেনের ছোটগল্প 'ডোমের চিতা' আরোও অনেক। এদের মধ্যে আরেকটি উল্লেখ্য সুবোধ ঘোষের 'শ্মশান চাঁপা'। ঘাটবাবু এখানকার প্রধান চরিত্র। ঘাটবাবু চিরকালই চেয়েছেন স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মত গৃহী জীবন যাপন করতে। বিয়েও করেছিল। স্ত্রী সন্তানসম্ভবাও হল। নতুন করে এক সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখছিল ঘাটবাবু। কিন্তু সন্তানকে পেটে নিয়েই ঘাটবাবুর স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। তখন থেকেই ঘাটবাবু আর অন্য জায়গায় চলে না গিয়ে সেই শ্মশানঘাটের উপান্তেই অপেক্ষা করতে থাকে তার স্ত্রীর ফিরে আসার। স্ত্রীর মৃতদেহ এলও একদিন। এতদিনের স্ত্রীকে না দেখার অতৃপ্তির এইভাবে পূরণ ঘাটবাবুকে আরও বিচলিত করে তুলেছিল। এবার ঘাটবাবু অপেক্ষা করে রইল তাদের অসুস্থ পুত্রের। একসাথে জীবন না কাটাতে পারলেও শ্মশানভূমিতে যে একসাথে থাকার স্বপ্ন দেখেছিল ঘাটবাবু সেই অতৃপ্ত কামনাই তাকে পাগল করে তুলেছিল।

'কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা'র মূল চরিত্র ক্ষ্যাপা। শ্মশানেই তার ঘরবাড়ি। অনেক মৃতদেহকে সে মাটির কবরে শুইয়ে দিয়েছে। তার ঘরের উঠোনে অনেক শিশু পরম শান্তিতে নিদ্রামগ্ন রয়েছে। এই মৃত্যুযন্ত্রণা কোনোদিন স্পর্শ করতে পারেনি ক্ষ্যাপাকে। সে নিজের মত আনন্দে গান গেয়ে বেড়াত। বিয়ের অনেকবছর পর তাদের ঘর আলো করে আসে ইরুল। এই ইরুলের অকালমৃত্যু ঘটে। ছোট্ট ইরুলকে যখন পেশাদারী দক্ষতায় ক্ষ্যাপা চিরশান্তি শয্যায় শুইয়ে দিল তখনই তার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছিল পিতৃসত্তা। এতদিন যে শিশুরা তার উঠোন জুড়ে ছিল তারাও ক্ষ্যাপার হ্যালুশিনেশনে জেগে উঠে শিশুপুত্র ইরুলের সঙ্গে খেলতে থাকে। সন্তানহারানো পিতার বেদনা ফুটে ওঠে ক্ষ্যাপার মধ্যে।

প্রতিবাদে মুখরিত হয়েছিল শিবন মেথরও। মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের এক অতি ছোট চরিত্র শিবন মেথর। বীরসার মৃত্যুর পর তার শেষ কাজ করেছে শিবন। বীরসার উপর হওয়া সমস্ত অত্যাচার শোষণ পীড়নের সাক্ষী সে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেনি। একেবারেই যে সে কখনো প্রতিবাদ করেনি তা-ও নয়। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে পারেনি সে। শেষপর্যন্ত প্রচন্ড এক মানসিক চাপে সে মানসিক স্থিতি হারায়। পাগল হয়ে যায়। সুস্থ থাকা অবস্থায় যে পৃথিবীকে যে কথাগুলো জানাতে পারেনি পাগল হয়ে গিয়ে সবার কাছে গিয়ে প্রতিবাদে মুখরিত হয়েছে। বীরসার মৃত্যুতে শ্মশানবৈরাগ্যের বদলে তার মধ্যে যে শুভ- আর অশুভ বোধের দ্বন্দ্ব কাজ করেছে তার পারস্পরিক বিপরীত শক্তির চাপে সে পাগল হয়ে গেছিল এবং মহাশ্বেতা

দেবীর এক বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছে। ইংরেজ শাসন-আইন পাগলের জন্য নয়। তাই সত্য কথা বলানো হয়েছে শিবন মেথরের পাগলামির মধ্য দিয়ে।

'জন্মিলে মরিতে হবে/ অমর কে কোথা কবে'।[১২]

এই সত্য চিরন্তন। মানুষ মরণশীল। প্রতিদিন আমরা একপা একপা করে এগিয়ে চলেছি মৃত্যুর দিকে। এই চলার পথে অবশ্যম্ভাবী যন্ত্রণা প্রিয়বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা। মানুষ জানে, তবু হায় মন তো মানে না। বীরসা ছিল বীরসাইতদের ভগবান। উলগুলানে যারা নাম লিখিয়েছে তার পরিবারের মায়া কাটিয়েই এসেছে। কারণ তারা জানে দেশ-মাতৃকার পূজার বেদীতে যে কোনো সময়ে আত্মবলিদান দিতে তারা প্রস্তুত। বীরসার মৃত্যুও তাই প্রতিটি বীরসাইতের কাছেই ছিল খুব চেনা, খুব জানা। শিবন মেথর প্রত্যক্ষত বীরসাইত ছিল না। তাই হয়ত বীরসার অকালমৃত্যু তার মনে এত গভীর দাগ কেটেছে। শিবনদের কাজই হল মৃতদেহ সৎকার করা। এই বৃত্তির মানুষের মধ্যে এইরূপ সুকুমার বৃত্তিগুলির জাগরণ খুব একটা বেশি না হলেও খুব অস্বাভাবিকও নয়। শ্মশানকর্মীদের জীবন বড় বিচিত্র। জীবনমৃত্যুর সীমারেখা তাদের খুব একটা বেশি নাড়া দেয় না। কিন্তু যখন দেয় তখন তা হয়ে ওঠে মারাত্মক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জয়কান্তন দন্ডপাণির লেখা তামিল ছোটগল্প 'কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা'।

সমাজ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পাগল হয়েছে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'স্টীলের চঞ্চু' গল্পের রুণু। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় রুণুরা ব্যবহৃত হয়েছে। পরিণামে হারিয়েছে তাদের সব কিছু। এমনকি মানসিক ভারসাম্যটুকুও হারিয়ে ফেলেছে রুণুরা। অতিসংবেদনশীলতায় আচরণে ধ্বংসাত্মক হয়ে পড়েছে রুণু।

রুণুরই আরেক রূপ তার বোন রঞ্জনা। রঞ্জনা দাদার একেবারেই বিপরীত। জড়ভরতস্বরূপা সে। স্থবির হয়ে গেছে রঞ্জনা। রঞ্জনা ঠিক পাগল নয়। আজকের ভাষায় অটিস্টিক পর্যায়ে ফেলা যায় তাকে। রঞ্জনা নিজের মধ্যেই নিজের জগৎ গড়ে তুলে ভাল থাকতে চায়। যা সাধারণ মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। তাই সমাজের চোখে রঞ্জনাও abnormal- পাগল।

মহাশ্বেতা দেবীর এক ভিন্ন মাত্রার ছোটগল্প 'রোমথা'। কাহিনির প্রেক্ষাপট একটু ভিন্নমাত্রার। মিথভিত্তিক কাহিনি। দেবঅস্ত্র তৈরীর জন্য প্রয়োজন নিখুঁত মানবশরীর।তার জন্য যে মানুষকে নির্বাচন করা হত তারা যাতে পালিয়ে না যেতে পারে তার জন্য দগ্ধ শলাকা দিয়ে তার শরীরে লিখে দেওয়া হত 'রোমথা'। এরা কিন্তু কোনো অংশেই শারীরিক বা মানসিক দিক থেকে অক্ষম নয়। বরং পুরোপুরি সক্ষম। সক্ষমতার শীর্ষ স্পর্শ করে বরং আরোও অধিকতর সক্ষম। তাহলে আলোচ্য আলোচনা প্রসঙ্গে এদের উল্লেখ করার কারণ এরাও প্রতিবন্ধী মানুষদের মতই

সমাজ-বিচ্ছিন্ন। আর পাঁচটা সাধারণ মানুষ যে জীবনযাপন করে, যারা সেই জীবনযাপনে অক্ষম তারাই প্রতিবন্ধী। অর্থাৎ সমাজ-বিচ্যুত। এবার আরেক ধারার মানুষদের কথা উল্লেখ্য।

আদি মধ্যযুগীয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ নপুংসক। অন্ত্যমধ্যযুগীয় 'লোরচন্দ্রাণী'র বামনও নপুংসক। উভয়ক্ষেত্রেই স্বামীদের নপুংসতা কেবলমাত্র তাদের শারীরিক ও মানসিক কষ্টই দিয়েছে তাই-ই নয়, তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই স্ত্রীরা পরপুরুষে আসক্ত হয়েছে। স্ত্রীকে সুখ দিতে না পারার যন্ত্রণা এদের মধ্যে ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কথা। প্রথমেই বলে রাখি চন্দ্রশেখর নপুংসক নন। তবে শৈবলিনীর উদ্ভিন্নযৌবন তার মনেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। বিবাহের পর আটবছর কেরে গেলেও চন্দ্রশেখর গ্রন্থপাঠ এবং শালগ্রামশিলাতেই অভিনিবিষ্ট ছিলেন। জীবনাকাঙ্খী শৈবলিনী পূর্বপ্রণয়ী প্রতাপের জন্য যখন গৃহত্যাগ করেছিল ইংরেজ লরেন্স ফস্টরকে অবলম্বন করে, তখন চন্দ্রশেখরের চক্ষুন্মীলন ঘটেছিল।

লিঙ্গগত সমস্যাযুক্ত মানুষদের মধ্যে আরেক প্রকার মানুষ থাকেন, যাদের মধ্যে দুই বিপরীত লিঙ্গের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এরা বহিরঙ্গে নারী অন্তরঙ্গে পুরুষ, আবার উল্টোটাও হতে পারে বহিরঙ্গে পুরুষ, অন্তরঙ্গে নারী। চৈতন্যচরিতসাহিত্যানুযায়ী ভগবান কৃষ্ণের রাধার প্রেমস্বরূপ উপলব্ধির জন্য ভগবানকৃষ্ণের ইচ্ছানুযায়ী একই অঙ্গে রাধা এবং কৃষ্ণ অবতার রূপে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়েছিল। মহাভারতে অর্জুনকেও দেখা গেছিল অজ্ঞাতবাসের সময় বৃহন্নলাবেশ নিতে। বর্তমানে তৃতীয় লিঙ্গ স্বীকৃতি পেয়েছে। এরা রূপান্তরকামী রূপেও পরিচিত। সাহিত্যের আঙ্গিনাতেও এদের স্বচ্ছন্দ পদচারণা রয়েছে।

মধ্যযুগীয় সমাজপ্রেক্ষিত উল্লেখ পাওয়া যায় গুর্মা পন্ডিতদের। পূর্ববঙ্গে অনেক স্থানে মনসার গান করেন গুর্মা পুরোহিতের দল। গুর্মারা হচ্ছেন নপুংসক পুরোহিতের দল। শ্রীহট্ট-কাছাড় সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে গুর্মাসম্প্রদায় রাত্রিব্যাপি মনসাগানের আসরে নর্তকীর বেশ ধারণ করে। মনসা বিবাহের দেবী অথচ তাঁর পৌরোহিত্য করছেন গুর্মা পুরোহিত সম্প্রদায়। Great mother Goddess মহাদেবী মনসা পুরুষ নিরপেক্ষভাবে সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। মধ্যপ্রাচ্যে মহাদেবী মন্দিরগুলিতে তাই পুরুষ প্রবেশের অনুমতি ছিল না। পৌরোহিত্যে ইচ্ছুক পুরুষরা তাই মন্দিরে প্রবেশ করতেন মুস্কচ্ছেদ করে-

''If there is any truth in this conjectual explanation of the custom, we can readily understand why other Asiatic Goddesses of fertility were served in like manner by eunuch priests...Goddess thus ministered to by eunuch priests were the great Artemis of Ephesus and the great Syrian Astrate of Hierapolis, ...the greates festival of the year at Hierapolis fell

at the beginning of spring, when multitudes thronged to the Sanctuary from Syria and the religious round about. While the flutes palyed, the drums beat, and the eunuch priests Slashed themselves with knives, the religious excitement gradually spread like a wave among the crowd of onlookers, and many a one did that which he little thought to do when he came as a holiday spectator to the festival. For man after man, his veins throbbing with the music, his eyes fascinated by the sight of the streaming blood, flung his garments from him, leaped forth with a shout, and seizing one of the swords which stood ready for the purpose, castrated himself on the spot.''[১৩]

আর জয়ন্তীতে মনসারাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সে রাজ্য রক্ষা করে ঠামাই পন্ডিতরা। ঠামু বা ঠামাইদের লিঙ্গ অনির্ণীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছোটগল্পে কাফ্রি খোজার মধ্যে শারীরিক অক্ষমতার মানসিক যন্ত্রণার চিত্রই পরিস্ফূট। উচ্চবিত্তীয় সমাজের নারকীয় অত্যাচারের ছবি কাফ্রি খোজা।অধুনা সমাজ তৃতীয় লিঙ্গের সম্মতিপত্র দিয়েছে। কিন্তু এখনও এই মানুষরা ঠিক সামাজিক বলা যাবে না। সমাজ এদের পাগল বা অসুস্থ বলেই জানে। লিঙ্গগত প্রতিবন্ধকতার স্বীকার এরা। লিঙ্গগত পরিচয়ের সমস্যা এদের মোকাবিলা করতে হয়। একদিকে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা তার সাথে সামাজিক কটাক্ষ দুর্বিষহ করে তোলে এদের জীবন। কিন্তু কিছু মানুষ আছেন সমাজের রক্তচক্ষুতে তাদের কিছু যায় আসে না।জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'আরাবল্লীর আড়ালে' খোজাদের দু:খযন্ত্রণার কথা সুনিপুণভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' এবং 'শুকসারী কথা' উপন্যাস দুটিতে রয়েছে নসুরাম বা নসুবালা। জন্মগতভাবে সে একজন পুরুষ। কিন্তু তার আচার-আচরণে নারীর ভাব প্রকাশিত। এই নসুই সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করেছে। সমাজ বিবর্তনের পথে মাতৃতান্ত্রিকতা ও পিতৃতান্ত্রিকতার মধ্যবর্তী সমাজ ব্যবস্থার যোগসূত্র স্থাপন করেছে নসু। তবে নসু সমাজের কটাক্ষ উপেক্ষা উপহাস পরিহাস উপেক্ষাভরে উড়িয়ে দিয়ে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় স্থাপন করেছে।কমলকুমার মজুমদারের 'মতিলাল পাদরী' গল্পে বদন হিজড়ে এসেছে একেবারে সামাজিক স্থিতির দর্পণ রূপে। হিজড়ে সমাজের অবস্থান দু:খবেদনার প্রকাশ ঘটেছে বদন চরিত্রে। প্রকৃতপক্ষেই সে হিজড়ে সমাজের বদন-মুখ- মুখপাত্র। কমল চক্রবর্তীর 'ব্রহ্মভার্গব পুরাণ' উপন্যাসে হিজড়ে সম্প্রদায়ের ব্যথা-বেদনার কথা উন্মোচিত হয়েছে।তবে সময় এগিয়ে চলার সাথে সাথে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা যে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তার প্রমাণ সোমনাথ (মানবী) বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা' এবং স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'হলদে গোলাপ'-এর চরিত্ররা। নলিনী বেরার 'অপৌরুষেয়' উপন্যাসের আনন্দী লিঙ্গগত সামাজিক দৃষ্টির উপেক্ষাকে কাটিয়ে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবন যাপনের নিদর্শন স্থাপন করে। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা যে

অন্য দুই লিঙ্গের মানুষের মতই স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকারী এই সচেতনতায় সমাজকে সচেতন করার আগেও সবথেকে জরুরী তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া, তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ আনন্দী।

মিথে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়েছিল।কিন্তু সে তাতে মানসিকভাবে ভেঙ্গে না পড়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায়।শাম্বের জীবনকে অবলম্বন করে রচিত সমরেশ বসুর 'শাম্ব' উপন্যাসের শাম্ব বলল,হেরে যাবার নাম জীবন নয়।প্রতিমুহূর্তে সত্যের পথে অবিচল থেকে যেকোনো কঠিন বাধা পেরনো সম্ভব।জীবনে অসম্ভব বলে কিছু নেই।কঠোর অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিকতায় সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।পরবর্তীকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' উপন্যাসে এরকম অনেক শাম্বদের জীবনযুদ্ধ ও জয়লাভের কাহিনি রচনা করলেন।রোগাক্রান্ত হবার প্রাথমিক মানসিক অভিঘাত,শোক,ক্ষোভ,ক্রোধ এগুলি পেরিয়ে জীবনকে উপভোগ করা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।উপন্যাসে একাধিক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত চরিত্র একাধিক অঙ্গবিকৃতির স্বীকার হলেও একত্রিতভাবে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করেছে তাদের প্রবল সম্মিলিত মানসিক সদিচ্ছায়।চরিত্ররা পারস্পরিক আস্থায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে এবং জীবনকে উপভোগ করেছে।

শারীরিক বিকৃতির বিভিন্ন কারণ এবং তাদের ফলস্বরূপ চরিত্রগুলির মধ্যে এক বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। 'হিবাকুশা' জাপানি শব্দ বিশেষ। যার অর্থ পারমাণবিক বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত বিকৃতদেহী মানুষজন। প্রদীপ রায়গুপ্ত 'ছায়াবাগানের জুঁই' গ্রন্থের (২০০৯) 'সমান্তর' গল্পে ভারতের পটভূমিকায় মানুষের শরীরে রেডিওঅ্যাকটিভিটির মারাত্মক প্রভাব দেখালেন। পরশুরামের 'গাঁ-মানুষ জাতির কথা' ছোটগল্পে উল্লিখিত আছে গামারশ্মির প্রভাবের কথা। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কল্পবিজ্ঞানের গল্প ডমরুচরিতের চঞ্চলার গাইগরুর সঙ্গে ডমরুধরের শরীরের বিষমজোড়ের ছবি রয়েছে।

কুদর্শন, বিকৃতদর্শন, বিকৃত অঙ্গ, বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষরা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্নভাবে ব্রাত্য হয়েছেন। স্পার্টায় দুর্বল শিশু জন্মালে পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দেওয়া হত নগরের বাইরে। গ্রীক পুরাণে দেখেছি আগুনের দেবতা Hephastor কেবলমাত্র কুদর্শন বলে জন্মদাত্রী মা Hera তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল। পরবর্তীসময় সমুদ্রদেবী Thetis তাকে উদ্ধার করলেও সে ফিরে আসে খঞ্জত্বকে বরণ করে। দেবদেবীদের কাছে মরণশীলতাই শেষ অবধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ।

প্রাচীন মহাকাব্য পুরাণে অঙ্গ-বিকলতা স্বাভাবিক জীবনযাপনে কিছু অনিবার্য কষ্ট সৃজন করলেও সংসারধর্ম প্রতিপালন এবং সামাজিকতার দিক থেকে কোনোভাবে অসম্মানিত হতেন না

তাঁরা। নারীগণের পতিনিন্দা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের এক বিশেষ অংশ। এখানে নারীরা তাদের স্বামীদের নিন্দায় মুখরিত হয়েছে। হিন্দু ভারতীয় নারীর কাছে পতি পরম গুরু। পতির নিন্দা মহাপাপ সমান। সেখানে আবার আধুনিকারা নন, মধ্যযুগীয় গৃহবধূরা নিজেদের স্বামীদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সরব হয়েছেন। স্বামীরা বিভিন্নরকম শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত। আধুনিক যুগের নারীদের দেখেছি পতি অক্ষম হলেও তাকে পরম ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করার সনাতন শিক্ষার পরিচয় দিয়েছে নারীরা। 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে মহাশ্বেতা আধুনিকা হলেও স্বামীর মনকষ্ট লাঘব করার জন্য স্বামীর এরূপ রোগের জন্য নিজেকেই দায়ী করেছে। ভিখু ডাকাতের ('প্রাগৈতিহাসিক') হাত না থাকলেও সে বিকৃতরূপী হলেও কর্মচরিতার্থায় কোনো খামতি ছিল না।বিমল করের 'আঙুরলতা' গল্পে প্রভুলাল বিকৃত চেহারার অধিকারী। কিন্তু আঙুরলতাকে পয়সার জন্য তারই শয্যাসঙ্গিনী হতে বাধ্য হতে হয়েছিল। এখানে পুরুষের বিকৃতরূপ বিক্রিত হয়েছে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে ।প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় তিলোত্তমা মজুমদারের ছোটগল্প 'ভোগ' এর কথা।'সুন্দরম' গল্পে হাবু-হামিদার দাম্পত্য এক্কেবারে সঠিক হয়েছে দুজনেরই প্রতিবন্ধকতায়। খোঁড়া শেখের ('নারী ও নাগিনী') শুধু বিকৃত চেহারাই নয় মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে কামসম্পর্ক স্থাপনও নিকাকরা বিবি জোবেদা মেনে নিয়েছিল। যার ভয়ঙ্কর পরিণামে জোবেদার প্রাণও বিসর্জিত হয়েছিল এরূপ পতিদেবতার বিবিজান উদয়নাগিনীর ছোবলে। রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীরপত্র' গল্পে বিন্দুর স্বামী চরিত্রের মধ্যে স্পষ্টই দেখালেন স্বামী পাগল হলেও সে স্বামীই হয়। বিন্দু প্রথমে পাগল স্বামীকে মেনে নিতে না পারায় পালিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে পারেনি। আত্মহত্যা করে সমস্যা থেকে পালিয়ে গেছিল বিন্দু। এই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলকাব্যগুলির 'নারীগণের পতিনিন্দা' নি:সন্দেহে অনেকটাই আধুনিক। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা'দের এবং রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র নায়িকাদের মুখে আধুনিক কবি তৎকালীন নারীদের না-বলা যন্ত্রণার কথাগুলি বসালেও মধ্যযুগীয় দেববাদের যুগে নারীজবানীতে মানবতাবাদের কথা নি:সন্দেহে অতি-আধুনিক। 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশের পুরুষচরিত্ররা বিভিন্নরকম প্রতিবন্ধকতাযুক্ত। তাদের আনার মূল উদ্দেশ্য নায়ক চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা।

আর আধুনিকযুগ সমস্ত প্রতিবন্ধকতা জয় করে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হবার আরেক নাম।

তথ্যসূত্র

১ https://en.wikipedia.org/wiki/OedipusThe ।

২ চক্রবর্তী জাহ্নবী কুমার। চর্যাগীতির ভূমিকা। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা। পুর্নমুদ্রণ- ফাল্গুন ১৪১১/ মার্চ ২০০৫। পৃ. ২০৫ ।

৩ https://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Strangelove ।

৪ https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke ।

৫ https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Jefferies_%28comedian%29 ।

৬ https://james-camerons-avatar.fandom.com/wiki/Jake_Sully ।

৭ https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jimmy_Timmy_Power_Hour ।

৮ https://en.wikipedia.org/wiki/Professor_X ।

৯ https://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Rhyme:_Hunt_for_the_Bone_Collector ।

১০ https://familyguy.fandom.com/wiki/Joe_Swanson ।

১১ ঘোষ শঙ্খ । কবিতা সংগ্রহ । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৬৭। পৃ.২২৮।

১২ পাত্র প্রফুল্লকুমার (সম্পাদক) । মধুসূদন রচনাবলী (অখন্ড সংস্করণ) । পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলকাতা । পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ- অক্টোবর ২০০১।পৃ.১৯৮ ।

১৩ Golden Bough: A Study in Magic and Religion-Sir James George Frazer, Abridged Ed. Macmillan & Co. Ltd, 1954, pg-349,350 ।

উপসংহার

গবেষণা অভিসন্দর্ভে নির্বাচিত বাংলা কথাসাহিত্যের প্রতিবন্ধী চরিত্র অবলম্বন করে প্রতিবন্ধী চরিত্রদের সমাজে অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। সমকালীন সময়-অনুযায়ী আলোচ্য অভিমুখ্য চরিত্ররা সমাজে কি অবদান রেখেছে আলোচনা প্রসঙ্গে যুগ-যুগান্তরে দেশ-দেশান্তরে মিথ পুরাণ মহাকাব্যে প্রতিবন্ধী চরিত্রদের সমাজে কি অবস্থান ছিল তাও আলোচনা করেছি। সমাজে লিঙ্গগত প্রতিবন্ধী চরিত্ররা বর্তমানে তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আইনের ধারায় প্রতিবন্ধী চরিত্রদের সমাজ কতটা নিরাপত্তা দিতে পেরেছে তাও আলোচনার চেষ্টা করেছি। সমাজের শিশু-কিশোরদের প্রতিবন্ধী চরিত্র-সাপেক্ষে মতাদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, তা শিশু-কিশোর সাহিত্যিকদের কলমে কিরূপ প্রতিফলিত তাও আলোচনা করেছি। প্রতিবন্ধকতা মানে অসঙ্গতি, আর হাস্যরসসৃষ্টির একটি কারণ অসঙ্গতি। প্রতিবন্ধী চরিত্ররা সমাজের চোখে করুণার পাত্র হবার সাথে সাথে কতটা বিদ্রূপের পাত্র এবং লেখক কিভাবে এই চরিত্রদের তার মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন তাও আলোচনা করেছি। চরিত্রকেন্দ্রিক আলোচনায় আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের পাশাপাশি ওপার বাংলা, প্রতিবেশী ভারতীয় কয়েকটি আধুনিক কথাসাহিত্য থেকে চরিত্র এবং প্রাক্-আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের কয়েকটি চরিত্র আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরের জন্য অনুসন্ধানের আরোও অনেক ক্ষেত্র রয়ে গেল। ভবিষ্যতে এ নিয়ে বিস্তর গবেষণার ইচ্ছা রইল।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের আলোচনা-অভিমুখ প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে সমাজের পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষ। সমাজে প্রতিবন্ধী মানুষদের স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে। প্রাচীন স্পার্টায় দেখেছি বিকলাঙ্গ শিশু জন্মালে তাকে পাহাড়ের উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত। কারণ, সে শিশু সমাজকে কিছু দিতে পারবে না, উল্টে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং সমাজকে যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেবে, সেও হয়তো প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে পারে। আইনের অনুশাসনেও দেখেছি প্রতিবন্ধী মানুষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, তবে গ্রাসাচ্ছাদনের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিবন্ধী মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অনেকটাই সম্ভবপর হয়েছে। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপট নির্মাণে প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি সমাজের আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর বদল এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী যে পাল্টাচ্ছে তা ধরা পড়েছে সাহিত্যক্ষেত্রে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় দেখি (প্রাগৈতিহাসিক) ভিখু ডাকাত, পাঁচীরা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' উপন্যাসের কুষ্ঠরোগীরা কি অসাধারণ দক্ষতায় তাদের প্রতিবন্ধকতাকে কাজে লাগাচ্ছে জীবিকা উপার্জনের মূলধন হিসাবে। সমাজ যখন প্রতিবন্ধী মানুষদের স্বনির্ভরতার ব্যবস্থা করে দিতে পারেনি বা চাকরিক্ষেত্রে তাদের বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেনি, কিন্তু তবুও প্রতিবন্ধী মানুষরা হেরে না গিয়ে জীবনসংগ্রামে প্রতিমুহূর্তে লড়াই করে বেঁচে থাকা উপভোগ করেছে। এই ধারাতেই একবিংশ শতাব্দীতে দেখি রমাপদ চৌধুরীর (পশ্চাৎপট) লেখায় প্রতিবন্ধীদের জন্য বিকল্পব্যবস্থার উল্লেখ। মূক ও বধিরদের জন্য বিশেষ স্কুল এবং স্বনির্ভরতার ব্যবস্থা সমাজে যে হচ্ছে তার জ্বলন্ত উদাহরণ রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট'।

আগে যে সমাজ প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিত, তাদের প্রতি বর্তমান সমাজ অনেকটাই সহৃদয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপে' দেখি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সন্তান ভুবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন তার মা চারু। মায়ের অবর্তমানে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী মানুষ নিজেরটা নিজে যাতে করতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্টতার উল্লেখ রয়েছে। এরই ক্রমপরম্পরায় রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' সুশান্ত-জুঁই-এর বাবা-মা তাদের স্বাভাবিক জীবন দেবার চেষ্টায় নিজেরাও বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

প্রতিবন্ধী মানুষদের সম্পর্কে সমাজের মনে এই stigma-কালব্যাধি বিশ্বাসরূপে সুদৃঢ় ছিল যে প্রতিবন্ধী মানুষের সন্তানও প্রতিবন্ধী হবে। সেইজন্যই দেখি বিমল করের 'দেওয়াল' উপন্যাসের উমার বিয়ে হল না। অবশ্য ড. নীহাররঞ্জন গুপ্ত 'উল্কা' উপন্যাসে দেখিয়েছেন, অরুণাংশুর বিকৃতরূপ উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী লেখক ক্রোমোজমের ভূমিকা উল্লেখ করেছিলেন। এটাও ঠিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা জিনঘটিত রোগ থেকে আসে। তবে এও দেখালেন অরুণাংশু বিকৃতদর্শন হলেও তার পর দুই ভাই-বোনের মধ্যে সেই ক্রোমোজমের প্রভাব কার্যকর হয়নি। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' উপন্যাসে দেখি মানুষের মনে প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূরীভূত হয়নি, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিবন্ধকতার দুশ্চিন্তায়। অর্থাৎ সমাজ অন্য সব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মানুষদের উপর উদারতা দেখাতে পারলেও সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ প্রতিবন্ধী মানুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে দ্বিধামুক্ত হতে পারেনি।শ্বেতী রোগাক্রান্ত মানুষদের বিয়ের ব্যাপার সমাজে এখনও খুব সহজ নয় প্রদীপ রায়গুপ্তর 'প্রজাপতির আকাশ' গল্পের কথক অরুণ তার নিদর্শন ।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে শিশু কিশোর সাহিত্যও। এইক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের প্রতি মানবিক বোধের জাগরণ অত্যন্ত ইতিবাচক। শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার শিশুদের সামনে প্রতিবন্ধকতাকে অত্যন্ত সাধারণ-স্বাভাবিকভাবেই হাজির করছেন। শিশু মন প্রতিবন্ধকতাকে জানার আগেই সেই সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়ছে না আগে থেকে। বরং খুব সুন্দরভাবে সাবলীলতার সঙ্গে তা পেরিয়ে যেতে পারছে। কিশোর সাহিত্য হিসাবে নির্বাচিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু চরিত্র নিজে প্রতিবন্ধকতার স্বীকার হয়েও শারীরিক অক্ষমতাকে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা উত্তরণ করার দৃষ্টান্ত প্রতিস্থাপন করেছেন।

শারীরিক অক্ষমতা একজন মানুষের ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে যতটা না প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তার থেকেও বেশি আঘাত হানে মানসিক দিক থেকে। সমাজের জন্য যেমন রাম বারবার বাধ্য হয়েছিলেন স্ত্রী সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করাতে তেমনি দাম্পত্যজীবন-সম্পর্ক-বিশ্বাসের ভিত অনেকসময় টলে যাবার ছবি পাই প্রতিবন্ধকতার জন্য। মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে নারীগণের পতিনিন্দা অংশে যেমন পাই স্বামীর অক্ষমতার জন্য স্ত্রীদের পরকীয়াসম্পর্কে লিপ্ততার ছবি, অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কুষ্ঠরোগীর বউ’ গল্পে দেখি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সেই একই পুরুষের প্রতিবন্ধকতায় নারীর প্রতি বিপথগামিতার সন্দেহ। একদিকে দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাসহীনতা মধ্যবিত্ত সমাজজীবনে রয়েছে, পাশাপাশি নিম্নবিত্তীয় সমাজ জীবন ও জীবিকার তাগিদে প্রতিবন্ধকতাকেই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত দুই স্তরের মানুষের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দু’রকম দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করেছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিবন্ধকতার একটি কারণ যেমন দারিদ্র্য, তেমনিই দারিদ্র্যেরও একটি কারণ হয়েছে প্রতিবন্ধকতা। সোমেন চন্দের ‘সংকেত’ গল্পের দশরথ, সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসের বৌকা বাওয়া, চখুরী ও রামিয়ার বাবা, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জটায়ু’ গল্পের নিত্যচরণ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নারী ও নাগিনী’ গল্পের খোঁড়া শেখ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পের ভিখু ডাকাত ও ‘নব আলপনা’ গল্পের নটুক, সুবোধ ঘোষের ‘শ্মশান চাঁপা’ গল্পের ঘাটবাবু-এরা প্রত্যেকেই নিম্নবৃত্তীয় সমাজের প্রতিনিধি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য এরা উন্নততর জীবনযাপনে ব্যাহত হয়েছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অর্থমনর্থম’ গল্পে ফণিভূষণ তো তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দ্বারা মানসিকভাবেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বনফুলের ‘তাজমহল’ গল্পে ফকির সাহেব তার বেগমের সঠিক চিকিৎসা যদি করাতে পারতেন, তাহলে হয়ত রূপবিকৃতির শিকার তাকে হতে হত না। একই কথা বলা যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পের ভিখু ডাকাতের হাতের ক্ষত প্রসঙ্গেও।

সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থান যুগ-যুগান্তরে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা অনেকটাই অবহেলিত, এ সত্য আংশিক। বরং বলা যায়, নারীর দুরাবস্থার জন্য দায়ী নারীরাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীরপত্র' গল্পে দেখি বিন্দুর শাশুড়ী পাগল। তার ছেলেও পাগল। এ পাগলামি সারানোর কোনো প্রচেষ্টা নেই, উল্টে বিবাহের নামে অন্য আরেকটি মেয়ের জীবন নষ্ট করা হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহাকালের জটার জট' গল্পে সুচিত্রার পাগলামো সারানোর কোনো ব্যবস্থা না করে, বরং বাড়ির মেয়েদের দ্বারা তা আড়াল করা হচ্ছে। তবে সময়ান্তরে সমাজ পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' উপন্যাসে সুশান্ত-জুঁই-এর সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার পেছনে সুশান্তর মায়ের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী ('রজনী'), রবীন্দ্রনাথের কুমু ('দৃষ্টিদান')-র দৃষ্টিহীনতার চিকিৎসার ছবি রয়েছে। কারণ তারা শহর কলকাতার শিক্ষিত সচ্ছল পরিবারের সদস্য। নিরুপমা দেবীর শ্যামলীর ('শ্যামলী') মূকত্বের চিকিৎসায় তৎপর হয়েছে তার শিক্ষিত জমিদার স্বামী অনিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভা ('মীমাংসা') পঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও চলাফেরায় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে না, কারণ তার বাড়িতে গাড়ি এবং ড্রাইভার রয়েছে, হাঁটার জন্য অবলম্বনও পাচ্ছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণিমারও ('তিরোলের বালা') আর্থিক সঙ্গতির জন্য চিকিৎসার বহুবিধ প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু পাশাপাশি প্রেমেন্দ্র মিত্রের যামিনীর মা ('তেলেনাপোতা আবিষ্কার')-য়ের অন্ধত্ব, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালার ('পদ্মানদীর মাঝি'), নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিন্তু ('অভিনেত্রী'), সতীনাথ ভাদুড়ীর ফুলঝরিয়া ('ঢোঁড়াই চরিত মানস'), বিমল করের 'জননী' গল্পে শচীনবাবুর নাতনীর খঞ্জত্ব, গৌরকিশোর ঘোষের 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-তে সুধাময়ের ছোটকাকীমার উন্মাদরোগগ্রস্ততা চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য। দরিদ্র সমাজে মেয়েদের প্রতি অবহেলা অতি স্বাভাবিক, এর সাথে যদি যুক্ত হয় প্রতিবন্ধকতা তাহলে সেই অবহেলা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মেয়ে গোপীর পায়ের খুঁত সেরে গেল ডাক্তার দেখিয়ে। কিন্তু মা মালা সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারল না। সমাজে পরিবারের জন্য গৃহকর্ত্রী তথা মায়েদের আত্মত্যাগ মানিকের লেখায় ফুটে উঠেছে। সেখানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় সুচাঁদ বুড়ীকে দেখেছি নিজের উদ্যোগে নিজের খোঁড়া পায়ের চিকিৎসা করিয়েছে রেল-হাসপাতালে। সুচাঁদ বুড়ী একা মানুষ হয়েও, নারীর আত্মনির্ভরশীলতা প্রতিবন্ধকতা থেকে উদ্ধার করতে পারে, এ তার দৃষ্টান্ত।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'স্টীলের চঞ্চু' গল্পে দুই ভাই বোন রণু এবং রঞ্জনা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। রুণুর চিকিৎসা চললেও মধ্যবিত্ত পরিবারে কন্যা রঞ্জনার চিকিৎসার কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না।

তবে একবিংশ শতাব্দীতে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা যখন উঠে আসছে তখনকার প্রেক্ষিতে লেখা রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' উপন্যাসে মূক ও বধির দম্পতি সুশান্ত এবং জুঁই-এর দুই পরিবারের তরফেই সমান চিকিৎসাব্যবস্থা এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের শারীরিক অক্ষমতা যতটা না ক্লেশ দেয়, তার থেকেও বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে আশে-পাশের মানুষদের তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার। সচেতনতার অভাব এখনও উন্নত-শিক্ষিত-পরিশীলিত সমাজেও রয়ে গেছে। রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' উপন্যাসে এর ছবি স্পষ্ট।

বেশ কিছু অসুখ আছে যেগুলি যথাযথ চিকিৎসায় সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব না হলেও, অক্ষম মানুষটির জীবনযাপন সহজতর হতে পারে, যেমন অটিজম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারপর?' গল্পে হাবো, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের বগলী, 'সরীসৃপ' গল্পের ভুবন হাবা-গোবা, অটিজমের লক্ষণাক্রান্ত। দারিদ্র্য এবং যথাযথ সচেতনতার অভাবে যাদের চিকিৎসার আলোকে আনা সম্ভব হয়নি।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন স্থানে প্রতিবন্ধী মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ব্যবস্থা, পাগলাগারদ তৈরি করে মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের প্রচেষ্টা, যার উদাহরণ পাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তিরোলের বালা'য় পূর্ণিমাকে গল্পে শেষে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায়, মান্টোর 'টেক টোবা সিং'-এর পুরো ঘটনাস্থল পাগলাগারদ-এর মধ্যে, মূক ও বধিরদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' উপন্যাস এবং রমাপদ চৌধুরীর 'পশ্চাৎপট' উপন্যাসে ; খঞ্জত্ব অতিক্রমের জন্য ক্র্যাচের ব্যবহার, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সামনে চামেলি' গল্পকথক ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু চরিত্রের কথা- এগুলি সবই অক্ষমতার শিকার মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোকের বৃত্তে আনার যাত্রাপথের সোপানস্বরূপ।

পুরুষের বহুবিবাহ বহুবিধ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারপর?' গল্পে মা-মরা গজেন বহু প্রতিবন্ধকতার শিকার হলেও পড়াশোনায় মেধাবী ছিল। কিন্তু পিতার দ্বিতীয় বিবাহের পর পিতা এবং সৎ-মায়ের ঔদাসীন্যে চোরাপথের বাঁকে হারিয়ে যায়। সুতরাং বলা যায়, প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি বিশেষ সহৃদয় মনোযোগই তাদের স্বাভাবিক সমাজজীবনে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে গোপী পিতা কুবেরের অবহেলা,অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সুস্থ জীবন পেল কারণ গোপীর মা মালার সহৃদয় প্রচেষ্টা।

শারীরিক খর্বত্বের ব্যাপারে দেখা যায় নারীর থেকে পুরুষের দুরাবস্থা ভয়ঙ্কর। সাধারণ নারীর উচ্চতা পুরুষের তুলনায় কমই হয়। সমাজের চোখে পুরুষের বামনত্ব প্রবল উপহাসের বিষয়। উমা (দেওয়াল: বিমল কর) যেখানে অনূঢ় জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার সাহস দেখিয়েছিল, সেখানে একজন পুরুষ হিসাবে ভোম্‌রা (খাখ্ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত) আশৈশব গঞ্জনা শুনতে শুনতে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল।

কুষ্ঠরোগ নিয়ে মানুষের মধ্যে থেকে কুসংস্কার এখনও দূরীভূত হয়নি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুষ্ঠরোগীর বউ' গল্পে মধ্যবিত্ত যতীনের ব্যবহার তারই সাক্ষ্যবহন করে। সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্' গল্পের হাবু বোষ্টম বা নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'উল্কা' উপন্যাসের ফুটপাথবাসী কুষ্ঠরোগীদের কাছে কুষ্ঠরোগের ছোঁয়াচ মানসিকতা জীবনসংগ্রামের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে।কুষ্ঠরোগীদের সামাজিক অবস্থান, এবং সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় নিজ অধিকার প্রতিস্থাপন, একটা কুষ্ঠপল্লী গড়ে তোলার অসাধারণ ইতিবাচক শক্তির জয় ঘোষণা করলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' উপন্যাসে। তবে এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জয়লাভ করার প্রাথমিক বীজ উপ্ত হয়েছিল সমরেশ বসুর 'শাম্ব' উপন্যাসে। এখানে দ্বাপরযুগীয় শাম্ব হেরে না গিয়ে প্রবল মনের জোরে একক সাধনায় কুষ্ঠমুক্ত হয়েছিল।কুষ্ঠরোগ সেরে যাবার পরও মানুষের মন থেকে সে ভয় দূর হয় না।রোগীর পাশে থাকার বদলে আরো একাকীত্বে ঠেলে দেয়,তার ছবি পাই সমরেশ বসুর উপন্যাস 'মহাকালের রথের ঘোড়া'তে।

কুষ্ঠের মত শ্বেতীরোগ নিয়েও মানুষের মনে কুসংস্কার রয়েছে তার উদাহরণ রয়েছে একবিংশ শতাব্দীর প্রদীপ রায়গুপ্তর 'প্রজাপতির আকাশ' গল্পে।

ভারতের পটভূমিকায় মানুষের শরীরে রেডিওঅ্যাকটিভিটির মারাত্মক প্রভাব আসলে একবিংশ শতাব্দীতেও অর্থনীতি দ্বারা সমাজ পরিকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করার একটা ছবি প্রদীপ রায়গুপ্তর ছায়াবাগানের জুঁই গ্রন্থের (২০০৯) সমান্তর গল্প ।

ইতিহাস, সমাজ, আইনের অনুশাসন, চিকিৎসাবিজ্ঞান সর্বস্তরেই প্রতিবন্ধকতার বিবর্তিত রূপ ধরা পড়েছে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে। স্বল্প পরিসরে নির্বাচিত কয়েকটি গল্প-উপন্যাস অবলম্বিত হল। এ বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধানের ক্ষেত্র রইল।

পরিশিষ্ট

নির্বাচিত গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা

দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

রজনী (রজনী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

কুমু (দৃষ্টিদান: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সেনদিদি (পুতুলনাচের ইতিকথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

সনাতন (অন্ধ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

হামিদা (সুন্দরম্ : সুবোধ ঘোষ)

দশরথ (সংকেত : সোমেন চন্দ)

যামিনীর মা (তেলেনাপাতা আবিষ্কার : প্রেমেন্দ্র মিত্র)

দীনেন্দ্র (জননী : বিমল কর)

মূক ও বধির

সুভা (সুভা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শ্যামলী (শ্যামলী : নিরুপমা দেবী)

বগলী (পদ্মানদীর মাঝি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

গণশা (বরযাত্রী : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়)

ন্যায়রত্ন (বরযাত্রী : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়)

সুচাঁদ (হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

ফুলবানু (পেরানটা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

রাজেনের স্ত্রী (গায়েন : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

বৌকা বাওয়া (ঢোঁড়াই চরিত মানস : সতীনাথ ভাদুড়ী)

গঙ্গামণি (গাছ: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

তাতারী (ক্রীতদাসের হাসি: শওকত ওসমান)

সুশান্ত-জুঁই (পশ্চাৎপট : রমাপদ চৌধুরী)

হস্তসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী

মাণিকলাল (রাজসিংহ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

ভিখু ডাকাত (প্রাগৈতিহাসিক : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

সুচারু (দেওয়াল : বিমল কর)

মদনের মাসি (শিল্পী : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

কলকাটা (হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

নিত্যচরণ (জটায়ু : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

গমন সংক্রান্ত

ফণিভূষণ (অর্থমনর্থম্ : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

খোঁড়া শেখ (নারী ও নাগিনী : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভূতো (পুতুলনাচের ইতিকথা :মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মোহন (পুতুলনাচের ইতিকথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

মালা (পদ্মানদীর মাঝি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

গজেন (তারপর ? : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

বসন্তের স্বামী (হাঁসুলীবাঁকের উপকথা :তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

নাটুক (নব আলপনা: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

ফুলি (ভয়ংকর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

খোঁড়া চখুরী (ঢোঁড়াই চরিত মানস : সতীনাথ ভাদুড়ী)

রামিয়ার বাবা (ঢোঁড়াই চরিত মানস : সতীনাথ ভাদুড়ী)

ফুলঝরিয়া (ঢোঁড়াই চরিত মানস : সতীনাথ ভাদুড়ী)

বিন্তু (অভিনেত্রী : নরেন্দ্রনাথ মিত্র)

চন্দ্রচৌধুরী (সৈনিক : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়)

অবলা (লেভেল ক্রসিং : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিভা (মীমাংসা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

আমি (সামনে চামেলি : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী)

শচীনবাবুর নাতনি (জননী : বিমল কর)

কুষ্ঠ

যতীন (কুষ্ঠরোগীর বউ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

হাবু বোষ্টম (সুন্দরম্ : সুবোধ ঘোষ)

পথবাসী (উল্কা : নীহাররঞ্জন গুপ্ত)

রুহিতন কুরমি (মহাকালের রথের ঘোড়া : সমরেশ বসু)

শাম্ব (শাম্ব : সমরেশ বসু)

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মানুষরা (অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

বামন

ভোম্‌রা (খাখ্ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

উমা (দেওয়াল : বিমল কর)

অ্যাসিড আক্রান্ত

অমৃতা (অমৃতা : বাণী বসু)

ফাতিমা (জ্বলবা: ফণীশ্বরনাথ রেণু)

রূপবিকৃতি

মহামায়া (মহামায়া : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ফকির শা-জাহানের বেগম (তাজমহল: বনফুল)

প্রভুলাল (আঙুরলতা : বিমল কর)

অরুণাংশু (উল্কা : নীহাররঞ্জন গুপ্ত)

বড়দি অনুপমার ছেলে (জননী : বিমল কর)

শ্বেতী

অরুণ (প্রজাপতির আকাশ : প্রদীপ রায়গুপ্ত)

স্প্যাস্টিক

রাপ্তি (সমান্তর : প্রদীপ রায়গুপ্ত)

রেডিওঅ্যাকটিভিটি জনিত বিকলাঙ্গতা

গঞ্জাটারের ভূমিপুত্ররা (সমান্তর : প্রদীপ রায়গুপ্ত)

মানসিক প্রতিবন্ধী

মেহের আলি (ক্ষুধিত পাষাণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিন্দুর শাশুড়ী (স্ত্রীর পত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিন্দুর স্বামী (স্ত্রীরপত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যামিনী কবিরাজ (পুতুলনাচের ইতিকথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

পাগলাদিদি (পুতুলনাচের ইতিকথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভুবনের পিতা (সরীসৃপ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

ভুবন (সরীসৃপ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

সুচিত্রা (মহাকালের জটার জট : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

পূর্ণিমা (তিরোলের বালা: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

হাবো (তারপর ? : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)

পাগল (হাঁসুলীবাঁকের উপকথা :তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

ছোটকাকীমা (জল পড়ে পাতা নড়ে : গৌরকিশোর ঘোষ)

মণীন্দ্রনাথ ভৌমিক (নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়)

বিশণ সিং (টোবা টেক সিং : সআদত হোসেন মন্টো)

ঘাটবাবু (শ্মশান চাঁপা : সুবোধ ঘোষ)

ক্ষ্যাপা (কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা : দন্ডপাণি জয়কান্তন ;তামিল ;অনুবাদ : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য)

শিবন মেথর (অরণ্যের অধিকার : মহাশ্বেতা দেবী)

রুণু (স্টীলের চঞ্চু : সাধন চট্টোপাধ্যায়)

রঞ্জনা (স্টীলের চঞ্চু : সাধন চট্টোপাধ্যায়)

ভিন্নতর প্রান্তিক

কাফ্রি খোজা (ক্ষুধিত পাষাণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খুশ্‌নজরজী (আরাবল্লীর আড়ালে : জ্যোতির্ময়ী দেবী)

নসুরাম-নসুবালা (হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

নসুরাম-নসুবালা (শুকসারী কথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়)

বদনচাঁদ (মতিলাল পাদরী : কমলকুমার মজুমদার)

কিম্‌পুরুষ (ব্রহ্মভার্গব পুরাণ : কমল চক্রবর্তী)

হিজড়ে মহল্লার চরিত্ররা (অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা : সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

আনন্দী (অপৌরুষেয় : নলিনী বেরা)

পরি'- 'দুলালি'রা (হলদে গোলাপ : স্বপ্নময় চক্রবর্তী)

শিশু-কিশোর সাহিত্য

সর্দারের ছেলে ও ভাল্লুকের ছানা (হলদে পাখির পালক : লীলা মজুমদার)

পানু (নেপোর বই : লীলা মজুমদার)

পুঁটি (কাঠের ঘোড়া : লীলা মজুমদার)

কুমু (পাখি : লীলা মজুমদার)

তানি (তানির ডায়েরী : লীলা মজুমদার)

নয়টি ভূত (আহিদিদির বন্ধুরা : লীলা মজুমদার)

বুড় ও তার পোষ্যরা (চিড়িয়াখানা : লীলা মজুমদার)

কাকাবাবু (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. একালের ছোটগল্প সঞ্চয়ন (২য় খন্ড) । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । ২০০৯।

২. ওসমান শওকত । ক্রীতদাসের হাসি । সময়, বাংলাদেশ । ২০০৪।

৩. কর বিমল । দেওয়াল । ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ । দ্বিতীয় মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৬৪।

৪. কর বিমল । দেওয়াল ((দ্বিতীয় খন্ড) । ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ । ফাল্গুন ১৩৬৪।

৫. কর বিমল । দেওয়াল (তৃতীয় খন্ড) । ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ । প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৬৯ ।

৬. কর বিমল। বাছাই গল্প। মন্ডল বুক হাউস। কলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ। মাঘ ১৩৯৩ সন।

৭. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ । রচনাবলী (প্রথম খন্ড) । মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা । ১৩৫৯।

৮. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল । কাকাবাবু সমগ্র ১-৭ । আনন্দ, কলকাতা । ২০১১।

৯. গুপ্ত নীহাররঞ্জন । উল্কা । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ । ষষ্ঠ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪০৫ । ISBN: 81-7293-193-X. ।

১০. ঘোষ গৌরকিশোর।জল পড়ে পাতা নড়ে ।ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। ২,শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,কলিকাতা- ১২।

১১. ঘোষ সুবোধ । রচনা সমগ্র (অষ্টম খন্ড), (সম্পাদনা-উত্তম ঘোষ, সমীরকুমার নাথ) । নাথ পাবলিশিং, কলকাতা । ১৯৯৯।

১২. চক্রবর্তী কমল । ব্রহ্মভার্গব পুরাণ । কৌরবী প্রকাশনী, জামশেদপুর । প্রথম প্রকাশ, জানুরারি ১৯৯৩।

১৩. চক্রবর্তী স্বপ্নময় । হলদে গোলাপ । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫ । মাঘ ১৪২১ । ISBN: 978-81-295-2318-1 ।

১৪. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র । রজনী। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১৭৭। ঢাকা। প্রথম সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ। ফাল্গুন ১৪১৭। ফেব্রুরারী ২০১১। ISBN- 984-18-0176-X. ।

১৫. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র । রাজসিংহ । আমারবইডটকম (amarboi.com) । ২০১২।

১৬. চৌধুরী রমাপদ । পশ্চাৎপট। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭০০০০৯ । প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৫। ISBN 81-7756-462-5. ।

১৭ ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ । গল্পগুচ্ছ (অখন্ড সংস্করণ) । স্কুল লাইব্রেরী, কলকাতা । ২০০২।

১৮. দেবী জ্যোতির্ময়ী । সোনা রূপা নয় । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৬৯।

১৯. দেবী নিরুপমা । শ্যামলী । মিত্র ও ঘোষ। ১০,শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ,কলকাতা-১২।মাঘ, ১৩৬২।

২০. দেবী মহাশ্বেতা । অরণ্যের অধিকার । করুণা, কলকাতা । ভাদ্র ১৪১২।

২১. পাঠ উপকরণ (ইবিজি ৭)। জয়কান্তন দন্ডপাণি। কুঞ্জবনের ক্ষ্যাপা। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা। ২০১০

২২. পাঠ উপকরণ। পিবিজি। পত্র চতুর্থ। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা। দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, জুন ২০১৭

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায় অতীন । ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’। প্রথম খন্ড। করুণা, কলকাতা।

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর । ‘তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প’ । অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত । বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা । ১৩৯৫।

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর । ‘তারাশঙ্কর রচনাবলী’ (সপ্তম খন্ড) । মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা । ১৩৮৯।

২৬ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর । ‘শুকসারী কথা’ । শশধর, কলকাতা । ১৯৬০।

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর । হাঁসুলীবাঁকের উপকথা । চারুলতা প্রকাশন, ২০৪, রাজা ধীরেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৮১। চতুর্থ প্রকাশ, বইমেলা ২০১১।

২৮. বন্দ্যোপাধ্যায় দীপেন্দ্রনাথ। গল্পসমগ্র একুশ শতক। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৫।

২৯. বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ । ‘বিভূতি-রচনাবলী’, (ষষ্ঠ খন্ড) । মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা । আষাঢ়, ১৩৯০।

৩০. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক । ‘পদ্মানদীর মাঝি’ । মূর্ছনা।। ই-বুক।। (www.murchona.org)

৩১. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক । ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ । প্রকাশ ভবন, কলকাতা । জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩।

৩২. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র। দ্বিতীয় খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ISBN 81-86908-66-8 (Set), ISBN 81-86908-76-6. ।

৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র। তৃতীয় খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ISBN 81-86908-66-8 (Set), ISBN 81-86908-76-5. ।

৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র। পঞ্চম খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ISBN 81-86908-66-8 (Set). ।

৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র। ষষ্ঠ খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ISBN 81-86908-66-8 (Set), ISBN 81-7751-025-8.

৩৬ বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র। নবম খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ISBN 81-86908-66-8 (Set), ISBN 81-7751-058-4. ।

৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু । ‘ব্যোমকেশ সমগ্র’ । আনন্দ, কলকাতা । ২০০৭।

৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায় সোমনাথ । ‘অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা’ । প্রতিভাস, কলকাতা । ২০০২।

৩৯. বসু, ড. নিতাই (সম্পাদনা ও ভূমিকা) । ‘জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প’ । দে’জ, কলকাতা । জানুয়ারী ১৯৬০।

৪০. বসু সমরেশ। মহাকালের রথের ঘোড়া।আনন্দ পাবলিশার্স।কলকাতা।২০১৬ । ISBN ৯৭৮৮১৭০৬৬৪৭৫৮

৪১. বসু সমরেশ। শাম্ব। সাহিত্য আকাদেমি। কলকাতা। ২০০৯। ISBN 8126026650, 9788126026654. ণ

৪২. বেরা নলিনী । অপৌরুষেয় । দে’জ, কলকাতা । ২০০৭ ।

৪৩. ভাদুড়ী সতীনাথ । ঢোঁড়াই চরিত মানস । (প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ একত্রে)। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,কলকাতা-৭৩।আগস্ট,২০০৬।

৪৪. মজুমদার কমলকুমার । ‘গল্পসমগ্র’ । সুপ্রকাশনী, কলকাতা । ১৯৬৫।

৪৫. মিত্র নরেন্দ্রনাথ। গল্পমালা-১। আনন্দ পাবলিশার্স।

৪৬. মিত্র প্রেমেন্দ্র । 'শ্রেষ্ঠ গল্প' । নাভানা, কলকাতা । ১৩৫৯।

৪৭. মুখোপাধ্যায় বলাইচাঁদ । 'বনফুলের গল্পসমগ্র' (প্রথম খন্ড) । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। ১৩৫৮।

৪৮. মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ । বিভূতিভূষণ-রচনাবলী, (দ্বিতীয় খন্ড) । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।বৈশাখ ১৪০৫ ।

৪৯. মুখোপাধ্যায় সুভাষ। অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৪ । ISBN-81-7066-505-1.

৫০. মৈত্র সমীর (সম্পাদনা) । লীলা মজুমদার রচনাবলী ১ । এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-সাত। প্রথম প্রকাশ: ১৩৬০।

৫১ মৈত্র সমীর (সম্পাদনা) । লীলা মজুমদার রচনাবলী ২ । এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-সাত। প্রথম প্রকাশ: ১৩৬১।

৫২ মৈত্র সমীর (সম্পাদনা) । লীলা মজুমদার রচনাবলী ৩ । এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-সাত। প্রথম প্রকাশ: ১৩৬২।

৫৩. রায়গুপ্ত প্রদীপ। ঘরে ফেরার সময় ।অনুষ্টুপ প্রকাশনী ।কলকাতা।২০০১।

৫৪. রায়গুপ্ত প্রদীপ। ছায়াবাগানের জুঁই ।ঋতাক্ষর ।কলকাতা।২০০৯।

৫৫. সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার । অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড । গ্রন্থালয় প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯।

৫৬. সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার । একশ এক গল্প । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ ১৪১০। ISBN: 81-7293-798-9. ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. আইয়ুব সালাহউদ্দীন। সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।১৯৯৯।

২. আচার্য অনিল। সত্তর দশক : সত্তরের দশকের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যায়ণ। অনুষ্টুপ। কলকাতা-৯। প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৮০।

৩. আচার্য অনিল (সম্পাদিত)। সত্তর দশক, খন্ড-২। অনুষ্টুপ, ১৯৮০।

৪. আচার্য অনিল (সম্পা:) ।সত্তর দশক, তৃতীয় খন্ড। অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ। জানুয়ারি ২০১২।

৫. আজাদ হুমায়ুন (অনুবাদ)। দ্বিতীয় লিঙ্গ (সিমোন দ্য বেভোয়ার The Second Sex-এর অনুবাদ) আগামী প্রকাশনী। জুন ২০১৮।

৬. এঙ্গেলস ফ্রেডারিক। পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা: লি: কলকাতা ১৯৯৯।

৭. ওঝা কৃত্তিবাস। রামায়ণ। শিশু সাহিত্য সংসদ, প্রা: লি:। কলকাতা আশ্বিন ১৩৬৪।

৮. কর নীপা। নারী : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে। পুস্তক লিপি। কলকাতা ২০০৪।

৯. ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস। মনসামঙ্গল (সম্পা: বিজনবিহারী ভট্টাচার্য)। সাহিত্য আকাদেমি। কলকাতা ১৯৮৭।

১০. খাস্তগীর আশিস সম্পাদিত। শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ। মদন মোহন শর্মা তর্কালঙ্কার। ১৮৫০। বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। জানুয়ারি ২০০৬ ।

১১. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ। কথাকোবিদ। বাক্ সাহিত্য (প্রা:) লিমিটেড, কলকাতা । মাঘ ১৪১১।

১২. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ। বাংলা গল্প বিচিত্রা। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা । মাঘ ১৩৬৪।

১৩. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ । সাহিত্যে ছোটগল্প । মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা । ১৯৯৯।

১৪. গঙ্গোপাধ্যায় মুনমুন। দৌলত কাজী- লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না : পুনর্বিচার। রত্নাবলী, কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৭/ আগষ্ট ২০১০। ISBN 978-81-910422-2-1.।

১৫. গঙ্গোপাধ্যায় সৌরেন্দ্রমোহন। রাজনীতির অভিধান। আনন্দ পাবলিসার্স প্রা: লি:, কলকাতা । জানুয়ারি ১৯৯৭।

১৬. গিরি ড. সত্য (সম্পা:)। বৈষ্ণব পদাবলী। রত্নাবলী। ৩৯ এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯। বৈশাখ ১৪১০। এপ্রিল ২০০৩।

১৭. গিরি সত্যবতী। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩। জানুয়ারি ২০০৭। ISBN-81-295-0747-1.

১৮. গুপ্ত কৃষ্ণা। ভারতবর্ষের ইতিহাস (১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ- ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)- রোমিলা থাপার। ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা । চতুর্থ সংস্করণ: ১৯৯৩।

১৯. গুপ্ত ক্ষেত্র। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস। গ্রন্থনিলয়, কলকাতা । ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০২।

২০. গুপ্ত ক্ষেত্র। রবীন্দ্রগল্প: অন্য রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থনিলয়, কলকাতা । ১৩৯১।

২১. গোস্বামী অচ্যুত । বাংলা উপন্যাসের ধারা । পাঠভবন, কলকাতা। অক্টোবর ১৯৬১।

২২. গোস্বামী শ্রীবিজনবিহারী, (অনুবাদ ও সম্পাদনা) । অথর্ববেদ-সংহিতা । হরফ, কলকাতা । ২০০০।

২৩. গোস্বামী শ্রীবিজনবিহারী (অনুবাদ ও সম্পাদনা) । শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ-সংহিতা । হরফ, কলকাতা । ২০০০।

২৪. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬।

২৫. ঘোষ উত্তম । সুবোধ ঘোষ : বড় বিস্ময় জাগে । আনন্দ, কলকাতা । ১৯৯৪।

২৬. ঘোষ জ্যোতির্ময়। কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথ: তার গল্প। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা জানুয়ারি ২০০০।

২৭. ঘোষ তপোব্রত । রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ । দে'জ, কলকাতা । আগস্ট ২০০৩। ISBN 81-7612-806-6

২৮. ঘোষ নিত্যপ্রিয়। স্বভাবত স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ। প্রমা। কলকাতা ১৯৯৩।

২৯. ঘোষ নির্মল। নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা । প্রথম প্রকাশ: ১৩৮৮।

৩০. ঘোষ প্রবীর। যুক্তিবাদের চোখে নারীমুক্তি। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । ১৯৯৪।

৩১. ঘোষ মীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্য। মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা: লি:, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কল-৭৩। প্রথম প্রকাশ ১৫/৯/১৯৮৪।

৩২. ঘোষ মৈত্রেয়ী। সতীনাথ ভাদুড়ী : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায়। মর্ডান, কলকাতা। ১৯৮৫।

৩৩. ঘোষ শঙ্খ । কবিতা সংগ্রহ । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৬৭।

৩৪. ঘোষ সেমন্তী (সম্পা:)। দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা । গাঙচিল, কলকাতা । চতুর্থ মুদ্রণ, আগষ্ট ২০১৪।

৩৫. ঘোষ সুধাংশুরঞ্জন (সম্পাদনা ও ভাষান্তর) । বেদ উপনিষদের শ্রেষ্ঠ কাহিনী (ভূমিকা, ড: নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য) । মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা । ১৯৮৬।

৩৬. ঘোষ স্বপন কান্তি (সম্পা:) । রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস : নকশালবাড়ি থেকে নেতাই গ্রাম । পদাতিক, কলকাতা । দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০১১।

৩৭. চক্রবর্তী জাহ্নবী কুমার। চর্যাগীতির ভূমিকা। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা। পুর্নমুদ্রণ- ফাল্গুন ১৪১১/ মার্চ ২০০৫।

৩৮. চক্রবর্তী ধ্যানেশনারায়ণ। মহর্ষি বাল্মীকিকৃত রামায়ণম্ এর অনুবাদ। মর্ডান বুক এজেন্সী, কলকাতা । ১৯৫০।

৩৯. চক্রবর্তী বারিদবরণ।সমরেশ বসু : জীবন ও সাহিত্য।শিলালিপি,কলকাতা।২০০৬।

৪০. চক্রবর্তী শম্ভুনাথ।কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে।প্রতিভাস,কলকাতা।২০১৪।

৪১. চক্রবর্তী সুমিতা। উপন্যাসের বর্ণমালা। পুস্তক বিপণি, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৯৮।

৪২. চক্রবর্তী সুমিতা। ছোটগল্পের বিষয় আশয়। পুস্তক বিপণি, কলকাতা । জুন ২০০৪।

৪৩. চট্টোপাধ্যায় অজয়। ফ্রয়েডীয় ভালবাসা। নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা । ১৯৯৫।

৪৪. চট্টোপাধ্যায় কুন্তল । সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। রত্নাবলী, কলকাতা-৯। পঞ্চম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১০/ অক্টোবর ২০০৩.।

৪৫. চট্টোপাধ্যায় ড. কৌশিক । উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞান, (দ্বাদশ শ্রেণী) । অভিষেক পাবলিশার্স, ৬-বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ । এপ্রিল, ২০১৬।

৪৬. চট্টোপাধ্যায় ড. পার্থ। বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা (প্রাচীন-মধ্য- আধুনিক যুগ)। তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা-৯। আগষ্ট, ২০১১। ISBN 81-89118-04-8.।

৪৭. চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত (সম্পা:) ।বিশ শতক শেষ দশক বঙ্গসংস্কৃতি। পুস্তক বিপণি, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০০।

৪৮. চট্টোপাধ্যায় ভবানীপ্রসাদ। দরিদ্রজনসখা, রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ-গান্ধীজী। প্রকাশক: গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ। প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৮৫।

৪৯. চট্টোপাধ্যায় মনোরঞ্জন (সম্পাদিত)। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্য (১ম খন্ড)। প্রিয়া বুক হাউস, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ, ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৯।

৫০. চট্টোপাধ্যায় শ্রী রসিকমোহন (সংগৃহীত) । অষ্টাদশপুরাণম্ (প্রথম খন্ড) । তর্কালঙ্কার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার (অনুবাদ)। জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্র, কলকাতা। ১২৮৯।

৫১. চট্টোপাধ্যায় সত্যচরণ। গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা-৯। বইমেলা-২০১০।

৫২. চট্টোপাধ্যায় হীরেন (সম্পাদনা)। বাংলা ছোটগল্প সমীক্ষা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। মহালয়া ১৪১০।

৫৩. চন্দ্র বিপন, মুখার্জি মৃদুলা, মুখার্জি আদিত্য (সম্পাদিত)। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে, ১৯৪৭-২০০০। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৬ । ৮১৭৭৫৬৬০০৮।

৫৪. চাকলাদার স্নেহময়। ভারতের জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। প্রকাশকাল: দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ১৯৯৫।

৫৫. চৌধুরী কমল (সম্পা:)। স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৯।

৫৬. চৌধুরী ড. অনিরুদ্ধ, চট্টোপাধ্যায় ড. কৃষ্ণদাস, ঘোষ ড. শান্তনু। ভারতের সামাজিক সমস্যা। চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা ।পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ: জুলাই ২০০৬।

৫৭. চৌধুরী শ্রী ভূদেব। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা। ১ম পর্যায়। দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা।জানুয়ারি ২০০২/মাঘ ১৪০৮। ISBN-81-7079-850-7 ।.

৫৮. চৌধুরী শ্রী ভূদেব। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা। ২য় পর্যায়।দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । আগষ্ট ২০০৬/ ১৪১৩ শ্রাবণ। ISBN-81-7079-741-1. ।

৫৯. চৌধুরী শ্রী ভূদেব। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা। তৃতীয় পর্যায় (রবীন্দ্রযুগ : প্রথম পর্ব : প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ)।দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ।মে ২০০৩/ বৈশাখ ১৪১০। ISBN-81-7079-575-3. ।

৬০. চৌধুরী শ্রী ভূদেব। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা। চতুর্থ পর্যায় (রবীন্দ্রযুগ : দ্বিতীয় পর্ব) । দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা । জুন ২০০৩/আষাঢ় ১৪১০। ISBN-81-7079-388-2. ।

৬১. চৌধুরী শ্রী ভূদেব । বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার । মর্ডান বুক এজেন্সী, কলকাতা। পঞ্চম প্রকাশ ২০০৩।

৬২. চৌধুরী শ্রী ভূদেব। রবীন্দ্র উপন্যাস : ইতিহাসের প্রেক্ষিতে। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । ১৯৮৪।

৬৩. চৌধুরী সত্যজিৎ (সম্পা)।সমরেশ বসু : স্মরণ সমীক্ষণ।চয়নিকা,কলকাতা। ১৯৯৪।

৬৪. জানা বাপ্পাদিত্য (সম্পা:)। আন্দোলন ঘটনা ও কবিতা, বঙ্গভঙ্গ থেকে সাম্প্রতিক। অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা । প্রথম সংস্করণ, ২০১৭।

৬৫. ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ। ক্ষীরের পুতুল। পাঠক পাবলিশার্স, কলকাতা। ২০১৪। ISBN 9788192979809 ।

৬৬. ঠাকুর পরিতোষ (অনুবাদ ও সম্পাদনা) । সামবেদ-সংহিতা । হরফ, কলকাতা । ২০০১।

৬৭. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ।কণিকা।মাঝারির সতর্কতা।বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়,কলকাতা। ১৩৫৫।

৬৮. ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ । চয়নিকা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২১০ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা। পৌষ ১৩৪৪।

৬৯. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ । ছিন্নপত্র । বিশ্বভারতী । শ্রাবণ ১৪২৫।

৭০. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। পঞ্চভূত। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা। অগ্রহায়ণ ১৩৯৯।

৭১. ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খন্ড। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ফাল্গুন ১৩৭০: ১৮৮৫ শক।

৭২. ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ ।রবীন্দ্রসঙ্গীত। পূজা ও প্রার্থনা পর্যায়। সংখ্যা ৩০। রাগ সাহানা। তাল ঝাঁপতাল। রচনাকাল ১২৯১ বঙ্গাব্দ (১৮৮৫ খ্রী:) ।

৭৩. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ।সূর্যাবর্ত । বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।। চৈত্র ১৪০৭। ISBN- 81-7522-292-1. ।

৭৪. ঠাকুর শ্রী রবীন্দ্রনাথ । সোনার তরী। বিশ্বভারতী। পৌষ ১৪০৮। ISBN- 81-7522-108-9

৭৫. তথাগতনন্দ স্বামী । মহাভারত কথা । উদ্বোধন, কলকাতা । ২০০১।

৭৬. তথাগতনন্দ স্বামী । রামায়ণ কথা । উদ্বোধন, কলকাতা । ২০০০।

৭৭. তর্করত্ন, পন্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন (সম্পাদিত)। ব্রহ্মান্ডপুরাণ (শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীতম্)। বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেস, কলিকাতা। ১৩১৫।

৭৮. তর্করত্ন পন্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন (সম্পাদিত)। শিবপুরাণম্। (শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীতম্)।বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা।

৭৯. তর্করত্ন পন্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন (সম্পাদিত)। বরাহপুরাণম্ (মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রণীতম্)। নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা। ১২৯৬।

৮০. তর্করত্ন পন্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন প্রভৃতি কর্ত্তৃক অনুবাদিত। লিঙ্গপুরাণ (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি শ্রীবেদব্যাস প্রণীত)। বঙ্গবাসী-স্টীম-মেসিন প্রেস, কলিকাতা। ১৩১০।

৮১. তর্করত্ন শ্রীপঞ্চানন (সম্পাদিত)। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্। (মূল ও বঙ্গানুবাদ)। বঙ্গবাসী-স্টীম-মেসিন-প্রেস, কলকাতা। সন ১৩০০ ।

৮২. তর্করত্ন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন (সম্পাদিত)। স্কন্দ পুরাণম্। (সপ্তখন্ডাত্মকম্)। শ্রীমন্মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্। বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন-প্রেস, কলিকাতা। ১৩১৮।

৮৩. তর্করত্নেন বর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন (সম্পাদিত)। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্। (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-মহর্ষি-শ্রীবেদব্যাস-প্রণীতম্)। বাণী চরণ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৮২৭ শকাব্দ।

৮৪. তর্কালঙ্কার শ্রী জগমোহন (অনুবাদ)। কল্কিপুরাণ। দ্বিতীয় সংস্করণ। বৈদিক যন্ত্র। কলিকাতা। বাগ্বাজার। ১৩০০।

৮৫. দত্ত অমিতকুমার। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নবজাগরণ ও রবীন্দ্রনাথ। পুনশ্চ কলকাতা । ১৯৯৭।

৮৬. দত্ত অম্লান। সমাজ ও ইতিহাস। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা । ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৩।

৮৭. দত্ত বীরেন্দ্র । বাংলা কথা সাহিত্যের একাল (১৯৪৫-১৯৯৮)। পুস্তক বিপণি, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ ২০শে ডিসেম্বর ১৯৯৮।

৮৮. দত্ত বীরেন্দ্র । বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (প্রথম খন্ড) । পুস্তক বিপণি, কলকাতা । ২০১৩।

৮৯. দত্ত বীরেন্দ্র । বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খন্ড) । পুস্তক বিপণি, কলকাতা। ২০১৪।

৯০. দত্ত রমেশচন্দ্র (ভূমিকাকার) । ঋগ্বেদ সংহিতা (দ্বিতীয় খন্ড) । হরফ, কলকাতা । ২০০০।

৯১. দত্ত শ্রীরমেশচন্দ্র (প্রকাশক)। ঋগ্বেদ সংহিতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক তবনে স্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। কলকাতা। সন ১২৯২ সাল।

৯২. দত্ত (মিত্র) সঞ্চারী। রবীন্দ্র গল্পে আধুনিক নারী। সোনার তরী, কলকাতা । নভেম্বর ২০০৬।

৯৩. দাশ অরূপকুমার। সমাজ দ্বন্দ্ব ও বাংলা কথাসাহিত্য। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা । ২০০৫।

৯৪. দাশ জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি, কলকাতা-৭৩। বৈশাখ ১৪১৪, এপ্রিল ২০০৭। ISBN 81-86134-30-1.

৯৫. দাশ ধনঞ্জয়। মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক। নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা । চৈত্র ১৩৬৫।

৯৬. দাশ শিশিরকুমার । বাংলা ছোটগল্প । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । ১৯৯৫।

৯৭. দাশগুপ্ত সুরজিৎ । যুগবদলে বাংলা উপন্যাসের রূপবদল। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১০।

৯৮. দাস কাশীরাম। মহাভারত। সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা । শ্রাবণ ১৩৮৩।

৯৯. দাস জ্ঞানেন্দ্রমোহন । বঙ্গমালা ভাষার অভিধান, দ্বিতীয় ভাগ । সাহিত্য সংসদ, কলকাতা । ১৯৭৪।

১০০. দাস বেলা ও চৌধুরী বিশ্বতোষ (সম্পাদিত)। বাংলা অ্যাখ্যান বহুমাত্রিক পাঠ। রত্নাবলী, কলকাতা । ২০১১।

১০১. দাস শিশির কুমার। বাংলা ছোটগল্প। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । ১৯৯৮।

১০২. দে অশোক কুমার। বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে। এশিয়াটিক বুক এজেন্সী, কল-১৪। প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৯।

১০৩. দে সত্যব্রত। রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা, প্রথম খন্ড। জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ (প্রা:) লি:, কলকাতা । ১৩৭৮।

১০৪. দে সরকার দিগ্বিজয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী চরিত্র। এন. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা । ২০০৫।

১০৫. দেব রণেন্দ্রনাথ। বাংলা উপন্যাসে আধুনিক পর্যায়। বুক ল্যান্ড প্রা. লি. কল-৬। ১ম সং অক্টোবর ১৯৬৪।

১০৬. দেবী বামাসুন্দরী। কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। কলকাতা। ১৭৮৩ শক।

১০৭. দেশপান্ডে জি. টি. (অনুবাদ: রত্না বসু)। অভিনবগুপ্ত। সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী । ১৯৯৬। ISBN: 81-260-0096-1.।

১০৮. নাথ প্রিয়কান্ত । কাল বিভাজিত বাংলা উপন্যাস। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা । প্রথম প্রকাশ, স্বাধীনতা দিবস, ২০০৭।

১০৯. পাত্র প্রফুল্লকুমার (সম্পাদক) । মধুসূদন রচনাবলী (অখন্ড সংস্করণ) । পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলকাতা । পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ- অক্টোবর ২০০১।

১১০. পাল প্রশান্তকুমার। রবিজীবনী। প্রথম খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা । পৌষ ১৪০০।

১১১. পাল প্রশান্তকুমার। রবিজীবনী। দ্বিতীয় খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা । শ্রাবণ ১৩৯১।

১১২. পাল প্রশান্তকুমার। রবিজীবনী। তৃতীয় খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা । বৈশাখ ৩৯৪।

১১৩. পাল প্রশান্তকুমার। রবিজীবনী। চতুর্থ খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা । শ্রাবণ ১৪১৩।

১১৪. পাল প্রশান্তকুমার। রবিজীবনী। পঞ্চম খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা । শ্রাবণ ১৪০৯।

১১৫. পাল প্রশান্তকুমার। রবিজীবনী। ষষ্ঠ খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা । আশ্বিন ১৪১১।

১১৬. পাল প্রশান্তকুমার। রবিজীবনী। সপ্তম খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা । আশ্বিন ১৪০৯।

১১৭. পাল প্রশান্তকুমার। রবিজীবনী। অষ্টম খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা । আশ্বিন ১৪০৯।

১১৮. পাল প্রশান্তকুমার। রবিজীবনী। নবম খন্ড। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা । জানুয়ারি ২০০৪।

১১৯. পাল মধুময় । দেশভাগ বিকাশ ও বিনির্মাণ। গাঙচিল, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০১১।

১২০. পাল শিবশংকর । সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে মানবিক মূল্যবোধ । সুবর্ণা, কলকাতা । ১৯৯৯।

১২১. পাল ড: শ্রাবণী (সম্পাদিত)। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯। মে, ২০০৮।

১২২. পুরকায়স্থ রাহুল (সম্পা:) । বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা । ধানসিড়ি, কলকাতা । প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৭।

১২৩. প্রামাণিক মলয় (সম্পাদনা)। রামায়ণ : কৃত্তিবাস বিরচিত। গ্রন্থবিকাশ, কলকাতা-৭। জানুয়ারি ২০১১।

১২৪. বন্দ্যোপাধ্যায় ড. অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (খ্রীষ্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী)। মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩। ২০০৬-০৭।

১২৫. বন্দ্যোপাধ্যায় ড: সুরেশচন্দ্র। ভরত নাট্যশাস্ত্র।(১ খন্ড) । নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা- ৭৩। ISBN: 81-8065-048-0।, নভেম্বর, ২০০৯।

১২৬. বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থপ্রতিম । উপন্যাস রাজনৈতিক: বিভূতিভূষণ । র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা । ১৯৯২।

১২৭. বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থপ্রতিম ।পোস্টমর্ডান ভাবনা ও অন্যান্য। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা । ২য় সংস্করণ, ২০০৭।

১২৮. বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথ, দাস সজনীকান্ত (সম্পাদক)।ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা-৬। শ্রাবণ ১৪০৪।

১২৯. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাদাস এবং অন্যান্য (সম্পাদিত) । বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র । মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ।১৯৭৫।

১৩০. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর। আমার সাহিত্য জীবন; তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খন্ড । নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা: লি:, কলকাতা । দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

১৩১. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর। আমার সাহিত্য জীবন। বাংলা অকাদেমি, কলকাতা ।দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭।

১৩২. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর।তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা, প্রথম খন্ড। নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা: লি:, কলকাতা । দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

১৩৩. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবনাথ। রাজসভার কবি ও কাব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। ২০০৮।

১৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায় দেবনাথ (সম্পাদিত)। লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না। দৌলত কাজি। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। জানুয়ারি : ১৯৯৫। ISBN 81-85626-81-2.।

১৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায় রুমা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান (১৯৪৭-১৯৭৭)। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২৮ নভেম্বর ২০০৫।

১৩৬. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা । মর্ডান, কলকাতা । ২০১৭।

১৩৭. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার। বাংলা সাহিত্যর বিকাশের ধারা। ওরিয়েন্ট বুক, কলকাতা । ১৯৬৩।

১৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার। সমালোচনা সাহিত্য। এ. মুখার্জী, কলকাতা । ১৩৭৯।

১৩৯. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ। উপনিবেশ কড়চা। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা । ১ম প্রকাশ পৌষ ১৪০৯।

১৪০. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩, ৭ম সংস্করণ, নভেম্বর, ২০১৬। ISBN: 978-81-295-1474-5।

১৪১. বন্দ্যোপাধ্যায় সুরভি । গবেষণা প্রকরণ ও পদ্ধতি। দে'জ পাবলিশিং।, কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ১৯৯০। তৃতীয় সংস্করণ জুলাই ২০০৫।

১৪২. বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্র । স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙালী । এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা.লি. ,কলিকাতা । ১৯৩৮।

১৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচরণ । বঙ্গীয় শব্দকোষ (প্রথম খন্ড) । সাহিত্য একাদেমি, কলকাতা । ২য় খন্ড, ১৯৭৮।

১৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায় হিমবন্ত । গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে । বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা । ১৪১২।

১৪৫. বসু জ্যোতির্ময়। টাকা ও ক্ষমতার গোপন উৎস। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা । আশ্বিন, ১৩৮৪।

১৪৬. বসু ড. দুর্গাদাস (আচার্য)। ভারতের সংবিধান পরিচয়। অনুবাদক-ড. রমেন মজুমদার। Wadhwa and Company Law Publishers. প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪।

১৪৭ .বসু দেবকুমার। কল্লোলগোষ্ঠীর কথাসাহিত্য। করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন, কল-৯। প্রথম প্রকাশ বুদ্ধ পূর্ণিমা ১৩৮৭।

১৪৮. বসু নিতাই । তারাশঙ্করের শিল্পিমানস । দে'জ, কলকাতা । ১৯৯৮।

১৪৯. বসু নিতাই। অনন্য রবীন্দ্রনাথ। পুনশ্চ । ১৯৯৩।

১৫০. বসু বুদ্ধদেব । রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য। নিউ এজ পাবলিশার্স। ২০১৩। ISBN 9788178181164. ।

১৫১. বসু রাজশেখর (সারানুবাদ)। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩। ১৪১৮। ISBN-81-7157-006-2।

১৫২. বসু স্বপন, দত্ত হর্ষ (সম্পা:)। বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি। পুস্তক বিপণি । প্রথম প্রকাশ ১১ মার্চ ২০০০।

১৫৩. বাগচী অমিয়কুমার। বিশ্বায়ন : ভাবনা দুর্ভাবনা (১ম খন্ড)। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩। প্রথম প্রকাশ ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ ।

১৫৪. বাগচী অমিয়কুমার। বিশ্বায়ন : ভাবনা দুর্ভাবনা (২য় খন্ড)। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩। ৭ নভেম্বর, ২০০২।

১৫৫. বিদ্যারত্ন শ্রীকালীপ্রসন্ন। (পদ্যছন্দে বঙ্গানুবাদ)। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ (মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কৃত মূলের অনুবাদ)। সীতানাথ রায় এন্ড সন্স, কলিকাতা। ১৩৩৩।

১৫৬. বিশী শ্রী প্রমথনাথ । রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প । মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা । বৈশাখ ১৩৭৬।

১৫৭. বিশী শ্রী প্রমথনাথ। বঙ্কিম সরণী। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

১৫৮. বিশী শ্রী প্রমথনাথ, 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী', মৈত্রী, কলকাতা, ১৯৬৬।

১৫৯. বিশী সুনীল চন্দ্র ও পাল অমিতকুমার। ফ্রয়েড ও মন: সমীক্ষণ। সংস্কৃতি বৈঠক। বৈশাখ ১৩৫৩।

১৬০. বিশ্বাস অচিন্ত্য। প্রতিহত মনুষ্যত্ব, প্রবহমানকাল ও হাঁসুলী বাঁকের কালো মানুষেরা, প্রতিক্ষণ ১৯৯১।

১৬১. বিশ্বাস অচিন্ত্য। সমর্থ পঞ্চম : হাঁসুলীবাঁকের উপকথা। রত্নাবলী। কলকাতা-৯। ভাদ্র ১৪১৫। সেপ্টেম্বর ২০০৮।

১৬২. বিশ্বাস শৈলেন্দ্র (সংকলক)। সংসদ বাংলা অভিধান। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। ডিসেম্বর ২০১৯। ISBN : 978-81-86806-92-X.।

১৬৩. বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মহর্ষি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। নবভারত পাবলিশার্স। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১।

১৬৪. বৈদ্য প্রদীপ (সম্পাদক), 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প: কলাকৌশল', 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প/আলোচনার আলোকে', বামা, কলকাতা, ২০০০।

১৬৫. ভোজ মনোজ / আচার্য ব্রাত্য (সম্পাদক), 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার : প্রেমেন্দ্র মিত্র', 'ছোটগল্প : সানুপুঙ্খ', অক্ষ, কলকাতা, ১৯৯৫।

১৬৬. ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন (ভূমিকা সম্পাদনা টীকা)। বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা-৭৩। আশ্বিন ১৪১১। অক্টোবর ২০০৪। ISBN-81-7079-901-5.।

১৬৭. ভট্টাচার্য অরূপকুমার। উপন্যাস শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। পুস্তক বিপণি। ১৯৮৯।

১৬৮. ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস । এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং, কলকাতা । শ্রাবণ ১৩৭২।

১৬৯. ভট্টাচার্য জগদীশ । আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী । ভারবি, কলকাতা । ১৯৯৪।

১৭০. ভট্টাচার্য জগদীশ । কবিমানসী, প্রথম খন্ড : জীবনীভাষ্য । ভারবি, কলকাতা । ১৯৯৭ ।

১৭১. ভট্টাচার্য জগদীশ । কবিমানসী, দ্বিতীয় খন্ড : কাব্যভাষ্য । ভারবি, কলকাতা । ২০০০।

১৭২. ভট্টাচার্য জগদীশ (সম্পাদিত) : তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা । ষোড়শ মুদ্রণ; অগ্রহায়ণ ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।

১৭৩. ভট্টাচার্য ড. বিজনবিহারী (সম্পাদক) । রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা, প্রথম খন্ড । বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন পক্ষে গ্রন্থনবিভাগ । ১৯৬৫।

১৭৪. ভট্টাচার্য তপোধীর । আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর । পুস্তক বিপণি, কলকাতা । দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ২০০৪।

১৭৫. ভট্টাচার্য তপোধীর । উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, ১লা বৈশাখ, ১৪১২।

১৭৬. ভট্টাচার্য তপোধীর, বাখতিন : তত্ত্ব ও প্রয়োগ। পুস্তক বিপনি। প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৯৬।

১৭৭. ভট্টাচার্য দেবীপদ। উপন্যাসের কথা। জি. এ. ই. পাবলিশার্স, ১৯৮২।

১৭৮. ভট্টাচার্য প্রদ্যুম্ন (সম্পাদিত)। তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য। সাহিত্য অকাদেমি। নতুন দিল্লী, ২০০১।

১৭৯. ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু ও সাহা দিলীপ । বাংলা প্রগতি সাহিত্য সময় ও সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ। বইমেলা ২০১১।

১৮০. ভট্টাচার্য সুকুমারী। প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:। বৈশাখ ১৪০১।

১৮১. ভট্টাচার্য সুকুমারী। নিয়তিবাদ : উদ্ভব ও বিকাশ। ক্যাম্প, ১৯৯৭। ISBN 81-86883-03-7।.

১৮২. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার। উপন্যাসের জীবন ও শিল্প। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৮।

১৮৩. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদিত) । তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য । পুস্তক বিপণি, কলকাতা । ১৯৯৮।

১৮৪. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার (সম্পা:)। পঞ্চাশের দশকের কথাকার। পুস্তক বিপণি। কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৮।

১৮৫. মজুমদার, ড. অমলেন্দু, ব্যানার্জী সুনীপা দেব । শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা । ক্যালকাটা বুক হাউস, ১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩ । মার্চ ২০১৯।

১৮৬. মজুমদার ড. সমরেশ। পুতুলনাচের ইতিকথা : উপন্যাসের মৌলিক নির্মাণ। রত্নাবলী, কোলকাতা-৯। ডিসেম্বর ২০০১।

১৮৭. মজুমদার সমরেশ। বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর। রত্নাবলী, কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৬।

১৮৮. মজুমদার মোহিতলাল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। বিদ্যোদয় লাই. প্রা. লি.। ১৯৭৯।

১৮৯. মজুমদার সঙ্গীতা । দুই দশকের বাংলা উপন্যাস (১৯৫০-১৯৭০)। গাঙচিল, কলকাতা । ২০১২।

১৯০. মন্ডল শ্রী সুধাংশুশেখর ও দাস ড. অরূপকুমার। (সম্পাদনা ও পরিমার্জনা)। উপন্যাস পরিক্রমা- ইতিহাস থেকে উপন্যাস : অরণ্যের অধিকার। বামা পুস্তকালয়, কলকাতা-৭৩। আগষ্ট ২০০৫।

১৯০. মাজী বিপ্লব (সম্পাদিত)। বাংলা উপন্যাস ২০০ বছর। অঞ্জলি পাবলিশার্স । ২০০৮।

১৯১. মান্না গুণময়। রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি। প্যাপিরাস। জানুয়ারি ১৯৯৩।

১৯২. মিত্র গজেন্দ্রকুমার । কথা কল্পনা কাহিনী । মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা । ১৩৮৭।

১৯৩. মিত্র ড. সরোজমোহন। শতবর্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা । ২০০৭।

১৯৪. মিত্র প্রেমেন্দ্র । নানা রঙে বোনা (বিচিত্র জীবন কথা) । চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এন্ড কোং, কলকাতা । ১৯৮০।

১৯৫. মুখোপাধ্যায় অমলকুমার। বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭)। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৯।

১৯৬. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার । কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর) । দে'জ, কলকাতা ।১৯৯৩।

১৯৭. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার। বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল, ষাটবছরের বাংলা উপন্যাস (১৯৪৯-২০০৯) । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১১।

১৯৮. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার। বাংলা কথা সাহিত্য জিজ্ঞাসা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ জুন, ২০০৪।

১৯৯. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস। দে'জ পাবলিশিং । পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৪০৮, জানুয়ারী ২০০২।

২০০. মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার। রবীন্দ্রমণীষা। ওরিয়েন্টাল কোম্পানি । ১৯৭৯।

২০১. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার। সাহিত্য এপার বাংলা ওপার বাংলা । দে'জ পাবলিশিং । ২০০৯।

২০২. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার। বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল, ষাটবছরের বাংলা উপন্যাস (১৯৪৯-২০০৯) । দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১১।

২০৩. মুখোপাধ্যায় অশোক। সংসদ বানান অভিধান। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। সেপ্টেম্বর ২০১৮। ISBN : 978-81-7955-175-X.।

২০৪. মুখোপাধ্যায় জগমোহন । গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। দ্বিতীয় মুদ্রণ। সেপ্টেম্বর ২০০৬।

২০৫. মুখোপাধ্যায় ড: বিমলাকান্ত। (অনু:)। বিশ্বনাথ কবিরাজ-কৃত: সাহিত্যদর্পণ:। সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার, কলকাতা-৬ । ২০০৮।

২০৬. মুখোপাধ্যায় তরুণ। প্রসঙ্গ পঞ্চভূত। পান্ডুলিপি। দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০২।

২০৭. মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার (সম্পাদিত)। তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে। রত্নাবলী, কলকাতা । ১৯৯৯।

২০৮. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবেশক,প্রথম খন্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা । বৈশাখ ১৩৭৭।

২০৯. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবেশক,দ্বিতীয় খন্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা । চৈত্র ১৩৮৩ ।

২১০. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবেশক,তৃতীয় খন্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা । শ্রাবণ ১৩৫৯ ।

২১১. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবেশক,চতুর্থ খন্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা । অগ্রহায়ণ ১৩৭১ ।

২১২. মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর। ভারতীয় সংবিধান : পঞ্চাশে পা। এন. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা-৩৫। প্রথম প্রকাশ ২২ জানুয়ারী ২০০০।

৮. মুখোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র সম্পাদিত। কঠোপনিষদ ১/৩/১৪। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী। প্রথম ভাগ। বসুমতী-সাহিত্য। ১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১২, ১৩৫৩।

২১৩. মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত) । বৈষ্ণব পদাবলী । সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা । প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৫৩।

২১৪. মুরশিদ গোলাম। নারী প্রগতি: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী। নয়া উদ্যোগ, কলকাতা। জানুয়ারি ২০০১।

২১৫. রায় অর্জুন (সম্পাদিত) । ভাঙা কাঁচের শিল্প: বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদল । প্রয়াস, কলকাতা । ১৯৯৪।

২১৬. রায় অলক। কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা। সাহিত্যলোক। ১৯৯২।

২১৭. রায় অলক। বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি। অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা। প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০১০।

২১৮. রায় তরুণকান্তি (সম্পাদিত)। গল্পকার তারাশঙ্কর : প্রতিভা ও মূল্যায়ণ। মনন প্রকাশন, নৈহাটি। ১৯৮৫।

২১৯. রায় দেবেশ । উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। জানুয়ারী ২০০৬।

২২০. রায় নীহাররঞ্জন । রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, (প্রথম খন্ড) । দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড, কলকাতা । ১৩৫১।

২২১. রায় নীহাররঞ্জন । রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, (দ্বিতীয় খন্ড) । দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেড, কলকাতা । ১৩৫১।

২২২. রায় নীহাররঞ্জন। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩। অষ্টম সংস্করণ: বৈশাখ ১৪২০। ISBN 81-7079-270-3।.

২২৩. রায় বিনয়ভূষণ। বাংলায় সতীদাহ : সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ণ। সাহিত্যশ্রী, কলকাতা। ১৯৮৬।

২২৪. রায় রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র মনন। পুস্তক বিপণি। ১৯৮৭।

২২৫. রায় রামমোহন। রামমোহন রচনাবলী। হরফ প্রকাশনী। এপ্রিল ১৯৭৩।

২২৬. রায় সত্যেন্দ্রনাথ। বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা। গ্রন্থালয় প্রা: লি:, কলকাতা-৭৩। ১ম সং ২২ শ্রাবণ ১৩৯৪।

২২৭. রায় শ্রী সুপ্রকাশ। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। ডি এন বি এ ব্রাদার্স। তৃতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৮০।

২২৮. রায় শ্রী সুপ্রকাশ। ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস। ভারতী বুক স্টল। কলিকাতা-৯। ১৯৪৯।

২২৯. রায় সত্যেন্দ্রনাথ । বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০০।

২৩০. রায় সত্যেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ। দে'জ পাবলিশিং। ১৩৮৭।

২৩১. রায়চৌধুরী গোপিকানাথ। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য। দে'জ পাবলিশিং। ১৯৮৬।

২৩২. রায়চৌধুরী গোপিকানাথ। বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা । ৩য় সংস্করণ ১৯৯৬।

২৩৩. রায়চৌধুরী বাঁশরী। 'জয়ানন্দ' ও 'লোচনদাসের' 'চৈতন্যমঙ্গলে' সমাজচিত্র। সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার, কলিকাতা-৬। প্রথম সংস্করণ- আশ্বিন ১৩৯৭।

২৩৪. রায়চৌধুরী সুদর্শন। ইন্দিরাশাহী। নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা । প্রথম সংস্করণ, ১ অক্টোবর, ১৯৭৭।

২৩৫. শ' রামেশ্বর। আধুনিক বাংলা উপন্যাস। উত্তরসূরী প্রকাশনী, ৯-বি, ৮ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা-৫০ । প্রথম প্রকাশ ১৯৮২।

২৩৬. শর্মা ড: প্রশান্ত কুমার । উচ্চমাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান (একাদশ শ্রেণী) । ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ৫/১ এ কলেজ রো; কলকাতা-৯ । ২০১৫-১৬ ।

২৩৭. শর্মা ড: প্রশান্ত কুমার । উচ্চমাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান (দ্বাদশ শ্রেণী) । ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ৫/১ এ কলেজ রো; কলকাতা-৯ । ২০১৬-১৭ ।

২৩৮. শিকদার অশ্রুকুমার। আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস। অরুণা প্রকাশন, কলকাতা। দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৩।

২৩৯. সমাদ্দার ভাস্বতী। বাংলা উপন্যাসের পালাবদল। পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ: বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৯৪।

২৪০. সরকার সুধীরচন্দ্র (সংকলিত) । পৌরাণিক অভিধান । এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা । ১৪১২ ।

২৪১. সরকার সুনীলকুমার। ফ্রয়েড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

২৪২. সরকার সৌম্যেন্দ্রনাথ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল (আক্ষটি খন্ড। কালকেতুর উপাখ্যান)। গ্রন্থবিকাশ, কলিকাতা-৭৩। দ্বিতীয় বামা সংস্করণ ১৫ই আগষ্ট ২০০০।

২৪৩. সরকার হরিচরণ । বঙ্গীয় শব্দকোষ । সাহিত্য অকাদেমী, কলকাতা । ১৯৭৮।

২৪৪. সান্যাল কমলকুমার। উপন্যাসমীক্ষা : বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫/১, বি. বিধান সরণী, কল-৬। প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৪।

২৪৫. সিদ্ধান্তবাগীশ হরিদাস। মহাভারতম্। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। চৈত্র ১৩৮৩।

২৪৬. সিংহ অসিত। বাংলা উপন্যাসে সমাজচিন্তার বিবর্তন। গ্রন্থমেলা, কলকাতা-৭। প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৩।

২৪৭. সেন অতুলচন্দ্র, তত্ত্বভূষণ সীতানাথ, ঘোষ মহেশচন্দ্র (অনুবাদ ও সম্পাদনা) । 'উপনিষদ', অখন্ড সংস্করণ, (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুন্ডক, মান্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাম্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কৌষীতকি) । হরফ, কলকাতা । ২০০০।

২৪৮. সেন অঞ্জন ও সিংহ উদয় নারায়ণ (সম্পাদিত)। উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১০।

২৪৯. সেন ক্ষিতিমোহন। প্রাচীন ভারতে নারী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। আষাঢ় ১৩৫৭।

২৫০. সেন দীনেশচন্দ্র। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। আগষ্ট ২০০২/ বি। ISBN-81-247-0540-2.

২৫১. সেন দীনেশচন্দ্র। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। আগষ্ট ২০০২/ বি। ISBN-81-247-0541-2.

২৫২. সেন দীনেশচন্দ্র।বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ,দ্বিতীয় খন্ড । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১৪।

২৫৩. সেন রুশতী । সমকালের গল্প উপন্যাস, প্রত্যাখ্যানের ভাষা। পুস্তক বিপণি। ১৯৯৭।

২৫৪. সেন সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড। আনন্দ। কলকাতা। জুন ২০০৪। ISBN 81-7066-966-9.

২৫৫. সেন সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড। আনন্দ। কলকাতা। কার্তিক ১৪১৪। ISBN 81-7215-025-3।

২৫৬. সেন সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খন্ড। আনন্দ। কলকাতা। অগ্রহায়ণ ১৪১২। ISBN 81-7215-103-9.।

২৫৭. সেন সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। চতুর্থ খন্ড। আনন্দ। কলকাতা। আগষ্ট ২০০৫। ISBN 81-7215-396-1.

২৫৮. সেন সুনীল । বাংলার তেভাগা সংগ্রাম (১৯৪৬-৪৭) । চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা । ১৯৯৩।

২৫৯. সেনগুপ্ত অচিন্ত্য। কল্লোলযুগ। ডি.এম. লাইব্রেরী। ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। কল-৬। ৩য় সংস্করণ ১৯৫৩।

২৬০. সেনগুপ্ত অমলেন্দু। জোয়ার ভাঁটায় ষাট-সত্তর। পাল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৯৭।

২৬১. সেনগুপ্ত চন্দ্রমল্লী। মিথ পুরাণের ভাঙা-গড়া । পুস্তক বিপণি, কলকাতা। এপ্রিল ২০০১ ।

২৬২. সেনগুপ্ত নীতিশ । বঙ্গভূমি ও বাঙালীর ইতিহাস। দে'জ। ২০০৮।

২৬৩. সেনগুপ্ত মল্লিকা। বিবাহবিচ্ছিন্নার আখ্যান: বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে। প্যাপিরাস। কার্তিক ১৪১৪।

২৬৪. সেনগুপ্ত মল্লিকা। স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা । ১৯৯২।

২৬৫. সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ। এস সি সরকার, কলকাতা। ৪র্থ সংস্করণ ১৩৫৯।

২৬৬. সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র। এস সি সরকার, কলকাতা। ১৩৬৮।

২৬৭. স্নাতকোত্তর পাঠক্রম MSW-13 & 14. । নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা। জুলাই, ২০১৭।

২৬৮. হালদার গোপাল । বাঙলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

২৬৯. হালদার শ্রী যোগিলাল সম্পাদিত ''রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন''। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫৭।

২৭০. আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন সাত দশক: সমকাল ও আনন্দবাজার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কল-৯। প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৯।

২৭১. B. Ed (SE-DE) BANGLA PROGRAMME, SECP-04: INTRODUCTION OF DISABILITIES. A collaborative Programme of Netaji Subhas Open University and Rehabilitation Council of India. অক্টোবর ২০১৩।

সহায়ক ইংরাজী গ্রন্থ

1. Abrams M. H., A Glossary of Literary Terms. Earl Mcpeek. ISBN 981-243-668-5
2. Bailey, Greg. Ganesapurana : Introduction, translation, notes and index. Berlin : Otto Harrassowitz Verlag. ISBN 3-447-03647-8. 1995
3. Banerjee Debiprasad "Premendra Mitra" : Sahitya Akademi, Kolkata 1999.
4. Basu Nirmal Kumar, "Calcutta : A Premature metropolis", Cities, Alfred A. KNopt, Kolkata 1971.
5. Coomaraswamy, Ananda K ; Sister Nivedita (2003). Myths of the Hindus and Buddhists. Kessinger Publishing.. ISBN 0-7661-4515-8.
6. Dutt, Dr. Ramesh Chandra. The Economic History of British India. London. Keganpaul, Trench, Triibner & Co, 1902.
7. Forster E.M. , Aspects of the Novel. Penguin. London, 1990.First Publication : Edward Arnold, 1927.
8. Ganguly B.N. Indian Economic thought : Nineteenth century perspectives. New Delhi. Tata McGraw Hill, 1977.
9. Malinowski Bronislaw.Magic, Science and Religion and other Essays.Doubleday.Anchor Books.Garden City.New York.1984
10. Sarkar Sumit, Modern India (1885-1947),MACMILLAN INDIA LIMITED.Delhi Bombay Calcutta Madras. 1959,SBN 33390 425 7.
11. Stedman, Edmund Clarence, A Victorian anthology. Cambridge : Riverside Press, 1895
12. The New Oxford Dictionary of English, Oxford : Clarendon Press, 1998, ISBN 9780198612636.

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১. কোরক সাহিত্য পত্রিকা। মহাশ্বেতা দেবী সংখ্যা। বইমেলা ১৯৯৩।

২. কোরক সাহিত্য পত্রিকা। বিমল কর সংখ্যা। বইমেলা ১৯৯৭।

৩. দেশ,সমরেশ বসু স্মরণে,১৪মে ১৯৮৮।

৪. পরিচয় পত্রিকা, মে-জুলাই, ১৯৯৮।

৫. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-২০০৬-২০০৭।

৬. বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-২০০৭-২০০৮।

৭. International Research Journal "Persons with special Needs and Rehabilitation Management (Vol-I, ISSN: 2321-9254), Special Education & HEPSN Cell, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মার্চ,২০১৩ ।

বৈদ্যুতিন মাধ্যম

1. https://en.wikipedia.org/wiki/OedipusThe
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Dr._Strangelove
3. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Jefferies_%28comedian%29
5. https://james-camerons-avatar.fandom.com/wiki/Jake_Sully
6. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jimmy_Timmy_Power_Hour
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Professor_X 8.
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Rhyme:_Hunt_for_the_Bone_Collector
9. https://familyguy.fandom.com/wiki/Joe_Swanson
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Hephaestus
11. https://en.wikipedia.org/wiki/Changeling
12. https://en.wikipedia.org/wiki/Lesbian
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Hijra_%28South_Asia%29
14. https://en.wikipedia.org/wiki/Eunuch
15. https://www.britannica.com/topic/disability-studies
16. https://en.wikipedia.org/wiki/Disability_studies
17. http://displacementsolutions.org/wp-content/uploads/THE-HIND U-INHERITANCE-REMOVAL-OF-DISABILITIES-ACT-1928.pdf)
18. https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_Inheritance_(Removal_of_Disabilities)_Act,_1928#:~:text=The%20Hindu%20Inheritance%20(Removal%20of,their%20ability%20to%20inherit%20property.)
19. https://www.google.co.in/search?hl=en-IN&gbv=2&q=RCI+Act+1992+summary&sa=X&ved=2ahUKEwjU6JTpg4XvAhWEf30KHYYFC9IQ1QJ6BAgJEAQ
20. https://www.google.co.in/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://www.dwdsc.kar.nic.in/docs/Sahaya%2520Hastha/15.pdf&ved=2ahUKEwjU6JTpg4XvAhWEf30KHYYFC9IQFjAJegQICBAB&usg=AOvVaw15y4Zg1jrm2xE-DnC7fq63
21. https://www.thenationaltrust.gov.in/content/innerpage/introduction.php
22. https://legislative.gov.in/actsofparliamentfromtheyear/rights-persons-disabilities-act-2016
23 http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL
24 https://en.m.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_India